পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মাসিক মুখপত্র

বিশেষ সংখ্যা : রবীন্দ্রনাথ

বর্ষ ৩৬ ।। সংখ্যা ২৪

মে, ২০০৩

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৪১০

✿ ✿ ✿

প্রধান সম্পাদক **সুখেন্দু দাস**

সম্পাদক **সুপ্রিয়া রায়**

সহকারী সম্পাদক

মন্দিরা ঘোষাল স্মরজিৎ প্রামাণিক

সংগ্রাম গুহ সেরিনা জাহান

প্রচ্ছদ সজ্জা : শুভ্র চক্রবর্তী অঞ্জন খান

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
মানস মুখোপাধ্যায় স্বপন সোম অরুণকুমার বসু
অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষ চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রথম : রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় : রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্র

প্রথম পটচিত্র : ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত ডাকঘর নাটকের দৃশ্য

দ্বিতীয় পটচিত্র : নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর কলকাতার ওরিয়েন্ট ক্লাবে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা

মূল্য : তিরিশ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা :
একশ টাকা (বিশেষ সংখ্যাসহ)

সম্পাদকীয় শাখা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
মহাকরণ (চতুর্থ তল)
কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২১৪-৩০১১
২২১৪-৫৬০০
(এক্স-৪৭১০)

বিতরণ শাখা
সফদর আলি খান
বিজনেস ম্যানেজার
৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২৪৩-৬২৯৫

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রসংগীত : এক বিস্তৃত মানবিক আকাশের সন্ধান

ভোগসর্বস্ব ব্যস্ত আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকট হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের অবনতি। সত্য-সুন্দরের সাধনা থেকে মানবমন বিচ্যুত, বিভ্রান্ত, অস্থির। মূল্যহীন হয়ে পড়ছে চিরায়ত সম্পর্কের বন্ধন। বিপন্ন জাগতিক পরিবেশ, মানবিক পরিবেশ। বিপন্ন জীবনচর্যার আনন্দময় প্রেক্ষাপট।

এই বিপন্ন মুহূর্তে, এই অস্থির ক্ষণকালে এক বিপুল বিস্তৃত মানবিক আকাশের নীচে, অমৃতবাণীর ঝরনাতলায় আমাদের অবগাহন, নিভৃত আশ্রয়—রবীন্দ্রসংগীতে, যা এক যথার্থ জীবনসংগীত। শুধু কথা, সুর, ছন্দ, তাল নয়—ক্ষুদ্রতার, তুচ্ছতার সমস্ত সীমানা ভেঙে, জীবন-অতিক্রমী এক মহাজীবনের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় রবীন্দ্রসংগীত। অনুভব অভিজ্ঞতার হাজারো পরত পেরিয়ে জীবনের গভীর উপলব্ধির এক সহজতম পথের, এক মানবিক আকাশের সন্ধান দেয় এই গান। অলোকসামান্য এই সংগীত আধুনিক জীবনকে শুভবোধে, শুদ্ধবোধে জারিত করতে আরও বেশি করে হয়ে উঠছে জীবনচর্যার অঙ্গ। সংগীতের সীমানা ছাড়িয়ে হয়ে উঠছে জীবনদর্শন, জীবনধর্ম। দিশাহারা মানুষের কাছে সত্য আলো উদ্ভাসের প্রবল প্রাসঙ্গিকতায় রবীন্দ্রসংগীতের মোহন ভূমিকা প্রতিদিনই এই পৃথিবী আরও বেশি করে উপলব্ধি করছে।

সেকারণেই 'রবীন্দ্রসংগীত' শীর্ষক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা শুধু কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের যে উন্নয়নচিত্র পত্রিকায় তুলে ধরা হয়, এও সেই ধারাবাহিকতাতেই নবতম সংযোজন। সব উন্নয়নের শেষ কথা মানুষ। মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণা থেকে বলা যেতে পারে, মানুষের আত্মিক উন্নয়ন, জীবনবোধের উন্নয়ন না ঘটলে এই রাজ্যের বিপুল মানবসম্পদ উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় সদর্থক ভূমিকা নিতে পারবে না। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের জীবনমান উন্নয়নে নিতে পারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। শুধুমাত্র শিক্ষিত-সংস্কৃতিবান মানুষের পরিশীলিত জীবনবোধের অঙ্গরূপেই নয়, নিভৃত প্রাণের দেবতা হিসেবেই নয়—ব্যক্তিবোধের প্রকোষ্ঠ থেকে এই অমূল্য সম্পদকে বের করে এনে আজ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে আরও প্রবলভাবে, ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের দায়বদ্ধতার পাশাপাশি রবীন্দ্র অনুরাগী প্রতিটি মানুষের গভীর সাহচর্য প্রত্যাশিত।

'রবীন্দ্রসংগীত' শীর্ষক এই বিশেষ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও গবেষক এবং সৃজনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রবীন্দ্রসংগীত সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারভিত্তিক বিভিন্ন অভিমত ও প্রতিবেদনে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রবন্ধকার বা শিল্পীর অভিমত নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গ

রবীন্দ্রসংখ্যা

মে, ২০০৩

বিষয়সূচি

র•বী•ন্দ্র•স•ং•গী•ত

জীবনস্মৃতি-র মাঝগগন থেকে গানের পূর্বাচলে ফেরা

784/2(৩)

অরুণকুমার বসু

জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী। যদিও এর কালপরিধি শৈশব থেকে সদ্য-উপনীত যৌবন পর্যন্ত। এই স্মৃতিচারণা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছেন। এই বয়সে পূর্ব দিগন্তের দিকে চোখ মেলে যা কিছু দেখা যায়, তার কিছুটা ছবির রঙে-রেখায় আঁকা হয়ে ওঠে। কিছুটা সুর হয়ে গুনগুনিয়ে ওঠে। জীবনস্মৃতি কালাঙ্ক-চিহ্নিত ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। যে বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলির স্মৃতিচিত্র এই বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠার অ্যালবামে স্পষ্টে-অস্পষ্টে ফুটে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রতিকৃতি

উঠেছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সবকটি লক্ষণই মুখ বাড়িয়েছে। তাঁর নির্জনপ্রিয়তা, তাঁর প্রকৃতিবিস্ময়, ছন্দের দিকে শ্রবণের টান, সংগীতের প্রতি স্নায়ু ও শিরার স্পন্দন, তাঁর কাব্যপ্রীতি : জীবনস্মৃতির সর্বত্র এসবের অনুকূলে অসংখ্য সাক্ষীসাবুদ ছড়িয়ে আছে। জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ থেকে কবি যখন বিদায় নিয়েছেন, তখন সবে কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) বেরিয়েছে। পঁচিশের কোঠায় পা রাখতে চলেছেন তিনি। এই বয়সের ভিতর তাঁর কিছু গদ্য রচনা, বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাস ও আরও কয়েকটি গল্প জাতীয় আখ্যান এবং কাব্যনাট্য গীতিনাট্য বেরিয়েছে, 'রবিচ্ছায়া' নামে একখানি গানের বইও প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থই তালিকায় সর্বাধিক। তরুণ কবি রূপে সমকালীন সাহিত্য-সমাজে তাঁর ছোটোখাটো একটি আসনও তৈরি হয়ে গেছে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় কবিতার প্রতি দুর্বলতা, কাব্যচর্চার সূচনা ও বিস্তার, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ, কবিত্বের নিবিড় উপলব্ধি ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার উপাদানগুলিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিয়েছেন। তবু মনে হয়, সংগীতের প্রতি দুর্মর আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথের সৃজনসত্তার স্থায়ী ভাব। জীবনস্মৃতির সাক্ষ্য তাই বলে।

সে বিষয়ে তথ্য পেশের আগে ভূমিকায় আরও দু-চারটি কথা মনে আসে। জীবনস্মৃতির পাঠককে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই জানিয়ে দেন যে, বইটি চিত্রশালা জাতীয়। 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।' 'এই রূপে বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে। আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে।' ছবি

সংগীতের প্রতি দুর্মর আকর্ষণই রবীন্দ্রনাথের সৃজনসত্তার স্থায়ী ভাব। জীবনস্মৃতির সাক্ষ্য তাই বলে।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ এবং রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ

চিত্র এবং সংগীতেই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

মাত্রই নিঃশব্দ, মৌন দিয়ে ঘেরা। সবাক্ অতীতের কোনো ধ্বনিত মুহূর্ত ছবিতে ধ্বনিহীনতায় অনূদিত হয়ে যায়। চিত্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতিনিমগ্ন ধ্বনি, সেই সরব উচ্চারণ, সেই গুঞ্জিত গীত সুর যেন পুনর্ধ্বনিত হয়ে ওঠে। তাই জীবনস্মৃতি কেবলই ছবির প্রদর্শনী নয়। ছবির সঙ্গে গান এখানে হাত ধরাধরি করে চলেছে। তাই ছবি ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে ছবির আনুষঙ্গিক কথাগুলির সুরগুলি। জীবনস্মৃতি তাই স্মৃতিবাহিত কথা ও সুরের অনুরণন। 'সাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "চিত্র এবং সংগীতেই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ"। তবে এই চিত্রময়তা ও সংগীতধর্মিতা হল জীবনস্মৃতির ভাষাগত গুণ। আর আমাদের আলোচ্য জীবনস্মৃতিতে দেখতে চেয়েছি গানের প্রসঙ্গ কতবার এসেছে। জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ-সীমায় যখন এসে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তখন তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে সংগীত রচনার সংখ্যা ও গৌরব নিতান্ত কম ছিল না। তখনও রবীন্দ্রসংগীত শব্দটি লোকমুখে ঠাঁই পায়নি। অথচ তাঁর গীত রচনার সংখ্যা হাজার পেরিয়ে গেছে। আর জীবনস্মৃতির এলাকা যে পঁচিশ বছরে এসে থেমেছে, তখন পর্যন্ত তাঁর গানের পরিমাণ চারশো পেরিয়ে গেছে। জীবনস্মৃতির অজস্র অধ্যায়ে গানরচনা ও গীতিচর্চার উপাদান প্রকীর্ণ হয়ে আছে। তাঁর জীবনসূচনার ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকেই তিনি দেখে এসেছেন পরিবারের গৃহে গৃহে আনাচে-কানাচে অঙ্গনে-প্রাঙ্গণে গানের প্রবাহ চলেছে। তাঁর পিতা থেকে শুরু করে অগ্রজ-অনুজ আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই যেন গীতসুধার জন্যে 'চিত্ত পিপাসিত রে'। 'প্রাণে গান নাই মিছে তাই ফিরিনু যে' এমন গীতরিক্ত নীরস ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া বোধহয় এই পরিবারে সেকালে দুর্ঘট ছিল। তখনকার কলকাতার সংগীতচর্চার অতিবৃষ্টি চৌকাঠহীন এই পরিবারকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। তাছাড়া তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজে পৌত্তলিক

আচার-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় সংগীতচর্চার উপর ব্রাহ্মদের মনোযোগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঠাকুরবাড়ি ছিল ব্রাহ্ম সমাজের বৃন্দাবনধাম। তাই সংগীতমুখর ব্রাহ্ম-উৎসবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, মহর্ষি ভবন হয়ে উঠেছিল ব্রহ্মসংগীতের রাজধানী। শুধু ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেই নয়—মনোরঞ্জন ও চিত্ততোষণের উপকরণরূপে বিশুদ্ধ সংগীতের অনুশীলনও ছিল এই পরিবারের সংস্কৃতি ও শীলাচরণের সুনির্দিষ্ট বিধান। এর ফলে অংশত পরিবেশ-প্রভাবে এবং অংশত স্বভাবের সহজাত সাংগীতিক বোধে গানের প্রতি যে আগ্রহ ও অনুরাগ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য-কৈশোরে অর্জন করেছিলেন, তা যথাসময়ে নিজস্ব সংগীতরচনায় স্বাধীনভাবে জারিত হতে পেরেছিল। জীবন স্মৃতির 'গীতিচর্চা' অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন :

> "আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়ে উঠিতেছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনও অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

'পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায়। আমি বেহাগে গান গাহিতেছি'।
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

উদ্ধৃতীর শেষাংশের ভাষাকে কবির সর্বতোভদ্র সৌজন্যবোধ বিনয় নম্রতার উদাহরণ বলে মনে করা যেতে পারে। বস্তুত কবির কাব্যলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মী এক দেহেই বিরাজমানা ছিলেন। তাই স্মৃতির পটে জীবনের ছবি আঁকার মধ্যে বারে বারেই এসে পড়েছে এই গীতচর্চার স্মৃতি, এই আবাল্য-আস্বাদিত গীতিরসের মধুর স্মরণখানি। পিতৃনির্দেশে গীতশিক্ষা ছিল পরিবারের শিশুদের অবশ্য অনুশীলনেরই অঙ্গ, সচল পাঠক্রমের অপরিত্যাজ্য ধ্রুবপদ। ব্রাহ্ম সমাজের বেতনভুক্ গায়ক সংগীতাচার্য বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে প্রতি রবিবার নির্দিষ্ট সময় গান শিখতে হত বালক কবিকে, 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ে সে কথা জানিয়েছেন তিনি। পরিণত বয়সে লেখা ছেলেবেলা (১৯৪০) বইতে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

> "সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই ঘর্ঘর শব্দে। এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসনকর্তা।....বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নিচের তলায়।....
>
> আমার দোষ হচ্ছে। শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছে মতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই।"

পরিবারে বহিরাগত গীতানুরাগীদের কাছে কিশোর রবীন্দ্রনাথের সুকণ্ঠ ও সংগীতদক্ষতার পরিচয় অবিদিত ছিল না। শ্রীকণ্ঠ সিংহ নামে সুরুল সিংহ-বাড়ির সদাশয় ব্রাহ্ম বৃদ্ধ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত শিষ্য, যিনি প্রায়ই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। 'শ্রীকণ্ঠবাবু' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছিলেন :

> "গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল ময় ছোড়োঁ ব্রজকি বাঁসরী। ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝংকার দিতেন, এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ময় ছোড়োঁ' সেইখানটিতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যেন সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো-লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।"

তাই স্মৃতির পটে জীবনের ছবি আঁকার মধ্যে বারে বারেই এসে পড়েছে এই গীতচর্চার স্মৃতি, এই আবাল্য-আস্বাদিত গীতিরসের মধুর স্মরণখানি। পিতৃ নির্দেশে গীত শিক্ষা ছিল পরিবারের শিশুদের অবশ্য অনুশীলনেরই অঙ্গ, সচল পাঠক্রমের অপরিত্যাজ্য ধ্রুবপদ।
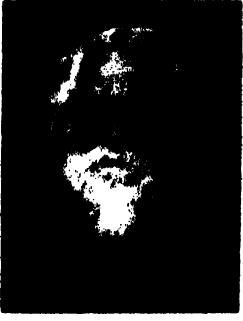
জীবনস্মৃতির একাধিক পৃষ্ঠায় এক কিশোরী চাটুজ্যের উল্লেখ আছে। তাঁর কণ্ঠে পাঁচালি গান শুনে তার ভাষা-ছন্দ-সুরের লৌকিক দোলায় শিশুমন দুলে উঠত। কিশোরী চট্টোপাধ্যায় মহর্ষিদেবের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। এই কিশোরীর সঙ্গেই পিতৃদেব বালক রবীন্দ্রনাথকে হিমালয় থেকে কলকাতায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। 'প্রত্যাবর্তন' অধ্যায়ে এর কথা কবি লিখেছেন

> "আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে এক কালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায়ই বলিত, 'আহা দাদাজি তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দল এমন জমাইতে পারিতাম সে আর কী বলিব।' শুনিয়া ভারি লোভ হইত, পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশ দেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিখিয়াছিলাম....এই গানগুলিতে আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিত এমন সূর্যের অগ্নি-উচ্ছ্বাস বা শনির চন্দ্রময়তার আলোচনায় হইত না।"

পরবর্তী জীবনে ছড়ার ছবি'র 'বালক' কবিতায় (আষাঢ় ১৩৪৪) এই পাঁচালি-ঘটিত স্মৃতির পুনরুল্লেখ ঘটেছে, যদিও কিশোরী চাটুজ্যের নাম হয়েছে কঙ্কালী চাটুজ্যে :

> কঙ্কালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে ;
> বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
> দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া ;
> থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—
> মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
> ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে
> ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
> গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

জীবনস্মৃতির পাতায় গাঁথা এই পাঁচালি গান শোনার স্মৃতি ও পাঁচালি গায়ক হওয়ার অবচেতন ইচ্ছে বহন করে তাঁর ছোটো গল্পে এসেছিল 'আপদে'র নীলকণ্ঠর মতো, বা 'অতিথি'র তারাপদর মতো কিশোর। তাঁর গীতসৃষ্টিতে পাঁচালির কোনো দূরতর প্রভাব পড়েছে কিনা, সে তথ্যসন্ধানের স্থান এই প্রবন্ধ নয়।

জীবনস্মৃতির একাধিক পৃষ্ঠায় এক কিশোরী চাটুজ্যের উল্লেখ আছে। তাঁর কণ্ঠে পাঁচালি গান শুনে তার ভাষা-ছন্দ-সুরের লৌকিক দোলায় শিশুমন দুলে উঠত।

গান-গাওয়াই শুধু নয়, গুরুজনদের মতো গীতরচনাতেও অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়েছিল। 'গীতচর্চা' অধ্যায়ে এই কাজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণার কথা স্বীকার করেছেন :

> "এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়া ছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আয়ত্ত হইয়াছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গান রচনার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-তে আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-তে নেই।

২

হিন্দুমেলা রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় সমকাল থেকে কলকাতার বার্ষিক একটি সাংস্কৃতিক আনন্দমেলা হয়ে উঠেছিল। সেই মেলায় নিয়মিত দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটি হিন্দুমেলার সর্বাধিক জনপ্রিয় দেশপ্রেমাত্মক গানের মর্যাদালাভ করেছিল। ঠাকুর পরিবারের অন্য অনেকেরই গান হিন্দুমেলায় শোনা যেত। এমনকী কিশোর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও উত্তেজক কবিতা বা গান পরিবেশিত হয়েছে। তার একাধিক পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের কয়েকটি স্বদেশগর্বিত গান এই পারিবারিক গীতরচনার প্রেরণাজাত। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা-লেখার সঙ্গে গীতরচনায় ও সুরযোজনায় নিজস্ব একটি অন্তর্বেগ খুঁজে নিতে চাইছিলেন। বিলেত যাওয়ার পথে সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের শাহিবাগ বাসভবনে। সেখানকার পরিবেশে নিজস্ব গীতসৃষ্টির একটি প্রবণতা ক্রমশ তীব্রতা পেতে লাগল। জীবনস্মৃতিতে তার বিবরণ আছে 'আমেদাবাদ' অধ্যায়ে :

> "শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে বলি ও আমার গোলাপবালা গানটি এখনও আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।"

অপেক্ষাকৃত যৌবনে মাঘোৎসবের জন্য ব্রহ্মসংগীত রচনা করা তাঁর আনন্দকৃত্যে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথের চুঁচুড়া-চন্দননগরে অবস্থানকালে পিতৃদেবকে মাঘোৎসবের গান শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ পারিতোষিক পেয়েছিলেন। বড়ো বয়সের এই স্বীকৃতির স্মৃতি জীবনস্মৃতির 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়ে তিনি পাঠকদের শুনিয়েছেন, পুত্রকন্যাদের গীতরচনায় পিতৃদেবের উৎসাহদানের স্মারক রূপে।
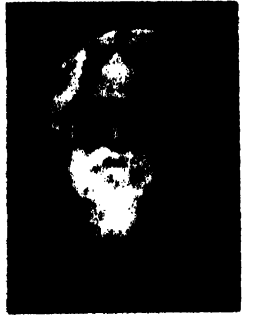
রবীন্দ্রনাথের সতেরো বছর বয়সে ইংলন্ডে পড়তে যাওয়া ও সেখানে কিছুকাল কাটানোর যে স্মৃতি জীবনস্মৃতিতে আছে সেখানেও সংগীতপ্রসঙ্গ অনুপস্থিত নয়। অন্তত বিলিতি গান শেখার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। এমনকী কোনো বিদেশিনী গৃহকর্ত্রীর অনুরোধে একটি ইংরেজি লোকসংগীত বেহাগ রাগে পরিবেশন করতে হয়েছিল, এই সরস-করুণ ঘটনাটিও জীবনস্মৃতি পাঠকের অজানা থাকে না। বিদেশে বাসকালে দু-চারটি আইরিশ স্কটিশ বা ব্রিটিশ লোকগীতি তিনি শিখেছিলেন। পাশ্চাত্য সংগীতের এইসব লঘু উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া পাশ্চাত্য সংগীতের গভীরে প্রবেশ করা নয়। এ সত্য তিনি অস্বীকার করেননি। তবে আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, মহাসমুদ্রের উপকূলবর্তী উপল-সংগ্রহের মতো এই শিক্ষাও নিষ্ফল হয়নি। এই নিতান্ত সামান্য অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিভাকে স্বকীয় সৃষ্টির দিকে কিছুদুর চালিত করেছিল। অন্তত প্রত্যাবৃত্ত জীবনে বাল্মীকি প্রতিভা কালমৃগয়া ইত্যাদি গীতিনাট্যে তার ছায়া রয়ে গেছে। 'বিলাতি সংগীত' অধ্যায়ে পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে তরুণ কবির প্রথম সম্পর্কজনিত রহস্যময়তার বোধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবনার কথা আমরা পেয়েছি। তিনি অন্তত এটুকু বুঝেছিলেন যে,

> "আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুখ্য, সেই গানেই আমাদের যত কিছু দুরূহতা ; য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে।"

বিলাত-প্রবাসকালে অর্জিত কিছু বিদেশি গানের সুর এবং বিলেতে দেখা দু চারটি অপেরার স্মৃতি সম্বল করে, তার সঙ্গে জ্যোতিদাদার শেখানো অনেকগুলো গতের সুর ও আত্মলব্ধ কিছু পূর্বতন সাংগীতিক অভিজ্ঞতা মিশিয়ে বিলেত থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) এবং কালমৃগয়া (১৮৮২) রচনা করেছিলেন। তার ইতিহাস-ভূগোল জীবনস্মৃতি থেকেই আমরা জানতে পেরেছি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভা-বিকাশের তথা সংগীত-রহস্যভেদের অবিশ্বাস্য সূত্রগুলি জীবনস্মৃতিতেই গেঁথে রেখেছেন তিনি। তারই অংশ বিশেষ উদ্‌ধৃত হচ্ছে :

> 'এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।...সংগীতকে এইরূপ নাট্যকাব্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধন মোচন এবং তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আমোদ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।...বস্তুত বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে। উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা। অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুরে নাটিকা ; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই। ইহার নাট্য বিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র। স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।'

জীবনস্মৃতির সূচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল চিত্র বিন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে বিলাতি সংগীত বা বাল্মীকি প্রতিভা অধ্যায় সে তুলনায় আদৌ ছবির মালা নয়—এইগুলি যথার্থই জীবনীর উপকরণ। তাই রবীন্দ্রনাথের একখানি সাংগীতিক জীবনী গড়ে তোলার পক্ষে জীবনস্মৃতির মতো গুরুতর আর কোনো গ্রন্থই নেই।

বাল্মীকি প্রতিভার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর বৎসর কালমৃগয়া গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। কালমৃগয়া বাল্মীকি প্রতিভার পরিপূরক। 'তেতালার ছাদে স্টেজ খাটাইয়া ইহার অভিনয় হইয়াছিল' বলে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত 'বাল্মীকি প্রতিভা' অধ্যায়ে জানিয়েছেন। 'ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।' মায়ার খেলা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় গীতিনাট্য, বাল্মীকি প্রতিভার প্রায় আট বছর পরে লেখা। বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়ার সঙ্গে মায়ার খেলার পার্থক্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও অমোঘ ভাষ্যটীকাসূত্র এই বাল্মীকি প্রতিভা অধ্যায়েই নির্ধারণ করে গেছেন তিনি :

> "ইহার অনেককাল পরে মায়ার খেলা বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য , বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"

এর সঙ্গে বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়ায় 'অভিনয়টাই মুখ্য' ছিল।

৩

অতএব বিলেত-প্রত্যাগত জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন গীতিরচনার ও সুরযোজনার ইতিহাসের সূত্রপাত। যে রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল সম্পদে আজ আমাদের অনায়াস অধিকার, যে রবীন্দ্রগীতসুধারসে

যে রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল সম্পদে আজ আমাদের অনায়াস অধিকার, যে রবীন্দ্রগীত-সুধারসে আজ আমাদের তৃপ্তিহীন পিপাসা, সেই সংগীতকে আপনার করে আবিষ্কার করলেন কবি তাঁর কুড়ি-বাইশ বছর থেকেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন সেই রবীন্দ্র তরণীর কর্ণধার।

আজ আমাদের তৃপ্তিহীন পিপাসা, সেই সংগীতকে আপনার করে আবিষ্কার করলেন কবি তাঁর কুড়ি-বাইশ বছর থেকেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন সেই রবীন্দ্রতরণীর কর্ণধার। তাঁর উৎসাহে প্রেরণায় সহায়ক শক্তিতেই রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক সত্তা আপন স্বকীয়তায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। এই বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতির দাম আছে :

> "তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না ; তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরল-বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকর বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে ; তখন নব যৌবনে নব নব উদ্যমে নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে ; তখন সকল জিনিসই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না ; তখন লিখিতেছি গাহিতেছি অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।"

পাশ্চাত্য সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অধিকার ছিল। বিলাত-ভ্রমণ না করেও তিনি বিলাতি সংগীত কলকাতায় বসেই শিক্ষা করেছিলেন। পিয়ানো ক্লারিওনেট অর্গান ভায়োলিন প্রভৃতি বিদেশি বাদ্য অনায়াসে বাজাতে পারতেন, পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশান তাঁর করায়ত্ত ছিল। তিনিই সহজ স্বরলিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করে গীতলিপি রক্ষা করার উপায়কে এ দেশে জনপ্রিয় করেছিলেন। অথচ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত দেশি লোকসংগীত এসবের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর দুর্বলতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের ভিতরকার প্রাণশক্তির তুলনা করার দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন বা দুরূহ হয়নি। যে সাংগীতিক উত্তেজনাবশত রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া রচনা করেছিলেন, তাকে জীবনস্মৃতিতে তিনি বলেছেন 'গীত বিপ্লবের প্রলয়ানন্দ'। 'উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরাজি-বাংলার বাছবিচার নাই' অথচ পাশ্চাত্য সংগীত ও ভারতীয় সংগীতের গভীর অন্তর্নিহিত বিরোধের এলাকাটিকে কিছুটা বুঝে নিতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ইউরোপ-প্রবাসের সময় থেকে জীবনস্মৃতি লেখার সময় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই উভয় সংগীত-

পাশ্চাত্য সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাভাবিক অধিকার ছিল। বিলাত-ভ্রমণ না করেও তিনি বিলাতি সংগীত কলকাতায় বসেই শিক্ষা করেছিলেন।

সংগীতচর্চায় নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

সংস্কৃতির তুলনাত্মক ধারণাটি মোটের উপর অপরিবর্তিতই ছিল। তাই জীবনস্মৃতির এই প্রাসঙ্গিক সংগীতচিন্তা এখানে স্মরণ করতেই হয়—

> "কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার এই কথা মনে হয় যে, য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন, ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের সুর খাটানো চলে ; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এইজন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য। সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবহৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত ; সেই রহস্য-লোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরামকুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্মনিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।...আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে

কোথাও কোথাও সে চেষ্টা হয় নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণ রাগকে ভাষা দিতেছে ; আমাদের গান ঘন বর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।"

৪

জীবনস্মৃতির বাল্মীকি প্রতিভা অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ হার্বার্ট স্পেনসরের 'অরিজিন অ্যান্ড ফাংশান অফ মিউজিক' নামের এক তত্ত্বগ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়ের কথা লিখেছেন। কবির ভাষায় :

> "হার্বার্ট স্পেনসরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেনসরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে ও তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে। অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ, ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে ; ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে।"

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ (১২৯৭)

জীবনস্মৃতির এই অংশ পাঠ করলে মনে হয়, হার্বার্ট স্পেনসরের উক্ত প্রবন্ধপাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই বাল্মীকি প্রতিভা রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, বাল্মীকি প্রতিভা লিখিত ও অভিনীত হওয়ার পর হার্বার্ট স্পেনসরের প্রবন্ধটি তাঁর হাতে এসেছিল। জীবনস্মৃতি লেখার সময় সম্ভবত সে কথা তাঁর স্মরণে ছিল না। বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ের তারিখ ১৬ ফাল্গুন ১২৮৭। বাল্মীকি প্রতিভার উপকরণ দিয়ে তিনি 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন ও বেথুন সোসাইটিতে সেটি পড়ে শোনান ৯ বৈশাখ ১২৮৮ তারিখে। ভারতী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হয়। ওই পত্রিকার আষাঢ় ১২৮৮ সংখ্যায় তাঁর আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা : হার্বার্ট স্পেনসরের মত'। এই প্রবন্ধ শুরু হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে :

> 'সংগীত ও ভাব'—নামক প্রবন্ধ রচনার পর হার্বার্ট স্পেনসরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম The Origin and Function of Music-নামক প্রবন্ধে যে সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে, এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।"

বাল্মীকিপ্রতিভা-র রচনা ও অভিনয় এবং তারই সাংগীতিক উপকরণগুলির সাহায্যে 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলার সঙ্গে আরও কয়েকটি সংগীত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতি-তে। বেথুন সোসাইটি-র সদস্যদের সামনে প্রায়-কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি পাঠ করলেন, সঙ্গে গান গেয়ে শ্রোতাদের কাছে বক্তব্য ব্যাখ্যা করে শোনালেন। সভাপতি রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে 'বন্দে বাল্মীকি কোকিলং' বলে কুড়ি বছরের বক্তাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে লেখা হয়েছে :

> "প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা

জীবনস্মৃতির এই অংশ পাঠ করলে মনে হয়, হার্বার্ট স্পেনসরের উক্ত প্রবন্ধপাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই বাল্মীকি প্রতিভা রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, বাল্মীকি প্রতিভা লিখিত ও অভিনীত হওয়ার পর হার্বার্ট স্পেনসরের প্রবন্ধটি তাঁর হাতে এসেছিল।

করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

কিন্তু কালক্রমে এই মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের যোগ শিথিল হয়ে গেছিল। জীবনস্মৃতি-তে তারও অকপট স্বীকৃতি আছে। এই মত-পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বয়সের অভিজ্ঞতা হলেও এই প্রসঙ্গেই সে কথা তিনি ঘোষণা করে দিয়েছেন। সংগীত-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশ্বাস ও দৃষ্টিকোণের কারণে তাঁর ভাষ্য সবটাই উদ্ধারযোগ্য :

> "কিন্তু যে-মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে-কথা আজ স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া। সেখানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো ; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এইজন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যত কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানী গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বরূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেখানেই সংগীতের উৎকর্ষ।"

হিন্দুস্থানী গানে কথার অকিঞ্চিৎকরতা মেনে নিয়ে সুরের সর্বাত্মক অভিভব স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে বাংলা গানের কথা হিন্দুস্থানী সংগীতের মতো এত নিরর্থক নিশ্চেষ্ট নয়।

এই আলোচনায় হিন্দুস্থানী গানে কথার অকিঞ্চিৎকরতা মেনে নিয়ে সুরের সর্বাত্মক অভিভব স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে বাংলা গানের কথা হিন্দুস্থানী সংগীতের মতো এত নিরর্থক নিশ্চেষ্ট নয়। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ঈষৎ ভিন্ন :

> "বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য-বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বারবার অনুভব করা গিয়াছে।"

পরবর্তী কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটির কথা ও সুরের সম্মিলিত রসাভিব্যক্তির একটি অনবদ্য বিশ্লেষণ করেছেন। গীতবিতান-এর 'প্রেম'-পর্যায়ভুক্ত এই

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথ

গানটির রচনাকাল ১৩০২, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চৌত্রিশ বছর বয়সের সৃষ্টি ; সুতরাং জীবনস্মৃতির আলোচনা-এলাকার পরবর্তী। তবু প্রথম যৌবনের 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধের বিশ্বাস থেকে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক চিন্তা কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে, তার কবি-স্বীকৃতি এখানে রয়ে গেছে বলেই তা মূল্যবান। কথাগুলি এই :

> "বহু-বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে'। সেই গানের ওই একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে, আজও ওই লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ওই গানের ওই পদটার মোহে আমিও একটা গান লিখিতে বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, আমি চিনি গো চিনি, তোমারে, ওগো বিদেশিনী। সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত এ গানের

কী ভাব দাঁড়াইত বলিতে পারি না। কিন্তু ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোনও রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।

ইহার অনেকদিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে ; মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায় ; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।"

কথাকে অতিক্রম করে গানের সুর যে অনির্বচনীয়তার আভাস এনে দিতে পারে, জীবনস্মৃতি-র পৃষ্ঠায় এই চিন্তার সুতোয় একদিকে আপনার গান এবং অন্যদিকে লালনের বাউল গান, উভয়কেই বেঁধে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, জীবনস্মৃতি রচনার এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন 'গোরা' উপন্যাস লিখতে। আর সেই উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই শ্রাবণমাসের এক বৃষ্টিক্লান্ত সকালবেলায় উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র বিনয় যখন তার শহরের বাসগৃহের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্মব্যস্ত শহরের জীবনচিত্র দেখছিল, ঠিক তখনই :

"আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু... একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গানও লেখা হইল না, কেবল ওই অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুনগুন করিতে লাগিল।"

জীবনস্মৃতি-র অন্য অধ্যায়ে সংগীত-প্রসঙ্গ তেমন আনন্দধ্বনি জাগায়নি, কিন্তু সংগীত সেসব ক্ষেত্রে নির্বাসিতও ছিল না। বিলেত থেকে ফিরে কিছুকাল চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে একত্রে বাস করছিলেন। তার সংগীতস্মৃতির রঙিন ছায়া পড়েছে গঙ্গাতীর অধ্যায়ে, সেখানে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে সুরকার ও গায়ক দুই ভূমিকাতেই পাওয়া যায় :

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির ভরাবাদর মাহ ভাদর পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিধারামুখরিত জলধারাচ্ছায় মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম ; কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম ; পুরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব-বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত।"

কথাকে অতিক্রম করে গানের সুর যে অনির্বচনীয়তার আভাস এনে দিতে পারে, জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠায় এই চিন্তার সুতোয় একদিকে আপনার গান এবং অন্যদিকে লালনের বাউল গান, উভয়কেই বেঁধে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

৫

সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত ছবি ও গান প্রভৃতি কাব্যরচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গান উভয় রসেই আকণ্ঠনিমগ্ন ছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যরচনাতেও তাঁর সমকালীন গীতচর্চার উপাদান প্রকীর্ণ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুকাল সদর স্ট্রিটে থাকার সময় একবার তাঁরা কারোয়ারে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যান। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে দু-একটি গীতরচনার স্নিগ্ধ স্মৃতি জীবনস্মৃতির পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। যেমন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ে :

"কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া গাহিতে-গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম

হ্যাদে গো নন্দরানী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

সকালে সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকেরা মাঠে যাইতেছে—সেই সূর্যোদয় সেই ফুল-ফোটা সেই মাঠে-বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না, সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে ; সেইখানেই অসীমের সাজ-পরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায় ; সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; দূরে নয়, ঐশ্বর্যের মধ্যে নয়, তাহাদের উপকরণ অতি সামান্য, পীতধড়া ও বনফুলের সানাই তাহাদের সাজের পক্ষে যথেষ্ট—কেননা, সর্বত্রই যাহার আনন্দ তাহাকে কোনো বড়ো জায়গায় খুঁজিতে গেলে, তাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিতে গেলেই লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিতে হয়।"

স্মৃতিচারণসূত্রে এক-একটি গীতরচনার যে ভাষ্য জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠায় রক্ষিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তার দুর্মূল্য উপাদান। সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত ছবি ও গান কোনোটাই গীতিসংকলন নয়, কিন্তু কবিতার সঙ্গে সংগীতের একটি নিবিড় অবিচ্ছিন্ন অন্তঃসংলগ্নতা তিনি সর্বদাই অনুভব করেছেন। ছবি ও গান অধ্যায়ে লিখেছেন :

"গানের সুর যেমন সাদা কথাকেও গভীর করিয়া তোলে, তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গানে ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নহে। নিজের মনের তারটা যখন সুরে বাঁধা থাকে তখন বিশ্বসংগীতের ঝংকার সকল জায়গা হইতে উঠিয়াই তাহাতে অনুরণন তোলে। সেদিন লেখকের চিত্তযন্ত্রে একটা সুর জাগিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিল। এক-একদিন হঠাৎ যাহা চোখে পড়িত, দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা সুর মিলিতেছে।"

এইজন্যেই ছবি ও গানের 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' অথবা 'ওই জানালার কাছে বসে আছে'—কবিতাগুলি গীতিরূপে রচিত না হয়েও স্বচ্ছন্দে গান হয়ে উঠতে পেরেছিল। 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, কড়ি ও কোমল কাব্যের পটভূমিতে, কলকাতার শরৎঋতুর রৌদ্রকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নগুলি কেমন করে গীতরচনার মাদকতায় পূর্ণ হয়ে উঠত :

তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে-ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুনগুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেগে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে। কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিনে।—

হেলাফেলা সারাবেলা
একী খেলা আপন-মনে।

....এদিকে সেই কর্মহীন শরৎমধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ ; সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা-বোঝাই-করা শরৎ ; আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।"

জীবনস্মৃতির অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে সংগীতের প্রসঙ্গ তেমনভাবে আর আসন পাতেনি। কিন্তু নিতান্ত বাল্য থেকে উপনীত-যৌবনের এই খণ্ডিত ব্যবহৃত স্মৃতিচারণায় গানের কথা বারেবারেই এসে পড়েছে! গানের ভিতর দিয়েই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, বারেবারেই সে স্বীকৃতি আঁকা হয়েছে এর পাতায়। রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক জীবনের ইতিহাস রচনায় জীবনস্মৃতি তাই দুর্লভ উপাদানে সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত প্রভাতসংগীত ছবি ও গান প্রভৃতি কাব্যরচনাকালে রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গান উভয় রসেই আকণ্ঠনিমগ্ন ছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যরচনাতেও তাঁর সমকালীন গীতচর্চার উপাদান প্রকীর্ণ আছে।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশিষ্ট গ্রন্থকার

রবীন্দ্রসংগীত : সংরক্ষণ ও প্রচার

সুভাষ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সংগীত-সৃজনকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি—একথা আজ আর কারও অজানা নেই। এই সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার ছিল বিশেষ দুর্বলতাও। তাঁর নিজের কথায়, 'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালবাসার অমৃত।'

১৯৪১ সাল অর্থাৎ তাঁর প্রয়াণকাল এমনকী তার কিছুকাল পর পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের গানের 'প্রাণবীজ ও অন্তর্দীপ্তি' বিষয়ে বাঙালি শ্রোতারা তেমন সচেতন ও ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁর গানের

রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

বৈভব ও বৈচিত্রও ছিল অনেকটাই অজানা। প্রধানত শান্তিনিকেতন, ব্রাহ্মসমাজ এবং কলকাতার কিছু অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গানের পরিচিতি সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪১ থেকে এই নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই কাজে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও প্রচার মাধ্যমগুলির সক্রিয় সহযোগিতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ থেকে এই গানের প্রচার ও প্রসার প্রায় প্লাবনের মতো আপামর বাঙালিকে ভাসিয়ে দিল। তখন থেকে এ গানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। এ যাবৎ যা ঘটেছে তার গতি স্বাভাবিক। কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। এ জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা চিন্তা করার আগে যে বিষয়টির প্রতি আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা হল সংরক্ষণ।

প্রসঙ্গত একটি কথা মেনে নিতেই হয়, বাংলা গানের পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'কম্পোজার' যিনি তাঁর সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বিকৃতির আশঙ্কায় তাঁর গানগুলির ছন্দোবদ্ধ কাব্য ও সুরের স্বরলিপি প্রস্তুত করানোয় যত্নশীল ছিলেন—যদিও সৃষ্টির প্রাচুর্যের সঙ্গে তা তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। এমনও হতে পারে, যা তাঁর 'নির্জন এককের গান' যে গান তাঁর 'ঘরের মধ্যে মাধুরী' পাওয়ার জন্যে তা যে এতটা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে তা উপলব্ধি করতে পারেননি, পারলে হয়তো আরও দ্রুত সম্পন্ন হত এই কাজ। অন্য সুযোগ-সুবিধাও তেমন ছিল না। যেমন স্বরলিপি মুদ্রণও

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ থেকে এই গানের প্রচার ও প্রসার প্রায় প্লাবনের মতো আপামর বাঙালিকে ভাসিয়ে দিল। তখন থেকে এ গানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। এ যাবৎ যা ঘটেছে তার গতি স্বাভাবিক। কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না।

তেমন সহজসাধ্য ছিল না। সবার আগে দেখে নেওয়া যাক রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এই কাজ কেমনভাবে কতদূর হয়ে উঠেছিল।

বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রে প্রকাশের কথা বাদ দিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বরলিপি গীতিমালা' (১৩০৪), সরলা দেবী চৌধুরাণীর 'শতগান' (১৩০৭) ও কাঙ্গালীচরণ সেনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'-র ছয় খণ্ডে (১৩১১-১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হলেও তাঁর একক গানের স্বরলিপি গ্রন্থভুক্ত হয় প্রায়শ্চিত্ত নাটকের বিশেষ সংস্করণে (১৩১৬)। এই নাটকের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত নাট্যভুক্ত ২৩টি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এরপর ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হতে থাকে। গীতলিপি ৬ খণ্ড (১৩১৭-১৩২৫), গীতলেখা ৩ খণ্ড (১৩২৪-১৩২৫), গীতপঞ্চাশিকা (১৩২৫), বৈতালিক (১৩২৫), কাব্যগীতি (১৩২৬), কেতকী (১৩২৬), শেফালি (১৩২৬), গীতিবীথিকা (১৩২৬) ও নবগীতিকা ৬ খণ্ড (১৩২৯)। গীতলিপির স্বরলিপিকার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাকি অন্য সমস্ত গ্রন্থের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখনও বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়নি। গ্রন্থগুলি শান্তিনিকেতন প্রেসে অথবা কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে ছাপা হলেও প্রকাশক সবক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান প্রেস অথবা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।
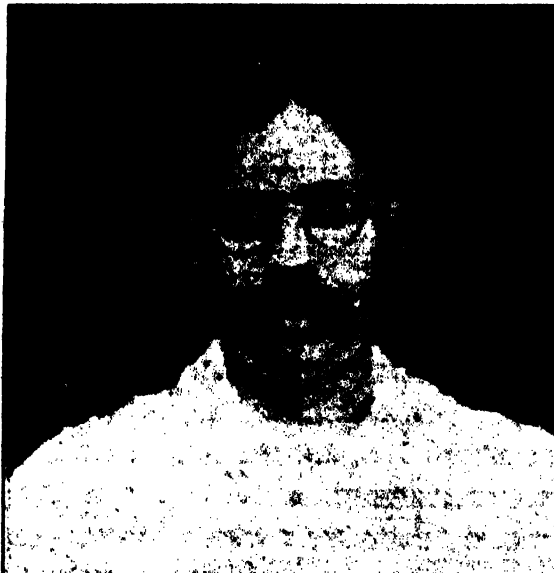
বিশ্বভারতী থেকে প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশিত হল ১৯২৩ সালে। বসন্ত গীতিনাট্য প্রকাশের পর পর স্বরলিপি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৪১ সাল পর্যন্ত যেসব স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশিত হল তার অধিকাংশ গানের স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্যতিক্রম 'মায়ার খেলা' (১৩৩২) যার স্বরলিপি করেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। এ ছাড়া যে স্বরলিপি গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হল—গীতমালিকা দুই খণ্ড (১৩৩৩/১৩৩৬), বাল্মীকি-প্রতিভা (১৩৩৫) ও তপতী (১৩৩৬)।

তারপর স্বরবিতান গ্রন্থমালার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয় (১৩৪২-১৩৪৬) এবং সম্ভবত পঞ্চম খণ্ডের কাজও শুরু হয়, কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সনে। ইতিমধ্যে যে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—দিনেন্দ্রনাথের প্রয়াণ (শ্রাবণ ১৩৪২)। রবীন্দ্রনাথ গানের সুর সংরক্ষণে যাঁর ওপর সর্বাধিক নির্ভর করেছিলেন। তখন বেশ একটি টালমাটাল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের সমাদর ও ব্যবহার নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায় সব অনুষ্ঠানে ক্রমশ বাড়তে থাকে, আর প্রামাণিক মুদ্রিত স্বরলিপি পাওয়া দুর্লভ হওয়ায় গানের সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ স্বরলিপি গ্রন্থের দ্রুত সংকলনের উদ্দেশ্যে একটি স্বরলিপি সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতির সদস্য হিসাবে যাঁরা মনোনীত হলেন তাঁরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা করেছেন এবং সংগীতচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রণয়ন, সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বও দেওয়া হল এই সমিতিকে। এঁদের তত্ত্বাবধানে প্রথম প্রকাশিত হল স্বরবিতান প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৪ সনের ভাদ্র মাসে। এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় তৎকালীন বিশ্বভারতীর সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখলেন :

> রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য সম্প্রতি দেশব্যাপী যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, গত কয়েক বৎসরে মুদ্রণকার্য সংক্রান্ত নানা বাধায়, নিয়মিত স্বরলিপি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া সে আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার আয়োজন বিশ্বভারতী করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি-সংগ্রহ যাহাতে ভবিষ্যতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারে, সম্প্রতি যে বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা

বিশ্বভারতী থেকে প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশিত হল ১৯২৩ সালে। বসন্ত গীতিনাট্য প্রকাশের পর পর স্বরলিপি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৪১ সাল পর্যন্ত যেসব স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশিত হল তার অধিকাংশ গানের স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকালে, গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে বা লোকমুখে যে-সকল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার সংস্কার ; গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত স্বরলিপি-সংগ্রহ ; নূতন স্বরলিপি রচনা এবং সেগুলি সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ ; এই সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন ; শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে যে-সকল স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে, আশাকরি সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।

স্বর-বিতান বর্তমান খণ্ডের অধিকাংশ স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। অন্যান্য গানের স্বরলিপিকার রমা কর (২১), শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার (১, ২, ৮, ১৬, ২০, ৪২, ৪৩ ও ৫০) ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার (৪৭, ৪৮, ৪৯)।

বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন।

ভাদ্র, ১৩৫৪

এই স্বরলিপি সমিতির কাজে নিরলস পরিশ্রম করেছেন প্রধানত অনাদিকুমার দস্তিদার আর তাঁকে অকৃত্রিম সহায়তা করেছেন সমিতির বয়োজ্যেষ্ঠা সদস্যা রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। ১৩৫৪-১৩৬৪ এই দশ বছরের মধ্যে মোট ৫০ খণ্ড স্বরবিতান প্রকাশিত হয় (৬-৫৫)—যার মধ্যে যেমন আছে নূতন সংকলন, তেমন আছে পূর্বতন সংকলনের নতুন সংস্করণ। সংস্করণে সম্পাদনা প্রয়োজনীয় ছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে স্বরবিতানের অনেকগুলি খণ্ডের পুনর্মুদ্রণও করতে হয়।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর স্তরে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে আর সেইসঙ্গে স্বরবিতানের চাহিদা বেড়েছে অপ্রত্যাশিত হারে। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগও সেই প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণে রেখে স্বরবিতানের নূতন নূতন খণ্ডও যেমন প্রকাশ করতে থাকেন, তেমনই স্বরবিতানে গানের রচনা-প্রকাশকাল, সুর ও স্বরলিপির 'আকরভূমি', পাঠভেদ, সুরভেদ, ছন্দোভেদ প্রভৃতি তথ্যাও যুক্ত করায় সচেষ্ট হন। এ পর্যন্ত ৬৩টি খণ্ডে ১৭০০ গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। ৬৪ খণ্ডটি আশু প্রকাশিতব্য।

এই কাজ যে খুব সহজে করা গিয়েছে এমন মনে করার সঙ্গত কোনও কারণ নেই। স্বরলিপিকারদের মধ্যে মতপার্থক্য তো ছিলই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'অহং'। প্রায় সকলেই ভাবতেন তাঁর করা স্বরলিপিটিই গুরুত্ব পাক। যত দিন এগিয়েছে, এই মতান্তর ক্রমশ মনান্তরের স্তরে পৌঁছিয়েছে। তবুও এই বিশাল এবং অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ যে একটা প্রায় পূর্ণাঙ্গ রূপে সমাধা হয়েছে এ বড়ো কম কথা নয়।

লক্ষ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে সব স্বরলিপিকার যোগ্যতার নিরিখে সমান মাপের নন। তাই সমস্ত স্বরলিপির গুণগত মান এক নয়। দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনে স্বরলিপিচর্চার বিশেষ অভ্যাস ছিল না। তাই খুব প্রচলিত গানেও রূপের বদল ঘটত। প্রসঙ্গত কলকাতায় অনাদিকুমার দস্তিদারকে লেখা শান্তিনিকেতন থেকে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের একটি চিঠির উল্লেখ করতে হয়। তিনি লিখছেন :

'অনাদিবাবু, আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি অবশ্য বন্ধু হিসাবে আমাকে যে কয়েকটি

লক্ষ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে সব স্বরলিপিকার যোগ্যতার নিরিখে সমান মাপের নন। তাই সমস্ত স্বরলিপির গুণগত মান এক নয়। দ্বিতীয়ত, শান্তিনিকেতনে স্বরলিপিচর্চার বিশেষ অভ্যাস ছিল না। তাই খুব প্রচলিত গানেও রূপের বদল ঘটত।

বিষয় লিখেছেন তার উত্তর বন্ধু হিসাবেই দিচ্ছি, নতুবা দিনদার স্বরলিপির উপরে আমি কোনোরকম পরিবর্তন না চালিয়ে স্বরলিপির বইয়ে যা আছে তাই রাখতে চেষ্টা করি ; অন্তত সেইটেই একটা principle করে কাজ করি। এখানে বর্তমানে teacher-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রত্যেকেই যদি নিজেদের ভালোমন্দ হিসাবে দিনদার স্বরলিপি বদলাই, তবে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমেই গুরুদেবের প্রত্যেক গানের যে কত রকম সুর হয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কিশোরীবাবু আমাকে লিখেছেন যে, যেহেতু আমাদের স্বরলিপি বই-এ অনেক ভুল আছে এই অভিযোগ ক্রমাগত শুনতে হচ্ছে সেই কারণে তার সংশোধনের জন্য এক সেট স্বরলিপি বই নাকি আমাকেও পাঠাচ্ছেন। অবশ্য আমি এখনো সে-সব বই পাইনি। বই পেলেও আমি জানতে চাই যে 'ভুল' মানে কী ? এখানে অনেক গানের সুর প্রচলিত আছে যা স্বরলিপির সঙ্গে মেলে না। সেগুলিকেও ঠিক ধরে নিয়ে স্বরলিপি সংশোধন করতে হবে ? তাহলে দিনদার করা স্বরলিপি রইল কোথায় ? এখানে প্রায়ই একটা কথা শুনতে পাই যে, দিনদা নাকি স্বরলিপির মতো অনেক গান শিখিয়ে যাননি। এ সম্বন্ধে আপনি কী ভাবছেন আমাকে যদি জানান তবে বড়ো ভালো হয়। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে, এখানে যেহেতু প্রচলিত সুর স্বরলিপির সঙ্গে মেলে না এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে যে সকলেই যতদূর সম্ভব স্বরলিপিতে stick করছেন, তা'ও নয়।'

এই চিঠিটিতে যে সমস্যার কথা উল্লিখিত হয়েছে আজও তার কোনও সমাধান তো দূরে থাক, অবস্থার সামান্যতমও পরিবর্তন হয়নি। এমনকী সংগীত ভবনেও তার কোনও প্রচেষ্টা দেখা যায়নি, বরং যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরাও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। মূল পীঠস্থানেই যদি ন্যূনতম শৃঙ্খলা না থাকে অন্য কারো কাছে তা কতখানি প্রত্যাশিত।

এখনও সময় আছে। রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংরক্ষণের কাজে একটু সংহতি একটু শৃঙ্খলা আনা সম্ভব যদি প্রধান উদ্যোগী হয় বিশ্বভারতী—বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি নয়। এখানে স্বার্থান্বেষী, ধান্দাবাজ, অযোগ্য ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। অন্দরমহলের চাপকে অগ্রাহ্য করতে হবে রবীন্দ্রনাথকে, তাঁর সৃষ্টিকে সম্মান জানাতে! এই প্রচেষ্টায় কর্মধারার একটি রূপরেখার খসড়া প্রস্তাব :

রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংরক্ষণের কাজে একটু সংহতি একটু শৃঙ্খলা আনা সম্ভব যদি প্রধান উদ্যোগী হয় বিশ্বভারতী—বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি নয়।

১। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর গানের যে-সব স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে তা সংগ্রহ করা। সুর অবিকৃত রেখে মুদ্রণপ্রমাদ এবং পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা।

২। এক গানের ভিন্ন ব্যক্তিকৃত স্বরলিপিগুলি (তা যেখানেই প্রকাশিত হোক-না-কেন) একত্র করা।

৩। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত স্বরলিপিগুলি একত্র করা—সুরান্তর সহ।

৪। গ্রামোফোন রেকর্ড, ক্যাসেট—প্রচারিত প্রতিটি গানের (বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি অনুমোদিত) সুর স্বরলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এবং তা চিহ্নিত করা।

৫। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো সুরগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে সেগুলিকে নির্মূল করায় সচেষ্ট হতে হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত স্বরলিপি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অনুসৃত হবে না তা কল্পনা করা যায় না—কিন্তু এরকমই বাস্তব চিত্র।

৬। এই কার্যক্রমে কোনো ব্যক্তি তা সে যিনিই হোন-না-কেন কাকে কোন্ সুর শিখিয়েছেন তা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের স্থান এঁদের সকলের ওপরে।

৭। বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি অনুমোদিত 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' কবিতায় অন্যের সুরারোপিত গানকে যে 'রবীন্দ্রসংগীত' হিসাবে অনুমোদন করেছেন তা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে—এটি অনবধানবশত ত্রুটি। না হলে এরকম আরো গানকে রবীন্দ্রসংগীত বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। এমনই একটি গানের নিদর্শন পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল। এমন আরো নিদর্শন আছে। কেবল অর্থের বিনিময়ে হিন্দি ছায়াছবি 'যুগপুরুষ'-এর গানে 'কথা সুর রবীন্দ্রনাথ' বলে যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সময় কি তাকে ক্ষমা করবে ?

৮। সব শেষে সম্পাদনায় সুর বদলের যৌক্তিকতা এবং তা কীসের ভিত্তিতে সে কথা খুব স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন।
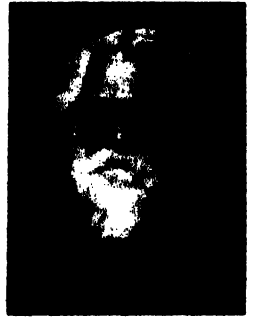
৯। লয় নির্দেশের প্রয়োজন না হলে প্রয়োগগত দিক থেকে সমস্তটাই অর্থহীন।

এ সবই সমস্যা। সমস্যার কথা বলা যায় যত সহজে সমাধান করা তত সহজসাধ্য হয় না। এ কাজে সবচেয়ে বড়ো বাধা মানসিকতা। এই কাজ করার জন্য যে মানসিকতা ও যে সহনশীলতার প্রয়োজন তেমন মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শুধু এই যোগ্যতা থাকলেই হবে না, রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসটুকু তাঁর জানা থাকা প্রয়োজন আর তবেই তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। আর প্রয়োজন যথেষ্ট অর্থ ও সময়। এই অর্থ আছে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির হাতে যা অর্জন করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি স্মরণযোগ্য। এর অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না। ঐকমত্যের ঠাঁই বদল হয়েছে মাত্র আর সবই ঠিক আছে।

*(মিশ্র তিলককামোদ-বেহাগ— • ঝাঁপতাল)

(কথা : রবীন্দ্রনাথ)

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি,
কখনো শুনিনা যে ॥
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে
ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে
বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা
স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে,
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনি না যে ।।
চলিতেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুন রাতে জাগে,
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণ-রেণু-রাগে।
যে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত ত্বরিতপাখা মধুকরের সনে,—
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনি না যে ।।

* '১৯২৬ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে কবিবর এ গানটিতে আমাকে সুর দিতে বলেন। আমি যে সুরটি দিয়েছিলাম সেটি এই।' —দিলীপকুমার রায়

মুদ্রিত স্বরলিপির প্রতিলিপি

এ সবই সমস্যা। সমস্যার কথা বলা যায় যত সহজে সমাধান করা তত সহজসাধ্য হয় না। এ কাজে সবচেয়ে বড়ো বাধা মানসিকতা।

সংরক্ষণে প্রাসঙ্গিকতায় অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় পাঠভেদ। বর্তমান গীতবিতানের পাঠে ব্যবহারযোগ্যতার প্রয়োজনে স্বরলিপির পাঠ যে অনুসৃত হচ্ছে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে।

এবার দেখা যাক সংরক্ষণ প্রসঙ্গে যে খসড়া প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার রূপায়ণ কীভাবে সম্ভব। যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তাতে কোথাও কোনও আশার আলো দেখছি না। আর কিছু না হোক প্রচলিত স্বরবিতানগুলির সম্পাদনাটুকু হোক-না-কেন। তা হলেও একটা প্রাথমিক কাজ তো হয়ে থাকতে পারে। স্পষ্ট করে বলি, সম্পাদনার অর্থ সুর বদল নয়। যতি চিহ্ন, পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন, লয় নির্দেশ ইত্যাদি কাজগুলি তো এগিয়ে রাখা যায়। এসব কাজে কোনও প্রচার নেই, তুলনায় মাঝে মাঝে জলসা করলেই বরং অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়। এসব কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেকখানি সম্পন্ন হবে, কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ। তারই প্রতীক্ষায় কাল গোনা। আর কিছু না হোক তথ্য সংগ্রহের কাজটাও যদি হয়ে থাকতে পারত !

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী

আর কিছু না হোক প্রচলিত স্বরবিতানগুলির সম্পাদনাটুকু হোক-না-কেন। তা হলেও একটা প্রাথমিক কাজ তো হয়ে থাকতে পারে। স্পষ্ট করে বলি, সম্পাদনার অর্থ সুর বদল নয়। যতি চিহ্ন, পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন, লয় নির্দেশ ইত্যাদি কাজগুলি তো এগিয়ে রাখা যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণের কাজটির মধ্যে যে জটিলতা আছে প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে তেমন জটিলতা নেই বললেই চলে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা মতো এই কাজটি সংঘটিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যরা অনেকেই রবীন্দ্রসংগীতকে জীবিকা করে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে অন্য বাংলা গানের তুলনায় এই গানের প্রচার সুদূরপ্রসারী হতে পেরেছে। প্রচারমাধ্যমগুলি বিশেষ করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এক সময় রবীন্দ্রনাথের গান বিক্রয় করে যে যথেষ্ট লাভবান হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। এ পর্যন্ত বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি কত অর্থ বিভিন্ন রেকর্ড বা ক্যাসেট কোম্পানি থেকে রয়ালটি বাবদ অর্জন করেছেন তা থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব।

এই বিষয়ে দু-একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া যায়। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় রবীন্দ্রসংগীতের কর্মশালা করেছি। সবচেয়ে বড়ো অভাব যা লক্ষ করেছি তা হল, গানের সুরের শুদ্ধতা। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সুরের শুদ্ধতার অভাব আমাকে বিস্মিত করেছে। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী এবং বর্তমানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর নির্ধারিত পাঠক্রম সমাপ্ত করে জীবিকার সন্ধানে বাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন তাঁদের খোঁজ কি কেউ রাখেন ? চেষ্টা এবং ইচ্ছা থাকলে এঁদের মধ্যে সমন্বয় সাধন কি একেবারেই অসম্ভব ? শিক্ষক-শিক্ষণের কি কোনও ব্যবস্থা করা যায় না ?

এ ছাড়াও কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে জীবিকা করছেন তাঁরাই বা কোথায় যাচ্ছেন ? এঁদের সকলকে বছরে দু-একটি দিন একত্র করা কি একেবারেই অসম্ভব ?

বিশ্বভারতী সংগীত সমিতি কি পারেন না, অন্তত প্রতিটি জেলার প্রধান শহরে একজন করে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক নিয়োগ করতে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের সঠিক সুরটি শেখাবেন। আমার স্থির বিশ্বাস, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য যদি একটি পরিকল্পনা সত্যিই করা যায় এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা যেতেই পারে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি স্বত্ব উঠে গেলেও যাঁরা স্বাধীনতার নামে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে স্বেচ্ছাচারে মেতেছেন তা বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাবে একদিন—এসব বালখিল্যদের প্রহসন। রবীন্দ্রসংগীত তার নিজের ক্ষমতার জোরে বেঁচে থাকবে—কারও অনুগ্রহে নয়। রবীন্দ্রসংগীত চিরন্তন সত্য—এই কথাটি ভোলা অপরাধ।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক, প্রাবন্ধিক

রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণ

পবিত্র সরকার

প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণের কিছু নীতিনিয়ম তৈরি হয়ে যায়। এ কথা যাকে আমরা উপভাষা বলি—ঢাকাই বা সিলেটি বা বাঁকড়ি উপভাষা যেমন—তার সম্বন্ধে যেমন সত্য তেমনই সত্য সেই উপভাষা সম্বন্ধে, যাকে আমরা বলি মান্য বা আদর্শ উপভাষা। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এই আদর্শ উপভাষার নাম মান্য চলিত বাংলা (মা-চ-বা),

ইংরেজি নাম Standard Colloquial Bengali (SCB)। এই মা-চ-বা'র আবার দুটো রূপ আছে—একটা মুখের, আর একটা লেখার। মুখের মা-চ-বাই আমরা মূলত শুনতে পাই রেডিয়ো-টেলিভিশনের ঘোষণায়, সংবাদপাঠে, শিক্ষিতের আলোচনায়, নাটকে, চলচ্চিত্রে, লেখাপড়া জানা মানুষদের অর্থাৎ 'ভদ্রলোকদের' সাধারণ সংলাপে।

আমাদের মান্য চলিত ভাষার যেটা মুখের রূপ, তার উচ্চারণের বেশ কিছু নিয়মকানুন তৈরি হয়ে গেছে। সবাই সেসব নিয়মকানুন সচেতনভাবে জানি যে এমন নয়, শুনতে-শুনতে এবং বলতে-বলতে তা অনেকে শিখে যাই। বিশেষ করে যাঁরা উপভাষা অঞ্চলের লোক বা সামাজিক স্তরবিন্যাসে এমন এক শ্রেণিতে অবস্থান করেন যেখানে মা-চ-বা'র মুখের রূপটি বলা হয় না, তাঁদের তা শিখে নিতে হয়। ওই শিখে নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে রেডিয়ো-টেলিভিশনে নাটকে চলচ্চিত্রে উচ্চারিত মা-চ-বা। আবার কখনও ব্যাকরণে[১], কখনও অভিধানে, বিশেষত উচ্চারণ অভিধানে[২], উচ্চারণের হদিস দেওয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ বাঙালির উচ্চারণের মূল শিক্ষা হয় শ্রুতি থেকেই, গ্রন্থপাঠ থেকে নয়। উচ্চারণের ক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিলে হয়তো কেউ কেউ অভিধান দেখে বা বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরসনের জন্য—কথাটা 'নোমোশ্‌কার' হবে, না 'নমোশ্‌কার' হবে।

কিন্তু মুখের মান্য ভাষা উচ্চারণের নিয়ম আর কবিতার ভাষা উচ্চারণের নিয়ম যে হুবহু এক হবে এমন কোনো কথা নেই। মুখের মা-চ-বা'র উচ্চারণের সমস্ত নিয়মই যে কবিতায় খাটবে তাও নয়। বাংলা কবিতার ছন্দ নানা কালে নানারকম উচ্চারণ দাবি করে। অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কবিতার বিশেষ বিশেষ প্রাচীন ও কাব্যিক শব্দ এবং তার ছন্দসংস্থান এক বিশেষ ধরনের উচ্চারণরীতি-নির্ভর, যার সঙ্গে আজকের মা-চ-বা'র উচ্চারণের বেশ তফাত আছে। আবার উনবিংশ শতক থেকে সাধারণভাবে ১৯৪৭ পর্যন্ত, এমনকি পরে জীবনানন্দ বা তাঁকে অনুসরণ করে কিছুদিন পর্যন্ত শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাংলা কবিতা লিখতে গিয়ে যে 'মিশ্রভাষা' ব্যবহার করেছেন, যাতে সাধু ক্রিয়াপদ ('বলিতেছে', 'মরিয়া'), কাব্যিক ক্রিয়াপদ ('হেরে' 'নিরখি'), ('শুনি' [শুনিয়া], 'বলিছে', 'সাজাতেছে')

আমাদের মান্য চলিত ভাষার যেটা মুখের রূপ, তার উচ্চারণের বেশ কিছু নিয়মকানুন তৈরি হয়ে গেছে। সবাই সেসব নিয়মকানুন সচেতনভাবে জানি যে এমন নয়, শুনতে-শুনতে এবং বলতে-বলতে তা অনেকে শিখে যাই।

এবং চলিত ক্রিয়াপদ মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিছু কাব্যিক শব্দ ('বরিষন', 'শয়ান, 'বরণ') ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার থাকায় কবিতার সেই ভাষাও কখনও কখনও বিশেষ উচ্চারণ দাবি করে। আর বুদ্ধদেব বসু **দময়ন্তী**-র প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে (১৯৪৩) এক আলোচনায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের পরে ক্রমশ বহুসংখ্যক কবির কবিতা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশ্রভাষা থেকে যখন প্রায় চলিত ভাষায় এসে পৌঁছাল, তখনই কবিতায় কি মা-চ-বার পূর্ণ উচ্চারণরীতি প্রতিষ্ঠা হল ?

না, তাও হয়নি। কবিতার উচ্চারণ সব সময়েই মুখের কথার, এমনকি গদ্যের উচ্চারণ থেকে দু-এক ক্ষেত্রে আলাদা হবে, আর কোনো কারণে না হোক, অনেক সময় ছন্দেরই কারণে। কবিতার ভাষারও বিন্যাস আলাদা।[৫] তাতে হয়তো মুখের ভাষারই শব্দ সব ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও প্রাচীন, কাব্যিক শব্দ বা তার রূপভেদ নেই—কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতার ভাষা যেমন মুখের ভাষার থেকে ভিন্নভাবে সাজানো-গোছানো হয়, তার উচ্চারণও অল্পস্বল্প তফাত হয়ে যায়। ধরা যাক, পুরোটাই মা-চ-বা'তে লেখা এই ছত্রগুলিতে—

সারা দিন ধরে
শুধু ধুলো ওড়ে,
শুধু কাঁপে বুক
অশথপাতার
সে দাঁড়িয়ে ঠায়
আজও জানালায়
চলেছে তবুও
প্রতীক্ষা তার।[৬]

এখানে কবিতায় মুখের ভাষার একটু ওলটপালট ঘটেছে, 'বুক কাঁপে' হয়েছে 'কাঁপে বুক', 'ঠায় দাঁড়িয়ে' হয়েছে 'দাঁড়িয়ে ঠায়' আরও বৃহত্তর খণ্ড 'সে আজও জানলায় ঠায় দাঁড়িয়ে' কথাটাও ছন্দে কী চেহারা পেয়েছে দেখুন ; আর 'তার প্রতীক্ষা তবুও চলেছে' হয়েছে 'চলেছে তবুও প্রতীক্ষা তার'। ছন্দ ও মিল-নিয়ন্ত্রিত এই সব বাক্যবন্ধের পুনর্বিন্যাসে কবিতার ছন্দ-নিয়ন্ত্রিত উচ্চারণ ও সুর হুবহু কথার উচ্চারণের মতো হবে না।

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি গদ্যকবিতার উচ্চারণ হবে মুখের মা-চ-বা'র উচ্চারণের মতো ? এর উত্তরও নেতিবাচক। পদ্যই হোক, গদ্যই হোক, কবিতামাত্রেই একটি 'পোশাকি' রচনা—তাতে ভাষার কিছুটা সাজগোজ থাকেই। এই সাজগোজ বেরিয়ে আসে বিশেষ বিশেষ শব্দে, অলংকার-প্রয়োগে ও অন্যান্য কারুকর্মে। সব কবির সব গদ্যকবিতা একরকম নয়, কোনোটির ভাষার চলিতধর্ম মুখের ভাষার কাছাকাছি, কোনোটির ততটা নয়। শেষের ধর্মটির দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের এই ছত্রগুলি—

পদ্যই হোক, গদ্যই হোক, কবিতামাত্রেই একটি 'পোশাকি' রচনা—তাতে ভাষার কিছুটা সাজগোজ থাকেই।

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা সাঁওতাল-পাড়া ;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে,
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ—
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়—
তারই এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক্ষয়ে
দেখা দিয়েছে
ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়[৭] ;...

এ অংশে ছন্দ নেই, কিন্তু অলংকার আছে, মুখের কথায় বলা হয় না এমন শব্দ আছে, আছে কিছু উপমা ও রূপকভিত্তিক অলংকার। সবচেয়ে বেশি করে আছে অসমান ছত্রের বিন্যাসে যতিপাত ও নৈঃশব্দ্যের এক প্রকল্প, যা কেবল কবিতার ভাষাতেই লভ্য। এমন কি যেখানে কবিতা টানা গদ্যের মতো করে সাজানো, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' (১৯২২)-য় বা অরুণ মিত্রের একাধিক রচনায়, যেখানে ভাষার উপাদানের ওলটপালট এবং গদ্যকবিতার সংযত আবেগ তার উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ উচ্চারণ মা-চ-বা'র দৈনন্দিন মৌখিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি সজ্জিত ও সচেতন। ফলে কবিতা আবৃত্তির জন্য মুখের মা-চ-বা'র উচ্চারণ জানাই যথেষ্ট নয়, তারও বেশি কিছু জানতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সে উচ্চারণ মুখের ভাষার উচ্চারণ থেকে যথেষ্টই আলাদা, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে খুব কাছাকাছি হয়েও সম্পূর্ণ এক নয়। তাতে শুধু উচ্চারণের ব্যাকরণ নয়, উচ্চারণের নন্দনতত্ত্বেরও একটা ভূমিকা থাকে।

২

সাধারণভাবে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান এবং আরও দু-একজনের লেখা দু-একটি গান বাদ দিলে বাংলা গানের ভাষা যে দীর্ঘকাল তার কবিতার ভাষা থেকে পিছিয়ে থেকেছে তা আমরা আগে অন্যত্র বলেছি।[৮] অর্থাৎ কবিতার ভাষা যেখানে ক্রমশ কথ্যতার দিকে এগিয়ে গেছে এবং কখনও কখনও গদ্যের এলাকা জরিপ করে এসেছে সেখানে গানের ভাষা সেই 'মিশ্রভাষা'ই হয়ে থেকেছে। তাতে ছন্দ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার আগে সে-ছন্দ সুরের টানাপোড়েনে খানিকটা নিজের অধীনতা মেনে নিয়েছে। তাই সেগুলি যতটা গান ছিল, ততটা কবিতা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত এবং তাঁর পরবর্তী গীতিকারদের কিছু কিছু গানে ছন্দের নিখুঁত আদল রক্ষা করার যে সতর্ক চেষ্টা দেখা যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ। তাতে ছত্রশেষের মিল হয়েছে একটি আবশ্যিক উপাদান। সেই সঙ্গে তার শব্দসম্ভার, শব্দরূপ ইত্যাদিও যে মুখের ভাষার থেকে খানিকটা দূরবর্তী তা আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি।' এ সবের ফলে বাংলা গানের ভাষায় সাধারণ উচ্চারণ মুখের মা-চ-বা'র উচ্চারণ থেকে যেমন, বাংলা পদ্য বা

গদ্য কবিতার ভাষার উচ্চারণ থেকেও আলাদা হয়ে আছে। এই আলাদা জায়গাটা গানের শিক্ষার্থীদের আলাদা করেই শিখতে হবে। জয় গোস্বামীর কবিতায় 'মেঘবালিকা' কথাটিতে 'মেঘ'-এর ঘ-এ হসন্ত উচ্চারণ ('মেঘ্') না দিলে তাতে ছন্দপতন হবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' যখন সুরের আশ্রয়ে গীত হবে তখন 'সন্ধ্যার'-এর র-এ যেমন 'অ > ও' স্বর লাগবে, তেমনই 'মেঘমালা'ও হবে 'মেঘোমালা'।

আমরা উপরে 'গানের ভাষার সাধারণ উচ্চারণ' কথাটা লিখেছি এই কারণে যে গানের ভাষার বিশেষ, ব্যক্তিগত উচ্চারণশৈলীরও হেরফের ঘটে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চারণ আর সুচিত্রা মিত্রের উচ্চারণভঙ্গি একরকম ছিল না রবীন্দ্রসংগীতে, যেমন নয় সুবিনয় রায় আর দেবব্রত বিশ্বাসের উচ্চারণভঙ্গি। হয়তো এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব উচ্চারণশৈলীর তফাত যেমন আছে তেমনই আছে 'স্কুল' বা গোষ্ঠীর উচ্চারণশৈলীর তফাত। শান্তিনিকেতনের গায়কি আর কলকাতার স্বাধীন শিল্পীদের—যাঁরা অন্য নানা গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতও গেয়েছেন—গায়কি এক নয়, উচ্চারণভঙ্গিরও যথেষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনেই শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের গায়নরীতি-দীক্ষা এবং উচ্চারণ-দীক্ষার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব ছিল।

এই ব্যক্তি বা গুরু-প্রণোদিত বিশেষ বিশেষ ঘরানার নির্দিষ্ট উচ্চারণশৈলী আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের মূল আলোচ্য উচ্চারণের 'ব্যাকরণ'। আমরা প্রথমে বলব মা-চ-বা'র উচ্চারণের সেই সব নিয়মের কথা যা রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গেলে মানতেই হবে, না মানলে উচ্চারণ-দোষ ঘটবে। যেমন 'ব্যথিত' কথাটির যে 'বেথিতো' উচ্চারণ হবে—*'ব্যাথিৎ' বা *'বেথিৎ' বা *'ব্যাথিতো' নয়—তা সাধারণভাবে প্রত্যেক রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীকে জানতে হবে। এটা বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়মের অঙ্গ—এটা না জানলে আমাদের গানের শুধু নয়, কথার উচ্চারণও ত্রুটিযুক্ত হবে। শুনলে লোকে বুঝবে যে, আমাদের মান্য চলিত-ভাষার উচ্চারণ সম্পূর্ণ দুরস্ত হয়নি। ফলে যাঁরা উপভাষা অঞ্চল থেকে এসেছেন, যাঁদের উচ্চারণে 'প্রাদেশিক' বা আঞ্চলিক প্রভাব আছে, তাঁদের প্রথম কাজ হল মা-চ-বা'র উচ্চারণ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নেওয়া।
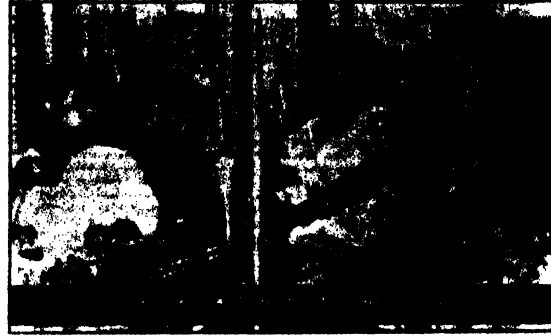
৩

যে-কোনো ভাষার উচ্চারণের অন্তত এই তিনটি দিক আছে, যা গানের উচ্চারণেও মনে রাখতে হয়—

১. প্রত্যেকটি ধ্বনির সুস্পষ্ট প্রকাশ। স্বরধ্বনিই হোক আর ব্যঞ্জনধ্বনিই হোক, প্রত্যেকটির স্পষ্ট উচ্চারণ বাগ্‌যন্ত্রের এক-একটি সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। স্বরের বেলায় ঠোঁটের আকৃতি ও উন্মুক্তির পরিমাণ এবং জিহ্বার অগ্রপশ্চাৎ ও উপর-নীচে গতির মাত্রা ঠিক ঠিক বজায় রাখতে হয়। স্পষ্টস্বরে 'অ' বা 'আ' বলতে ঠোঁট যতখানি খোলার কথা তার চেয়ে কম খুললে 'অ' বা 'আ' অস্পষ্ট ও দুর্বল হয়ে পড়বে। ব্যঞ্জনের বেলায় জিভ বা ঠোঁট মুখের ভিতর দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বেরোবার পথে যে বাধা বা ব্যাঘাত তৈরি করছে তার তীব্রতা বা অসম্পূর্ণতা, জিহ্বা স্পর্শের স্থান ইত্যাদির পার্থক্য ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনেও পার্থক্য তৈরি করে। উচ্চারণে এই পার্থক্যগুলি

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত এবং তাঁর পরবর্তী গীতিকারদের কিছু কিছু গানে ছন্দের নিখুঁত আদল রক্ষা করার যে সতর্ক চেষ্টা দেখা যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ। তাতে ছত্রশেষের মিল হয়েছে একটি আবশ্যিক উপাদান।

যথাযথভাবে রক্ষা করা গেলে তবেই ব্যঞ্জনের স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে। নইলে অল্পপ্রাণ গ্ আর মহাপ্রাণ ঘ্-এর তফাত যদি কারও উচ্চারণে উপেক্ষিত হয় তবে তাও মা-চ-বা'র উচ্চারণকে বিকৃত করে। ফলে প্রত্যেকটি পৃথক ধ্বনির স্পষ্ট উচ্চারণ শিক্ষা সকলের আগে দরকার। এ প্রসঙ্গে এই কথাটা আর একবার এখানে স্মরণ করিয়ে দিই যে, বর্ণমালায় যাই থাক, উচ্চারণে মা-চ-বা'র স্বরধ্বনি **সাতটি**—অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা ; আর ব্যঞ্জনধ্বনি **তিরিশটি**—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ চ্ ছ্ জ্ ঝ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ড় ঢ়, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, র্ ল্ শ্ হ্ স্। পণ্ডিতেরা স্-কে শ্-এর রূপভেদ বলে ফতোয়া দিলেও, এ দুটি ধ্বনির উচ্চারণ আলাদা-আলাদাভাবে শেখা দরকার। আর স্বরধ্বনির **চারটি** ই্ উ্ এ্ ও্ খানিকটা হসন্ত উচ্চারণ পায় ভাই [ভাই্], বউ [বোউ্], খায় [খাএ্], নাও [নাও্] ইত্যাদি শব্দে। এগুলিকে বলে অর্ধস্বর।

স্বরধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে বাংলায় আর-একটি জিনিস মনে রাখা খুব জরুরি। ওই সাতটি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই 'নাকিসুর' পেয়ে অনুনাসিক হতে পারে—যা লেখাতে আমরা সাধারণভাবে উপরে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে লিখি। পঁক্পঁক্, আঁক, ইঁট, উঁচু, এঁটেল, ওঁছা, ট্যাঁক। যাঁরা শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, যে-কোনও গান গাইবেন তাঁদের বিশুদ্ধ আর অনুনাসিক স্বরের তফাত রক্ষা করতেই হবে। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অনেক সময় অনুনাসিক থাকে না, তাঁরা 'চাঁদ'-কে বলেন 'সাদ', পাঁচ'-কে 'পাস'। এও প্রাদেশিক, আঞ্চলিক উচ্চারণ। এ উচ্চারণকে পিছনে ফেলে মা-চ-বা'র স্বরধ্বনির উচ্চারণ অধিকার করতে পারলে তবেই আঞ্চলিক পল্লিগীতি ছাড়া অন্য গান গাইবার যোগ্যতার প্রথম ধাপ তৈরি হয়।

যাঁরা শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, যে-কোনও গান গাইবেন তাঁদের বিশুদ্ধ আর অনুনাসিক স্বরের তফাত রক্ষা করতেই হবে।

২. দুটি ধ্বনি (স্বর হোক, ব্যঞ্জন হোক বা কখনও পাশে ব্যঞ্জন-স্বরের অবস্থান হোক) পরস্পরের পাশাপাশি এলে অনেক সময় একটি অন্যটিকে বদলে দেয়। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে অ আর অ্যা বদলে গিয়ে যথাক্রমে ও আর এ খুব বেশি হয়, বাংলাভাষায় স্বরধর্ম পরিবর্তনের এই নিয়মের নাম স্বরোচ্চতাসাম্য বা স্বরসংগতি। ফলে কোথাও লেখাতে অ থাকলেও তার উচ্চারণ [ও] হবে, আর বানানে এ বা এ-কার থাকলেও তার উচ্চারণ [অ্যা] হবে—তা নিয়ে সংশয় হয়। সংশয়ের ফলে ভুল হলে উচ্চারণ-দোষ ঘটে। পুব বাংলার বা মেদিনীপুরের মানুষেরা যদি প্রথম-কে [প্রোথোম্] না বলে [প্র-থম্] বা [প্র-থোম্] বলেন তাহলে এই দোষ তৈরি হয়ে যায়। কারণ শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনের পরে র্ র-ফলা চেহারায় থাকলে, তার পরের অ মা-চ-বা'তে [ও] হয়ে যায়।

বাংলা বানানে যাকে যুক্তব্যঞ্জন বলি তাতেও ব্যঞ্জনগুলির উচ্চারণ সবসময় মূলের মতো থাকে না, বদলে যায়। প্র-তে প্ + র্ দুইই তাদের উচ্চারণ বজায় রাখে, কিন্তু শ্র-তে র্-এর প্রভাবে শ্-এর উচ্চারণ দন্ত্য স বা ইংরেজি 's'-এর মতো। শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনে র-ফলা থাকলে ব্যঞ্জনটি ডবল উচ্চারিত হয়, 'এ' হয় 'ৎএ'—তাও জানতে হবে।

৩. শব্দে ও বাক্যে ঝোঁক ও সুরের ব্যাপারও একটা আছে, তা কথা বলবার সময় বিশেষভাবে রক্ষা করতেই হয়। প্রত্যেক ভাষাতেই এই সুর ও ঝোঁক আলাদা। এগুলিকে বলে অধিধ্বনি (supra segmentals)। এ সুর গানের সুর নয়, কথার সুর। বলা বাহুল্য, গানের সুর এসে কথার সুরকে আড়াল করে দেয়, তা আর তত গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। কিন্তু গানের সুর অনেক সময় কথার সুরকে মর্যাদা দিয়ে নিজের বিন্যাস রচনা করে, যেমন দলবৃত্ত ছন্দে লেখা 'কান্নাহাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা' বা 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন' গানদুটিতে। কথার সুর আর গানের সুরের এই জটিল সম্পর্ক ও তার নিয়মাবলি হয়তো সচেতনভাবে শেখার দরকার নেই, কিন্তু তবু বিষয়টা অন্তত তাত্ত্বিকভাবে খেয়াল রাখলে সুবিধা হয়।

৪

গানের ভাষার, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের কথার 'বিশেষ' উচ্চারণের আলোচনায় যাবার আগে আমাদের মা-চ-বা'র 'সাধারণ' উচ্চারণের সূত্রগুলি আর একটু বিস্তারিত আকারে বলি। এই একই কথা আমরা নানা জায়গায় বহুভাবে বলেছি, কিন্তু এ লেখার স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য আর একবার বলি। প্রথমে স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্নের উচ্চারণ—

১. অ কোথায় [ও] উচ্চারিত হবে

লিখিত বাংলায় অ-এর দুটি রূপ আছে। একটা হল স্পষ্ট লিখিত বা মুদ্রিত 'অ', আর একটা ব্যঞ্জনের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা অ। যেমন 'অমল'-এর প্রথম অ, আবার ম-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকা অ। আমরা বলি নিহিত অ, ইংরেজিতে inherent vowel। দুটোই কখনও কখনও [ও] হয়ে যায় উচ্চারণে। যেখানে যেখানে হয় তার তালিকা দেব আমরা, কিন্তু তার আগে বলি, একটা স্পষ্ট অ কিছুতেই [ও] হয় না, সে সেই অ, যার মানে হল 'না' 'উলটো' ইত্যাদি। যেমন 'অমিল' ('মিল নেই'), অসিত ('শাদা নয়'), অপূর্ব ('পূর্বে ছিল না') ইত্যাদি।

আর একটা নিহিত অ-ও প্রায়ই [ও] হয় না। সেই অ-টা উপসর্গের মধ্যে থাকে, যেমন স-শিষ্য,

সম্‌-পূর্ণ, সম্‌-প্রীতি, এ সব ক-টা দৃষ্টান্তেই অ লুকিয়ে আছে স-এর মধ্যে। অন্য ধরনের আরও দৃষ্টান্ত ক-টি, ছ-টি, ন-টি, (কিন্তু কোমর অর্থে 'কটি'-তে ' কো') দশ-টি (কিন্তু ফষ্টিনষ্টি-তে [ও] হচ্ছে দেখুন)। এগুলিতে পরের 'টি' অংশটা শব্দের বাইরে থেকে এসে জুড়ছে, তাই তা আগেকার অ-কে বদলাতে পারছে না। এই রকম আরও দৃষ্টান্ত আছে 'কদ্দুর' 'যদ্দুর', 'ঝড়্‌টি' (কিন্তু 'ঝরতি-পড়তি'-তে ঝ-এর অ [ও] হচ্ছে)।

উপরে আমরা অ কখন [ও] হবে না তা বলেছি। কিন্তু অ তো বেশির ভাগ সময়েই [ও] হয় না। 'অত, সম্ভব, কদর্য, অসাম্য' ইত্যাদি নানা শব্দে অ-এর [ও] হওয়ার তো কোনও প্রসঙ্গই নেই, তা সে প্রকাশ্য অ-ই হোক, আর লুকোনো অ-ই হোক।

এই আগের অনুচ্ছেদের উপরের দৃষ্টান্তগুলি আর একটু ভালো করে লক্ষ করুন। আরও দু-একটা যোগ করে তাদের দুটো দলে এভাবে সাজাই আমরা—

অমিল	অপূর্ব
অসিত	সম্পূর্ণ
সশিষ্য	কদ্দুর
সম্প্রীতি	তদ্দুর
ক-টি	তদ্রূপ
ছ-টি	যদ্দুর
ন-টি	স্বরূপ
স্বকৃত, স্ব-শিক্ষা	স্বমুখ
দশ-টি	সম্মুখ
ঝড়তি	সন্নিবিষ্ট

এ দুটো সারিতে সেই সব না-বদলানো স্পষ্ট ও গুপ্ত অ-কে আমরা রেখেছি, যাদের বদলে যাবার কথা ছিল, কিন্তু তারা বসলে [ও] হয়নি। কেন হয়নি তার কারণও বলেছি আমরা। বদলাবার কারণটি পাশে থাকলেও যেহেতু এই স্পষ্ট বা গোপন অ-এর তার সঙ্গে যোগ নেহাত বাইরের, হয় অ, না-হয় ওই বদলাবার কারণ বাইরে থেকে এসে শব্দে জুড়েছে সেহেতু অ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে, [ও]-তে পরিবর্তিত হয় না। উপসর্গ বা-টি জাতীয় বিভক্তি এই বাইরে থেকে এসে জুড়ে গেছে বলেই অ-কে বদলাতে পারেনি।

বদলাবার কারণটি বা কারণগুলি এবার বলি। তার **প্রথম** কারণ হল—শব্দের 'মধ্যে' অ-এর পরে উচ্চারণে ই বা উ ধ্বনি থাকা। উচ্চারণে যা [ই] তা ই [ি] দিয়ে লেখা হতে পারে, এমনকি ঈ, দীর্ঘ ঈ-কার দিয়েও লেখা হতে পারে। আবার ঋ বা ঋ-কার থাকলেও তাতে একটা [ই] উচ্চারণ আছে। সেই সঙ্গে আরও যোগ করি, ক্ষ, জ্ঞ এবং য-ফলার মধ্যেও একটা ই উচ্চারণ এসে যেত একসময়। বাংলার পুরো ব্যাপক ভাষাটাতেই তা ছিল, এখনও পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে তা বজায় আছে—যজ্ঞ [জোই্‌গ্‌গো], বক্ষ [বোই্‌ক্‌খো], গদ্য [গোই্‌দ্‌দো] ইত্যাদিতে যেমন। এই ই মা-চ-বা'তে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তার চিহ্ন রেখে গেছে আগের অ-কে [ও] করে দিয়ে। ফলে মা-চ-বা'তে আমরা পাই [বোক্‌খো], [গোদ্‌দো], [জোগ্‌গো]।

ফলে যে অ-গুলি [ও] হয়, সেগুলির বদলের একটা কারণ বা 'প্রতিবেশ' হল শব্দে তারপরে একটা ই-র উপস্থিতি। অবশ্যই ব্যতিক্রমী অ-গুলি এ পরিবেশে বদলাবে না। ওই যেসব অ 'না' 'বিপরীত' ইত্যাদি বোঝায় বা যেগুলিতে পাশের ই বাইরে থেকে এসে জুড়ে বসেছে।

দ্বিতীয়ত অ-এর [ও] হওয়ার আর-একটা কারণ হল শব্দের 'মধ্যে' (আবার বলি 'বাইরে' নয়) তারপরেই (আসলে পরের সিলেবলে) একটা উ-র উপস্থিতি। যেমন অতুল [পরিচিত নাম হলেই শুধু, অ-তুল 'তুলনাহীন' অর্থে নয়], অঙ্কুশ, অঙ্কুর, অত্যুৎসাহ, অনুপ, অনুরোধ, করুণ, জরুরি, পটুয়া, সরু, ভরুক। এখানে উ-কারে লুকোনো উ-কে পাচ্ছি। কিন্তু বউ, মউ ইত্যাদি কথাতে স্পষ্ট উ-ও ব-এর আর ম-এর অ-কে ও করে শব্দদুটির উচ্চারণ [বোউ] [মোউ] করেছে তা লক্ষ করুন। ফলে শব্দের বাইরে থেকে আসা 'না' ধরনের অ, -'টি'-র অ উপসর্গের অ-ছাড়া সবই শব্দমধ্যকার ই আর উ-র প্রভাবে বদলায়।

মনে রাখতে হবে, মূলের যেসব ই বা উ সন্ধির ফলে য-ফলা বা ব-ফলায় পরিণত হয় সেগুলির প্রভাবও নষ্ট হয় না। ফলে অতি + অন্ত যখন অত্যন্ত হল তার উচ্চারণে অতি-র 'ও' রাখবে, হবে 'ওৎতোন্তো'। এইরকম অত্যধিক, অত্যল্প, অত্যাশ্চর্য, অত্যুষ্ণ। অন্যদিকে মধু + অভাবে হবে 'মোদ্ধাভাবে', 'মোধ্‌'-উচ্চারণের 'মো'-কে রক্ষা করবে।

কিছু শব্দে ই-এর প্রভাবে অ-এর পরিবর্তনে কিছু ব্যতিক্রম কয়েক বৎসর হল লক্ষ করা যাচ্ছে। সেসব জায়গায় নিয়ম অনুযায়ী অ-এর [ও] হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বক্তারা ভুল করে এই অ-কে 'না'-বাচক অ ধরে নিয়ে অ-কে রেখে দিচ্ছে। এ শব্দগুলি হল অণিমা (< অণু + ইমা), অতীশ (অতি + ঈশ), অতীন্দ্র > অতীন (অতি + ইন্দ্র > ইন) ইত্যাদি। এগুলির সূত্রসম্মত উচ্চারণ যথাক্রমে ওনিমা, ওতিশ্‌, ওতিন্‌। কিন্তু বাঙালিরা এইসব অ-কে নিষেধবাচক অ ধরে নেয় বলেই এ অ-কে বদলায় না। ফলে এটা প্রচলনে এসে গেছে। প্রচলনই কখনও

সেই সঙ্গে আরও যোগ করি, ক্ষ, জ্ঞ এবং য-ফলার মধ্যেও একটা ই উচ্চারণ এসে যেত একসময়। বাংলার পুরো ব্যাপক ভাষাটাতেই তা ছিল, এখনও পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে তা বজায় আছে—যজ্ঞ [জোইগ্‌গো], বক্ষ [বোইক্‌খো], গদ্য [গোইদ্‌দো] ইত্যাদিতে যেমন।

কখনও মেনে নিতে হয়।

তেমনই 'অসুর অতুল' যখন খুবই প্রচলিত নাম (প্রথমটা যদিও মানুষের নাম নয়), এ দুটি শব্দের আগে মূলে না-বাচক অ থাকলেও, তা বদলে গিয়ে ও হয়েছে। ফলে অতুলপ্রসাদ [ওতুল্ প্রোশাদ] হবে। অর্থের প্রভাবে সূত্রের প্রয়োগে যেমন ব্যতিক্রম ঘটে, তেমনই তার অতিপ্রয়োগও ঘটে। 'না'-বাচক অ-এর অপরিবর্তন প্রথমটার দৃষ্টান্ত, আর 'না'-বাচক অ-এর পরিবর্তন (অসুর, অতুল) দ্বিতীয়টার দৃষ্টান্ত। মনে রাখতে হবে, 'অসুর' যখন সুরের অভাব, আর 'অতুল' যখন তুলনাহীনতা বোঝায় তখন অ অক্ষত থাকবে। 'অতুলনীয়'তে 'অ' পরিবর্তিত হবে না, 'জগতে অতুল কীর্তি'-তে 'অতুল'-এর 'অ' ও 'ও' নয়।

অ-এর [ও] হওয়ার প্রথম নিয়মটি আমরা দেখলাম। সেটি হল শব্দের অ যে দলে (সিলেব্‌লে) আছে তার পরের দলে একটি ই (যার মধ্যে বানানে ই, ই-কার, ঈ, ঈ-কার, ঋ-কার, ক্ষ, জ্ঞ এবং য-ফলা পাব—শেষ তিনটির উচ্চারণে বাংলায় একটা ই এসে যেত একসময়), বা উ (বানানে উ, উ-কার, ঊ-কার) থাকতে হবে। উ সন্ধির ফলে ব-ফলা হলেও তা কখনও হয়, আবার কখনও হয় না। যেমন 'মধ্বাভাবে'-তে কখনও 'মো' শুনি, আবার কখনও 'ম'। 'বহ্বারম্ভে'-তে 'ব'-ই শুনি, 'বো' নয়। 'অন্বেষণ' কখনোই 'ওন্নেশোন' হয় না।

মনে রাখতে হবে, 'অসুর' যখন সুরের অভাব, আর 'অতুল' যখন তুলনাহীনতা বোঝায় তখন অ অক্ষত থাকবে। 'অতুলনীয়'তে 'অ' পরিবর্তিত হবে না, 'জগতে অতুল কীর্তি'-তে 'অতুল'-এর 'অ' ও 'ও' নয়।

ক্ষ নিয়ে কিছু অনিশ্চয়ের এলাকা আছে। কিছু 'শিক্ষিত' লোকের ব্যবহৃত শব্দে ক্ষ-এর আগেকার অ [ও] হয় না, এখন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন 'দক্ষ', 'নক্ষত্র'। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি ('লক্ষ'-ও যে বানানই হোক, যে-অর্থই থাকুক হবে [লোক্‌খো], এটা মনে রাখবেন), ক্রমশ তা [দোক্‌খো] [দোক্‌খোতা], [নোক্‌খোৎত্রো] উচ্চারণ পাচ্ছে যত এ শব্দগুলি সাধারণ মানুষের ব্যবহারে আসবে তত এদের গোড়ায় অ[ও] হয়ে যাবে।

উপরের নিয়মটা সাধারণভাবে শব্দের গোড়াকার অ-এর [ও] হওয়ার নিয়ম। গোড়াকার অ[ও] হওয়ার আরও নিয়ম আছে।

তার একটা হল, শব্দের গোড়ায় যদি র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে, আর তার সঙ্গে থাকে নিহিত অ, তখন সেই অ উচ্চারণ [ও] হবে। যেমন এইসব দৃষ্টান্তে—

ক্রমাগত [ক্রো-] গ্রহণ [গ্রোহোন্], ত্রস্ত [ত্রোস্তো], দ্রবণ [দ্রোবোন্], প্রথম [প্রোথোম্], ব্রত [ব্রোতো], ভ্রমণ [ভ্রোমোন্], শ্রবণ [স্রোবোন্], স্রস্ত [স্রোস্তো]

এর উদাহরণ অবশ্যই প্রচুর বাড়ানো যায়। কিন্তু সর্বত্রই বিশেষ অ [ও] হয়ে যাবে। একমাত্র বাংলা শব্দে

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে উদ্বোধনী সংগীত গাইছেন শান্তিদেব ঘোষ

এর ব্যতিক্রম সেই হ্রদ-এ সেখানে 'হ্রোদ্' হয় না।

গোড়াকার অ [ও] হওয়ার তৃতীয় নিয়ম হল কিছু একদল (এক সিলেবলের) শব্দে অ-এর পরে ন্ এই দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনিটি [ন] যদি পাই তাহলে কিছু বহুল প্রচলিত শব্দে গোড়াকার (আসলে একমাত্র) অ [ও] হয়ে যায়। যেমন 'মন' [মোন্] 'বন' [বোন্], 'ধন' [ধোন্]। এটি খুবই সংকীর্ণ নিয়ম, কারণ এর ব্যতিক্রমও আছে—রণ, গণ, শব্দের গোড়াকার 'জন', কিন্তু 'লোকজন'-এর 'জন'-এ প্রায়ই ও-কার এসে যায়। আবার 'বন' 'বোন্' উচ্চারিত হয়, 'বনতল'-ও 'বোনোতল্'—কিন্তু 'বনানী' 'ব-নানি'। মন-এর প্রভাবেই 'মণ্ডল' 'মোন্ডোল্' হয়ে যায়।

এই 'ন্'-এর অ-কে ও করার ক্ষমতা অন্যান্য নাসিক্য ধ্বনিতে বিস্তারিত হয়েছে। যেমন 'সংসার' অনেকে 'শোংশার' (গ্রামীণ 'সোম্সার') বলেন। কিন্তু এটা মান্য উচ্চারণ নয়। তেমনই 'সঙ্গে' 'শোংগে' হবে না।

আর-একটা নিয়ম তৈরি হয়েছে শব্দের গোড়ার ম-কে নিয়ে। 'মহা' হয়েছে 'মোহা', 'মতো' হয়েছে 'মোতো'। এও চলতি উচ্চারণ, কথাবার্তায় প্রচুর শোনা যায়। কিন্তু 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে'-তে 'ম-হা' উচ্চারণ করা উচিত, বা 'জীবন যখন ছিল ফুলের মতো'-র 'ম-তো'-ই হবে, 'মোতো' নয়। এখানে কথার উচ্চারণরীতির সঙ্গে গানের বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণরীতির একটা পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। ফলে এই তফাতগুলি খেয়াল রাখতে হবে—

	মুখের কথায়	রবীন্দ্রসংগীতে
মহা	মোহ'	মহা
নমস্কার	নোমোস্কার	নমোশকার্
সংসার	শোংশার	শং-শার
মতো	মোতো	ম-তে

এই অ-এর মতো এ (এ/অ্যা), কিছু একক ব্যঞ্জন এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নিয়েও সমস্যা আছে। কিন্তু আর আমরা সাধারণ বাংলা উচ্চারণের আলোচনা করব না। বিশেষত রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণের স্বর ও ব্যঞ্জনগত সমস্যা, যুক্তব্যঞ্জনের সমস্যা নিয়ে এবার আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করছি।

অ-নিয়ে সমস্যা

রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণের অ-সংক্রান্ত সমস্যার তিনটি দিক। অ কোথায় অ-ই থাকবে, কোথায় ও হবে, এবং কোথায় সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে গিয়ে ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবে।

বাংলা উচ্চারণের ব্যাকরণের দিক থেকে বলি, উৎখাত হয় আসলে 'ও'। কিন্তু এটি বর্ণমালার ও বা ও-কার নয়। এটি হল সেই ও যা আগে অ ছিল, কিন্তু শব্দের গোড়ায় না থাকার ফলে (non-initial) ঝোঁকের দুর্বলতায় ও হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঝোঁকের আরও দুর্বলতায় ও-ও লুপ্ত হল। যা সংস্কৃতে আ-কা-শ(অমে) ছিল, তা বাংলায় আকাশ্ হয়ে যায়। বাংলাতেও পদবৃদ্ধি-তে 'দো' পাই, হরিপদ-তে 'দো' পাই। কিন্তু আলাদা পদ-এ তা 'পদ্' 'পদো' নয়। ফলে এই সমস্যাকে আরও স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম সমস্যা অ হবে না ও হবে ? দ্বিতীয় সমস্যা ও হবে না (= শূন্য) অর্থাৎ হসন্ত উচ্চারণ হবে—'আজি বিজন্ ঘরে নিশীথ্ রাতে' হবে না 'আজি বিজনো ঘরে নিশীথো রাতে' হবে ?

'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়' গানে 'নয়োনো' 'নিবিড়ো' এসব উচ্চারণ আমরা লক্ষ করি, অন্যত্র নয়োন্ পাই বহু গানে, যেমন 'তোমার 'নয়োন্' আমায় বারে বারে'-তে। কিন্তু 'আমার নয়ন' গানটিতেই সেদিন একজনের মুখে 'অশ্রুধারায় মজে' [ম-কে] শুনে একটু প্রশ্ন জাগল। মেয়েটি গীতবিতানের ছাত্রী, তার শিক্ষাদীক্ষা চমৎকার। কিন্তু এই গানটিতে, স্বরলিপিতে যাই থাকে, উচ্চারণটা যে 'মোজে' বা 'ম'জে' [< মজ্জিয়া] হবে—তার অন্তত দু-রকমের সংকেত আছে। একটা সংকেত হল মিলের। 'মজে'-র মিল হচ্ছে তিনটি শব্দের বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে—'খোঁজে', 'ও যে' আর 'বোঝে'। এ তিনটিতেই ও রয়েছে প্রথম দলে। রবীন্দ্রনাথের মতো সতর্ক বাকশিল্পী 'মজে'-তে অ রেখে দেবেন, এই সংকেতের পরিপ্রেক্ষিতে তা মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত যে-বাক্যে এই কথাটি আছে তার অন্বয় সংগঠন বা syntax-এরও এটা সংকেত আছে। 'অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে অশ্রুধারায় মজে'—এ কি দুটি বাক্য, না একটি ? আমাদের পাঠ থেকে মনে হয় একটিই বাক্য, অর্থাৎ বাক্যটিকে এভাবে পুনর্গঠন করা যায়—'অজানার মাঝে অশ্রুধারায় ম'জে অবুঝের মতো ফেরে।' এখানে 'অশ্রুধারায় ম'জে' কথাদুটো ক্রিয়াবিশেষণের মতো 'ফেরা' ক্রিয়াটির একটি চরিত্র নির্দেশ করছে। অর্থাৎ অশ্রুধারায় সজ্জিত অবস্থায় সে অবুঝের মতো ফিরছে।

কেন আমরা এই অনুমান করছি ? করছি এই কারণে যে, তার আগেই আমরা পেয়েছি 'আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে'। আতুর দিঠি-র একটা অবস্থাই হওয়া উচিত অশ্রুধারায় মজ্জিত অবস্থা। ফলে

রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণের অ-সংক্রান্ত সমস্যার তিনটি দিক। অ কোথায় অ-ই থাকবে, কোথায় ও হবে, এবং কোথায় সম্পূর্ণ উৎখাত হয়ে গিয়ে ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণ বোঝাবে।

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশি রই আপন মনে
বাতাস বহে সুমন্দ।

সারা দিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে সুগন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক সময় দুজন গায়ক গায়িকা যখন একই গান করেন তখন তাঁদের উচ্চারণের ব্যাকরণ সব সময় হুবহু এক থাকে না। এতে একটা কালের মাত্রা আছে, অর্থাৎ পুরানো আর নতুন উচ্চারণের তফাত আছে।

তার ফেরাটাই ওই রকম। অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরবার পর হঠাৎ সে অশ্রুধারায় মজতে আরম্ভ করল, এমন ঘটনা হয়তো নয়।

'ও' হবে না হসন্ত হবে, এই সমস্যার কথা আগে দু-একটি দৃষ্টান্তে বুঝিয়েছি, আর-একটু বিশদভাবে বলা যেতে পারে। পদান্তের উচ্চারণেই এই প্রশ্নটা এসে যায়। যেমন এই সম্ভাব্য বিকল্পগুলির ক্ষেত্রে—

> আমার [মন্] চেয়ে রয় মনে মনে (হসন্ত)
> মম [মনো] উপবনে চলে অভিসারে (ও-অন্ত)
> অশেষো বাসনা লয়ে ভাঙা বল (ও-অন্ত)
> আমারে তুমি অশেষ্ করেছ

সমস্যার সমাধানের কথা পরে হবে, আগে অন্যান্য সমস্যা একটু দেখে নিই।

এ-সংক্রান্ত সমস্যা

এ বা এ-কারের দুটি উচ্চারণ আছে—এ, আর অ্যা। অবশ্যই বাংলা ভাষায় উচ্চারণের যে ব্যাকরণ তাতে অ-ও-র মতো পরিষ্কার না হলেও, একটা সূত্র বার করা যায় এ সম্বন্ধে। এখানে ঝগড়া এ আর অ্যা-র, অ-এর মতো হসন্ত উচ্চারণের সমস্যা নেই। এখানে উচ্চারণের একটি বিখ্যাত সমস্যা "আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী"-র হেরে-টি 'হ্যারে' হবে না 'হেরে' (< হেরিয়া) হবে।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ সংক্রান্ত বৃহৎ সমস্যা তাহলে এই দুটি—

১. অ বনাম ও বনাম হসন্ত
   উপবিভাগ অ বনাম ও
   ও বনাম হসন্ত

২. এ বনাম অ্যা

আগে বুঝে নিই এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য কী কী আয়োজন করা আছে। এবং কোন্‌খানে সহায়তা নেই বলে আমাদের বিচক্ষণ অনুমান করে নিতে হয়। আমি মূলত রবীন্দ্রসংগীতের মুদ্রিত পাঠ—**'গীতবিতান'-স্বরবিতান**-বদ্ধ টেক্সট নিয়েই কথা বলব। কিন্তু বলা বাহুল্য শ্রুতিবদ্ধ পাঠ, অর্থাৎ গুরুর কাছে মৌখিক শেখা গান, রেকর্ডে-ক্যাসেটে বদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত থেকেও আমরা গান তুলে নিই গলায়। এবং এমন ভাবাই যেতে পারে যে, এই শুনে শুনে গান শিখলে আর কোনও সমস্যা নেই, উচ্চারণ তো মুখে-মুখেই শেখা হয়ে যাবে। আর বইপত্র দেখার দরকার হবে না।

এ সমাধানটা তত সহজ নয়। তার কারণ এই যে, অনেক সময় দুজন গায়ক গায়িকা যখন একই গান করেন তখন তাঁদের উচ্চারণের ব্যাকরণ সব সময় হুবহু এক থাকে না। এতে একটা কালের মাত্রা আছে, অর্থাৎ পুরানো আর নতুন উচ্চারণের তফাত আছে। রবীন্দ্রনাথ 'তবু মনে রেখো'-তে 'মন' কথাটাকে 'মোন্' উচ্চারণ করেননি, কিন্তু আজকে শিল্পী হয়তো 'মোনে'-ই উচ্চারণ করবেন। সুচিত্রা মিত্রও রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণসূত্র খানিকটা মেনে চলেন বলে মনে হয়, ফলে তাঁর 'কত যে তুমি ম-নোহর ('মোনোহরো' নয়) ম-নেই ('মোন্ই' নয়) তাহা জানে' আমরা শুনি, কিন্তু আবার 'মোনোহরো' এবং 'মোন্-ই'-ও তো অন্যদের মুখে শুনেছি। রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞরা এরকম আরও অনেক উদাহরণ মনে করতে পারবেন। সুরের তফাত বা লয়ের তফাতও ঘটে, কিন্তু সেটা এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

ফলে মৌখিক এবং শ্রুতিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনও মুদ্রিত নির্দেশ বা সংকেত থাকে তাও আমাদের মন দিয়ে দেখতে হবে। এ রকম কিছু নির্দেশ সংগীতের বা স্বরলিপির মুদ্রিত পাঠেই আমরা পাই, আর কিছু আমাদের অনুমান করে নিতে হয়।

মুদ্রিত নির্দেশ প্রথমে পাই স্বরবিতান গ্রন্থমালায়। স্বরবিতান-এর খণ্ডগুলির শেষে স্বরলিপি-সংকেতের

ব্যাখ্যার শেষে 'উচ্চারণ' সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ থাকে। সেটি আমরা পুরোপুরি উদ্ধৃত করি—

> **উচ্চারণ**। স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ-অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে। ে = এ এবং ে = অ্যা, যেরূপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনাশ্রিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া 'অবেলায়' বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় অ বে লা য়। 'মনে'—ম নে।

বলা বাহুল্য, উপরের দাবিটি সম্পূর্ণ সংগত নয়। এখানে এ-অ্যা-র পার্থক্য যেটুকু এ-কারের সঙ্গে যুক্ত সেটুকু পরিষ্কার করা হয়েছে তা ঠিক। মাত্রাহীন এ-কারে এ, আর মাত্রাযুক্ত এ-কারে অ্যা বোঝাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু 'প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ অনুযায়ী' দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। যেমন 'এ' বর্ণটিতে কোথায় এ আর কোথায় অ্যা হবে তার নির্দেশ কোথাও নেই। যেমন 'যখন মল্লিকাবনে' গানটির সঞ্চারীতে 'এখনো বনের গান সখা হয়নি তো অবসান, তবু এখনি যাবে কি চলি'-তে 'এখনো' আর 'এখনি'-র দুটি এ একই চেহারায় আছে, কিন্তু প্রথম এ-র উচ্চারণ যে অ্যা ('অ্যাখোনো') এবং দ্বিতীয়টির যে এ ('এ-খোনি') তা মুদ্রিত পাঠ থেকে বুঝব কী করে ? বা 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' গানে 'এমনি লীলা তব'-র 'এমনি' 'অ্যামোনি' হবে না 'এমোনি' হবে সে নির্দেশ নেই। ফলে অভিকরণের সময় কেউ একটা, কেউ অন্য একটা উচ্চারণ করেন।

দ্বিতীয়ত অ-ও-হসন্ত সমস্যায় হসন্ত চিহ্নটিকে স্বরলিপিতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলেও অ-এর ও উচ্চারণটি কোথাও ও-কার দিয়ে বোঝানো হয়নি। ফলে এক্ষেত্রে স্বরবিতান খুব একটা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে না।

অবশ্যই এ কথা বলা হতে পারে যে, অতটা দেখানোর কি আদৌ প্রয়োজন আছে ? যে বাঙালি বা অবাঙালি শুদ্ধ মান্য চলিত বাংলা বলতে পারে না তাকে প্রথমে সেটার উচ্চারণ শিখে নিতে হবে, তারপরে সে রবীন্দ্রসংগীত শিখবে। এ ফতোয়া যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়। একটার উচ্চারণ শেখা শেষ করে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা শুরু করতে হবে—এমন প্রকল্প প্রায়ই সার্থক হয় না, দুটোই হয়তো পাশাপাশি চালাতে হয়। একটা অন্যটাকে সাহায্যও করে।

অবশ্যই **স্বরবিতান**-এর স্বরলিপিতে রয়েছে ওই হসন্তের সংকেত। কোথায় অ/ও উচ্চারণ হবে বা হসন্ত (মানে অনুবর্তী স্বরহীন ব্যঞ্জন) হবে তা **স্বরবিতান**-এ সুনির্দিষ্টভাবেই দেওয়া আছে।

> আমরা লক্‌খীছাড়ার্ দল্ ভবের্ পদ্দপত্‌ত্রে
> জল্ সদা কর্‌ছি টলোমল্...

এই উচ্চারণ নির্দেশের মধ্যে ত্রুটি নেই তা নয়। 'লক্‌খী' কেন 'লোক্‌খি' হল না পদ্দ কেন 'পদ্‌দো' হল না। এসব প্রশ্ন আমরা তুলছি না, কিন্তু লক্ষ করছি যে হসন্ত দিয়ে হসন্ত উচ্চারণ স্পষ্ট করা হচ্ছে। ফলে স্বরলিপি থেকে যে গান তুলবে সে কখনোই 'প্রোলয়ো নাচন্' গাইবে না, গাইবে 'প্রোলয় নাচন্', 'আপনো ভুলে' গাইবে না, গাইবে 'আপন্ ভুলে।'

ফলে, উচ্চারণ-নির্দেশ আংশিক হলেও তা থেকে শিক্ষার্থী বেশ কিছুটা ইঙ্গিত পায় **স্বরবিতান**-এ গানের কী উচ্চারণ মান্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। সে জন্য **স্বরবিতান** থেকে শুধু সুর তোলা নয়, তা যত্ন নিয়ে পড়ার অভ্যাস করাও শিক্ষার্থীর অবশ্যপালনীয়।

আর কোথাও কি কোনো সহায়তা লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রসংগীত-শিক্ষার্থীদের জন্য ? এই লেখকের চোখে পড়েছে আরও কিছু সংকেত, যাতে অন্তত কোথায় পদান্তের অ > ম লুপ্ত হয় বা হয় না তা খানিকটা আগে থেকে অনুমান করা যাবে।

এই একটা সংকেত হল গীতরচনাটির ভাষাভঙ্গি বা স্টাইল। তাতে মনে হয়েছে এই সংকেতগুলি শিক্ষার্থীরা পরখ করে দেখতে পারে—

১. তৎসম শব্দ প্রধান খানিকটা ধ্রুপদি বা ক্লাসিকাল রীতির গানে অ > ও বেশি প্রত্যাশিত, হসন্ত উচ্চারণ প্রত্যাশিত নয়। যেমন একটি গানের উদাহরণ তুলে দেখাই—

> অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা
> অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
> জনকজননী জননী॥
> নীল সিন্ধুজল ধৌতচরণতল
> অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
> অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল
> শুভ্রতুষার কিরীটিনী॥
> প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
> প্রথম সামরব তব তপোবনে।
> প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
> জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
> চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
> দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
> জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
> পুণ্যপীযূষ স্তন্যবাহিনী॥

এ রকম গানের একটি প্রাথমিক ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা আমরা নীচে সূত্র হিসেবে শুরু করছি, রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞরা নিশ্চয়ই এই তালিকা আরও বাড়িয়ে পুরো করে নিতে পারবেন—

> অন্তর মম বিকশিত করো
> আজি এ আনন্দসন্ধ্যা
> আজি এ গন্ধবিধুর সমীরণে
> আজি কমলমুকুলদল খুলিল
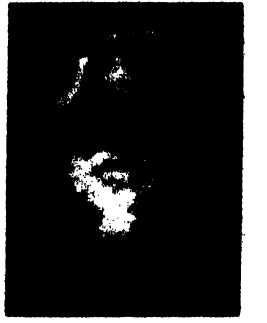
যে বাঙালি বা অবাঙালি শুদ্ধ মান্য চলিত বাংলা বলতে পারে না তাকে প্রথমে সেটার উচ্চারণ শিখে নিতে হবে, তারপরে সে রবীন্দ্রসংগীত শিখবে। এ ফতোয়া যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয়।

আজি গোধূলিলগনে এই বাদলা গগনে
আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু

বিশেষ করে বাংলাভাষায় তৎসম চরিত্রের সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদের শেষের ব্যঞ্জনটি অ > ও দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা আমরা এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে জানি—

জল কিন্তু জলযান
পদ কিন্তু পদতল, পদপাত
বন কিন্তু বনতল, বনবাণী
জীবন কিন্তু জীবনপাত্র

কাজেই ধ্রুপদি শৈলীর গানগুলির মধ্যে যে সব তৎসম শব্দের সমাস রয়েছে, সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে।

কিন্তু তৎসম শব্দ ছাড়াও দেখি, এ ধরনের গানে অন্যত্রও অ > ও উচ্চারিত হচ্ছে অন্ত্যব্যঞ্জনে, যেমন আঁধার অম্বরে, বাদলগগনে, আনমনে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এগুলিতে সুর ও তালের সংগতিসাধনের জন্য অন্ত্য অ > ও রক্ষা করা হয়েছে। এগুলি শুধু মুদ্রিত পাঠ থেকে জানা যাবে না। অবশ্যই স্বরবিতান এবং শিক্ষাগুরুর সাহায্য নিতে হবে। এই দুয়েরই তাগিদে সাব্ধানী হয় সাবোধানী (পথিক), পথ্ হয় 'পথো' (ভুলে)। 'আমারে তুমি অশেষ্ করেছ' হলেও 'শুধু যাওয়া আসা' গানে 'অশেষো বাসনা' হয়। এই সুরতালের আমন্ত্রণে থেকে যাওয়া অ > ও-র দৃষ্টান্ত এত অসংখ্য যে তার তালিকা করা সম্ভব নয়। 'লিখনো তোমার' 'মধুরো মধুরো ধ্বনি' 'এ শুধু আপনোমনে', 'সন্ধ্যায় মলিনো ফুল', 'বেণুবনো মর্মরে, 'ভিখারিরো বীণা' ইত্যাদি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কোথাও কোথাও মুদ্রণে খণ্ড ৎ-কে 'পূর্ণ-ত' করে দিয়ে মুদ্রণে এই স্বরান্ত উচ্চারণ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে—যেমন শরৎ-এর জায়গায় 'শরত-তপনে', জগৎ-এর জায়গায় 'নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত ; 'জগত-জুড়ে উদার সুরে'। এখানে অন্তত মুদ্রিত রূপেই উচ্চারণের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু কোথায় 'প্রভাত' 'প্রভাৎ' আর 'প্রভাতো' হবে, 'অরূপ' 'অরূপ্' ('অরূপ তোমার বাণী') না 'অরূপো' ('অরূপবীণা') হবে—তা বোঝবার জন্য ভাষার ব্যাকরণের সূত্রের সঙ্গে স্বরলিপি সূত্রও মাথায় থাকা চাই। এই ধরনের অজস্র শব্দ উচ্চারণের এই উভমুখিতা নিয়ে শিক্ষার্থীকে ধাঁধায় ফেলে—অকূল, অনেক, অন্তর, অন্ধকার, অপার, অমল, অরূপ, অসীম, আকাশ, আগুন, আঘাত, আঁধার, আনমন, আপন, আমার, আর, আসন, উদার, একটি, এক, এখন, এমন, কঠিন, কাল, খেলার, গভীর, গহন—তালিকা প্রায় অসংখ্য শব্দের। তবে একটা লক্ষ করেছি, যে সব শব্দ -য় দিয়ে শেষ হয়েছে, যেমন হায়, কোথায়, উপায়, সভায়, ইত্যাদি, সেগুলিতে অধিকাংশত হসন্ত উচ্চারণ রক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

একটা লক্ষ করেছি, যে সব শব্দ -য় দিয়ে শেষ হয়েছে, যেমন হায়, কোথায়, উপায়, সভায়, ইত্যাদি, সেগুলিতে অধিকাংশত হসন্ত উচ্চারণ রক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

এর আগে আমরা তৎসম-শব্দপ্রধান সমাসসমৃদ্ধ রীতির কথা বলেছি, যাতে অন্তের অ > ও প্রায়ই রক্ষা করা হয়েছে, ওই 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর' জাতীয় শৈলীতে। এর উলটো যে শৈলী, অর্থাৎ বাউল ধরনের সহজিয়া ভাষার গানে, সেখানে কিন্তু তৎসম শব্দের প্রয়োগ স্বাভাবিকভাবেই কম, ফলে অন্ত্য স্বরও প্রত্যাশিত নয়। এ সব গানের কথা সহজেই মনে আসে—

কান্নাহাসির দোলদোলানো
তোমার সুরের ধারা (এতেও 'নীরবো বেলা' আছে)
তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন
তোমায় গান শোনাব
পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে
আপন হতে বাহির হয়ে

কিন্তু 'সহজিয়া ভাষা'-র মধ্যেও নিরুক্তি বা রেজিস্টারের পার্থক্য আছে। এগুলিতে যেমন ভাষার একটি মৌখিকতা আছে, প্রায় চলতি ভাষার প্রয়োগ এগুলির প্রধান চরিত্র, তেমনই অন্য গানেও 'সহজ' ভাষা আছে। কিন্তু সে সহজ ভাষা আমাদের এই সহজ ভাষা নয়। নয় এই কারণে যে, সেখানে প্রায়ই চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়নি। বরং সাধু বা 'কাব্যিক' ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়েছে। শেষেরটির উদাহরণ 'দাঁড়ায়ে' 'লুটায়ে' ইত্যাদি। ফলে 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গানটির ভাষা কঠিন নয়, তা সত্ত্বেও আমরা যাকে বাংলা কবিতার 'সাধু শৈলী' বলি তার চিহ্ন এ গানের সর্বাঙ্গে, ফলে এতে শব্দের শেষে অ > ও ধ্বনি রক্ষিত। বিশেষত টপ্পা ও ছুট্খেয়াল অঙ্গের গানগুলিতে এই শৈলী বিশেষভাবে রক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং এই শৈলী, এবং অবশ্যই ধীরলয়ের ছন্দের প্রভাবে, তাতে অন্ত্যস্বর বহুলাংশে বজায় আছে। 'বিমল আনন্দে জাগোরে', 'নূতন প্রাণ দাও', সরলতা হয় সরোলোতা। এই পরের ও হয়ে যাওয়া অ কি একেবারেই হুবহু ও ?

শুভ গুহঠাকুরতা তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে আনন্দ, বসন্ত ইত্যাদি শব্দের শেষের ও ধ্বনিকে অ আর ও-র মাঝামাঝি উচ্চারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে প্রত্যয় থেকে তিনি একথা বলেছিলেন, তা সম্ভবত বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি
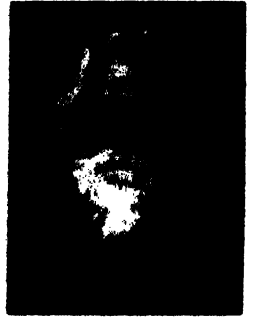
পর্যবেক্ষণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এই অ থেকে জন্মানো ও-গুলিতে যে 'আসল' ও-এর মতো ঠোঁট গোল হয় না তা আমরা লক্ষ করেছি। আসল ও-তে ঠোঁট যতটা ছোটো হয়ে গোল হয় এই অ-উপজাত ও-তে ঠোঁট অতটা ছোটো হয়ে গোল হয় না। অবশ্যই এটা দৃষ্টি-পর্যবেক্ষণের ব্যাপার, এর যান্ত্রিক নিরীক্ষা অবশ্যই করা দরকার।

এ আর অ্যা-এর বিষয়টি অ-ও-হসন্তের মতো ব্যাপকভাবে সূত্রবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে কয়েকটি জায়গায় এ-অ্যা নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। 'একত্র' 'একাকী' ইত্যাদি শব্দ কেউ কেউ একত্র-অ্যাকোত্রো, একাকী-অ্যাকাকি নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন। স্বরবিতানগুলিতে এ সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। 'আমার মল্লিকাবনে' গানটিতে 'অ্যাখোনো বোনেরো গান' দিয়ে যে সঞ্চারী শুরু হল তাতেই 'এখোনি যাবে কি চলি ?' রয়েছে। মুখের কথাবার্তায় এখনি/এখনই 'অ্যাখোনি' উচ্চারিত হয়। এই গানে 'এখোনি' নিশিদিন চাহোরে', 'বাণী তব ধায়' ইত্যাদি তো আছেই। সেই সঙ্গে আছে 'সাধু' শৈলীতে লেখা 'নব বসন্তের দানের ডালি'-র মতো গান, যাতে অন্ত্যস্বর (অ > ও) বহুলাংশে উচ্চারিত।

অবশ্যই এগুলি সাধারণ ইঙ্গিত, একেবারে নিগড়বদ্ধ নির্ভুল নিয়ম নয়। চলিত রীতির 'সংকোচের বিহ্বলতা' গানটিতে 'নিজেরে দীন নিঃসহায়', 'কঠিন পরিচয়' ইত্যাদি স্বরান্ত ব্যবহার আছে—এসব জায়গায় সুর ও তাল স্বাভাবিক উচ্চারণকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

অ যেখানে ও উচ্চারণ পায় তার নিয়মগুলি উপরে আমরা বলেছি। সেসব নিয়ম মান্য চলিত বাংলার স্বাভাবিক কথাবার্তার। কিন্তু আগেই বলেছি, কবিতার ভাষা বা গানের ভাষা স্বাভাবিক কথাবার্তার ভাষা নয়। তার উপর গানে স্বাভাবিক উচ্চররণ সুর ও তালের অধীন হয়ে পড়ে, তাই যেখানে শব্দের শেষ ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণ হওয়ার কথা সেখানে 'ও' উচ্চারণ চলে আসে।

এই 'ও' কি ঠোঁট গোল করা 'ও' ধ্বনি, বাংলার চেনা ও-কারের ধ্বনি ? এ 'ও'-র সৃষ্টি হয় নানাভাবে তা আমরা দেখেছি। কখনও শব্দের মধ্যে পরের দলে (সিলেব্‌লে) ই বা উ ধ্বনি থাকলে, কখনও শব্দের গোড়ায় বল বা stress পড়লে পরবর্তী দলের নিহিত (= লুকোনো) অ ও হয়ে যায়। এভাবেই বাঁদর বাঁদোর্‌ হয়, পাগল হয় পাগোল্‌। পূর্ববঙ্গের ভাষায় এখনও বান্দর্‌ পা-গল্‌-ই আছে। অনবরত হয় অনোবরোতো, হওয়ার কোনো কারণ বোঝা যায় না। এর ইতিহাসটি উদ্ধার করা গেলে ভালো হত। নইলে এ-কারের বেলায় স্বরবিতানের ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তবে শব্দের প্রথম দলের ক্ষেত্রে। শব্দমধ্যবর্তী এ-কার তো সবই মাত্রা দেওয়া, তার এ এবং অ্যা উচ্চারণের তফাত উদ্ধার কীভাবে করা যাবে ? ধরা যাক 'অবেলা', 'ছেলেখেলা', ' ছেলেবেলা' ইত্যাদিতে স্থূলাক্ষর এ-কারগুলি এগুলি এ না অ্যা তা যে বাংলাভাষার উচ্চারণ আগেই না জানে তারপক্ষে ধরা মুশকিল।

কতকগুলি একক (single) ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের খেয়াল রাখতে হবে।

আমরা সবাই অন্য উপভাষা-অঞ্চল থেকে এসে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন নিয়ে সমস্যায় পড়ি। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ঢ়, থ, ধ, ফ, ভ, ইত্যাদি যে ধাক্কা দিয়ে খানিকটা বিস্ফোরণের মতো উচ্চারণ করতে হয়। এর মধ্যে 'হঠাৎ' কারও কারও গলায় 'হটাৎ' হয়ে যায়, এমন কি বিখ্যাত জনপ্রিয় গায়কেরাও সে ভুল করেছেন। ঢ় প্রায়ই শব্দের শেষে ড় হয়ে যায়, 'আষাঢ়সন্ধ্যা' হয়ে যায় আষাড়্সন্ধ্যা'। সেটা তত দোষের নয়, বরং জোর করে 'আষাঢ় সন্ধ্যা' করতে গেলেই হয়তো কৃত্রিম শোনাবে। কিন্তু 'আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্‌ খেয়া'-তে ঢ়-এর স্পষ্ট প্রবল উচ্চারণ দরকার। অর্থাৎ যে ঢ়-এর সঙ্গে স্বরধ্বনি লেগে আছে, তার উচ্চারণ ড় হলে চলবে না।

ফ্‌ ভ্‌ নিয়েও সকলকে সাবধান হতে বলি। অসতর্ক উচ্চারণে এ দুটি ধ্বনি প্রায়ই ইংরেজি /f/, /v/ হয়ে যায়। ইংরেজি ধ্বনি দুটির উচ্চারণে নীচের ঠোঁট উপরের দাঁতের পাটি ছোঁয়। কিন্তু দুয়ের মধ্যে খুব অল্প একটু ফাঁক থাকে, ফলে ইংরেজি ধ্বনি দুটোর মধ্যে একটু বাতাস বেরোনোর আওয়াজ হয়। কিন্তু বাংলা ফ্‌ ভ্‌ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন। অর্থাৎ দুটো ঠোঁট শক্ত করে বন্ধ করে বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ করে এ দুটোর উচ্চারণ করতে হবে। রবীন্দ্রসংগীতের উচ্চারণে ইংরেজির /f/ /v/ ঢুকে পড়লে খুব কলঙ্কের কথা।

স্‌ শ্‌ নিয়ে অনেকের সমস্যা হয়। যাদের শুধু 'স্‌' (শ্যামবাজারের সশিবাবু) অর্থাৎ ইংরেজির /s/ ধ্বনি আসে—তাঁরা যেখানে জিভ ঠেকচ্ছে, সেখানে ঠেকিয়ে একটু জিভটাকে পিছনে টেনে নিলেই শ্‌ হবে। আবার যাদের শ্‌-এর দোষ [বাশ্‌, শাইকেল, শিগারেট] আছে তাঁরা শ্‌ বলতে বলতে জিভটাকে টাকরা ধরে একটু এগিয়ে দিলেই স্‌ এসে যাবে। উচ্চারণের সমস্যা নেই।

অ্যা এ হয় যে-পরিবেশে তা অ-এর ও হওয়ার মূল নিয়মটার মতোই। সে নিয়ম স্বরোচ্চতাসাম্যের। শব্দে দ্বিতীয় দলে ই বা উ ধ্বনি থাকলে অ্যা এ হয়। এটা কথার নিয়ম, গানেরও নিয়ম। ফলে এই পরিবর্তনগুলি আমরা লক্ষ করি—

'একত্র' 'একাকী' ইত্যাদি শব্দ কেউ কেউ একত্র-অ্যাকোত্রো, একাকী-অ্যাকাকি নিয়ে বিভ্রান্ত থাকেন। স্বরবিতানগুলিতে এ সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। 'আমার মল্লিকাবনে' গানটিতে 'অ্যাখোনো বোনেরো গান' দিয়ে যে সঞ্চারী শুরু হল তাতেই 'এখোনি যাবে কি চলি ?' রয়েছে। মুখের কথাবার্তায় এখনি/এখনই 'অ্যাখোনি' উচ্চারিত হয়।

অ্যা - শব্দ	এ - শব্দ
এক	একটি, একটু
প্যাঁচা	পেঁচি

যুক্তব্যঞ্জনের ব্যাপারে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষকদের একটা নির্দেশের কথা আমি শুনেছি যে, যুক্তব্যঞ্জনগুলিকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে উচ্চারণ করতে হবে। অর্থাৎ 'উদ্ভাসিত'-কে 'উদ্-ভাসিত' হিসেবে উচ্চারণ না করে আগের স্বরটিকে দীর্ঘ করে দ্-কে আলতো ভাবে ভ-এর সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে, অর্থাৎ 'উ—দ্ভাসিত', স—ম্পদ ('সম্-পদ্' নয়), 'বি—দ্রোহ', 'বিদ্-রোহ' নয়।

এক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জনের ভাবাতাত্ত্বিক চরিত্র সম্বন্ধে একটু বলতে হয়। যুক্তব্যঞ্জন মূলত লেখার ছবি—উচ্চারণের ছবি এ রকম নয়। লেখায় যুক্তব্যঞ্জন একটি একক, কিন্তু উচ্চারণে ব্যঞ্জনদুটি দুটি দল বা সিলেব্‌লে বিভক্ত। প্রত্যেক সিলেব্‌লের তিনটি অংশ—
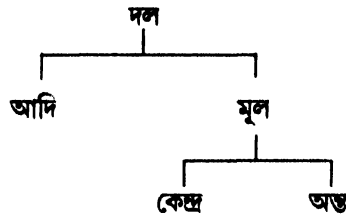
এই হিসেবে 'অন্ধকার'-এর 'অন্ধ কথাটি দুটি দলে বিভক্ত 'অন্-ধো'—এইভাবে
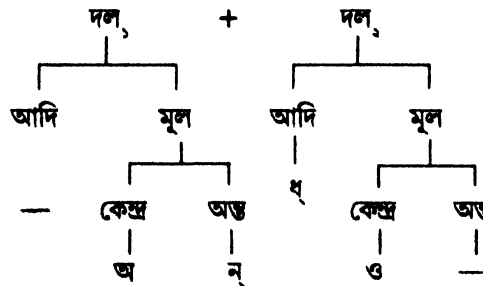
আমরা দেখতে পাচ্ছি, লেখায় 'ন্ধ' লেখায় একটা একক, কিন্তু উচ্চারণে ন্ আর ধ্ পাশাপাশি হলেও দুটো দলে ভাগ হয়ে আছে।

তাতে কিছুই সমস্যা নেই, মুখ পাশাপাশি ব্যঞ্জনকে সারিবদ্ধভাবে উচ্চারণ করে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতেই কোথাও কোথাও যুক্তব্যঞ্জনের ওই পেলব উচ্চারণ যে সব সময় রক্ষা করা সম্ভব নয় তাও মনে রাখতে হবে। যেসব গানে দ্রুত লয় আছে, অনেকটা 'মার্চিং সং'-এর মতো, যেমন 'সংকোচের বিহ্বলতা' 'চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে' ইত্যাদি গান—এমন কি 'জনগণমন'-তেও যুক্তব্যঞ্জনের দুটি ব্যঞ্জনকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

যুক্তব্যঞ্জনের প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আজকাল 'হ্ব' যুক্তব্যঞ্জনটিকে নিয়ে অনেকের খুব সমস্যা হচ্ছে। এর উচ্চারণ 'ও্‌ভ্', ফলে 'আহ্বান' হবে বাংলার মান্য উচ্চারণে 'আও্‌ভান্', 'বিহ্বল' হবে 'বিও্‌ভল্', 'জিহ্বা' হবে 'জিও্‌ভা'। কিন্তু দূরদর্শনের সংবাদপাঠিকা থেকে শুরু করে অনেকে আজকাল শ্রুতিকটু এক উচ্চারণ 'আহোবান্' করতে শুরু করেছেন—এ তাঁরা কোথায় শিখলেন জানি না। দূরদর্শন-রেডিয়োতে অনেকে আজকাল 'ক্ষ'-র সংস্কৃত উচ্চারণ করছেন ক্‌ষ্ (ক্‌শ্) হিসেবে, বলছেন 'দীক্‌শা', 'আত্মা'কে 'আঁত্তা' না বলে বলছেন 'আত্‌মা', মহাত্মা-কে 'মহাত্‌মা'। এতে বাংলা উচ্চারণের স্বধর্মই নষ্ট হচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের একথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ কখনও বাংলা উচ্চারণকে ভুয়ো সংস্কৃত উচ্চারণ দিয়ে আচ্ছন্ন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেননি। তাঁর **বাংলা শব্দতত্ত্ব** এ জন্য রবীন্দ্রসংগীতের নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীদেরও পড়া দরকার।

দূরদর্শন-রেডিয়োতে অনেকে আজকাল 'ক্ষ'-র সংস্কৃত উচ্চারণ করছেন ক্‌ষ্ (ক্‌শ্) হিসেবে, বলছেন 'দীক্‌শা', 'আত্মা'কে 'আঁত্তা' না বলে বলছেন 'আত্‌মা', মহাত্মা-কে 'মহাত্‌মা'। এতে বাংলা উচ্চারণের স্বধর্মই নষ্ট হচ্ছে।

এ লেখাটি একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনমাত্র। রবীন্দ্রসংগীতের আগ্রহী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তা পেলে এ লেখা আরও সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হবে। ফলে তাঁদের সহায়তা ও সমালোচনা দুইই আমার বাঞ্ছিত।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১। উচ্চারণের নীতিনিয়মের জন্য এই লেখকের **বাংলা বলো** [প্রমা] বইটি দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া এ লেখকের **ভাষা-জিজ্ঞাসা** (নবম-দশম) [বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির] বইটিতেও কিছু আলোচনা আছে।

২। সুভাষ ভট্টাচার্যের **সংসদ উচ্চারণ অভিধান** এবং এ লেখকের প্রকাশিতব্য **আকাদেমি উচ্চারণ অভিধান** দ্রষ্টব্য।

৩। এই লেখকের **গদ্যরীতি পদ্যরীতি** [সাহিত্যলোক, ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ] কবিতার ভাষা কোথায় আলাদা তার আলোচনা আছে। দ্র. 'কবিতার ভাষা ও বাংলা কবিতা।'

৪। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর **সাকুল্যে তিনজন**, ২০০০, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪ পৃ.

৫। রবীন্দ্রনাথের **পুনশ্চ**-এর 'খোয়াই' কবিতা।

৬। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত **[illegible]**-এর বাংলা সংগীত সংখ্যাতে এই লেখকের প্রবন্ধ দ্র. বর্তমানে **গদ্যরীতি পদ্যরীতি** বইয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৭। ৩-এর সূত্র দ্র.।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট ভাষাবিদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য।
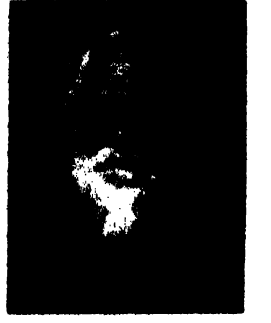
রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুর : নান্দনিক মিলনের সূত্রসন্ধান

সিতাংশু রায়

কথা ও সুরের মূল উৎস একই এবং তা মানুষের স্বরযন্ত্র। যে স্বরযন্ত্র দিয়ে মানুষ কথা বলতে শিখেছে, সেই স্বরযন্ত্র দিয়েই সে সুরও সৃষ্টি করেছে। স্বরযন্ত্রই মানুষের আদি ও অকৃত্রিম সংগীত-যন্ত্র।

আবার, একই ইন্দ্রিয়ের প্রতি কথা ও সুরের আবেদন। বলাই বাহুল্য, তা শ্রবণেন্দ্রিয়। আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে কথা ও সুর দুই-ই।

একই উৎস থেকে সৃষ্ট ও একই ইন্দ্রিয়ের জন্যে সৃষ্ট হলেও কথা ও সুর উভয়ের গঠনরীতি, প্রকাশনীতি, আবেদনধর্ম ও স্বরূপ ভিন্ন। সেগুলির পর্যালোচনা করলেই কথার আবেদন, সুরের আবেদন ও উভয়ের মিলিত আবেদন আমাদের কাছে স্পষ্টতর হবে।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সহযোগে মানুষ সৃষ্টি করেছিল শব্দের (words), যা কোনও বস্তুর বা ভাবের বা ক্রিয়ার চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হতে থাকল। বিভক্তি যোগে শব্দই হয়ে উঠল পদ এবং পদসমষ্টিযোগে বাক্যের উদ্ভাবনা দ্বারা প্রকাশ ক্ষমতা অনেক উন্নত হতে থাকল। এইভাবে হতে থাকে ভাষার উদ্ভব ও

একই উৎস থেকে সৃষ্ট ও একই ইন্দ্রিয়ের জন্যে সৃষ্ট হলেও কথা ও সুর উভয়ের গঠনরীতি, প্রকাশনীতি, আবেদনধর্ম ও স্বরূপ ভিন্ন।

ক্রমবিবর্তন। গদ্যের ভাষা সংবাদ পরিবহন করে, যুক্তি পরম্পরায় প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে এবং দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের ও কথাসাহিত্যের যথোপযুক্ত ধারক এবং বাহকরূপে নিজেকে ক্রমাগত গড়ে তোলে। জীবের মতো ভাষারও বৃদ্ধি এবং ক্রমবিবর্তন আছে। তাই বিগত দিনের অভিধান ও ব্যাকরণ কালক্রমে অচল হয়ে পড়ে। কাব্যের ক্ষেত্রে ভাষার কাজ ভিন্নতর। ব্যাচ্যার্থটুকু প্রকাশ করাই কাব্যের কাজ নয়। কাব্যের ক্ষেত্রে ভাষা তার একান্ত অর্থের ধার ধারে না, বরং হয়ে ওঠে ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী, যে ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনার নির্দেশকে ভারতীয় আলংকারিক বলেছেন ধ্বনি।

যে-কোনো দেশের সংস্কৃতির আদি যুগে দেখা যায় যে সংগীত ছিল কাব্যাশ্রয়ী, তথা কাব্য ছিল সংগীতনির্ভর (বাংলার দৃষ্টান্ত নিলে চর্যাগান বা চর্যাপদই তার নিদর্শন।) বিশুদ্ধ সংগীতের উদ্ভব আরও পরবর্তীকালে। সংগীতযন্ত্র প্রথমে ছিল কণ্ঠসংগীতেরই সহযোগী। কালক্রমে বিশেষজ্ঞের প্রতিভা, উদ্ভাবনা, সাধনা ও অনুশীলনের গুণেই যন্ত্রসংগীতের প্রচলন, যা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ সংগীতের আকর।

কাব্যরস সহৃদয়ের অন্তরে অনির্বচনীয়। তবু বচনীয়তাই কাব্যের দেহ বা আশ্রয়, কেননা কথাকে ত্যাগ করার সাধ্য কাব্যের নেই। পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ সুর স্বপ্রকাশ, যাকে শার্ঙ্গদেব বলেছেন নাদতনু। সুর তুলনা ও তর্জমারহিত এবং আক্ষরিক অর্থেই অনির্বচনীয়। সুরের সম্ভোগ বচনে মেটে না। কোনও বস্তু, ভাব বা ক্রিয়ার জ্ঞাপকরূপে নয়, আপন মাধুর্যেই সুরের পরিচয়। হতে পারে, হার্বার্ট স্পেন্সরের অনুমান অনুযায়ী মানবকণ্ঠের স্বরের উচ্চতা-নিম্নতার স্বতঃস্ফূর্তির কারণ নিহিত আবেগ-অনুভূতির তারতম্যের মধ্যে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্পেন্সরের সূত্র ধরে বলতে গেলে—মানুষ যা উচ্চারণ করত, তা ভাষার বীজ এবং যেভাবে উচ্চারণ করত তা সংগীতের বীজ। কিন্তু আর কিছুটা অগ্রসর হলে স্পেন্সরের সূত্রের থেই হারিয়ে যায়। কারণ প্রথমত, কথাবার্তা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে আর সংগীতের সুরের আবেদন ব্যবহারিক জীবনের ঊর্ধ্বে ; দ্বিতীয়ত, কথাবার্তায় কণ্ঠস্বরের ওঠানামা জৈব আবেগ-উত্তেজনা দ্বারা চালিত আর সংগীতের স্বরবিন্যাস সুরকার-শিল্পীর প্রতিভা, সাধনা ও সৌন্দর্যবোধ দ্বারা রূপায়িত।

কথায় ও সুরে মিলে গান যেন রূপ-অরূপের, সীমা-অসীমের, চেনা-অচেনার, বচনীয়-অনির্বচনীয়ের মিলনের মতো। অবশ্য সুরের একটা শ্রাব্যরূপ আছে। সেই বিচারে সুরকে অরূপ বা বিমূর্ত বলা যায় না।

প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সরের মতের অনুবর্তন করে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সমীক্ষা নানা সময়েই ভিন্ন পথে গমন করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।—

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতিবেগ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগমাত্র, তার যেন কোনও অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করে সুখে-দুঃখে বিচলিত হই।...কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে নাড়া দেয়, সে একেবারে অব্যবহিতভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দনবেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোনও ব্যবহারের যোগে নয়।[১]

উক্ত বক্তব্য হান্সলিকের বক্তব্যের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্বরূপে ও সাধর্ম্যে সুর কথা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশুদ্ধ সংগীতের নন্দনতত্ত্বকে সেখানেই দেখতে হবে।

তা সত্ত্বেও সুরবর্জিত বিশুদ্ধ কাব্য ও কথাবর্জিত বিশুদ্ধ সংগীতের পাশাপাশি কথাশ্রয়ী সংগীত বা গান যে কোনও দেশের সংগীত-সংস্কৃতিতে বিশেষ আদরের জিনিস। কথায় ও সুরে মিলে গান যেন রূপ-অরূপের, সীমা-অসীমের, চেনা-অচেনার, বচনীয়-অনির্বচনীয়ের মিলনের মতো। অবশ্য সুরের একটা শ্রাব্যরূপ আছে। সেই বিচারে সুরকে অরূপ বা বিমূর্ত বলা যায় না। তবে, গানের বাণী যেন বচন থেকে অনির্বচনীয়ে যেতে চায়, আর সুরের অনির্বচনীয় রস যেন বাণীর বচনীয়তার মধ্যেই বাঁধা পড়তে চায়। তবেই হয় সার্থক মিলন, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অর্ধনারীশ্বর। গীতিশিল্পে কাব্য ও সংগীতের মিলনকে রবীন্দ্রনাথ নানা সময় নানা রূপক দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। কখনো বলেছেন—দুটি কলা যেন যমজ ভ্রাতা, কখনো কাব্যকলাকে সংগীতের ভগিনী বলে উল্লেখ করেছেন, কখনো বা সংগীতকে কবিতার সহচর বলেছেন; এবং কাব্য ও সংগীতকে যখন স্বামী-স্ত্রী বলেছেন, তখন কোথাও কাব্য স্বামী ও সংগীত স্ত্রী, আবার কোথাওবা সংগীতই স্বামী এবং কাব্য স্ত্রী। আবার রবীন্দ্ররচনায় এমন দৃষ্টান্তও মিলবে যেখানে কাব্য ও সুরকে সমগ্র কলার দুই সতীন হিসাবে ধরা হয়েছে। যে প্রবল, সে অপরকে দাবিয়ে রাখে।

কথা ও সুরের মিলনের ভিত্তিটি নিয়ে দেশবিদেশের সংগীততাত্ত্বিকদের মধ্যে আলোচনার ও সমালোচনার অন্ত নেই। আমাদের আলোচনাকে অগ্রসর করার আগে কয়েকজনের বক্তব্যের কিছু কিছু তুলে ধরা যাক। Helmholtz তাঁর বিখ্যাত *On the Sensations of Tone* গ্রন্থে বলেছেন—

The union of music to words is most important, because words can represent the cause of the frame of mind, the object to which it refers, and the feeling which lies at its root, while music expresses the kind of mental transition which is due to the feeling.[২]

চিত্রকলার সঙ্গে গানের তুলনা করে Gluck বলেছেন যে গানের কথা যেন রেখাচিত্রের মতো, আর সুর সেখানে বর্ণসমাবেশের মতো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই Gluck-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

My idea was that the relation of music to poetry was much the same as that of harmonious colouring and well-disposed light and shade to an accurate drawing, which animates the figures without altering their outlines.[৫]

এই উপমা অবশ্য খুব যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা, কবিতা ও সংগীত গতিময় কাল-শিল্প, পক্ষান্তরে চিত্রকলা এক মুহূর্তের স্থির শিল্প যার গতি নেই। তবু, কথা ও সুরে সাযুজ্য উক্ত উপমায় কিছুটা প্রতিপন্ন হয় নিশ্চয়।

আর একদিকে Wagner-বিরোধী Eduard Hanslick সুরের বিশুদ্ধ স্বরূপটিকে সাংগীতিক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে ধ্যান করতে গিয়ে কথার সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলতে চাননি। সুরের সৌন্দর্য এমনই অনাবিল যে কথার সঙ্গে সুরের মিলনকে Hanslick *The Beautiful in Music* গ্রন্থে বলেছেন 'morganatic union'[৪] বা অসবর্ণ মিলন। তাই যদি হয়, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে অসবর্ণ মিলনও অনেক সময় সফল মিলন হয় যা প্রভূত আনন্দ, বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আনে। জাত-বাঁচানো বিশুদ্ধতায় মিলনের আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হতে হয়। অবশ্য, Hanslick-এর মতবাদের সর্বাঙ্গের সঙ্গে এখনো সকল নান্দনিকের পরিচয় হয়নি। অতি সম্প্রতিকালে Werner Abegg তাঁর *Musikasthetic und Musikkritik bei Eduard Hanslick* (Eduard Hanslick's *Music Aesthetics and Criticism*) গ্রন্থে Hanslick-এর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করেছেন, যে গ্রন্থে নাকি কণ্ঠসংগীত সম্বন্ধে তাঁর ইতিমূলক নান্দনিক বিচার রয়েছে।[৫] গ্রন্থটি এখনো এ দেশে আসেনি, তার reviewটুকু আমরা পেয়েছি মাত্র।

Susanne K Langer কথা ও সুরের মিলনকে প্রায় বিশুদ্ধ সংগীতের পর্যায়েই উন্নীত করতে চেয়েছেন।—

When words and music come together in song, music swallows words; not only mere words and literal sentences, but even literary word-structures, poetry. Song is not a compromise between poetry and music, though the text taken by itself be a great poem; song is music.[৬]

প্রমথ চৌধুরী তাঁর হিন্দুসংগীত গ্রন্থে বলেছেন—

গীত, আমার বিশ্বাস, যে-পরিমাণে সংগীত হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণে তাতে কথার প্রাধান্য কমে আসে।[৭]

গানে কথা ও সুরের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে আমাদের দেশেও তর্ক-বিতর্ক কম হয়নি। 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের সংখ্যাগুলিতে তার দৃষ্টান্ত মিলবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত বিচিত্রা ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কথা ও সুর' প্রবন্ধমালার পঞ্চম প্রবন্ধে বলেছেন—

চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে—সুর বড়ো কি কথা বড়ো এ তর্ক ওঠেইনি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয় তা হলে আমি বলব এ ক্ষেত্রে সংগীতই স্বামী, ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে।[৮]

রবীন্দ্রনাথ দুই সহস্রাধিক গান রচনা করা সত্ত্বেও এবং কথার সঙ্গে সুরের যোগকে নানা ভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সুরের প্রতিও তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন। বিশুদ্ধ সুর কবির ভাষায় একটা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আবেগ'[৯] প্রকাশ করে এবং কাব্যনিহিত বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অবিমিশ্র সুরের নেই। কিন্তু কাব্যনিহিত ভাবকে সংগীতায়িত করার ক্ষমতা একমাত্র সুরেরই আছে। সুতরাং কথাশ্রয়ী সংগীত অর্থাৎ গানে সুরের মোটেই অমর্যাদা নেই। বিশুদ্ধ সংগীতের আবশ্যিক নিয়মকে লঙ্ঘন না করেও সুর কথার সঙ্গে মিলতে পারে এবং তাতে সুরের শক্তি, লীলা ও সীমা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়, কমে না। রবীন্দ্রসংগীত যে নানা জাতের বাংলা গানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তা শুধু কবিত্বগুণে হয়নি, হয়েছে বিশিষ্ট অথচ বিচিত্র সুর-শিল্পের গুণে। কবি যে বলেছেন শ্রেষ্ঠ সংগীত আপনার কথা আপনার নিয়মেই জুগিয়ে নেয়,[১০] তা তাঁর নিজের গান সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ দুই সহস্রাধিক গান রচনা করা সত্ত্বেও এবং কথার সঙ্গে সুরের যোগকে নানা ভাষ্যে প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সুরের প্রতিও তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন।

বেতিয়ার মহারাজা নওলকিশোর সিংহ শংকরা রাগে চৌতালে বেঁধেছিলেন চরম বৈরাগ্যের গান 'য়হ জগ ঝুট জান রে মন', আবার সেই একই সুরে-তালে ধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ জীবনপ্রীতির গান 'আমারে করো জীবনদান।'

রবীন্দ্রসংগীত যে উৎকৃষ্ট কাব্য ও উৎকৃষ্ট সুরের সম্যক সমন্বয়, কবির ভাষায় 'অর্ধনারীশ্বর' তার সপক্ষে স্বয়ং কবির ভাষ্য ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষক ও তাত্ত্বিকদের ভাষ্যও আমরা পেয়েছি। তবু কথার সঙ্গে সুরের মিলনের রহস্যটুকু নিয়ে আরো কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

কথার ভাবের সঙ্গে সুরের 'যৌগিক মিলনে'র ভাষ্যগুলি যদি একান্তই সত্য হয়, তা হলে দুটি পৃথক পৃথক ভাবের গানে একই সুর কীভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে? তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল যে ভাবাভিব্যক্তির তারতম্য ঘটানোর জন্যেই একই গানে সুরান্তর ঘটতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন, এমন-কী বিপরীত ভাবের গানে একই সুরমূর্তির প্রয়োগ কোন শিল্প-নীতির গুণে রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অসংগত নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সমস্যাটি স্পষ্ট করা যাক।

বেতিয়ার মহারাজা নওলকিশোর সিংহ শংকরা রাগে চৌতালে বেঁধেছিলেন চরম বৈরাগ্যের গান 'য়হ জগ ঝুট জান রে মন', আবার সেই একই সুরে-তালে ধ্বনিত হল রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ জীবনপ্রীতির গান 'আমারে করো জীবনদান।' আবার, এই গানের প্রারম্ভিক সুরটুকুই শেষ বয়সের রচনা নৃত্যনাট্য শ্যামায় হয়ে উঠেছে ক্ষুব্ধ অভিশাপের সুর 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' গানে।

টপ্পা তো মূলত ছিল প্রেমের গান। কিন্তু রামমোহন ও মহর্ষি-রচিত অধিকাংশ ব্রহ্মসংগীত রয়েছে খাঁটি টপ্পা অঙ্গে।

বৈশাখী ঝড় আর ফাল্গুনী বাতাস নিশ্চয়ই পৃথক পরিবেশের সৃষ্টি করে, এবং ভাবের সঙ্গে সুরের তথাকথিত তাত্ত্বিক বিচারে ওই দুই পরিবেশের সুর এক হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি একই সুরে তালে লয়ে ও গায়নশৈলীতে দুই পরিবেশের দুটি গান সমান রসোত্তীর্ণ—'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে', এবং 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে'। দুটি গানের একই সুরমূর্তিতে সচেষ্টভাবে পার্থক্য প্রতিপন্ন করতে গেলে প্রথম গানটিতে প্রয়োগ করতে হবে বৈশাখী ঝড়ের মতো অতিনাটকীয় দাপট ও দ্বিতীয় গানটি গাইতে হবে বসন্ত বাতাসের উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিতে। কিন্তু গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। গায়নভঙ্গিতে হৃদয়াবেগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার হয় না। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠানামার মতো সংগীতের নিজস্ব প্রকৃতিগত ওঠানামাই যথার্থ সংগীতসৌন্দর্য সংগত।

'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে যথাক্রমে বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ বর্ণিত হয়েছে; সুর কিন্তু তিনটি জায়গায় হুবহু এক।

'চলে ছলো ছলো নদীধারা নিবিড় ছায়ায়' বর্ষার গান, আর 'দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়' শরৎ-উষার গান। দেখছি, যে সুরে নদীধারা ছলো ছলো করে প্রবাহিত হয় সেই সুরেই শুকতারা চোখ মেলে চায়।

'বাকি আমি রাখব না কিছুই' আর 'আমার এই রিক্ত ডালি' একই সুরের গান দুটির কথা ভাবলে বোঝা যাবে যে ঐশ্বর্যের সুর ও রিক্ততার সুর একই, অর্থাৎ যে সুরে উজাড় করে সব দেওয়া যায় সেই সুরেই কাঙালিনীর আঁচল বিছিয়ে সব চাওয়া যায়।

জয়ের মালা আর দহনজ্বালার সুর এক হয়ে গেছে 'বসন্তের ফুল গাঁথলো আমার জয়ের মালা' ও 'অশান্তি আজ হানলো একী দহনজ্বালা' গান দুটিতে। প্রথম গানটি রয়েছে ফাল্গুনী নাটকের তত্ত্বজ্ঞ অন্ধ বাউলের কণ্ঠে, আর দ্বিতীয়টি নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার রূপতৃষ্ণায় উন্মথিত-যৌবন অর্জুন গেয়ে উঠেছে। দুটি গানের পরিপ্রেক্ষিত, পরিবেশ ও আবেদন ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু সুর দুটিতেই এক।

'আহা জাগি পোহালো বিভাবরী' প্রেম পর্যায়ের প্রভাতী গান। এতে বিরহ-কাতরা রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত-নয়না সুন্দরীকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। একই সুরে-তালে 'পোহালো পোহালো বিভাবরী' প্রকৃতি পর্যায়ের প্রভাতী গান। দুটিই অবশ্য শরৎ-প্রভাতের, কিন্তু প্রথমটি নারীর মনোবেদনাকে অবলম্বন করে শৃঙ্গাররসাত্মক ও দ্বিতীয়টি শরৎ-প্রভাতের আবেষ্টনে মাঙ্গলিক গান। গাইবার সময় 'interpretation-এর স্বাধীনতা'-টুকু[১১] গ্রহণ করে সংবেদনশীল সুশিল্পী নিশ্চয়ই দুটি গানে দুই পৃথক পৃথক সংবেদনশীলতার সঞ্চার করতে পারেন। তবু ঈষৎ ঈষৎ তারতম্য বাদে দুটি গানেই সুরমূর্তির মূল প্রকাশটি একই।

'সিক্ত মালতীগন্ধে'-র সুর আর 'ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে'-র সুর সম্পূর্ণ এক ; অথচ দুইয়ের স্মৃতি, অনুষঙ্গ, পরিবেশ, আবেষ্টন, এমনকি পরিপ্রেক্ষিতে কোনো মিলই নেই।

আসলে, কথা ও সুরের সমন্বয়—এই সুলভ উক্তির মধ্যে অনুসন্ধানবৃত্তিকে সন্তুষ্ট না রেখে আরো গভীরে যদি যাবার চেষ্টা করা যায়, তা হলে রবীন্দ্ররচনা থেকেই আলোচ্য আপাত-বিরোধী পরিস্থিতির (Paradox) একটা সামঞ্জস্যসূত্র মিলবে এবং কথা ও সুর সংক্রান্ত নান্দনিক সমস্যার সমাধান ঘটবে।

'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধের মধ্যে 'রাগ' বা ব্যাপক অর্থে সুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি নবতর
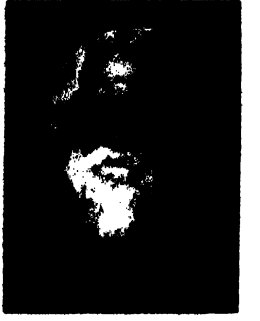
ব্যাখ্যা আছে। রাগ শব্দটির মৌলিক অর্থ রঙ। মনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে রাগের দ্বিমুখী দুটি অর্থ পাওয়া যায়। একটি অর্থ ক্রোধ ও অপর অর্থটি ভালো লাগা বা অনুরাগ। আপাতদৃষ্টিতে ক্রোধে ও অনুরাগে পার্থক্য বা বৈপরীত্যটাই চোখে পড়ে। তবু উভয় ক্ষেত্রে একটি গভীর ও সুতীব্র ঐক্য আছে। ঐক্যটি হচ্ছে এই যে উভয় ক্ষেত্রেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।'[১২]

এখন চিত্ত কোন ঘটনা বা কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা উদ্দীপ্ত হচ্ছে, তা সংগীতের সুরের ক্ষেত্রে খুব বড়ো কথা নয়। চিত্তের 'নিরুপাধি' বা বিশুদ্ধ উদ্দীপ্তি ও গতিই শেষ পর্যন্ত রাগের সঙ্গে বা সংগীতের সুরের সঙ্গে মেলে যেমন, ট্রেন যে চলে তা-ই যাত্রীর কাছে যথেষ্ট ; ট্রেন স্টীম ইঞ্জিনে বা ডিজেল ইঞ্জিনে বা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনে চলতে পারে যা যাত্রীর সঙ্গে খুব একটা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নয়। সংগীত হচ্ছে কাল-শিল্প। কাল যেমন গতিশীল, সংগীতও তেমনি গতিশীল। মানুষের মনও গতিশীল—অবশ্য সুপ্তি, নির্বেদ বা সমাধি প্রভৃতি অবস্থা ছাড়া। ঘটনা বা অভিজ্ঞতাজাত ভাব কাজ করে উত্তেজকের (stimuli), যা চিত্তকে উদ্দীপ্ত ও গতিময় করে তোলে। সেই উদ্দীপ্তি ও গতিই সংগীতের সুরের অনুষঙ্গ। বিশুদ্ধ সুরের নিজস্ব কোনো প্রাসঙ্গিক ভাবমূর্তি নেই বলেই বিভিন্ন এমনকী বিপরীত ভাবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে চলতে কোনো অসুবিধা নয় না তার। সুরের প্রাণ এ দিকে অনেক উদার। সে বহু ভাবের সঙ্গেই ভাব পাতাতে পারে।

ওই সূক্ষ্ম রহস্যের গুণেই বৈরাগ্যের ও জীবনানন্দের সুর এক হয়ে যায়, প্রেমের সুর পূজার গানে চলে যায়, কালবৈশাখীর তাণ্ডব ও বসন্ত বাতাসের উচ্ছ্বাস একই সুরকে বাহন করে ছোটে, একই সুরে রঞ্জকত্বগুণ লাভ করে বসন্তের, আষাঢ়ের ও আশ্বিনের বাণী, নদীর চলা আর শুকতারার দৃষ্টি নিক্ষেপ একই সুরে শ্রোতার মর্মে সংগীত-তরঙ্গ তোলে, ঐশ্বর্য ও দৈন্যের সুরে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং জয়ের আবেগ ও অশান্তির দাহ একই সুরের আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, তবে সুরের স্বরূপ ও কথার সঙ্গে তার যোগের রহস্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্ট সাহায্য করবে আশা করি।

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য নান্দনিক ও সংগীত-দার্শনিকের মধ্যে দু-একজনের মতবাদের অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Eduard Hanslick সংগীততত্ত্বে একান্ত রূপবাদী হয়েও বলেছিলেন যে, সংগীত মানুষের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারে না বটে, কিন্তু অনুভূতি-সংশ্লিষ্ট চিত্ত-চলমানতাকে প্রকাশ করতে পারে।

It (music) may reproduce the motion accompanying psychical action, according to its momentum : speed, slowness, strength, weakness, increasing and decreasing intensity. But motion is one of the concomitants of feeling, not the feeling itself.[১৩]

Susanne K. Langer আর একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

The tonal structures we call 'music' bear a close logical similarity to the forms of human feeling—forms of growth and attenuation, flowing and stowing, conflict and resolution, speed, arrest, terrific excitement, calm, or subtle activation and dreamy lapses—not joy and sorrow perhaps, but the poignancy of either or both-- the greatness and brevity and eternal passing of everything vitally felt. Such is the pattern, or logical form, of sentience; and the pattern of music is that same form worked out in pure, measured sound and silence. Music is a tonal analogue of emotive life.[১৪]

সত্যিই, আমাদের চিত্তপ্রবাহের সঙ্গে সংগীতের সুরতরঙ্গের সমান্তরাল সাদৃশ্যগত যোগ সংবেদনশীল মন নিয়ে সহজেই অনুধাবন করা যায়, কিন্তু Spencer-এর সূত্রানুযায়ী কার্য কারণগত যোগ খুঁজতে যাওয়া দুষ্কর। আমাদের চিন্তা-অনুভূতি ইচ্ছার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত কিছু বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ তথা কিছু গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য আমরা সংগীতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে থাকি। যেমন স্ফূর্ত, অস্ফুট ; উৎফুল্ল ; বিষণ্ণ ; মধুর, করুণ : উদ্দীপ্ত, অবসন্ন ; প্রচণ্ড, স্তিমিত ; দ্রুত, মন্থর বা বিলম্বিত ; আবির্ভাব, তিরোভাব—প্রভৃতি আরও অনেক শব্দ আমরা যেমন আমাদের ভাবজগৎ সম্বন্ধে প্রয়োগ করে থাকি, তেমনি সংগীতের গুণ বা স্বরূপ বোঝাতেও ব্যবহার করে থাকি। রঞ্জকত্বগুণ তো যে কোনও রাগেরই সাধারণ লক্ষণ। চলতি কথায় সুরের গতিবৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বোঝাতে আমরা বলে থাকি গড়ানে সুর, লতানে সুর, কাটাকাটা সুর ; জোরালো সুর, ঘুমপাড়ানো সুর, ঝিমিয়ে পড়া সুর ইত্যাদি। জীবনের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক ওই গুণগত দিক দিয়ে, জীবনের বস্তুগত দিক দিয়ে নয়। (একান্ত ethnic music-এর কথা আলাদা)। সংগীত

আমাদের চিত্তপ্রবাহের সঙ্গে সংগীতের সুরতরঙ্গের সমান্তরাল সাদৃশ্যগত যোগ সংবেদনশীল মন নিয়ে সহজেই অনুধাবন করা যায়, কিন্তু Spencer-এর সূত্রানুযায়ী কার্য কারণগত যোগ খুঁজতে যাওয়া দুষ্কর।

আনন্দেরও হতে পারে বা দুঃখেরও হতে পারে অথবা এমন এক 'বেদনা'-র সংবেদনের হতে পারে যা ঠিক 'সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়', এগুলির উর্ধ্বে বা এগুলি থেকে ভিন্ন এক বিশুদ্ধ সাংগীতিক সংবেদন। কবির 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে' গানটির মধ্যে আমরা দেখি যে সুরের রসে হারিয়ে গেলে বিরহ ও মিলন সমান সাজে সাজতে পারে। তাহলে সুরের রস নিশ্চয়ই বিরহ-মিলনের অতিরিক্ত কিছু। পক্ষান্তরে কথার রস লৌকিক ভাবেরই সাধারণীকৃত রস। তাই বোধ হয় কবি বলেছিলেন—

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখ-দুঃখকে সমস্ত আকাশের করে তোলে,.....মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।[১৫]

গানের এর চেয়ে স্পষ্টতর মূল্যায়ন আর কী হতে পারে ?

সংগীত আনন্দেরও হতে পারে বা দুঃখেরও হতে পারে অথবা এমন এক 'বেদনা'-র সংবেদনের হতে পারে যা ঠিক 'সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়', এগুলির উর্ধ্বে বা এগুলি থেকে ভিন্ন এক বিশুদ্ধ সাংগীতিক সংবেদন।

৩

অপেরা, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য প্রভৃতির বেলায় সংগীতের সুরকে শুধু কথার সঙ্গে মিলিত হলেই চলে না, প্রবহমান নাটকের সঙ্গে নাট্যধর্মীও হতে হয়। কবির গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির সৃষ্টি সাফল্য ও রসোত্তীর্ণতা প্রশ্নাতীত। তবু, এক সময় তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কোনও কলার আপন আপন বিশুদ্ধ স্বরূপই যথার্থ চারুকলার মানে উন্নীত, এবং নানান কলার মিশ্রণ খুব একটা উচ্চাঙ্গের জিনিস হতে পারে না। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়কলা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব।.....ছবিতে গানেতে কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে, কিন্তু সে কতকটা খেলা হিসাবে, তাহা হাটের জিনিস, তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।[১৬]

এই বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারি Leonard B. Meyer-এর উক্তির। পাশ্চাত্যে Programme Music বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ কোনও আখ্যান বা নাট্যবিষয়ের সংগীতায়ন, সেই Programme Music সম্বন্ধে তিনি Emotion and Meaning in Music গ্রন্থে বলেছেন—

The great disadvantage of a program lies in the fact that it is a powerful temptation toward extra-musical diversion.[১৭]

অর্থাৎ সংগীতকে তার বিশুদ্ধ স্বরূপ থেকে নেমে এসেই তাকে মিলতে হয় কথার সঙ্গে, নাটকের সঙ্গে, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-অপেরা-Programme Music-এর সঙ্গে।

তা হোক, তবু বাল্মীকি প্রতিভা রচিত ও অভিনীত হবার পর কবির মনে হয়েছিল যে সংগীতকে নাট্যকার্যে নিযুক্ত করা অসংগত বা নিষ্ফল হয়নি। বাল্মীকি প্রতিভা সুরে নাটিকা, তাই স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য এর প্রধান উপজীব্য নয়, এবং এটি সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা। এই ধরনের পরীক্ষায় বাল্মীকি প্রতিভা ছাড়া কালমৃগয়াও রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এগুলি হাটের জিনিস বা বারোয়ারি জিনিস নয়। মায়ার খেলা রচনার সময়ও গানের রসেই কবির মন অভিষিক্ত ছিল। এতো গেল প্রথম বয়সের রচনা। জীবনের শেষ প্রান্তে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামার সাফল্য মুখ্যত নির্ভর করেছে কবির অসাধারণ সুরময়তার জন্যেই। নৃত্যনাট্য যৌথ শিল্প—এতে যৌগিকভাবে মিশে গেছে নাট্যরস, গীতিরস ও নৃত্যরস। কোনও একটি কলাবিদ্যা নৃত্যনাট্যে একেশ্বরী নয় তবু নৃত্যনাট্য হাটের জিনিস নয়, কবিপ্রতিভার পরিণততম সৃষ্টিসংহতি। এগুলিতে শুধু কথা আর সুর সম্মিলিত হয়নি। তাদের সঙ্গে মিশে গেছে নৃত্যরস ও নাট্যরস। কিন্তু সবই রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে কবির অপূর্ব সুর সৃষ্টির জন্যে। নৃত্যনাট্য তিনটি সৃষ্টির পর তিনি লিখেছেন—

সুরের-বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি করা গেল।[১৮]

প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় সংগীত-শব্দটির অর্থ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সংগতি। সেই ধারণাকে স্মরণ করে বলা যায় কবির নৃত্যনাট্যগুলিও মুখ্যত সংগীত, নানা কলার বারোয়ারি মিলন নয়।

৪

সংগীতশিল্পের নন্দনতত্ত্বের বিচারে মোটামুটি দুটি মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সাপেক্ষবাদ, আর একটি নিরপেক্ষবাদ। সাপেক্ষবাদ বলে যে জগৎ-জীবন-বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংগীত গভীর যোগে যুক্ত ; লোকসংগীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে, বিদগ্ধ গীতিকলায় সূক্ষ্মভাবে, ও বিশুদ্ধ সংগীতে অলক্ষ্যভাবে। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষবাদ বলে, 'সংগীতের জগৎ লৌকিক অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রূপের জগৎ'।[১৯] এই নিরপেক্ষবাদেরই শামিল রূপকৈবল্যবাদ। সাপেক্ষবাদ
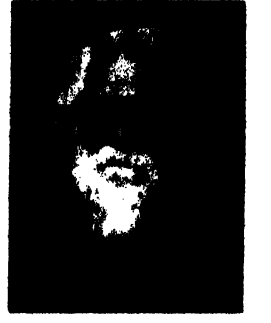
সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য, অপরদিকে নিরপেক্ষবাদ বিশেষজ্ঞের বিচারের অপেক্ষা রাখে। নিরপেক্ষবাদের মূল লক্ষ্য চলিষ্ণু সুরমাধুরীর বিশুদ্ধ রূপটির প্রতি, যেখানে জগৎ-প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোনও প্রতিফলন নেই।

গল্প-উপন্যাস-নাটকে নিরপেক্ষবাদ তথা রূপকৈবল্যবাদ হয় না, কেননা এগুলির উপকরণ সমাজ সংসার থেকেই আসে। অতি আধুনিক কবিতাও রূপকৈবল্যবাদের আওতায় আসবে না, কেননা যতই রূপক-ব্যঞ্জনা-ইঙ্গিত-সংকেতে সে নিজেকে রহস্যময় করুক, সহৃদয়ের লৌকিক ভাবের ভূমিতেই তার মূল আবেদন লুকিয়ে আছে। অতি আধুনিক অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভাস্কর্য ও চিত্রকলা নিরপেক্ষবাদের কাছে যেতে চাইলেও তাদের ফিরে আসতে হবে, কারণ সেগুলি নিছক রূপের খেলা রঙের মেলা নয়। আলপনা ও জ্যামিতিক নকশার মতো সেগুলি একেবারে বিষয়বস্তুবর্জিত বিশুদ্ধ রূপ নয়। সেগুলির গভীর গোপন অর্থ আছে, যে অর্থ জীবন-নিরপেক্ষ হতে পারে না। আলপনাকেও সব সময় বিষয়নিরপেক্ষ রূপলীলা বলা যায় না। প্রকৃতিজাত ফুল লতা পাতা ও মানুষের পদচিহ্নের কাছে সে বেশ কিছুটা ঋণী। স্থাপত্যকলার রূপমাধুর্য ও অলংকরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ ও অ-পূর্ব হতে পারে ; কিন্তু সে রূপ স্থির, চলিষ্ণু নয়। তাই বোধ হয় কোনও পাশ্চাত্য নান্দনিক বলেছিলেন 'Architecture is frozen music'। বিশুদ্ধ সংগীতের সুর এই বিচারে সমস্ত কলার থেকে স্বতন্ত্র। বিশুদ্ধ সংগীত গতিশীল ও ক্রমপরিবর্তনশীল সুরলীলামাত্র। সেটাই তার রূপ, সেটাই তার বিষয়বস্তু। লৌকিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মিলিয়ে দেখা যায় এমন বিষয়বস্তু তার নয়। ইথারের মতোই সে সূক্ষ্ম, তাই সমস্ত কারুকলার মধ্যে চারুতম। নিরপেক্ষবাদী বা রূপকৈবল্যবাদীদের মতে সংগীত প্রবণতা বিশুদ্ধ সুরেরই প্রবণতা, যার সঙ্গে আমাদের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ধর্মচেতনা প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রকৃতিপ্রীতি স্বদেশপ্রেম কোনও কিছুই আবশ্যিকভাবে যুক্ত নয়। সুরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিশুদ্ধ সাংগীতিক সংবেদনশীলতার সম্বন্ধ ; মানুষের অন্যান্য বৃত্তির বা ভাবের বা অনুভূতির বা প্রবণতার সম্বন্ধ নয়। একটি নাটক, গল্প, কবিতা বা একটি ছবি বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা কথা দিয়ে হয়তো কিছুটা করা যায়। কিন্তু সংগীতকলা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভোগ্য এবং সুর বাদ দিয়ে অন্য কোনও ভাবে এর উপস্থাপনা সম্ভব নয়। তার কারণ সংগীত সংগীতপ্রেমীর একটি স্বয়ংক্রিয়, স্বতন্ত্র ও লৌকিক ভাবনিরপেক্ষ বৃত্তি (faculty)। পক্ষান্তরে, সাপেক্ষবাদীদের মতে সংগীত আবেগ, অনুভূতি, ভাব ও অনুভাবের ভাষা। সংগীত মানুষেরই সৃষ্টি ও মানুষের জন্যেই সৃষ্টি। সুতরাং মানবস্বভাববর্জিত কোনও তদ্‌গত গুণ (objective quality) সংগীতের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া ভুল।

সংগীততত্ত্বে ভরতমুনিকে আমরা সাপেক্ষবাদী হিসাবেই দেখতে পাব, কেননা নাটকের প্রয়োজনে ভরতমুনি সংগীতের স্বরের সঙ্গে মানবমনের লৌকিক ভাব নবরসের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

> হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ কার্যৌ স্বরৌ মধ্যমপঞ্চমৌ
> ষড়জর্ষভৌ চ কর্তব্যৌ বীররৌদ্রাদ্ভুতেষ্বথ ।। ১৬ ক ।।
> গান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ কর্তব্যৌ করুণে রসে।
> ধৈবতশ্চ প্রয়োক্তব্যো বীভৎসে চ ভয়ানকে ।। ১৬ খ ।।
>
> (নাট্যশাস্ত্র, ২৯ অধ্যায়)

পরবর্তীযুগে সংগীতপারিজাত-রচয়িতা অহোবল রাগের সংজ্ঞা ও স্বরূপবর্ণনার কোনও কোনও অংশে নিজেকে প্রায় নিরপেক্ষবাদী করে তুলেছেন।

> যোঽয়ং ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
> রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ।।

অর্থাৎ, অহোবলের মতে স্বরবর্ণবিভূষিত ধ্বনি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জনচিত্তকে রঞ্জিত করতে পারে, পৃথক কোনও ভাবানুভূতিকে মাধ্যম করে নয়। স্বর এখানে সংগীতের স্বর, আর বর্ণ বলতে বোঝায় স্বরসমূহের আরোহ-অবরোহ গতি।

রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও রচনাংশে নিরপেক্ষবাদের বীজ খুঁজলে মিলবে। রাগসংগীতের সমঝদারেরা রাগসংগীত থেকে যে আনন্দ পায়, সেই আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই।"

পাশ্চাত্যে দেখব, Eduard Hanslick অত্যন্ত সচেতনভাবেই নিরপেক্ষবাদী। তাঁর *The Beautiful in Music* গ্রন্থটি সংগীতদর্শনে নিরপেক্ষবাদের একটি মৌলিক আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে সংগীত মানুষের আবেগ-অনুভূতির ভাষা নয়, সংগীত প্রকৃতির রাজ্য থেকেও কিছু গ্রহণ করেনি; সংগীত মানুষের বিশুদ্ধ ধ্যানের গতিময় স্বরসৌন্দর্যরূপ ফলশ্রুতি; এবং সে সৌন্দর্য সম্ভোগ্য বিশুদ্ধ সাংগীতিক বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে, হৃদয়াবেগ দিয়ে নয়।

J. W. Sullivan, Deryck Cooke, Romain Rolland, Aaron Copland, Howard D.

সংগীতকলা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভোগ্য এবং সুর বাদ দিয়ে অন্য কোনও ভাবে এর উপস্থাপনা সম্ভব নয়। তার কারণ সংগীত সংগীতপ্রেমীর একটি স্বয়ংক্রিয়, স্বতন্ত্র ও লৌকিক ভাবনিরপেক্ষ বৃত্তি (faculty)।

Mickinney, W. R. Anderson প্রমুখ ব্যক্তিরা স্পষ্টতই সাপেক্ষবাদী। তাঁদের মতে মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সংগীতকলা একান্তভাবেই গভীর যোগে যুক্ত। S. K. Langer তাঁর *Philosophy in a New Key, Feeling and Form* ও *Problems of Art* তিনখানি গ্রন্থেই নানা চারুকলার স্বরূপব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতকলার স্বরূপ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে চূড়ান্ত সাপেক্ষবাদী বা চূড়ান্ত নিরপেক্ষবাদী কোনোটাই বলা যায় না। তিনি হৃদয়াবেগের সঙ্গে সংগীতের কার্যকারণগত সম্বন্ধের কথা বলেননি। তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে হৃদয়াবেগের সঙ্গে সংগীতের সুরগত সমানধর্মিতা বা সাদৃশ্য নিশ্চয়ই বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা ও সংগীদর্শনকেও সামগ্রিকভাবে বিচার করলে তবেই তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। নচেৎ তাঁকে কখনো মনে হবে সাপেক্ষবাদী, আবার কখনো বা নিরপেক্ষবাদী।

প্রকৃতপক্ষে, দুটি মতবাদ এক জায়গায় বোধ হয় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেলে। সাপেক্ষবাদের ভাবালুতা, স্পর্শকাতরতা ও কল্পনাগত ব্যাখ্যা যেমন সর্বজনীন ও সর্বজনের ক্ষেত্রে একই রকম হতে পারে না, তেমনি নিরপেক্ষবাদের একেবারে মানবস্বভাববর্জিত বিশুদ্ধ সাংগীতিক বৃত্তিও বেশিদিন সেই স্বভাবের সঙ্গে লেনদেন না করে একলা থাকতে পারে না। চিত্তগতির সঙ্গে সংগীতের গতির সাধর্মকে স্বীকার করা মানেই হল নিরপেক্ষবাদের ভূমিতে সাপেক্ষবাদের বীজ বপন করা। Hanslick, Langer ও রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে উক্ত দুই গতিশক্তির সাযুজ্য না হোক, সাধর্ম ধরা পড়েছে। তবে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Hanslick ও Langer-এর একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কোনও বাঁধা তত্ত্বের বা মতবাদের বাঁধনে কখনোই একান্তভাবে বাঁধা পড়েননি, কোনও বিশিষ্ট মতবাদ বা *-ism* গঠন করতেও চাননি। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি চিরসচল ও মুক্ত। সেই কারণেই আবেগবাদ থেকে যাত্রা শুরু করে রূপবাদে পৌঁছেও তিনি রূপকৈবল্যবাদেই স্তব্ধ হয়ে থাকেননি, মত বদলেছেন জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কেননা, মতবাদের গঠনে একটা স্তব্ধতা এসে যায়। কিন্তু জীবন, অভিজ্ঞতা, সম্ভোগ, সৃষ্টি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিরসচল ও প্রশান্ত।[২১]

রবীন্দ্রনাথ কোনও বাঁধা তত্ত্বের বা মতবাদের বাঁধনে কখনোই একান্তভাবে বাঁধা পড়েননি, কোনও বিশিষ্ট মতবাদ বা -ism গঠন করতেও চাননি। সংগীত সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি চিরসচল ও মুক্ত।

কবির নিজের সংগীতসৃষ্টি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে তাঁর গানে কথার বচনীয়তা অনির্বচনীয়তার দিকে যেতে চায়, আর তাঁর অ-পূর্ব সুরসুষমা অনির্বচনীয় হয়েও কথার সঙ্গে মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায়। সবের ওপর, তাঁর যে-কোনও চালের গানে সেই চালটি মুখ্য নয় (অর্থাৎ খেয়াল-অঙ্গ, ধ্রুপদাঙ্গ—এইসব বিভাগ গৌণ), মুখ্য তাঁরই বিদগ্ধ সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের তথা সংগীত-সত্তার প্রকাশ, যা মহাকবির কবিত্বগুণেরও অতীত এক মাত্রা।

সূত্রনির্দেশ :

১ ছন্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪শ খণ্ড (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ), পৃ ১৫৫; সংগীত-চিন্তা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, পৃ ২২৭

২ *op. cit;* Dover Publication, New York, 1954 edition, ch. XIV, p. 251.

৩ দ্রষ্টব্য 'কথা ও সুর', স. চি., পৃ ৮৯

৪ Eduard Hanslick, *The Beautiful in Music* (1854), Liberal Arts Press, U.S.A. 1957 edition, ch. II, p. 46.

৫ *Literature Music Fine Arts,* Vol. XIV, 1981, No. 1, F.R.G., pp. 56-57.

৬ Susanne K. Langer, *Feeling and Form, Routledge and Kegan paul, London, 1953, ch. 10, 'The Principle of Assimilation', p. 152.*

৭ প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, হিন্দুসংগীত, বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃ ৩৩

৮ স. চি., পৃ ৮৯

৯ স. চি., পৃ ৮৮

১০ বিচিত্র প্রবন্ধ, র. র. ১৪, পৃ ৭৪৩

১১ স. চি., পৃ ১২৮

১২ 'সংগীতের মুক্তি', স. চ., পৃ ৫২

১৩ *Op. cit., The beautiful in Music,* p. 24.

১৪ *Op. cit.,Feeling and Form,* ch. 3, p. 27.

১৫ 'শ্রাবণসন্ধ্যা', শান্তিনিকেতন, র. র. ১২,, পৃ ৩৪৯

১৬ 'রঙ্গমঞ্চ', বিচিত্র প্রবন্ধ, র. র. ১৪, পৃ ৭৪৩

১৭ Leonard B. Meyer, *Emotion and meaning in Music,* The University of chicago Press, 1956, ch. VIII, p. 272.

১৮ অমিয় চক্রবর্তীকে কবির পত্র, স. চি., পৃ ২০৬

১৯ ডঃ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতের শিল্পদর্শন, দে বুক স্টোর, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ ১১০

২০ 'কেকাধ্বনি', বিচিত্র প্রবন্ধ, র. র. ১৪, পৃ ৭৩৩; স. চি. পৃ ২২২

২১ দিলীপকুমার রায়কে কবির পত্র, স. চি. পৃ ২৪০-৪১

লেখক-পরিচিতি : রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যাপক, সংগীতভবন, বিশ্বভারতী; গ্রন্থকার।

পাশ্চাত্যে সেদিন—রবীন্দ্রনাথের গান

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
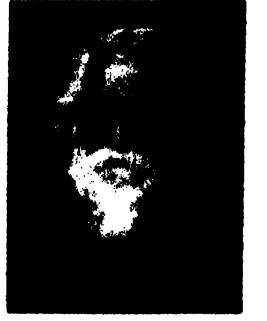
২৭ আগস্ট, ১৯৬১ ;
এডিনবরা উৎসব। স্কটল্যান্ড

এডিনবরার সাংস্কৃতিক উৎসব খুব বিখ্যাত। ইয়োরো-আমেরিকার মানুষ, পৃথিবীর নানান প্রান্তের শিল্প-সংগীত রসিকেরা উন্মুখ হয়ে থাকে এই বাৎসরিক উৎসবের জন্যে। সেদিনের মতন আজও এই উৎসব এডিনবরার গর্ব। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির প্রকাশ পায় উৎসব ঘিরে। তবে ১৯৬১ সালের এডিনবরা ফেস্টিভাল আলাদা রকম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান, বিশেষ মর্যাদায় এই আন্তর্জাতিক উৎসবে যুক্ত করা হয়। অভিনবত্বে ভরপুর রবীন্দ্রশতবর্ষে ওইদিন সন্ধ্যায় সংগীত অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা, নির্মাণ এবং নির্বাচিত কিছু গান নিয়ে তাঁর সৃষ্টিমালা পরিবেশিত হয় ইংরেজিতে। 'Songs by Rabindranath Tagore with their own melodies'. এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত করেন ডঃ আর্থার গেডেস। আর্থারের পরিকল্পনায় ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর এডিনবরায় চেম্বারস স্ট্রিটের অ্যাডাম হাউসে রবীন্দ্র-ডিজাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অভিনব বিষয়ভিত্তিক দোতলা প্রদর্শনী কক্ষের কেন্দ্রীয় বিন্যাস ছিল রবীন্দ্রনাথ। আশ্চর্য সুন্দর 'থিম প্যাভিলিয়ন' গড়ে উঠল আর্থারের পরিকল্পনায়। বিষয় ছিল নানা রবীন্দ্রনাথের মালা। 'Presenting Tagore in sound and light'—এই আগাম সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'The Scotsman, Weekend Magazine'-এ, ১৯৬১ সালের ১৩ মে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে এ ধরনের সমন্বয়ী উপস্থাপনা আগে আর কখনও হয়নি, পরেও হয়তো পাওয়া যায়নি: বহুধা, বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে আলো, দৃশ্য ও সংগীত ভাষায় উপস্থাপিত করতে হলে যে ধরনের জ্ঞান ও প্রয়োগচর্চার অভিজ্ঞতা ও রবীন্দ্র পরিচয় থাকার প্রয়োজন হয়, তা অধিকাংশ সময়েই কোনও একজনের কাছে মেলে না। একঝোঁকা জানা-বোঝায় রবীন্দ্রনাথকে তেমন বোঝা যায় না, জানা হয় না তাঁর সংগীতের সবখানে ছড়িয়ে পড়ার কী আর কেন-কে। এমন অভিনব প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানের নির্মাতা যিনি, তিনি রবীন্দ্রনাথকে একসময়ে খুব কাছ থেকে দেখে, জেনে, বুঝেছিলেন। জেনেছিলেন আন্তঃসম্পর্কযুক্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দিয়ে ; প্রয়োগশিল্পের সাংস্কৃতিক কুশলতায়। চোখ, মন আর হৃদয়ের সম্পর্কে। যেভাবে আর্থার গেডেস রবীন্দ্রনাথকে কিংবা সংগীতের গভীরতর এবং ব্যাপক প্রসারতার সম্ভাবনার আকাশকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, প্রয়োগ করেছিলেন, সর্বতোমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে মানবিক পরিবেশচর্চায়, তেমন কাজ, সেই দুর্লভ হিসেবি রবীন্দ্র অনুধ্যান আজও গড়ে উঠল না। তিনি যেমনটা ছিলেন, তেমন বহুমাত্রায় প্রকাশিত পূর্ণতার দিকে যাত্রার আয়োজন আজ আর কোথায় !

আর্থার গেডেসের পরিচয়ে আসি। ১৯২৯ থেকে টানা প্রায় ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। Human Geography বিদ্যাচর্চার বিশেষজ্ঞ। স্বদেশে ও বিদেশে Social Engineer হিসাবে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর্থার গেডেস (১৮৯৫-১৯৬৮) ভারতকে ভালবেসে ভারতে কাজ করেছেন। ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৪-২৫, আবার এসেছেন ১৯৩৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের কাছে, বিশ্বভারতীতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় লাভ করেছেন। সুযোগ্য পরিবেশকর্মী রূপে, প্রধানত শ্রীনিকেতনের কাজে। তাঁর গর্বের শেষ ছিল না; আত্মপরিচয় লিখতেন, 'আমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য-ছাত্র'। আর্থার গেডেস টেগোর সেন্টিনারি সেলিব্রেশন স্কটিশ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর ওপরই দায়িত্ব ছিল স্কটল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থাপিত করার। এই কঠিন কাজকে গভীর প্রজ্ঞায় সহজ সরল অভিনবত্বে হাজির করেছিলেন আর্থার। রবীন্দ্রনাথের গান ছিল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রে।

বহুধা, বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে আলো, দৃশ্য ও সংগীত ভাষায় উপস্থাপিত করতে হলে যে ধরনের জ্ঞান ও প্রয়োগচর্চার আ ও রবীন্দ্র পরিচয় থাকার প্রয়োজন হয়, তা অধিকাংশ সময়েই কোনও একজনের কাছে মেলে না।

রবীন্দ্রনাথকে থিম কক্ষে, বাংলার গ্রাম বাংলার মাটির কুটিরের বিন্যাসে, লতাপাতা সমাগমে আলো-আঁধারির আলো-ছায়ায় মেলে ধরা হয়। আপাতবিমূর্ত সেই আলোকস্থাপত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের গান ভেসে আসতে থাকে, আপন মেলোডি ভরে নিয়ে, পূর্ণতার দিকে। সংগীতের অন্তরবাণী, বিষয়স্থাপত্যের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলেছিল যেন। অন্তর থেকে ভেসে আসতে থাকল, শব্দে সংগীতে ধ্বনিতে আলোকের পরিপূর্ণ ভাষায়—'Deep in my heart he lives, everywhere.....'। রবীন্দ্রনাথের গানের অনুবাদ, অনুভবের সংগীত কাঠামোয় আশ্চর্য মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সংগীত আর স্থাপত্য—একে অপরের সঙ্গে যেন কথ্যভাষায় অন্য এক সৃষ্টির মুহূর্তমালা নির্মাণ করেছিল। তেমন বিরল ভাষায় ভাবনার দিন যেন জেগে থাকল। রবীন্দ্রসংগীতের নিপুণ শক্তি, সুন্দর ছন্দ, পরিবেশ রূপসৃষ্টির সখীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেদিনের পাশ্চাত্য সংস্কৃতিপ্রেমিকদের কাছে রবীন্দ্রসংস্কৃতি আরও গভীর অনুসন্ধানের অন্য এক মাত্রা সংযোজন করেছিল।

'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী'-কে সংগীতধ্বনিতে মেলে ধরে, মাটির স্থাপত্যকে যেন মানবিক অবয়বে বিন্যাস করা হল। মানুষের বৃহত্তর উন্নয়নে তাঁর নানান সৃষ্টি যে আকার লাভ করত, তারই সচলায়িত প্রতীকী রূপ যেন এই লোকস্থাপত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাণের কাছাকাছি।

মানুষের বৃহত্তর উন্নয়নে তাঁর নানান সৃষ্টি যে আকার লাভ করত, তারই সচলায়িত প্রতীকী রূপ যেন এই লোকস্থাপত্য। রবীন্দ্রনাথের প্রাণের কাছাকাছি।

এইদিন উৎসবে একটি সুসম্পাদিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। আর্থার গেডেস প্রবন্ধ লেখেন, 'Rabindranath Tagore—Bard, Musician and Seer'। চারণকবি—কবি সর্বঅর্থে, সংগীতস্রষ্টা ও ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা। কত অব্যর্থ, সঠিক বিশ্লেষণ ও প্রাঞ্জল অনুধাবনক্ষমতা। আর্থার শুনেছেন নিজের কানে মনে হৃদয়ে, তাঁরই সুরে সুরে যে তিনিই গানের মধ্যে দিয়ে জগৎকে দেখতে পান। বাংলার লোকসংগীত আর Gaelic Melodies-এর আলোচনাও তাতে ছিল। ছিল, রবীন্দ্রনাথের গানে এসে দুই ধারার মিলেমিশে নতুন এক সুরনদীতে জেগে ওঠার কথা। একদিন শিলঙের পাহাড়ে বসে রবীন্দ্রনাথকে আর্থার ভায়োলিনে ঐ Gaelic Melody কত যে শুনিয়েছেন; আর প্রাণভরে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতিময় সুরের সুর-কথা। কবি তখন 'রক্তকরবী' লিখছেন। আর্থার বাংলার মানুষ ভূমি পরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের জীবনে জীবন যোগ করা, মাটিতে পা, আকাশে হৃদয় রাখা—প্রযুক্তি গবেষণার কাজ করছেন। একদিন এই বিশ্বে যা আলোড়ন তুলবে। গবেষণার শিরোনাম, বিষয়বিন্যাস সবই অভিনব। সর্বকালে, সব জায়গার প্রয়োগ উপযোগী। 'Au Pays de Tagore' গ্রন্থ ফরাসি ভাষায় লেখা; মানবিক পরিবেশ সন্ধানে সে ছিল অনন্য প্রয়াস। ১৯২৮ সালে At the Country of Tagore গবেষণার উচ্চতম খ্যাতিলাভ করেছিল, আর্থার হয়েছিলেন বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ তখন পূর্ণ আশ্বাসে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের 'United Creativity' আন্দোলনের নায়ক। Peace Warrier হিসেবে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি যথার্থ অর্থে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের শীর্ষে। আর্থার তাঁর গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের গানকে, মাটি, আকাশ, বাতাস আর মানুষের জীবনসংস্কৃতির ভাষ্যরূপে উপস্থাপনা করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে মানবিক যুক্তিতে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে প্রমাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের সর্বগ্রাহ্য আবেদন। মানবিক পরিবেশ ভাব আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পথিকের অপরিহার্য মরমিয়া সুরটি।

তাইতো গড়ে উঠল (১৯৬১ সালে) এডিনবরা উৎসবের বিশিষ্ট পরিবেশনা 'Songs by Rabindranath Tagore with their own melodies'। ইংরেজি ভাষ্যে আর্থারের সাংগীতিক উপস্থাপনায় এক ব্যতিক্রমী রবীন্দ্র অনুষ্ঠানের আস্বাদ সেদিন পাওয়া গিয়েছিল। 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী', 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী', 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি' প্রভৃতি গানকে 'Melodies in staff'-এ পরিবেশন করা হয়। সংগীত অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশক্তির ঐক্যসাধনা।

প্রাক্-কথনে বলা হয়, "Tagore's purpose in first asking me at Santiniketan and in the hills in 1923 to write down his melodies in staff, play them on the violin for his own and his friends enjoyment and publish them (Paris 1928) was first 'to recall them in permanent form in staff as an international notations'. Tagore was not merely a 'poet' but singer—melodist-poet in one, truly a 'Bard'. His second purpose was that his songs should be sung in almost international tongue, English .....' এমনই আন্তর্জাতিক সংগীত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় পনেরটি গান উপস্থাপিত করা হয়।

Human Geography কাজে বিশেষজ্ঞ, যথার্থ Social Engineer, আর্থার, রবীন্দ্রনাথের গানকে সঙ্গী করে, মানবিক পরিবেশ প্রযুক্তি কাজের বিখ্যাত গবেষণা করেছিলেন এই বিশ্বের সুন্দর শান্তির দিনের

কথা ভেবে। পাশ্চাত্যে তখন সময়টা ক্রমশ যুদ্ধের দিকে হেলে পড়ছে।

১৯৬১ সালের এডিনবরা উৎসবে 'বিষয় : রবীন্দ্রনাথ' ব্যতিক্রমী সুরসমৃদ্ধ রবীন্দ্রস্থাপত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁরই প্রিয় শিষ্য-ছাত্র, আর্থার এমন আশ্চর্য সংগীত স্থাপত্যের নির্মাতা। যা ছিল অভিনব।

দুই

জুলাই, ১৯২৩
Visva Bharati Quaterly

আর্থারের খুব বড়ো আরও একটি পরিচয় আছে। প্যাট্রিক গেডেসের সুযোগ্য পুত্র। প্যাট্রিক গেডেসের (১৮৫৪-১৯৩২) পরিচয় বিখ্যাত জীববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, পরিবেশবিদ, শান্তিযোদ্ধা ও নগর-গ্রাম পরিকল্পনা কাজের একজন পথিকৃৎ হিসাবে। গৃহবাণী আর পরিবেশচর্চায় তিনি আধুনিক পৃথিবীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। প্রত্যক্ষ পরিবেশ-আদর্শকাজে আচরণে আর আন্দোলন সংগঠনে তিনি এই বিশ্বের শান্তির স্বপক্ষে আজীবন কাজ করেছেন। আর যথার্থ অর্থে ছিলেন ভারতবন্ধু। একদিকে যেমন থমাস হাকস্লির তত্ত্বাবধানে 'রয়াল স্কুল অব মাইনস'-এ (১৮৭৪-৭৮) জীববিজ্ঞানচর্চা করেছেন, আবার Culture City-র মানবিক স্থাপত্য কাজে, পথিকৃতের মতন তিনি লুই মাসফোর্ডের গুরু। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, গুণগ্রাহী। নিবেদিতার সহযোগী, বিশিষ্ট বন্ধু। জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার। বিবেকানন্দকে জানতেন, দেখেছেন, শুনেছেন; প্যারি প্রদর্শনীতে (Exposition Universelle-1900) প্রযুক্তি-প্যাভিলিয়নে তাঁর নিত্য সঙ্গী। গেডেস ১৮৮৪ সালে প্রথম Environment Society গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৮৫ সালে Evergreen জার্নাল প্রকাশ করেন।

১৮৮৬ সালে আন্না মর্টন-এর সঙ্গে বিবাহ। আর্থারের মা আন্না, বিদগ্ধ সংগীতজ্ঞা, সুগায়িকা হিসেবে ইয়োরোপে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে বলা হত 'gifted musician'। আন্না প্যাট্রিকের কর্মসাধনার যথার্থ সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁর সংগীতসমৃদ্ধ জীবনে মানবিক সেবাকর্ম যুক্ত হয়েছিল। আন্না ভারতে মানবিক জীবন সংস্কৃতির কাজে যুক্ত হয়েছিলেন প্যাট্রিকের সঙ্গে। আন্নার মৃত্যু হয়েছিল কলকাতায়, ১৯১৭ সালে। আর্থার তাঁর মায়ের সংগীতপ্রতিভা পেয়েছিলেন। সংগীতকে কাজে প্রয়োগ করতে শিখেছিলেন বাবার কাছে আর গুরুদেবের কাছে।

প্যাট্রিক গেডেস ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ভারতে কাজ করেছেন। স্থাপত্য, নগরপরিকল্পনা, সমাজবিদ্যা, শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবেশ চর্চার কাজে আর শান্তিনিকেতন পরিকল্পনার কাজে তাঁর অবদান প্রায় সচল ইতিহাসের মতন সংস্কৃতিময়।

প্যাট্রিক আর্থারকে বলেছিলেন, বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের কাজে যোগ দিতে। কারণ তিনি মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথই দুই বিশ্বের মেলবন্ধনের মানবিক সেতু। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বড় কাজের কথা ভেবেই আর্থারকে পাঠিয়েছিলেন। মাতৃহারা আর্থার, রবীন্দ্রনাথের কাছে স্নেহ ভালবাসা আর কাজের দিকনির্দেশ পেয়েছিলেন। উঠেপড়ে লাগলেন, মাটির কথা, মানুষের জীবন, আকাশ-বাতাসের মতন স্বচ্ছ সচল ভাষায় প্রযুক্তি বিজ্ঞান ভাষ্যে প্রকাশ করতে। পরিশ্রমসুন্দর জীবন দিয়ে, শ্রীনিকেতনের কাজে, পল্লি পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। লক্ষ করলেন, বাংলার মাটিতে, আকাশে, নদীতে মানুষের কণ্ঠে রয়েছে চলমান সংগীতধারা। আর রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানবিজ্ঞানের সারকথা, জীবনযাপন সংস্কৃতির কথা বলছেন গানে গানে। কথা সুরের সে সব কী গভীর বাণী, যা জীবনে যুক্ত হচ্ছে, আবার অতিক্রমও করে যাচ্ছে, সহজ স্বচ্ছন্দে। অনুকৃতি আর বিশ্বকৃতি রূপ ও ঋতুর ভাষ্য যেন তাঁর সংগীতে। বিজ্ঞানের রসবোধকে জৈব প্রয়োগ প্রযুক্তিতে বুঝতে যেন অপরিহার্য, এই গান, রবীন্দ্রনাথের গান। আশ্রমে, গ্রামের কোণে, আশেপাশে, মাঠে, খোয়াইতে, কোপাইতে আদিবাসী পল্লিতে, গৃহস্থের উঠোনে, শহরের রাজপথে আর কাছের অরণ্যকথায় ছড়িয়ে পড়ছে এই গান সবখানে। রবীন্দ্রনাথের গান, এ তো শুধুই সংগীত স্বরলিপি বা আনুষ্ঠানিক নয়। এ যেন প্রকৃতিতে পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতিনিহিত মানব সংস্কৃতি সংগীত। এ জিনিস ফেলে রাখা যায় না কোনও একটা ভবনে। কিংবা কোনও গতানুগতিক কিছু গানের আসরে। জীবনের কথা বলছেন গায়ক-কবি জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, দুহাত বাড়িয়ে এই পৃথিবীকে বন্ধুর মতন আলিঙ্গন করছেন। আবার পান্থজনেরই সখা তিনি।

এই সম্পদ নিয়েই আর্থার বিপ্লব ঘটালেন। পরিবেশ প্রযুক্তি গবেষণায়, রবীন্দ্রনাথের গানকে স্বচ্ছন্দে, ভাববিজ্ঞান প্রকাশের হাতিয়ার করলেন। যে কাজ আগে আর হয়নি। পরেই বা হয়েছে কই!

আর্থার গেডেসের অনবদ্য পরিবেশ-প্রবন্ধ 'A Masque of Earth and Man' ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে Visva Bharati Quaterly-তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের করা প্রায় পাঁচটি

আর্থার তাঁর মায়ের সংগীত প্রতিভা পেয়েছিলেন। সংগীতকে কাজে প্রয়োগ করতে শিখেছিলেন বাবার কাছে আর গুরুদেবের কাছে।

গানের ইংরেজি অনুবাদ এই কাজে ছিল। বাংলার মাটি, মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এই অভিনব পল্লিপরিবেশগাথা। এর পরই Bengal Studies-এর বহু কাজ করেন। আর্থার নিজেই খুব ভালো রবীন্দ্রসংগীতের বোদ্ধা হয়েছিলেন। এ গান তাঁর প্রাণের কথায় মিলেমিশে গিয়েছিল। বাংলা শিখে নিয়েছিলেন। সংগীতশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ভায়োলিনে Gaelic Melody শোনাতেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের সংগীত নিয়ে পাশ্চাত্যে বড় মাপের কাজ করা, গবেষণা গ্রন্থে গ্রাম প্রকৃতিময় সমীক্ষায় সংগীতের ব্যবহার করেছেন তাঁর একান্ত অনুরাগ ও উপলব্ধি থেকে। আর বাংলার সংস্কৃতি বুঝতে, অবিভক্ত বাংলার জল-বায়ু-মৃত্তিকা-জীবনঘেঁষা লোকসংগীতের ওপর যথেষ্ট জোর দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এই সংগীত যে জড়িয়েছিল তাও তাঁর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। এই ধরনের মানবিক ভূগোল ও পরিবেশচর্চার কাজ প্রায় বিরল বলা যায়। যেখানে লোককলাকে মানুষ ভূমি পরিবেশ সংস্কৃতির অনুসন্ধানে ব্যবহার করেছেন এবং আধুনিক রবীন্দ্রসংস্কৃতিকে সমন্বিত করে, মাটিঘেঁষা প্রযুক্তিবিজ্ঞানে রূপ দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশবিজ্ঞান চর্চায় অপরিহার্য শক্তিরূপে কাজে আসছে। এই কাজ থেকেই ফরাসি ভাষায় ১৯২৮ সালে 'Au Pays de Tagore' গবেষণা বই তৈরি হল। প্যারিতে আরমন্ড কলিন্স বইটি প্রকাশ করে। বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ Dr. Spat লিখেছিলেন 'probably the best geographical (and historical) analysis, in real detail, of any area in India.'

সংগীতশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে ভায়োলিনে, Gaelic Melody শোনাতেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের সংগীত নিয়ে পাশ্চাত্যে বড় মাপের কাজ করা, গবেষণা গ্রন্থে গ্রাম প্রকৃতিময় সমীক্ষায় সংগীতের ব্যবহার করেছেন তাঁর একান্ত অনুরাগ ও উপলব্ধি থেকে।

কোথা থেকে কোথায় এলেন আর্থার। একদিন যে সুর তাঁকে মাতিয়েছিল, সেই জীবনসংগীত তিনি যোগ করলেন আন্তর্জাতিক বহুধা প্রযুক্তিচর্চায়। মানবিক পরিবেশ সংস্কৃতির আমন্ত্রণে। ভাবলে আজও অবাক লাগে এইসব আধুনিক কাজ শুরু হয়েছিল সেদিনের শান্তিনিকেতনে-শ্রীনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের ঔৎসুক্যে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের প্রয়োগ নিয়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তির উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা; এমন কাজের প্রাসঙ্গিকতা আজও যথেষ্ট। যুদ্ধবিধ্বস্ত, ভেঙে পড়া নুয়ে পড়া পরিবেশ পুনর্গঠনের কাজের বড় বন্ধু।

এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু তিনি; 'মুক্তধারা' (১৯২২) প্রকৃতির পথরুদ্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদের চলচ্ছবির নাটক। কথায়, দৃশ্যনির্মাণে, সুরে প্রাণে-মনে গড়ে তোলা এ নাটক। প্রকৃতির অধিকারের স্বপক্ষে লেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দের বিন্যাস। ১৯২২ সালে মে মাসে (বৈশাখ) 'মুক্তধারা' বই হয়ে বেরোল। 'প্রবাসী' পত্রিকায় আগে বেরিয়েছে। এবার রবীন্দ্রনাথ নিজে 'The Water Fall' Modern Review-তে অনুবাদ করলেন।

এই নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বিশিষ্ট অভিনবত্বে। প্রায় পাঁচশোজন বসতে পারেন এমন ধরনের Amphi Theatre-এর ডিজাইন করেন প্যাট্রিক গেডেস আর্থার গেডেস শ্রীনিকেতনে। পরিকল্পনা ছিল, ওপর থেকে ধাপ কেটে কেটে ল্যাটেরাইট মাটির বাঁধুনি দিয়ে দর্শক আসন বিন্যাস। তলায় অভিনয়-চাতাল। শীতের দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কমলা আলোয় অভিনয় হবে। সেই কারণে গেডেস আর্থারকে (পিতা-পুত্রকে) সূর্যের স্থানীয় আবর্তন, রেখাপথকে এঁকে পাঠাতে বলেন, যা নির্মাণস্থান এবং কোণ নির্বাচন করতে দরকার পড়ে। অভিনয়বেদির পেছনে ছাঁচা বাঁশের গায়ে গায়ে লতানে জড়ানো গাছের চাদর Back drop-এর কাজ করছিল। দু-ধারেও এমন ডিজাইনের আড়ালছন্দ। সঠিক গেরুয়া স্থাপত্য, নীল আকাশ, সবুজের লতাপাতায় ঘেরা অভিনয় অঙ্গন—কী সব পরিকল্পনা। আজও যেন ভাবায়। 'মুক্তধারা' নাটকের আত্মাকে এত নিবিড় স্বচ্ছন্দে পরিবেশ স্থাপত্য ভাষায় মেলাতে চাওয়া হয়েছিল। এমনই মানসিক বোঝাপড়া ছিল গেডেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের। প্রয়োগবিদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিতির এত গভীর সখ্য আমাদের বিস্মিত করবে। ডিজাইনারদের সঙ্গে সাহিত্য, সংগীত, সংস্কৃতির এমন আদানপ্রদান, সচলতা সঠিক পরিবেশ-সংস্কৃতির রূপরেখা গড়ে তোলে। যতদিন যাচ্ছে ততই এই সত্য ভবিষ্যৎরূপে দেখা দিচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিকল্পনা এত বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে হয়েছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এমন ঐকতান এখন বোধহয় আর সুলভ নয়, বর্তমান গণ্ডিবদ্ধ বিদ্যাচর্চায় বরং বিরলই বলা চলে।

'মুক্তধারা'-র সুর, 'ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?', এই সত্য আমরা আজ কতখানি বুঝেছি বলা শক্ত। সেদিন আর্থার গেডেস 'মুক্তধারা'-র ঝরনায় অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে তুললেন পরিবেশ প্রযুক্তির লোকসংগীত, লোকগাথা—মুখোশধারী অভিনেতাদের নিয়ে প্রকৃতি-সমাজ-সংগীত। অরণ্য, মাটি, মানুষ, জল, ভূমিজ সন্তান এদের পরিবেশ-জীবনের সমস্যা টানাপোড়েন নিয়ে গড়ে উঠেছিল আর্থারের আশ্চর্য কাজ, 'A Masque of Earth and Man' (A pagent of wild nature tamed despoiled, restored a new) লিখছেন,

there is need for, and there are signs the world-over of such renewed and living drama which shall fearlessly play the great realities of Earth, of the elements of Life; of Nature and Humanity.' কোলাহল থেকে সংগীতে—জীবনযুক্ত সংগীতে, আসতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা, কথা-সুরের 'একি গভীর বাণী' হৃদয় নিয়ে উপলব্ধি করেছেন বলে। মানুষ-ভূমি-পরিবেশ সংস্কৃতির বড়ো বৃত্ত, বৃহত্তর উত্তরণ গড়ে উঠতে লাগল, ঢেউ লাগল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কাজে। আর্থার লিখলেন, 'World brotherhood of Lands towards a fulfilment of our united hopes'। সম্মিলিত মানবিক আশার বাণী শুনেছেনও রবীন্দ্রনাথের গানে। সেই জীবনসংগীত বিশ্বআত্মীয়তার দ্বারে প্রকাশ করতে হবে—বৃহতের ডাকে সাড়া দিতে পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদ উঠে পড়ে লাগবেন এবার। রবীন্দ্রনাথের গান! আর্থারের যোগ্য পরিবেশনায়, পাশ্চাত্য দেশে।

তিন

ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯২৬, কুমিল্লা

Dear Arthur,

How delighted to have your letter. Do whatever you like with my songs; only do not ask me to do the impossible. To translate Bengali poems into English verse from reproducing the original rhythm so that the words may fit in with the theme would be foolish for one to attempt. All that I can venture to do is render them in simple prose making it possible for a worthier person than myself to verify them. Please write the accompaniment yourself. I can trust you, for you are modest and are not likely to smother my tunes with a ruthless display of your own musical talent. I shall be able to give them their proper background. As for other details, I shall have them discussed when we meet in Europe.

Just now I am busy touring in East Bengal. It is perfectly unwise from medical point of view but there are other points of view in its favour which it has been difficult for me to ignore.

But I am tired and am longing to give up missons of all kinds and merely to share the life and impulse of the trees and birds in this delightful springtime redolent of mango blossoms.

With love.

Yours affectionately
Rabindranath Tagore

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, প্রযুক্তিচর্চার একজন গবেষককে, কত না আস্থা ভরে অনুপ্রাণিত করছেন রবীন্দ্রনাথ। সংগীতবোধ আছে, রয়েছে যথার্থ রসবোধ। সাধনার জীবনে রবীন্দ্রনাথকে যিনি পরিশ্রমসাধ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, সেই আর্থারকে কত বড় উৎসাহ দিচ্ছেন। সুরযোগ্য তিনি, এই তাঁর পরিচয়। সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত কিনা, গুরুগম্ভীর সংগীতজ্ঞ এসব বিচারে রবীন্দ্রনাথ গেলেন না। তিনি মনে করতেন, যোগ্য হাতে তাঁর গান, নিশ্চয়ই ভালোভাবে পরিবেশিত হবে। এমনভাবে আর্থারকে মাত্র কয়েকবছরের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন; সঙ্গে ছিল আর্থারের আগ্রহ সংগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে কেমনভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত প্রযুক্তি-বিজ্ঞান চর্চায় প্রয়োগ করা যায়। যা থেকে সমৃদ্ধ হবে বহুমাত্রিক জীবন সংস্কৃতি। মানবিক পরিবেশ গড়ে তুলতে, হৃদয়ের বোধকে ছড়িয়ে দিতে এই সুর এই কথা, গানের রঙ বিশ্বআত্মীয়তার চেতনাকে আরও সচল করে তুলবে, এই বিশ্বাস সেদিন পাশ্চাত্যের অনেকেরই ছিল। আর্থারের পিতা প্যাট্রিক গেডেসও তাই মনে করতেন। কিন্তু আর্থার শুধু ভাবনা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকেননি। এগিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয় মরমিয়া কবি, গুরুদেবের এই সম্পদকে পৃথিবীর কোলে সম্প্রসারিত করতে। তাই অনুবাদ চেয়েছেন, ভেবেছেন গানের সঙ্গে কী ধরনের সহযোগী সংগীত বাজবে।
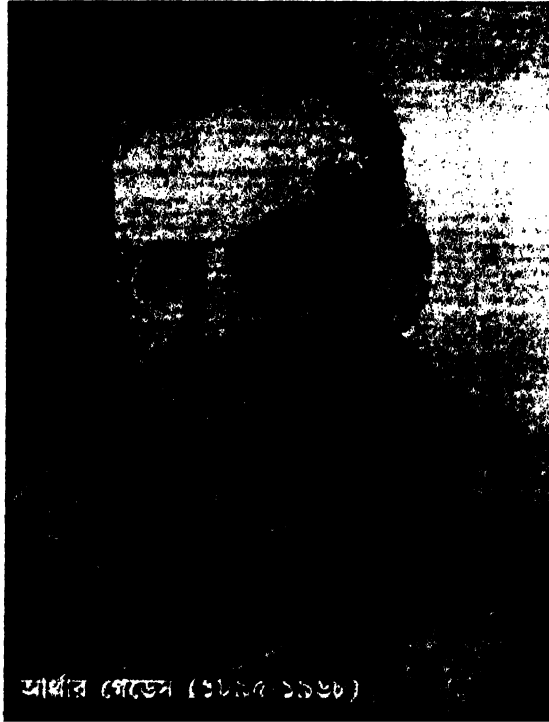
আর্থার গেডেস (১৮৯৫-১৯৬৮)

কেমনই বা হবে রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি স্বরলিপি। একথাও মনে রেখেছেন স্কটিশ গানের মতনই রবীন্দ্রনাথের গান পৃথিবীর সম্পদ। কণ্ঠ মাধুর্যে এই গান শুধু সুরেলা হলেই হবে না; ভাবপ্রকাশক

মানুষ-ভূমি-পরিবেশ সংস্কৃতির বড়ো বৃত্ত, বৃহত্তর উত্তরণ গড়ে উঠতে লাগল, ঢেউ লাগল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কাজে।

হতে হবে। যে নাটক থেকে কিংবা কোনও প্রেক্ষাপট থেকে নেওয়া এই সংগীত গভীরতাকে পরিবেশনার ব্যাপ্তি দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। এমনভাবে যাতে গানের মূল কাঠামো ঠিক রেখে মেলোডিনির্ভর এই সুরের বাণী আবার বাণীরও সুর ঠিক ঠিক রঙের দ্যোতনায় মানুষের কাছাকাছি এনে দেওয়া যায়। পাশ্চাত্যে যখন রবীন্দ্রনাথকে জানার আগ্রহ তুঙ্গে তখন গেডেসরা মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সংগীত সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছলে একদিকে যেমন সংগীতের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, স্পষ্ট জানা হবে অজানা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির গভীরতা। বৃহত্তর প্রেক্ষাপট সাংস্কৃতিক সচলতায় এই গান অপরিহার্য। সেকারণেই নানাকাজের মধ্যেও আর্থার প্রায় পনেরো কুড়ি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক, Sacrifice, King of the Dark Chamber, Spring Time ইত্যাদি। তাই, জানুয়ারি ২০, ১৯২৬ সালে তাঁর প্রিয় গুরুদেবকে লিখেছেন, দীর্ঘ চিঠি। তাঁর গান, অনুবাদ, মিউজিক ইন স্টাফ নিয়ে কেমনভাবে একটি সুসম্পাদিত বই প্রকাশ করবেন। King of the Dark Chamber নাটক থেকে পনেরোটা গান নেবেন, এও জানিয়েছেন। এমন ধরনের ভাবানুবাদের কথা ভেবেছেন, যাতে রবীন্দ্রনাথের গানের, কথার আবেদন ইংরেজিতেও সংগীতসমাজের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে বাংলা শব্দও রাখতে চাইছেন রোমান হরফে। যাঁরা বাংলা জানেন, তাঁরা যাতে দুভাষাতেই নোটেশন দেখে নিতে পারেন। রাইমের চেয়ে, রিদমের দিকেই জোর দিয়েছেন বেশি। কণ্ঠসংগীতেই রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক উপস্থাপনা যে করা দরকার সেই আয়োজনই করেছেন। আর্থার মনে করেছিলেন, সেই সময়ে পাশ্চাত্য দেশের সংগীতসংস্কৃতি 'sense of pure melody' থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এই তো সঠিক সময়, যখন রসজ্ঞ শ্রোতারা শুদ্ধ সুরের সুরেলা কণ্ঠের গান পেতে পারেন। সঙ্গে চেয়েছেন মানানসই সুরযন্ত্রের সহযোগিতা। এবার রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানাচ্ছেন সংগীতের কিছু বিস্তৃতি, যা নিয়ে তিনি ভাবনা-চিন্তা করছেন। '...I do not think that a very simple accompaniment need do harm. As for our Highland music, written in modes, the chords should stay within the mode, (and then sound fine) so I think it might be for your melodies. If the chords were kept within the raga or ragini it seems to me that they should help us to hear not disguise, the melody—just as a line of veil, a glimse of colour, may complete and perfect the movement of a dancer. There is also the rythm given by the drum for the rapidly moving songs, and their characteristic notes of the drums which the pains is well able to suggest...'

আর্থার মনে করেছিলেন, সেই সময়ে পাশ্চাত্য দেশের সংগীতসংস্কৃতি 'sense of pure melody' থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এই তো সঠিক সময়, যখন রসজ্ঞ শ্রোতারা শুদ্ধ সুরের সুরেলা কণ্ঠের গান পেতে পারেন। সঙ্গে চেয়েছেন মানানসই সুরযন্ত্রের সহযোগিতা।

রবীন্দ্রনাটকের গান (১৯২৬ সালে !) আলাদা ভাবে কীভাবে মঞ্চে পরিবেশনা করা হবে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ আর প্রয়োগের কাজ করেছেন। সম্মতিলাভ করে। রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে সম্মতি দিয়েওছেন। আর্থারের পরিকল্পনায় ছিল, নাটকের সারাংশ অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে প্রথমেই। যাতে করে, '...so that it is understood at the culminating point of a wave of emotion, which you expressed in words, action, colour and melody at its highest point ? It was with the idea of keeping the unity that I asked Dinu Babu to sing the airs (or their principal themes) of one whole play (the King of the Dark Chamber 'রাজা'-নাটক)'।

দিনুবাবু অর্থাৎ দিনেন্দ্রনাথকে আগেই আর্থার এই গানগুলো বাজিয়ে এবং Highlands-এর মতন বিন্যস্ত করে শুনিয়ে গিয়েছিলেন। নাটকের গানের প্রত্যেকটি সুর বাজিয়ে প্যারি শহরে গুণীদের শুনিয়েছেন। মাদাম কার্পলস, যিনি বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে পরিচিত, তিনিও সন্তুষ্ট হয়েছিলেন আর্থারের পরিবেশনায়। রবীন্দ্রনাথের গান তিনি উপস্থাপনা করছেন, জানতেন কার গান, কীই বা তার সংবেদনশীলতা। কত যত্নে, প্রাণের স্পর্শে এই সুরপ্রসাদের সৃষ্টি, কত ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যে ভরপুর এই গান। সে কারণেই বারে বারে জানিয়েছেন, বলেছেন, এমনকী কাছে পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছেন তাঁর প্রয়োগ। তাইতো সেদিনের চিঠিতে তাঁর 'Dear Gurudev'কে জানাচ্ছেন—'...Playing over the series from the 'Dark Chamber' last night I felt how much the quieter melodies, sung alone, gained when they came after some joyous shouting and drumming chorus. Some effect of this in the accompaniment of the latter would help the former...'। তারপর চিঠির শেষে লিখলেন, আশ্চর্য সত্যটি যাকে বলে যথার্থ সত্যবচন !

'...love and homage from one of your loving chelas in the West. Arthur'

পাশ্চাত্যে, আমি তোমার 'চেলা'। এই হোক আমার পরিচয়। ভাবতে অবাক লাগে কত বড় ব্যক্তিত্ব তাঁর পিতা, প্যাট্রিক গেডেস। নিজে মানবিক ভূগোল, পরিবেশ প্রযুক্তির বিশিষ্ট অধ্যাপক। ইয়োরোপে যথেষ্ট পরিচিতি হয়েছে। স্থাপত্য ডিজাইন কাজে বিশেষ দক্ষ। ইংরেজিতে গবেষণা করেছেন,

পেপার লিখেছেন, বই লিখেছেন, ফরাসি ভাষায় গবেষণা গ্রন্থের কাজ করছেন। উচ্চতম ডিলিট্ সম্মানও পরে লাভ করেছেন। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যিনি বিখ্যাত হবেন, যিনি তাঁর মুখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। এত গুণের অধিকারী, অল্পবয়সেই অনেক প্রশংসা ও খ্যাতি পেয়ে গেছেন। বিশ্বভারতী থেকে চলে এসেছেন বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। কিন্তু জীবনের ধ্রুবতারা সেই 'গুরুদেব'। যত দূরেই থাকুন না কেন। চারপাশের বড় বড় ব্যক্তিত্ব, পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো বৈজ্ঞানিক প্রগতি, প্রযুক্তির দাপট, উপছেপড়া বৈভব—সব দেখছেন, জানছেন, ব্যবহারও করছেন। কিন্তু জীবনে 'চেলা' একজনেরই। তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গান না বুঝলে, রবীন্দ্রসংস্কৃতিকে জানা হয় না। এ গান, এই সুর বাণী পাশ্চাত্যের রসিকেরা না পেলে, ক্ষতি তাঁদেরই।

সেই ঘাটতি পূরণ করতে, উঠে পড়ে লেগেছেন আর্থার। শত ব্যস্ততা, শত কাজের মধ্যেও মনে করেছেন, এই সম্পদ—তাঁর গুরুদেবের গান, মানবসভ্যতার প্রসারতায়, অগ্রগতিতে অপরিহার্য পুষ্টি। এ গান যেমন একার গান ; নীরব সংগীতের আত্মসমাহিত রূপ-রস-রেখা। আবার সকলমাঝে, সকলের যেন আপন গান। পৃথিবীর কবির আত্মপরিচয়। বিশ্বজীবনবোধের পরিচয়ও এই গান।

আর্থার ভালোভাবে বাংলা শিখেছিলেন, এই গান বুঝতে। কবির সঙ্গ করেছেন। সুর আদান-প্রদান করেছেন কখনও পাহাড়ে, জলে, স্থলে। কারণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরেছেন অনেক। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে দু-জায়গাতেই। তাই জানতেন তাঁকে। রবীন্দ্রনাথও জানতেন আর্থারের সংগীতপ্রতিভা। জানতেন, অন্য বিষয় নিয়ে (বিশেষ করে, প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের) যেসব গুণী কাজ করছেন, তাঁরা আর এক ব্যতিক্রমী মাত্রায়, এই সংগীত সম্পদকে অধ্যবসায়, ধ্যানের গুণে, আর এক মাত্রায় অনুধাবন করতে পারবে। সেই প্রকাশ হবে সমন্বয়ী ধরনের। সজীব প্রাণবন্ত। তাই নিশ্চিতভাবেই চিঠির উত্তরে, তাঁর প্রিয় আর্থারকে কুমিল্লা ভ্রমণের সময় লিখবেন, 'do whatever you like with my songs...' এমন ঢালাও অনুমতি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে, আর অন্য কেউ পেয়েছিলেন কিনা, অনুসন্ধান বা গবেষণা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন হবে একথাও ভেবে দেখার যে তাঁর মতন সংবেদনশীল (নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও) প্রতিভা তাঁর যথার্থ শিষ্যের সংগীত জ্ঞান ও দক্ষতা সম্বন্ধে কতখানি নিশ্চিত ছিলেন। কারণ জানতেন আর্থার সঠিক শিল্পী বলেই, অন্যের শিল্পকে মর্যাদা দিতে জানে। তাকে কখনই বিকৃত করবে না। নিজের খামখেয়ালিতে অন্যের শিল্পপ্রতিভায় আঘাত হানবে না। তাই আর্থার তাঁর প্রিয়। আর্থারও স্থিতপ্রজ্ঞায় এগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান, বিশ্বের কাছে পরিবেশনা করতে।

এই বিষয়ে প্যাট্রিক গেডেস ১২ মার্চ, ১৯২৭ সালের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "He (Arthur) is hopefully awaiting your promised translations of the songs for which he has your music. This will be another of your valued contributions to our European world; for translations into other languages will also soon be wanted. A fine thing to set all the world singing!" 'to set all the world singing' ! এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানের শক্তি ! অভিন্নহৃদয় আজিকে নাচে রে-র ডাক। পাশ্চাত্য এই ভাবে তাঁর গানকে পেতে চেয়েছে। যাঁরা জানতেন, শুনেছেন তাঁর গান—মনে করতেন পৃথিবীর যত সমস্যা, আনন্দ, বেদনা, সুখ দুঃখ—যত কিছু আলো, কালো কিংবা ছায়া আর রুপোলি রেখা ; সব আসনেই এই গান এই সুরের ভাষা বিশ্বের সম্পদ। প্রত্যক্ষ জীবন অভিজ্ঞতা, সত্য সাধনার ফসল এই সৃষ্টি। এমন সুরের টানে মানববিশ্বকে ফিরতেই হবে। কারণ সীমাউত্তীর্ণ হৃদয়ের কথা, জীবন সুরের নির্যাস এই সংগীতে এসে মিলেছে।

সেদিন যখন ফ্রান্সের মঁপিলিয়েতে ঐতিহাসিক ইন্ডিয়ান কলেজ, স্কটিশ কলেজের ক্যাম্পাসে (১৯২৮-১৯২৯) প্রতিষ্ঠিত হল গেডেসের উদ্যোগে ; সেদিন গেডেস রবীন্দ্রনাথের কাছে গানেরই আবেদন করেছিলেন। যে গান দিয়ে ফ্রান্সের এই কলেজের পথ চলা শুরু হবে। পাশ্চাত্যের এই অনুরোধ রবীন্দ্রনাথ ঠেলে সরিয়ে দেননি। লিখেছিলেন ইংরেজিতেই গান, সুর দিয়েছেন। সুর পাঠিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য আর্থারকে। আর্থারই রবীন্দ্রনাথের এই গান (এই কলেজের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জগদীশচন্দ্র, মাইকেল স্যাডলার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—সহসভাপতি—গৌরবের দিন সেসব !) পরিবেশন করেছিলেন সেদিন মঁপিলয়তে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে সংগীতটি লিখেছিলেন, ১৯২৯, ১৬ সেপ্টেম্বর :

'The eternal dream
is borne on the wings of ageless light
that rends the veil of the vague
and goes across time
weaving ceaseless patterns of Being
The mystery remains dumb
the meaning of this pilgrimage,
the endless adventure of existence
whose rush along the sky
flames up into innumerable rings of paths,
till at last knowledge gleams out from the dusk
in the infinity of human spirit
and in the dim lighted down
she speechlessly gazes through the break in the mist

পাশ্চাত্য এই ভাবে তাঁর গানকে পেতে চেয়েছে। যাঁরা জানতেন, শুনেছেন তাঁর গান—মনে করতেন পৃথিবীর যত সমস্যা, আনন্দ, বেদনা, সুখ দুঃখ—যত কিছু আলো, কালো কিংবা ছায়া আর রুপোলি রেখা ; সব আসনেই এই গান এই সুরের ভাষা বিশ্বের সম্পদ।

at the vision of life and of love
rising from the tumult of profound pain and joy.'

গেডেস যেদিন (১২ মার্চ, ১৯২৭) আর্থারের রবীন্দ্রসংগীতের কাজের খবর দিয়ে ঐ চিঠি দেন রবীন্দ্রনাথকে, সেই চিঠির প্রথমাংশে জানিয়েছে আপাতবৈপরীত্য কিন্তু সুদূর গভীর তাৎপর্যময় ছন্দ কাজের আর এক সংবাদ। যে কাজ আর্থারের পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছিল। বলছেন, যে তুমি খুশি হবে, আর্থার তাঁর 'Au Pays de Tagore' বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণার জন্য এখানে উচ্চতম স্বীকৃতি, D. litt লাভ করেছে—'...you will be pleased to hear that Arthur has at length presented his thesis—'Au Pays de Tagore'—and got his Doctorat-es-letters (D. litt) with highest honours...'।

এই দুধরনের অসাধ্যসাধন, আর্থার সম্ভবপর করে তুলতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় ; স্নেহ, উৎসাহভরা সাহসদানে। যা থেকে এবার আর্থার এগিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে নিটোল, ভবিষ্যতমুখী কাজে। যাকে ঐতিহাসিক বলা চলে।

চার

জুলাই ১৩, ১৯৩০
ডারটিংটন হল, ডেভন

বহুদিন অপেক্ষার পর সুযোগ এল। আর্থার দেখা করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এলমহার্স্টের ডারটিংটন হলে, ইংল্যান্ডে এসেছেন। হিবার্ট লেকচার দেবেন। বলবেন, ঐতিহাসিক অভিভাষণ, 'Religion of Man'। তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। আর্থারের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। রথীন্দ্রনাথের উদার মনের গঠন, প্রযুক্তি কাজের ধাঁচ এবং মাটি পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এবারের ভ্রমণে আর্থার রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন। কত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের অনুবাদ এবং ইংরেজিতে গানের পরিবেশনার কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেল। গানের সঙ্গে কী ধরনের যন্ত্রসংগীত বাজবে, বা কী হবে সে গানের ভাবার্থ—সবই এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে। তাঁর সাহচর্যে, আর্থার আরও অনেক অনুপ্রাণিত হলেন। চিঠিতে, এত বছর লেখালেখি চলছিল ; কাছে থেকে আলাপ-আলোচনায় কাজ অনেকখানি স্পষ্টতর হল। রবীন্দ্রনাথের মনের ভাব এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বুঝলেন আর্থার। গান নির্বাচনও হয়ে গেল। ১০ জুলাই ডারটিংটন থেকে, অমিয় চক্রবর্তীকে জানাচ্ছেন, '...I made the excursion here, and had 2 or 3 days with the Bard and have advanced to a stage whereby with your help, I should be able to publish the songs as I wish. Need I say what a profound pleasure it has been to meet my friend Gurudeva again? and Rathi and Pratima Devi, and Lal?...'

আর্থারের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। রথীন্দ্রনাথের উদার মনের গঠন, প্রযুক্তি কাজের ধাঁচ এবং মাটি পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।

অর্থবহ সংবাদ। 'গুরুদেব'-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত গভীর, প্রাণবন্ত! বলছেন 'my friend'—আমার বন্ধু। বন্ধু তো বটেই। প্রকৃতির বন্ধু, মানুষের বন্ধু, এই পৃথিবীর বন্ধু তিনি, আজও। তাঁর গান সেই বন্ধুত্বেরই প্রকাশ। সে গান প্রকাশ পাবে, পাশ্চাত্য দেশের বন্ধুদের কাছে। ১৪ তারিখেই অমিয় চক্রবর্তীকে (মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই পরামর্শ মতন) আর্থার লিখছেন যে ষোলোটি গান 'transliteration'-এর কথা। রবীন্দ্র-কবিতার, ভাবকে প্রকাশ করতে হবে ইংরেজিতে। নিছক অনুবাদ নয়। এই কাজে অমিয় চক্রবর্তীরও সাহায্য ও পরামর্শ চেয়েছেন। যাতে কাজটি ভালো হয়। সুসম্পাদিত হয়ে ওঠে, গানের ভাবে, সুরের ঐশ্বর্যে পাশ্চাত্য-শ্রোতাদের কাছে।

১৩ জুলাই-এর চিঠি খুবই অর্থময়তায় ভরপুর। A. A. Bake, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে, সৃষ্টিশীল জীবনের ও তাঁর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সংগীতগুণী হিসেবে আরনল্ড-এ বাকে-র সুনাম ছিল। গান শুনে নোটেশন গড়ে তুলতে জানতেন। পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবসংকলন স্বরলিপি দিয়ে প্রস্তুত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্যাট্রিক গেডেস উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। আরনল্ড-এ বাকে (১৮৯৯-১৯৬৩) হল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাভা ও বালিতে ভ্রমণ করেছেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে ভারতীয় সংগীত নিয়ে গবেষণা করেন ; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। ১৯৪৮-এ অধ্যাপনা করেছেন সংস্কৃত ও ভারতীয় সংগীত বিষয়ে, স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজে। ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গানের খুব বড় সংগ্রহ গড়ে তোলেন। ১৯৪৯ থেকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের রিডার পদে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৩০ সালের ৩ জুন, ইন্ডিয়া হাউসের ব্যবস্থাপনায়, বার্মিংহাম-এ, PEN Club Woodbrookes-এ, রবীন্দ্রসংগীতের ওপর বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির
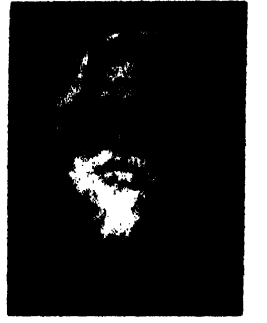
একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন বাকে। 'Mirror of Music' গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত বাকে, রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর যখন কাজ করলেন, তখন সে কাজ যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল বইটির নির্মাণে। গান নির্বাচনে। ১৯৩৫-এ যখন বইটি প্রকাশিত হল, তখন বাকে বা আর্থারের রবীন্দ্রসংগীতের উৎসাহদাতা এবং পথপ্রদর্শক দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারী), সেই বছরই (জুলাই ২১, ১৯৩৫) মারা গেলেন। বড় আঘাতের মতন বেজেছিল। বাকে বইয়ের প্রথম পাতাতেই লিখেছেন,

'In memory of Dinendranath Tagore who by his untiring patience and assistance has made the publishing possible. This volume is dedicated with our warmest gratitude'। 'তুমি কেমন করে গান কর'; 'আলো আমার আলো'; 'এই যে তোমার প্রেম'; 'প্রতিদিন আমি'; 'ছুটির বাঁশি বাজল'; 'এবার তোর মরা গাঙে'—প্রভৃতি ছাব্বিশটি নির্বাচিত গানের সংকলন ও স্বরলিপি রয়েছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের গানের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। অক্টোবর, ১৯৩৫ সালে, প্যারিতে, রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছাব্বিশটি স্বরলিপি সহযোগে গান ('Chansons De Rabindranath Tagore') পরিবেশনায় ছিলেন Librairie Orientaliste Paul Geuthrer। Ecole des Hautes Etudes, প্রাচ্য সংগীতের প্রকাশনার কাজ করতেন। এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। আর্থারকেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু আর্থার চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গান প্রকাশ করতে। দেরি হলেও, শেষ পর্যন্ত সেকাজ হয়েছিল।

A. A. Bake-কে আর্থার ডেভনের ডারটিংটন হল থেকে, চিঠিতে লিখলেন, (১৯৩০, ১৩ জুলাই) Philippe Sterne বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও সংগীতবোধ নিয়ে, ওরিয়েন্টাল মিউজিকের ওপর গবেষণা করছেন। Sterne-এর করা প্রাচ্য সংগীতের নোটেশন বিশেষভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন। (বাকে-র সঙ্গে সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ পায়।)

চিঠির প্রথমেই অভিনন্দন জানালেন, বাকে-কে, কারণ বাকে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকে রবীন্দ্রসংগীতের খুব ভালো নোটেশন প্রস্তুত করেছিলেন; জুলাই মাসের ওই কদিন, রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টের ওখানে রয়েছেন, আর্থার লিখেছিলেন, 'It is a pleasure to know that you have tackled the great work of noting Dr. Tagore's songs; a difficult but fine task...I have just had 3 days with Dr. Tagore and have gone over a number of songs; here with is the best of those noted. I've noted enough of the airs to identify them by. Will you tell me which, if any of those you've noted? I might also include some noted by Benoit ('Inde is now Amar')...'

বোঝা যাচ্ছে, কত পরিশ্রম ও অধ্যয়নের দ্বারা পাশ্চাত্যের সংগীতগুণীরা ভালবাসা-শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথের কথা-সুর সম্পদকে পৃথিবীর গানের সঙ্গে যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরই সম্মতিতে ও উপস্থিতিতে। এও বেশ বোঝা যায় কোনও রকম একঝোঁকা গোঁড়ামি কখনই রবীন্দ্রনাথের ছিল না। বরং উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছেন, তাঁর গান নিয়ে, যাতে বিস্তৃত কাজ হয়। অবশ্যই নির্বাচন করেছেন, সেইসব গবেষক বা সংগীত অভিজ্ঞকে, যাঁরা ওঁর গানের সঠিক কদর বুঝবেন। গানের মন প্রাণের সঙ্গে যাঁরা একাত্ম হয়েছিলেন। কত গভীরে সেদিন পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর কাজ হয়েছিল। ভাবতে বিস্ময় জাগে! আজ কিন্তু এই ধরনের দুই বিশ্বের মিলিত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রসংগীতের ওপর কাজ প্রায় হচ্ছে না বললেই চলে।

এরপর, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব অনুবাদ ও স্বরলিপি প্রস্তুত করে আর্থার পাশ্চাত্যে রবীন্দ্র-মেলোডির আস্বাদ পাইয়ে দিয়েছেন বৃহত্তর সংগীতশিল্প-রসিকদের। গানের ডালি সাজিয়েছিলেন ইংরেজিতে, স্বরলিপি নিয়ে। রথীন্দ্রনাথেরও পরামর্শ নিয়েছেন। আর্থার তাঁর বন্ধু রথীকে জানিয়েছিলেন,

'...to do justice to Gurudeva, there should be a few more of the slower, and deeper airs like 'Bairobi' and 'Pichu Dake'.—This is why I asked if you would have the photograph records if taken, with you here...And with this goes Mrs.Peake's invitation to your father to stay and try over the translations and make verses for the tune...'

এত বছরের সাধনা, নানান গুণীদের প্রচেষ্টায়, রবীন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর কাজ হয়েছিল। ধারাবাহিক গবেষণা ও সৃষ্টির উপলব্ধি নিয়ে। আত্মসমাহিতের চিরন্তন ভাব ও ঐতিহ্যের অনুবর্তনে।

আর্থারের কাজটির শিরোনামায় ছিল; 'A selection of the songs of Rabindranath Tagore translated at his wish by Arthur

বোঝা যাচ্ছে, কত পরিশ্রম ও অধ্যয়নের দ্বারা পাশ্চাত্যের সংগীতগুণীরা ভালবাসা-শ্রদ্ধায় রবীন্দ্রনাথের কথা-সুর সম্পদকে পৃথিবীর গানের সঙ্গে যুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরই সম্মতিতে ও উপস্থিতিতে।

Geddes. The melodies were noted chiefly from the Bard's singing by Arthur Geddes with notations. (Three of the songs translated are owed to A. A. Bake. Chanson de Rabindranath Tagore, Paris 1935):

1. Deep in my Heart (ontare jagicha ontarjami)
2. Ah, my master! I know not thy own singing (Tumi Kaemon Kore gan Karo he guni!)
3. Road that lures away (Gram Chara)
4. Ah my soul searches after—seeks the distance (Ami Chān Chāllo hē, āmi sudurer piāshi)
5. O, we're Rajas-Royal, one and all! (Amra Sabai Raja)
6. March alone! Stand alone! (Akla Chelo Re!)
7. Call me, Ah! Call me never more! (Deko na!)
8. Silent Art thou, why? (Nirobe acho Kaeno?)
9. Though my time has come to leave now, still they call me (Pi-chu da-ke)
10. O the gateways of the south—Let fling! (Basanta-Eso he!)
11. Ours is she—Santi-Niketan (Amader Santiniketan)

সেই সময়ে, আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ বেরোয় :

'রবীন্দ্রসংগীতের ইংরাজী অনুবাদ'

লন্ডন—পশ্চিমী স্বরলিপিসহ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের অনুবাদ নূতন বছরের দিকে লন্ডনে প্রকাশিত হইবে। এই গানগুলি প্রকাশ করিবে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ভূগোলের লেকচারার ড. গেডিস, যাঁহার এক সময়ে শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হয়েছিল।

জনৈক সাংবাদিককে তিনি বলেন : "রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গান আমি বাছিয়া লইয়াছি। এই গানগুলির অধিকাংশই নির্বাচিত হইয়াছে সংগীতপ্রধান নাটক 'দি কিং অফ দি ডার্ক চেম্বার' হইতে। তরুণ বয়সে অর্থাৎ ১৯২০-র দশকে আমি শান্তিনিকেতনে যাই। আমি রবীন্দ্রনাথকে এই সময় গেলির সংগীত বাজাইয়া শুনাই। তিনি এই মিল তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন।'

রবীন্দ্রস্মরণে, রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রাণবন্ত গবেষণার এক দীর্ঘ পরিক্রমা। রবীন্দ্রনাথের গান যে মানবিক সংস্কৃতির সেতুবন্ধন, যেকোনও কালে, যেকোনও স্থানে ও পরিবেশে, অর্থময় হয়ে ওঠে—সে কাজ একদিন পাশ্চাত্যে হয়েছিল। এই নিভন্ত আলোয়, সংকীর্ণতায় মোছা অন্দর বাহিরে যার ধারণা পাওয়াই আজ কঠিন।

রবীন্দ্র শতবর্ষের ওই সন্ধ্যায়, এডিনবরা উৎসবে, আর্থার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গানের উপস্থাপনা সঠিকভাবে কী ভারতে, কিংবা বিদেশে হচ্ছে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিস্তীর্ণ প্রতিভায়, সবকে আপন করে মিলিয়ে দেবার শক্তি-রহস্য ছিল। সেই সম্পদের কেন্দ্রীয় নদীকে না বুঝে, এই বিষয়ে কাজ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। লিখেছিলেন ও পাঠ করেছিলেন (১৯৬১, আগস্ট ২৭) 'Songs By Rabindranath Tagore with their own Melodies' এ—যেন নদীর মতন রবীন্দ্রনাথের গান। যেখানে তিন ধরনের সুরধারায় অবগাহন করেছে ; নিজের মাটি বাতাস জলে পুষ্ট তিনি। দেশজ মার্গ সংগীতের তরঙ্গ, আবার মেঠো গানের পুষ্টি—সঙ্গে পেয়েছেন পাশ্চাত্য গানের আতিথ্য। সব মিলিয়ে মরমিয়া কবির নিজস্ব সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ আত্মপ্রকাশ, গভীর আত্মনিবেদন। ঘাসে ঘাসে পা ফেলে বনের পথে পা বাড়ানোর, আনন্দযাত্রা। গ্রাম, নদী খেত ফসলের আমন্ত্রণ, ধ্রুবপদের মর্যাদাগান ও বিলাতযাত্রী যৌবনের পাশ্চাত্য (আইরিশ, ইংলিশ) মেলোডির প্রেমের ডাক। সব মিলেছিল, তাঁর সংগীতের জোয়ারে তরঙ্গ তুলেছিল। তাঁর গানকে জানতে পারলে পৃথিবীর গান যেন বোঝা যায়। এই ছিল তাঁর সংগীতসৃষ্টির শক্তি ; নিবিড় 'এ আমি আর বিশ্ব আমির' মিলের মাত্রা ও ব্যাপ্তি।

যুদ্ধের দিকে হেলে পড়া, বিভ্রান্ত-ভরা পাশ্চাত্যে সেদিন রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে আগ্রহের জোয়ার এসেছিল। সে গানের, ভোরের আশার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বহু সংগীতগুণী। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের কাছে শান্তির বাসায় ফেরার মতন—একী গভীর বাণী ছিল !

আজ, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, আর আত্মঅহংকারে বিভোর দেশ-বিদেশ নতুন করে, তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী। আমাদের যথার্থ যোগ্য হয়ে উঠতে হবে, তাঁর সুরের ধারায় কোলাহল-হলাহল থেকে উত্তীর্ণ হতে। সচল নীরবতার সংগীতে, আত্মনিমগ্নতায় জীবনসঙ্গী করতে হবে, উপলব্ধির বাণীময় সুরেলা, রবীন্দ্রভুবনকে। বৃহতের সঙ্গে সদাযুক্তময় কর্মময় সুন্দর আত্মপ্রসারতার পৌরুষে।

রবীন্দ্রনাথের গান যে মানবিক সংস্কৃতির সেতুবন্ধন, যে কোনও কালে, যে কোনও স্থানে ও পরিবেশে, অর্থময় হয়ে ওঠে—সে কাজ একদিন পাশ্চাত্যে হয়েছিল। এই নিভন্ত আলোয়, সংকীর্ণতায় মোছা অন্দর বাহিরে যার ধারণা পাওয়াই আজ কঠিন।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশ বিদ

রবীন্দ্রসংগীতে দার্শনিকতা : গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি

নন্দদুলাল বণিক
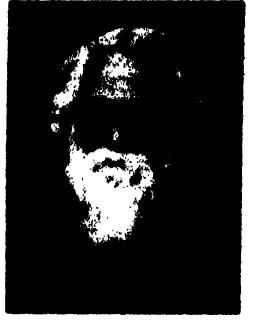
'জীবনস্মৃতি'র পাঠকের হৃদয়ে আঁকা রয়েছে এই চিত্র : 'যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।' *(জীবনস্মৃতি : 'হিমালয়যাত্রা')* 'গীতাঞ্জলি (১৯১০)-গীতিমাল্য (১৯১৪) গীতালি (১৯১৪) -র প্রায় সব কবিতাই গান, 'গীতধারা', 'যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীত', যার মধ্যে রয়েছে বিরহ-বেদনা, আলোর জন্য আর্তি এবং মুক্তির আনন্দ।

'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিস—এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদনের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।' রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির পাশে স্থাপন করা যাক নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত : ''গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'-র গানগুলি কবির স্বীয় অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা, মর্মছেঁড়া বাণী, জাগ্রত অধ্যাত্ম-চৈতন্যের গোপন গুঞ্জন। বস্তুতই গীতাঞ্জলি পর্বের অধ্যাত্ম-চৈতন্যের নিভৃত প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে, কারণ আমরা জেনেছি 'সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালি-কল্পনা'-পর্বের ঐশ্বর্য, আমরা পেয়েছি গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির পরবর্তী 'বলাকা-পূরবী-মহুয়া-বনমালী-পুনশ্চ'-এর বৈচিত্র্য ও জীবন জিজ্ঞাসার বিরাটত্ব।

এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিস—এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদনের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে।

রবীন্দ্রকাব্যধারায় 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালি'র জন্য বুদ্ধদেব বসু তৃপ্তি পান এজন্য : 'গীতাঞ্জলির সবগুলি রচনা পরস্পর সম্পৃক্ত, একই প্রেরণা ও মনোভাব থেকে সঞ্জাত ; এই তন্ময় সংলাপকে ব্যাহত করে না কোনো নীতিকথা অথবা কৌতুক-রচনা অনেকগুলি সমান্তর পথ অবশেষে এখানে এসে মিলিত হল : প্রকৃতি ও মানবজীবন, নারী ও কবিতা, স্বদেশ, দুঃখ, মৃত্যু ও ভগবান—এই সব সূত্র, যা এতকাল বিচ্ছিন্ন অথবা আংশিকভাবে যুক্ত অবস্থায় দেখা দিয়েছে, তার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটল, একবার এবং শেষবারের মতো, 'গীতাঞ্জলি'—'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র কাব্য পর্যায়ে। তিনটি নাম, কিন্তু একটিই কাব্য, বক্তব্যে ও শৈলীতে অভিন্ন, পরস্পরের পরিপূরক ও সমর্থক।' *('কবি রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৭৭)* আবু সয়ীদ আইয়ুব গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিকে 'স্পষ্টতই ঈশ্বর-প্রেমের কবিতা বা গান' বলেছেন, যদিও তিনি জানিয়েছেন, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তার পথ-পরিক্রমায় ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁর ক্রমশই ক্ষীণ হয়েছে। এমন অবস্থাতেও গীতাখ্য ওই তিন কাব্যকে, 'ঈশ্বর-প্রেমে আদ্যোপান্ত অনুরঞ্জিত কাব্যকে' হৃদয়ে স্থান দিতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। কেন হয়নি ? আবু সয়ীদ আইয়ুব উত্তর রেখেছেন : 'গীতাঞ্জলি-তে তো ঈশ্বর-বিষয়ক কোনো মত, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে না, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন কবির একটি বা একাধিক অনুভূতিমাত্র ব্যক্ত করা হয়েছে । তাই কবি এবং পাঠকের মধ্যে মত-বিশ্বাসের পার্থক্য যত গভীর ও মৌলিক হোক অনুভূতি প্রকাশ যদি সুন্দর হয়ে থাকে তবে যে-কোনো সহৃদয় পাঠকের মন তাতে সাড়া দিতে পারবে না কেন ?' *('আধুনিক রবীন্দ্রনাথ' পৃ. ৭৮)*। 'এ আমির আবরণ' উন্মোচনে নিভৃত প্রাণের দেবতার সন্ধান দিতে বসে কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষও লেখেন : "শমীর মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই কার শক্তিতে কবি লিখতে পেরেছিলেন 'তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া' ? তিনি ধর্মীয় কোনো ঈশ্বর না-ও হতে পারেন কারও কাছে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেন সকলেরই নিভৃত প্রাণের কোনো দেবতা, আত্মশক্তি যেন সকলের। প্রাণের লক্ষ্যে কোনো দেবতা নন, প্রাণই এখানে দেবতা, সেটা মনে রাখা চাই। সেই দেবতাকে পাবার জন্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো কথা ওঠে না আর, কথা ওঠে শুধু অন্তর্মুখিতার, আত্মদীক্ষার, সমস্যা সেখানে কেবল ধ্যান আর ধ্যানহীনতার।' *('এ আমির আবরণ', পৃ. ৪০)*

গীতাঞ্জলি-তে তো ঈশ্বর-বিষয়ক কোনো মত, তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হচ্ছে না, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে একজন কবির একটি বা একাধিক অনুভূতিমাত্র ব্যক্ত করা হয়েছে ।

মহাভারতের ২১৪৭৭৮টি পদের তুলনায়, রামায়ণের ৪৮০০০ পদের তুলনায় 'গীতাঞ্জলি'র ছোটো আয়তন দেখে তৃপ্ত হয়েছিলেন ফরাসি সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ। ইংরেজি গীতাঞ্জলির 'LIGHT, oh where is the light ? Kindle it with the burning fire of desire !' (বাংলা গীতাঞ্জলির 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।') কবিতাটি পড়ে বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্ত নিয়ে আঁদ্রে জিদ লিখেছিলেন : 'সর্বপ্লাবী এই যে উজ্জ্বল আনন্দের স্রোত, কোথায় তার উৎস ? কি এই সত্য যা একাধারে অন্তরকে পুষ্ট করে তোলে আবার মাতালও করে ? এই কি ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের শতাব্দী-অর্জিত ফল ? এই কি বৈষ্ণবদের আরাধনার রীতি ? না, এ হল সেই দর্শনের প্রেম, সেই ধর্মের প্রেম।' *('ফরাসিদের চোখে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি', পৃ. ৫৩)* কেমন সেই প্রেম ? উদ্ধৃত গানটিতেই তা ব্যক্ত হয়েছে :

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া—
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

(গীতাঞ্জলি : ১৭)

কেউ কেউ বলবেন, জীবনের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসেছিলেন ভাববাদের বলয় থেকে তখন তিনি প্রবিষ্ট হয়েছেন বস্তুবিজ্ঞানের অন্তর্লোকে এবং অন্য প্রকার দৃষ্টি ও মননে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সুতরাং 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র
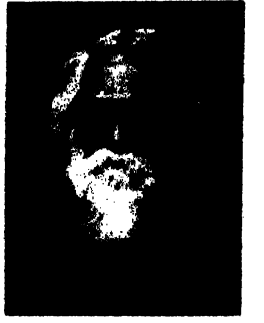
আধ্যাত্মিকতার প্রাসঙ্গিকতা আর কতটুকু ! ভিন্ন রুচির সমালোচক থাকতেই পারেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের আত্মকথনে এবং তাঁর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার জগৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে না। তাই দেখতে পাই, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বুলন্ত এজেভিট বিশ্বভারতীতে এসে 'দেশিকোত্তম' গ্রহণের সময়ে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন : 'রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, শিখেছি নম্যতার ভঙ্গি ; শিখেছি কখনও স্বর্গ হতে চায় মর্ত, ভগবান হতে চান মানুষ। আমার কাছে গীতা এবং গীতাঞ্জলি কোনও দিন ফুরোনোর নয়।' *(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ এপ্রিল, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ)*

'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র ভাববস্তু আলোচনার পূর্বে এই গানগুলি রচনার নেপথ্যালোকের দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বিষয় অরূপের সন্ধানে রূপের অভিসার পর্বের কাব্য। 'রাজা' (১৯১০) এই পর্বেরই নাটক (১৯১০)। এই নাটক রচনার পূর্বে দেশে এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে যা গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির দার্শনিকতা আলোচনায় মনে রাখা প্রয়োজন। ১৯০২ সালে কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু, ১৯০৩ সালে কন্যা রেণুকার মৃত্যু, ১৯০৪ সালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু, ১৯০৫ সালে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু। এই ঘটনাগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবনে বেদনাদায়ক, যেমন ১৯০৭ সালে পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে বিমূঢ় না করলেও শোকাহত করেছিল। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের চব্বিশ বছর বয়সের মৃত্যুশোকের অভিজ্ঞতা—'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর'। *(জীবনস্মৃতি : 'মৃত্যুশোক')*— মৃত্যুশোকজনিত এরূপ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে উচ্ছল করেছে, গীতাঞ্জলি-পর্বের মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে করেছে আত্মসমাহিত, ধ্যানমগ্ন, নিজের সত্তার স্বরূপ-সন্ধানে ব্যাপৃত। এর সঙ্গে যুক্ত করে নিতে হবে ১৯০৫ সালের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন, যার সঙ্গে বেশ কিছুদিন যুক্ত থেকে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সরিয়ে নেন রবীন্দ্রনাথ। সরে এলেও দেশ ও সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তায় থেকেছিলেন তিনি দায়বদ্ধ। সব কিছুর বিচার করলে দেখা যায়, উক্ত সময়টি ছিল যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনে সংকটকাল, তেমনি জাতির জীবনেও। এরূপ অবস্থায় ঘনীভূত দুঃখবোধের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিলেন। বলা যেতে পারে, 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এরূপ অন্তর্মুখীনতা প্রয়োজন ছিল, যেহেতু পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে বাজাতে হবে অভয়শঙ্খ, যার সূচনা 'বলাকা'য় হয়েছিল।

'আমি কোনো দেবতা সৃষ্টি করে প্রার্থনা করতে পারিনে, নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি। সে চেষ্টা প্রত্যহ করতে হয়, তা না হলে আবিল হয়ে ওঠে দিন। আর তো সময় নেই, যাবার আগে সেই বড়ো আমিকেই জীবনে প্রধান করে তুলতে হবে, সেইটেই আমার সাধনা।' *('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২৩৬)* এই 'দুর্লভ মুক্তির সাধনায় পূর্ণ ১৫৭টি কবিতা নিয়ে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। 'গীতাঞ্জলি'র এই ১৫৭টি রচনার মধ্যে ৮৫টি গান, বাকি ৭২টির 'গীতিযোগ্য রূপ থাকলেও তার কোনো সুরাশ্রয় নেই।' অবশ্য 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের এই শিরোনাম এবং রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা—'এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দু-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল'। 'গীতাঞ্জলি'কে গান হিসেবেই পরিচিতি দিয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশকালে অনেকগুলি গানের শিরোনামও ছিল। যেমন, 'প্রার্থনা' : 'আমার মাথা নত করে দাও', ; 'দুঃখভিসার' : 'কোথায় আলো কোথায় আলো' ; 'আষাঢ়-সন্ধ্যা' : 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল' ; 'ঝড়ের রাতে' : 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' ; 'দিনান্তে' : 'আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া' ; 'মৃত্যুলীলা' ; 'পারবি না কি যোগ দিতে ; 'নিশীথে' : 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন' ; 'মাতৃ-অভিষেক' : 'হে মোর চিত্ত' ; 'পরিসমাপ্তি' : 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা ; 'গান' : 'জীবনে যত পূজা' ইত্যাদি। শিরোনামগুলি নিঃসন্দেহে দার্শনিকতাযুক্ত।

'গীতিমাল্য' প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৮ আষাঢ়। ১৩২০-র ৩০ আশ্বিন প্রমথ চৌধুরীকে

রবীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, শিখেছি নম্যতার ভঙ্গি ; শিখেছি কখনও স্বর্গ হতে চায় মর্ত, ভগবান হতে চান মানুষ। আমার কাছে গীতা এবং গীতাঞ্জলি কোনও দিন ফুরোনোর নয়।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতনে মনের আনন্দে তাঁর মধ্যে গানের উৎস খুলে গেছে, এই গানগুলিই সংগৃহীত হয়েছে 'গীতিমাল্য' গ্রন্থে, মোট ১১১টি গান। অনেকগুলি গানই সাময়িকপত্রে প্রকাশকালে নামাঙ্কিত ছিল, যেমন—'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' ('আলো-আঁধারে'), 'স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি' ('দিনান্তে'), 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই ('প্রতীক্ষা'), 'এই যে এরা আঙিনাতে' ('সন্ধ্যা-সংকীর্তন'), 'এবার ভাসিয়ে দিতে' ('অবসান'), 'এমনি করে ঘুরিব দূরে ('তীর্থযাত্রা'), 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' ('আনন্দরূপ') , 'গাব তোমার সুরে' ('প্রার্থনা'), 'আমার ভাঙা পথের' ('গান') ইত্যাদি। 'গীতিমাল্য, প্রধানত গানেরই সংকলন, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র মতোই এরও সমস্ত রচনা সুরারোপিত নয়।

'গীতালি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। 'আত্মপ্রকৃতি ফিরে পাবার সাধনায়' লেখা হয়েছিল 'গীতালি'র গানগুলি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন রথীন্দ্রনাথকে : 'দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না

করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ...... কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এইবার থেকে আমি এই ভয়ঙ্কর মোহজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আবার আমার প্রকৃতি ফিরে পাব।' *(চিঠিপত্র ২)* 'গীতালি'-র গানের সংখ্যা ১০৮টি সহ সংযোজন ১১টি, মোট ১১৯টি। এর অনেকগুলি রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি রচনার শিরোনাম লক্ষণীয়। যেমন, 'ওই যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল' ('চরম নমস্কার'), 'ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে') ('শেষের দান'), 'মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে' ('সন্ধ্যার যাত্রী'), 'এই তীর্থদেবতার' (শেষ প্রণাম'), 'তোমার মোহন রূপে' ('মোহন মৃত্যু'), 'মোর মরণে তোমার হবে জয়' ('জয়'), 'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে' ('পথের গান'), 'ভেঙেছে দুয়ার' ('জ্যোতি'), 'এই তীর্থদেবতার' ('অঞ্জলি') ইত্যাদি।

দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। মনে হয়েছে আমার দ্বারা কিছুই হয়নি এবং হবে না, আমার জীবনটা যেন আগাগোড়া ব্যর্থ...... কাল সন্ধ্যার সময়ে ক্ষণকালের জন্য এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা আলোর আবির্ভাব দেখতে পেয়েছি।

৩

সুন্দরের অনুভূতি শিল্প-সাধনার চরম লক্ষ্য ও পরম আদর্শ। এই সুন্দর কী এবং তার অনুভূতিই বা কেমন—এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দর্শনের ভাষায় সুন্দর হল 'The beauty' বা 'The beautiful', ভারতীয়-দর্শনে সুন্দর রস-'আনন্দস্বরূপ-কল্যাণময় পরম' অস্তি বা Pure Existence। তৈত্তিরীয় উপনিষদে জানানো হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আনন্দ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই অস্তি বা আনন্দ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা চাক্ষুষ-উপলব্ধির নামই 'দর্শন'।

'গীতাঞ্জলি'-তে সুন্দর তথা আনন্দের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আভাস থাকলেও মূলত রয়েছে সুন্দরকে পাবার সাধনার কথা, বেদনার কথা, বিরহের ক্রন্দন। এখানে কবির বক্তব্যের যে ভাবধারা তা হল—! সুন্দরকে পাবার জন্য চাই—রবীন্দ্রভাবনায় সুন্দর অরূপরতন, তিনিই ঈশ্বর—আত্মনিবেদন, অহং থেকে

মুক্তি। ২. সাধকের জীবনে দুঃখ, বেদনা অর্থপূর্ণ, ঈশ্বরের দূতী হিসেবে এদের আবির্ভাব ঘটে ; ৩. নিসর্গপ্রকৃতি ও মানুষের বিচিত্র রূপ-রসে সুন্দরের প্রকাশ ; ৪. দীন-দরিদ্রদের মধ্যে, পতিতজনদের মধ্যেও রয়েছে তাঁর আসন পাতা ; ৫. অসীম-সসীমের, সসীম-অসীমের মেশামেশিতে তাঁর তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়।

'গীতিমালা'-তে দেখতে পাই 'গীতাঞ্জলি'র সময়ের বিরহব্যথা কবির এখনও দূর হয়নি। তবে যাঁর বিরহে কবি ব্যাকুল, ১. তিনিও কবির সঙ্গে মিলন-প্রয়াসী। এতে কবির আত্মা কিছুটা তৃপ্ত। ২. কবি এখন বুঝতে পারছেন, যিনি অন্তরতম, তিনি নানা রূপের মধ্য দিয়ে কবির অন্তর স্পর্শ করতে চাইছেন, বিশ্বপ্রকৃতিও তাঁর স্পর্শের সীমানা। ৩. তিনি সুন্দর, তবে তাঁর সৌন্দর্য কেবল মধুরতায় নয়, মহাবেদনায়ও। তিনি বজ্রপাণি। 'গীতালি'-তে দেখতে পাই ১. প্রিয়মিলনের সার্থকতা—ব্যথার মধ্য দিয়ে তাঁকে লাভ করার নিবিড় আনন্দ ; ২. পূর্ণ-উপলব্ধি ও চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ ; ৩. নিসর্গপ্রকৃতি এবং কবির হৃদয় অভিন্ন, রসস্বরূপের লীলাক্ষেত্র। ৪. পথিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ও নবতর চেতনায় রসের অন্বেষণ। 'গীতাঞ্জলি-গীতিমালা-গীতালি'-অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও উপলব্ধির যে সূত্রগুলি উল্লেখ করা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকপ্রবর ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য : 'গীতাঞ্জলির সঙ্গে গীতিমাল্য এবং গীতালির কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। গীতিমাল্যে অরূপ-উপলব্ধিতে সিদ্ধ, রসমুগ্ধ কবি-আত্মার বৈচিত্র এবং বিস্তারের দিকটাই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট দেখা যায়, কবি প্রকৃতিগত অরূপ-চেতনার বিস্ময়-ব্যাকুলতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিবিড় আনন্দ-চেতনাময় রাজ্যে উপস্থিত হচ্ছেন, অরূপতত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং গীতালিতে অরূপের আলোকে জীবন ও গতিকে দেখছেন। গীতালিতে এসে এইটুকু বোঝা যায় যে অতঃপর অরূপ-রস-চর্বনায় সমাহিত চিত্তে কবি অবস্থান করবেন না, জীবন ও অরূপের সমন্বয়সাধন করেই তাঁর মানস পরিতৃপ্ত হবে।' *(রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়)*

'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গান—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/চরণধূলার তলে।' বলা হয়েছে, সুন্দরকে পেতে হলে, রসস্বরূপকে জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে হলে, অহংকার, অভিমান বর্জন করতে হয়। সুতরাং 'সকল অহংকার হে আমার/ডুবাও চোখের জলে'। বহু বাসনায় চিত্ত কলঙ্কিত, সুন্দরের দয়া দিয়ে ধুয়ে নেবার জন্যও প্রার্থনা চাই। সুতরাং 'চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে'। প্রার্থনায়, আত্মনিবেদনে, চিত্ত যখন শুভ্র-স্বচ্ছ, তখন অনুভব করা যায়—জীবনদেবতার আনন্দস্পর্শে জীবন ধন্য।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ-রস সরসে
শতদল-সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

(গীতাঞ্জলি ৬)

জীবনযাত্রার পথে সঠিক লক্ষ্যের কথা কবি নিজেও জানেন না, তাই অজানা পথেই তিনি চলেছেন জীবনদেবতার নির্দেশে। 'দেখি নাই কভু দেখি নাই, এমন তরণী বাওয়া।' জীবনযাত্রার পথে অনেক দুঃখ, অনেক আঘাত, তার মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে এবং তখন উপলব্ধি হবে, 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে/আনন্দগান বাজে'। কিন্তু কবির হৃদয় জুড়ে আনন্দগান বাজবে কবে? 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের 'আনন্দরূপ রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনি সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া ওঠে, 'নহে নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে—এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।' .... ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে। মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম ! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না !"—সত্যকে দেখার জন্য কবির অসীম প্রতীক্ষা ! গীতাঞ্জলির ১৬ সংখ্যক গানটিতে এরূপ অপেক্ষার অনির্বচনীয় জীবন্ত প্রতীক্ষা : 'দূরের পানে মেলে আঁখি/কেবল আমি চেয়ে থাকি/পরান আমার কেঁদে বেড়ায়/দুরন্ত বাতাসে।' এই গানটির সমগোত্রীয় আকৃতি-পর্যায়ের অনেকগুলি গান আছে 'গীতাঞ্জলি'-তে। এরূপ একটি গানেরই উল্লেখ করেছিলেন আঁদ্রে জিদ—'কোথায় আলো, কোথায়
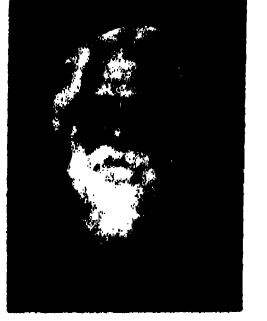
বহু বাসনায় চিত্ত কলঙ্কিত, সুন্দরের দয়া দিয়ে ধুয়ে নেবার জন্যও প্রার্থনা চাই। সুতরাং 'চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে'। প্রার্থনায়, আত্মনিবেদনে, চিত্ত যখন শুভ্র-স্বচ্ছ, তখন অনুভব করা যায়—জীবনদেবতার আনন্দস্পর্শে জীবন ধন্য।
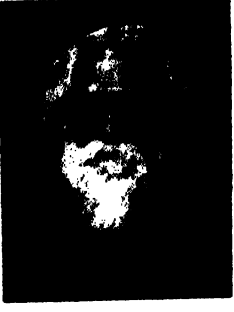
ওরে আলো।' *(গীতাঞ্জলি, ১৭ সংখ্যক)* যাঁর জন্য তীব্র বিরহ, সেই অপরূপের লীলামাধুর্যে আত্মহারা হয়ে কবি নিজেই আবার গেয়েছেন—'সীমার মাঝে, অসীম তুমি/বাজাও আপন সুর।/আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ/তাই এত মধুর। *('গীতাঞ্জলি', ১২০ সংখ্যক)*। এই গানটির পরিপূরক গীতাঞ্জলির ১২১ সংখ্যক গান—'তাই তোমার আনন্দ আমার পর/তুমি তাই এসেছ নীচে।/আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর/তোমার প্রেম হত যে মিছে।' গীতাঞ্জলির ১০১ সংখ্যক গানটিও একই ভাবের অভিব্যক্তি, তবে এই গান জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শিল্পের রহস্য উন্মোচক :

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

আত্মজীবনী লিখতে বসে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন 'নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা' *(আত্মপরিচয়, ১ম রচনা, পৃ. ২০)*, যা রবীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে আকর্ষণ করেছে। গীতাঞ্জলির দার্শনিকতায় অর্থাৎ অরূপের অন্বেষায়, কিংবা নীহাররঞ্জন রায়-কথিত 'আধ্যাত্ম-চৈতন্যের' স্বরূপ উপলব্ধিতে কিংবা জগন্নাথ চক্রবর্তীর ব্যাখ্যায় 'অস্তিত্ব বিরহ'-এর আলাপনে নিসর্গ-প্রকৃতিরও নিবিড় ভূমিকা রয়েছে। 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি'তেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। গীতাঞ্জলির 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়', 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে', 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে', 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে', 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল', 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'আজ বারি ঝর ঝর ভরা ভাদরে', 'এসো হে এসো, সজল ঘন, বাদল বরিষণে', 'শরতে আজ কোন অতিথি', 'আকাশতলে উঠল ফুটে,' 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' ইত্যাদি গানে কবি-চিত্তের ব্যাকুলতা-প্রতীক্ষা-উপলব্ধির সঙ্গে মিশে আছে নিসর্গপ্রকৃতি। এখানে প্রকৃতি কেবল অনুষঙ্গ নয়, কবির দর্শন-এর অন্যতম মর্মবাণী। কবির জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছে এই গান :

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার।

(গীতাঞ্জলি, ২০ সংখ্যক)

গীতাঞ্জলিতে কবি-হৃদয়ের আকুলতা ও বিরহের কান্না গীতিমাল্যতে প্রায় উপশমিত। গীতিমাল্যের প্রথম গানে এর কারণ প্রকাশিত, দেখতে পাই :

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।

আসলে সম্পূর্ণ মিলন এখনও ঘটেনি, তবে চোখের জলের মধ্য দিয়ে সান্ত্বনার তটভূমি দেখা দিয়েছে। এখন 'কোলাহল তো বারণ হল/এবার কথা কানে কানে/এখন হবে প্রাণের আলাপ/কেবলমাত্র গানে গানে' *(গীতিমাল্য, ৮ সংখ্যক)*।

তাই গীতিমাল্যের গানগুলিতে মিলনের আকুতি থাকলেও কবির হৃদয়ের হাহাকার নেই। এখানে আছে কবির অন্তরের সহজ সরল রসপূর্ণ আবেদন। যেমন 'স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি', 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ', 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী', 'তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে', 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে', 'তোমারি নাম বলব নানা ছলে', 'বাজাও আমারে বাজাও', 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে', 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না', 'তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল', 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' ইত্যাদি। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, '...... নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া ক্রমশ কবির আধ্যাত্মসাধনা এই গীতিমাল্যে বিচিত্রতা হইতে ঐক্যে, বেদনা হইতে মাধুর্যে, বোধ-প্রাখর্য হইতে সরল উপলব্ধিতে পরিণত হইয়াছে।' *('কাব্যপরিক্রমা')*

●

গীতিমাল্যের গানগুলিতে মিলনের আকুতি থাকলেও কবির হৃদয়ের হাহাকার নেই। এখানে আছে কবির অন্তরের সহজ সরল রসপূর্ণ আবেদন।

যেহেতু এই উপলব্ধি কবির আত্মায়, তাই না সংশয়হীন ও আনন্দমুখর। গীতিমাল্যের ১০২ সংখ্যক গানটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেহেতু গানটিতে কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর-এর স্পর্শ লাভ করে ধন্য হওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এখানে তাঁর চিত্ত অনুরাগে রঞ্জিত এবং প্রাণ তৃপ্ত মিলন-সুধায় :

এই লভিনু সঙ্গ তব,
　　সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
　　ধন্য হল অন্তর,
　　সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষুদুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদগগনে পবন হল
　　সৌরভেতে মন্থর
　　সুন্দর হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশরাগে
　　চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা
　　রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমন করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
　　জন্ম-জনমান্তর,
　　সুন্দর হে সুন্দর।

গীতিমাল্যের ৩০ সংখ্যক গানটিতে ভিন্ন সুর লেগেছে। অর্থাৎ গীতিমাল্যের অন্যান্য গানে, প্রায় সব গানেতেই, কেবলই আনন্দ-উচ্ছ্বাস, মধুর ভাবের স্নিগ্ধতা, সংশয়হীন আত্মতৃপ্তি, কিন্তু ৩০ সংখ্যক গানটিতে মধুর-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐশ্বর্য-ভাব। রবীন্দ্রনাথের সুন্দর মধুর ; তিনি আরও সুন্দর হয়ে ওঠেন রুদ্রের রুদ্রত্ব ধারণে। গীতাঞ্জলির ৭৪ সংখ্যক গানে কবি জানিয়েছেন 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি', গীতিমাল্যের গানটিতে জানালেন :

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
　　তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
　　বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
　　বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
　　যেন গো অস্ত-আকাশে।
জীবনশেষের শেষ জাগরণসম
　　ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম
　　তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
　　তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

এবার গীতালির প্রসঙ্গ। গীতিমাল্যের মতো এখানেও কোনো তত্ত্বকথা নেই, সাধনার কথা নেই, কেবলই ভারমুক্ত চিত্তের সহজ আনন্দ। কবির হৃদয়ের উপলব্ধি গভীর ও পরিপূর্ণ, এখন কবির দাবি :

আমার সকল রসের ধারা
　তোমাতে আজ হোক-না হারা।
　　জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
　　ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
　　তোমার রূপে মরুক ডুবে
　　আমার দুটি আঁখিতারা।

(গীতালি, ১৪ সংখ্যক)

কবির দাবি বৃথা যায়নি, গীতিমাল্যের গানগুলিতেই তার প্রমাণ আছে। 'দুঃখের বরষায়', 'তুমি আড়াল পেলে কেমনে', 'আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি', 'আলো যে যায় রে দেখা', 'আঘাত করে নিলে জিনে', 'আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে', ' পথ দিয়ে কে যায় গো চলে', 'নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে', 'তোমার ভুবন মর্মে আমার লাগে', 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়'—প্রতিটি গানে ভারমুক্ত চিত্তের সহজ বিস্তার দেখতে পাই। এবার 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল/অনন্ত আকাশে'—

হৃদয় আমার প্রকাশ হল
　　অনন্ত আকাশে
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে
　　বাতাসে বাতাসে।
এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হয়ে প্রাণে আমার
　　আবার ফিরে আসে
বাহিরে তুমি নানা বেশে
　　ফের নানান ছলে ;
জানি নে তো আমার মালা
　　দিয়েছি কার গলে।
আজ কী দেখি পরানমাঝে
তোমার গলায় সব মালা যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
　　গভীর সর্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল
　　অনন্ত আকাশে।

হৃদয় যখন অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে গেল, তখন বুঝি কবির আর কোনো দায় রইল না সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি। কিন্তু তা নয়। রবীন্দ্রনাথের
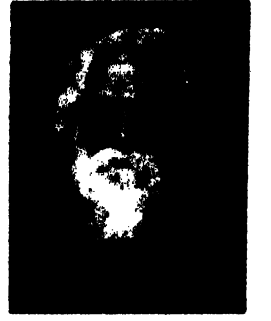
হৃদয় যখন অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে গেল, তখন বুঝি কবির আর কোনো দায় রইল না সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি। কিন্তু তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতি সুখ-দুঃখ-বেদনা-স্পন্দিত ধরণীর মানুষকে বাদ দিয়ে নয়।

ঈশ্বরানুভূতি সুখ-দুঃখ-বেদনা-স্পন্দিত ধরণীর মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। তাই গীতাঞ্জলিতে কবি বলেছেন, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার/সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।' তাই গীতালিতে কবি গাইলেন দিক্ পরিবর্তনেরও গান :

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারই কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন-পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

(গীতালি, ৯৫ সংখ্যক)

গীতালির এই গানটির মধ্যেই দেখতে পাই 'বলাকা'-কাব্যের 'ঝড়ের খেয়া'-র আবির্ভাব।

৪

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা নিয়ে যে আলোচনা করা হল তাতে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে কিনা এরকম অনুসন্ধান অর্থহীন না হলেও অবান্তর, কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ নিজের দার্শনিকতা বিষয়ে লিখেছেন : 'তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার মধ্যে নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে। প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভালো লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্‌বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখের সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।' *('আত্মপরিচয়, পৃ. ১৪)* সঙ্গীততাত্ত্বিক প্রখ্যাত গবেষক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রবীন্দ্রনাথের এই দর্শনচেতনাকে 'ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অভিনব উপলব্ধির রূপ' বলেছেন।

আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে।

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ দার্শনিকতা হলো তাঁর জীবনধর্ম, যাকে দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভিন্নভাবে বলেছেন 'মিস্টিসিজম। "In his mystic vision Rabindranath deeply feels that God is always approaching us in the various phenomena of nature, in the heat of summer, in the rains of the monsoon, in the corn-fields and sun-shine of autumn, through the shivering cold of winter and the rejuvenating touch of spring....We also find that the poet feels himself to be like a toy or a musical instrument in the hand of God and all his poetical effusions are supposed to rush out from some perennial source of inspiration of a creative energy which is far beyond the control or touch of the man Raindranath."*('The Golden Book of Tagore' Page 70)*

তথ্যসূত্র :

রবীন্দ্ররচনাবলী, ১১ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৬ খণ্ড—। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
সংগীতচিন্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
সংগীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ।
সংগীতে রবীন্দ্রনাথের দান—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ।
রবীন্দ্রনাথের গান—ডঃ সুকুমার সেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। নিউ এজ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ।
রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়—ডঃ ক্ষুদিরাম দাস। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।
কবি রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু, ভারবি।
আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব। দে'জ পাবলিশিং।
এ আমির আবরণ—শঙ্খ ঘোষ। প্যাপিরাস।
ফরাসিদের চোখে রবীন্দ্রনাথ—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রূপা।
রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গপ্রকৃতি—ডঃ নন্দদুলাল বণিক। সাহিত্য প্রকাশ।
আত্মচরিতের শিল্পী ও রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য—ডঃ নন্দদুলাল বণিক। সাহিত্য প্রকাশ।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক

রবীন্দ্রনাথের গান ও রোমান্টিক কল্পনা

মঞ্জুভাষ মিত্র
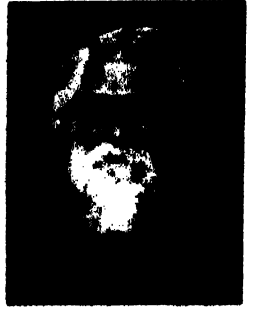
রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে এ কথা হলফ করে বলতে পারি। বিজ্ঞানীরা বলছেন গানের শুশ্রূষাময়ী শক্তি আছে, রবীন্দ্রসংগীত অবশ্যই আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম। যাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিশ্বভারতী প্রকাশিত গীতবিতান ৩টি খণ্ড অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড (গান) রয়েছে তাঁদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই দেশ-বিদেশের অনেক ভালো ভালো বই হাতের কাছে পাওয়ার পর বা পড়বার পর শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়িতার পাশাপাশি গীতবিতানকেই সদাসঙ্গী করেছেন। পাঠের অভিজ্ঞতা বলছে গীতবিতানকে কাব্যগ্রন্থ বা অসাধারণ কবিতার ভাঁড়ার হিসেবে অনায়াসে গ্রহণ করা যায়। প্রত্যেকটি গানই মুক্তানিটোল কবিতা, গীতিকবিতা এবং একই সঙ্গে কোনো শিল্প-উৎকৃষ্ট কবিতা এবং উৎকৃষ্ট সংগীত। এমন ঘটনা বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রসংগীত ব্যতীত একমাত্র বৈষ্ণবপদাবলির ক্ষেত্রেই ঘটেছে। যাঁরা অধিকতর তৎপর হয়ে রবীন্দ্রনাথকে জানবার আবেগে ও আগ্রহে স্বরবিতান পঞ্চাশ অধিক খণ্ডসমূহ সংগ্রহ করছেন—অবিরামভাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তারপর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহানা দেবী, কনক বিশ্বাস, শান্তিদেব ঘোষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, রাজেশ্বরী দেবী প্রমুখের গান ক্যাসেট, সি ডি এমনকী পুরানো দিনের দুর্লভ রেকর্ডে সংগ্রহ করছেন ও শুনছেন তাঁরাও অকপটে মানেন রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের সমন্বয় রাধাকৃষ্ণের মতোই শাশ্বত যুগলের একত্রে অবস্থান।

রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবাদী কবি, তিনি রোমান্টিক কবি অতএব কল্পনার উৎকর্ষ এবং কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ স্বীকার করেন এ কথা সবারই জানা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলি-কিটস প্রমুখ কবির সঙ্গে তাঁর তুলনা ও সাদৃশ্য এবং 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে কাব্যতত্ত্বের যে বিবৃতি তিনি

প্রত্যেকটি গানই মুক্তানিটোল কবিতা, গীতিকবিতা এবং একই সঙ্গে কোনো শিল্প-উৎকৃষ্ট কবিতা এবং উৎকৃষ্ট সংগীত। এমন ঘটনা বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রসংগীত ব্যতীত একমাত্র বৈষ্ণবপদাবলির ক্ষেত্রেই ঘটেছে।
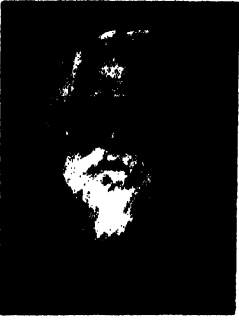
দিয়েছেন তা রূপে ও স্বরূপে রোমান্টিক বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচকেরা সকলেই সেটা লক্ষ করেছেন। অতএব মূল কথাটা হল মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, সানাই প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেও কবি রবীন্দ্রনাথকে পরিপূর্ণভাবে জানবার জন্যে অতঃপর তিনখণ্ড গীতবিতানের কাছে আসতে হবে। একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ যে সব অসাধারণ কথা তাঁর কবিতায় বলেছেন, সৌন্দর্যময় ও আনন্দ-বেদনাময় অনুভূতি প্রকাশ করেছেন সেগুলিই আবার যেন নিগূঢ় সংহত করে মন্ত্রের মতো সূত্রাকারে তাঁর গানগুলিতে ফিরে বলছেন এবং কবিতার মতো তাঁর গানও হয়ে উঠেছে রোমান্টিক কল্পনার লীলাভূমি।

ব্লেক-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ-শেলি-বায়রন এই কজন কবিকে বলা হয়েছে রোমান্টিকদের মধ্যে সবার সেরা। রোমান্টিকেরা যখন কবিতা লিখছিলেন তখন নিজেরাও তাঁদের স্বরূপ ও সামীপ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না ; সবাই মিলে হঠাৎ একসঙ্গে একটা রোমান্টিক কবিতা আন্দোলন তৈরি করে ফেললেন তাও নয়। রোমান্টিক কবিতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন আব্রামস, মরিস ব্যোরা অথবা রেনে ওয়েলেক-এর মতো সমালোচকেরাই ; তাঁরা এ কাজে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন ব্লেক ওয়াডর্সওয়ার্থ শেলি প্রমুখের কবিতা বিষয়ক গদ্য থেকে এবং অবশ্যই ওইসব কবিদের পদ্যাবলি থেকে। ফরাসি সমালোচক হিপোলাইত তেইন ১৮৬৩ সালে প্রথম উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ফরাসি রোমান্টিকদের সঙ্গে তুলনা করে সমকালীন কিছু ইংরেজ কবিকে রোমান্টিক বলে উল্লেখ করলেন। কবি হাইনরিশ হাইনে জার্মান রোমান্টিকদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন, এঁদের সঙ্গেও ইংরেজ রোমান্টিকদের তুলনা দেওয়া হল। আধুনিককালে রোমান্টিকতা নতুন সংজ্ঞা নিয়ে এল। 'A modern romanticist would probably not choose medievalism or romance or wondrous mystery as the central criteria for Romanticism, but rather idealism or egotism or perhaps primitivism and a turn to nature' (*A Companion to Romanticism, P. 6*)—একজন একালীন রোমান্টিক সম্ভবত মধ্যযুগ, রোমান্স অথবা অলৌকিক রহস্যকে রোমান্টিসিজমের কেন্দ্রীয় বিষয় করবেন না ; বরং তাঁর ঝোঁক হবে আদর্শবাদ, সুতীব্র ব্যক্তিবাদ অথবা আদিম জীবনোল্লাস ও প্রকৃতির বুকে ফিরে চলো এই আহ্বান গ্রহণ করার দিকে। রোমান্টিসিজম আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদ 'সাবজেকটিভ আইডিয়ালিজম' অথবা ন্যাচারালিজমে প্রত্যাবর্তন 'return to a certain form of naturalism' এ নিয়ে পল দে মান (Paul de Man)-এর মতো আধুনিক সমালোচকও বিভ্রান্তিতে পড়েছিলেন। প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ—এ সিদ্ধান্ত রোমান্টিকদের পিতা বলে উল্লেখিত জঁ জ্যাক রুশোর। এক তীব্র অন্তর্মুখিনতাই রোমান্টিক কবিদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল এবং এই কবিরা নিছক বহির্জগৎ ও বহিরঙ্গ বাস্তবকে তত গুরুত্ব দিলেন না। Shelley তাঁর 'Defence of Poetry-তে বললেন, 'All things exist as they are perceived'—বস্তুকে যে ভাবে দেখা হচ্ছে বা উপলব্ধি করা হচ্ছে তার উপরই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে ; Blake বললেন 'Mental Things are alone Real'—মানসে জারিত বস্তুই মাত্র প্রকৃত। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কবিরা বহির্জগৎকে অন্তর্জগৎরূপে রূপান্তরণের প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

রোমান্টিসিজমের তত্ত্ব সূত্রাকারে কিছু বলা গেল ; এবার দেখা যাক এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধে কতটা সমর্থিত হয়েছে এবং তাঁর গানে কীভাবে সৃষ্টিক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধের (১৩১০) প্রথম বাক্যটিতেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে ; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগা, আমাদের ভয়বিস্ময়, আমাদের সুখদুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিত করিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

......বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধরিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।'

বুঝতে পারছি শেলি এবং ব্লেক যে কথা বলেছিলেন—বস্তু মনের ভিতর কোন রূপে অনুভূত হচ্ছে সেটাই আসল, যা আত্মভাবনামণ্ডিত তাই একমাত্র বাস্তব—রবীন্দ্রনাথও অবিকল একই মত পোষণ করছেন। ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির অনুরঞ্জনা না পেলে নিছক বস্তুউপাদান বা বাইরের জগৎ সাহিত্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না।

শেলি এবং ব্লেক যে কথা বলেছিলেন—বস্তু মনের ভিতর কোন রূপে অনুভূত হচ্ছে সেটাই আসল, যা আত্মভাবনামণ্ডিত তাই একমাত্র বাস্তব—রবীন্দ্রনাথও অবিকল একই মত পোষণ করছেন।

কবির এই রোমান্টিক তত্ত্বভাবনা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে সুচারুভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—
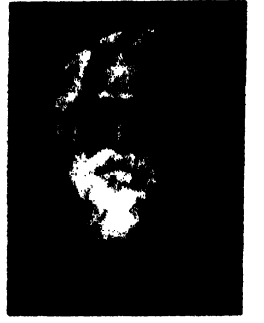
তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্যগগনবিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—ইত্যাদি

(গীতবিতান, দ্বিতীয় খণ্ড : প্রেম-৩৬)

স্বরবিতান ১০ম খণ্ডে উদ্ধৃত ইমনকল্যাণে একতালে গেয় এই গানটিতে রোমান্টিকের আত্মভাবনামূলক জীবনদর্শন প্রায় যেন ইস্তেহাররূপে প্রকাশ পেয়েছে। যে মেঘ জড়বস্তু, নিষ্প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক ঘটনামাত্র, তাই কবির মনের ভিতর প্রবেশ করে তাঁর 'হৃদয়বৃত্তির রসে জারিত' হয়ে সম্পূর্ণ অন্য এক রূপ ও তাৎপর্য নিয়েছে। যা ছিল সন্ধ্যার মেঘমালা তা হয়ে উঠেছে জীবনপ্রিয়া, ভালোবাসার সুখদুঃখবিষঅমৃতের নির্মাণপ্রতিমা।

'প্রকৃতির কোলে ফিরে চল'—রোমান্টিক কবিমানসের এই নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ মর্মবাণী বলেই গ্রহণ করেছিলেন। গীতবিতানে সংকলিত গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের অজস্র গানগুলি পড়লে শুধু কবিতা পড়ার উন্মাদনা পাওয়া যায় না, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথকে সরল সুন্দরভাবে বোঝা যায় এবং ওই চিরন্তন প্রেমিকের একটি উচ্চারিত বাক্যই মনে আসে—'তোমার চলার পথের আগে আগে ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে'। গীতবিতান দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকৃতি পর্যায়ের ৮ সংখ্যক গানটি প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বনিসর্গের সঙ্গে মৃৎপৃথিবীর সঙ্গে মিলনের আকুতি এখানে শুধু নেই, এখানে গড়ে উঠেছে এক অখণ্ড জীবনবেদ। মাত্র ১৩ পংক্তির এই গীতিকবিতা অথবা রবীন্দ্রসংগীতে কবি যে কথা সূত্রাকারে, প্রায় মন্ত্রের মতো ও মুক্তনিটোলভাবে বলেছেন—সেই এক কথাই গীতিকবিতা রোমান্টিক কবিতার বিশাল পরিসরে সুবিস্তৃতভাবে বলেছেন তাঁর বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি, পৃথিবী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সেরা আলোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী এই ভাবুকতারই নাম দিয়েছিলেন সর্বানুভূতি অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে ব্যক্তিমানুষ অথবা কবি-আত্মের প্রতিটি অণুপরমাণুর মিলন-আকুতি। পাঠক-পাঠিকা তুলনা করুন সোনারতরী কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় প্রকাশিত অংশের সঙ্গে—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্তগগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণতব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।
... ...
আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্বমাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে গুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে

(বসুন্ধরা : সোনারতরী)

অথবা তুলনা করুন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার সঙ্গে—
মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণমাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।
... ...
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথা-ভরে
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মরস্বর।

(সমুদ্রের প্রতি : সোনারতরী)

সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় গীতবিতানে রবীন্দ্রসংগীতের যেসব লেখ্যরূপ পাচ্ছি তাদের রবীন্দ্রনাথের বিকীর্ণ কাব্যসম্ভারের পরিপূরকরূপেই গ্রহণ করা যায়।

আদর্শবাদ বা idealism রোমান্টিক কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ব্লেকের ঘোষণা—আমি আমার নিজস্ব নিয়ম তৈরি করে নেব, অন্যের নিয়মের দাস হবো না, ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলি প্রমুখের ফরাসি বিপ্লব থেকে উদ্গত মানবতাবাদের দিকে ঝোঁক শেলির Ode to the West Wind-এ 'Drive my dead thoughts over the universe to quicken a new birth' ইত্যাদি উচ্চারণে পুরাতনকে উৎপাদন করে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ, কিটস-এর 'Truth is Beauty, Beauty Truth' ইত্যাদি বাণীতে সৌন্দর্যকেই সত্যরূপে গ্রহণ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কাব্যের 'বর্ষশেষ'-এর মত কবিতায় নতুন পৃথিবী সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টি, 'উর্বশী' কবিতায় 'Absolute Beauty' বা সার্বভৌম সৌন্দর্যের প্রতি পক্ষপাত—সবই Romanticism-এর অন্তর্গত অপরিহার্য

গীতবিতানে রবীন্দ্রসংগীতের যেসব লেখ্যরূপ পাচ্ছি তাদের রবীন্দ্রনাথের বিকীর্ণ কাব্যসম্ভারের পরিপূরকরূপেই গ্রহণ করা যায়।

আদর্শবাদের দিকে ইঙ্গিত করে। William Wordsworth তাঁর 'Tintern Abbey'-তে লিখেছিলেন—এক সমুচ্চ গভীর বোধির কথা, সূর্যের আলোয় সমুদ্রে বাতাসের প্রবাহে মানুষের মনে তার নিত্য অধিষ্ঠান—'a sense of sublime/Of something for more deeply interfused' যা রয়েছে দ্যুলোকভূলোক মানুষের আত্মাজুড়ে প্রতীতীরূপে। উপলব্ধির জ্যোতির্ময়তায় আক্রান্ত কবিরা অতঃপর যাত্রা করলেন প্রেমের আদর্শবাদের জগতে, শেলির Hymn to Intellectual Beauty পাঠ করে জানতে পারি প্রিয়া সেখানে বৈদেহী। শরীরীরূপে তত নয় দিব্যরূপিণী সৌন্দর্যপ্রতীক মানসীরূপেই বেশি প্রশস্তি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, আমাদের মনের ভিতর বিদেশিনীরূপে এই সৌন্দর্যদূতী বাসা বেঁধেছেন, শারদপ্রাতে মাধবীরাতে তাঁর আভাস পাওয়া যায়। একটি গানে এই আদর্শায়িত প্রেমভাবনার, প্লেটোনিক আত্মিক উপভোগের, তন্ময় আত্মসর্বস্বতার চমৎকার উদাহরণ আছে—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাকো সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবীরাতে
তোমায় দেখেছি হৃদিমাঝারে ওগো বিদেশিনী। ... ...
আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী।।

(৮৬, প্রেম, গীতবিতান, ২য় খণ্ড)

এই সর্বগ্রাসী প্রিয়ার কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাতেই বিস্তারিতভাবে আছে। 'ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া / যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া' (সুরদাসের প্রার্থনা : মানসী) ; তাঁরি উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে কথামালা শব্দমালা—'আয় রে ঝঞ্ঝা পরানবধূর / আবরণরাশি করিয়া দে দূর / করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন-বসন খোল / দে দোল দোল' (ঝুলন : সোনারতরী) ; এই প্রিয়া গগনে তাঁর এলো চুল ছড়িয়ে ভুবন ভরে আসেন, তাঁর চরণে জড়ানো থাকে বনফুল (আবির্ভাব : ক্ষণিকা) ; তাঁর উদ্দেশে মুগ্ধ কবির প্রার্থনা 'আজিকার দিন না ফুরাতে / হবে মোর এ আশা পুরাতে / ..... / ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো / সূর্য অস্ত যায় নি এখনো' (শেষ বসন্ত : পূরবী) ; এই প্রিয়া সাগরজলে স্নান করে সজল-এলোচুলে তীরতটে বসে থাকেন (সাগরিকা : মহুয়া) ; বাদলদিনে কবির বাহুতে মাথা রেখে এই কল্পনারূপিণী প্রিয়া শুনেছেন বাদলগাথা (অসম্ভব : সানাই)। আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করে মানসসুন্দরী দিব্যরূপিণীরূপে দশদিগন্তজুড়ে তাঁর অবস্থান

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; ঊষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি ;

(মানসসুন্দরী : সোনারতরী)

প্রেমের আদর্শবাদের কেন্দ্রস্থলে Spirit of Beauty হয়ে এই যে সৌন্দর্যসত্তারূপে প্রিয়ার অবস্থান কখনো তিনি আকাশজুড়ে অবস্থান করেন উর্বশীরূপে, কখনো বা বিজয়িনীরূপে অচ্ছেদ সরসীনীরে স্নান সমাপ্ত করে পরিপূর্ণ নগ্নিকার বেশে তটভূমিতে উৎক্ষিপ্ত হন (বিজয়িনী : চিত্রা)। বলা বাহুল্য, রোমান্টিক প্রেমের idealism-চর্চিত এই মূর্তি যা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় বহুভাষিত তা রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানে স্বল্পভাষিতরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

রোমান্টিক প্রেমের idealism-চর্চিত এই মূর্তি যা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় বহুভাষিত তা রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানে স্বল্পভাষিতরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

রোমান্টিক কবিতায় বিচ্ছেদ ও বেদনার বোধ গভীরভাবে ছাপ ফেলে যায়। বেদনার ভিতর থেকে

কবিতার জন্ম—এই সত্যে রোমান্টিকেরা আকৃষ্ট ছিলেন অন্যদিকে বিচ্ছেদকে তাঁরা মনে করেছেন বেদনার প্রথম সোপান। স্মৃতির প্রহারকে অশ্রুজলের রঙিন উপকরণে গেঁথে অনেক সময় তাঁরা স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন। মনে পড়ছে শেলির অপর পংক্তি 'Music, when soft voices die,/ vibrates in the memory'— কোমলকণ্ঠ থেমে যাওয়ার পরও সংগীত স্মৃতিতে গুনগুন করে। অথবা একবার ভাবা যাক মৃত্যুপথযাত্রী কিটসের সেই বেদনামথিত উচ্চারণ—ধরিত্রীর সুখমেলা একদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন আমি থাকব না, লিখব না লেখা, আকাশে প্রেমের উচ্চ প্রতীক মেঘ ভেসে যাবে কিন্তু আমি তখন তাদের হাসিকান্নার মায়াবী স্পর্শ না দিয়ে ভাবনার আলোছায়াময় চিত্রলেখায় ধরে রাখব না—

When I behold, upon the night's starr'd face,
Huge cloudy symbols of a high romance,
And think that I may never live to trace
Their shadows with the magic hand of chance
(When I have fears that I may cease to be)

এই বিচ্ছেদব্যথা এই স্মৃতিভারাতুরতার বেদনা বহু গানে নিখুঁত নিটোল কবিতার অবয়বে ফুটে উঠেছে। কখনো বেদনায় পেয়ালা ভরে উঠেছে, কখনো আবার যাকে নয়নজলে বিদায় করা হয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনার আর কোন ছল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার দেখি কোন ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে বর্তমানের জীবন অস্তিত্বের ভারকেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে অতীত দিনের বিমোহিনী। চেনা ফুলের গন্ধই তাকে পথ চিনিয়েছে। রোমান্টিকের এই 'pangs of separation' বা বিরহ-আকুলতা একটা শ্রেষ্ঠরূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে—

খেলার সাথী, বিদায়দ্বার খোলো—
এবার বিদায় দাও।
গেল যে খেলার বেলা।
ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে
ভাঙিল রে সুখমেলা।

সাহানা দেবীর কণ্ঠে গ্রামফোন রেকর্ডে এই গানটি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ওই দীর্ঘশ্বাসিত ব্যথিত সুরমূর্ছনা জীবনে ভুলতে পারবেন না। রবীন্দ্রসংগীত ঠিক কীভাবে গাওয়া উচিত তা সাহানা দেবী বা দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রজ্ঞাবতী ও প্রজ্ঞাবানেরা জানতেন। বিস্ময়ের কথা এই আশ্চর্য সুন্দর গানটির কোনো স্বরলিপি এখনো স্বরবিতানের কোনো খণ্ডে ধৃতনিবদ্ধ হয়নি। আলোচ্য রাগভিত্তিক সংগীতটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'মহারাজা, কেওয়ারিয়া খোলো' নামক হিন্দুস্থানী গান ভেঙে। প্রাসঙ্গিকভাবে জানাই এই গানটির স্বরলিপি সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতী পত্রিকায়

II সা-সা-রা-। সরা-গমা মা-।-। মা ঃ ধপাঃ পা-। মা-গা-ঃ-মঃ
খে লা র ০ সা০ ০০ থি০০০ বি ০ ০০ দা য় দ্বা ০ ০ র্
রগা -রমা-। সা সনা-। নসা রা-।-। নসা-রগা-সসগাঃ গঃ সা না সা-।-।
খো০ ০০০ ০ লো০০ গেল যে০০ খে০ ০০ ০০০ ০ ০ লার বেলা০০

ইত্যাদি।

আগেই বলেছি রবীন্দ্রসংগীত একইসঙ্গে ভালো কবিতা রূপে পাঠে পরম উপভোগ্য ও শ্রুতিরূপে শ্রবণসুভগ এবং এর সঙ্গে বাংলাসাহিত্যে একমাত্র প্রাক্ তুলনা বৈষ্ণবপদাবলী। 'খেলার সাথী'-তে বিচ্ছেদের যে দুঃখদীপ্ত দহন মানুষের আত্মার কাছে কান্নার ডালি নিয়ে এসেছে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে স্থাপিত হতে পারে এমন একটি বৈষ্ণবপদ উপহার দিচ্ছি। পদটি মাথুর পর্যায়ের, রচয়িতা অনন্য বিদ্যাপতি—

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতিমালা।।
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি।।
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস
সুখ গেও পিয়াসঙ্গ সুখ হাম পাশ।।

রোমান্টিক কল্পনার মধ্যে স্বপ্ন ও রহস্যময়তার বিশেষ স্থান আছে। কবিরা সকলেই স্বপ্ন বুনন করেছেন কারণ তাঁরা জেনেছেন—স্বপ্ন শুধু সত্য, আর সত্য কিছু নয়। কিন্তু আকাশনিলয়া এক স্বপ্নপ্রতিমা রচনায় তিলে তিলে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার পর কবিরা এক বিষম দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। এই স্বপ্নকে কী করে তাঁরা বাস্তবতা দেবেন এই চিন্তা তাঁদের আচ্ছন্ন করেছে। নিজেরা জানেন ও গভীরভাবে বিশ্বাস করেন তাঁদের এই স্বপ্নবৎ নির্মিতির মূল, তাঁদের কবিতার ও বিশ্বঅতিক্রমী জীবনভাবনার শিকড় এই মাটির পৃথিবীতেই রয়েছে। এই মর্তপৃথিবীর নানা তুচ্ছ ও অতুচ্ছ রূপের ধ্যানে রোমান্টিক কবিরা সতত সোচ্চার। 'ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে', (রবীন্দ্রনাথ), 'জোনাকি, ও জোনাকি, কি সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ' (রবীন্দ্রনাথ) 'To me the meanest flower that blows can give/ Thoughts that do often lies too deep for tears' (Wordsworth) ইত্যাদি কথাবার্তায় তার প্রমাণ রয়েছে। এরই বিপরীতে রয়েছে কল্পনাবাহিত হয়ে কবি ও তাঁদের সৃজিত সৌন্দর্যের আকাশে মাথা তোলার অভিযান।

রোমান্টিক কল্পনার মধ্যে স্বপ্ন ও রহস্যময়তার বিশেষ স্থান আছে। কবিরা সকলেই স্বপ্ন বুনন করেছেন কারণ তাঁরা জেনেছেন—স্বপ্ন শুধু সত্য, আর সত্য কিছু নয়।

জন কিটস তাঁর একটি বিখ্যাত চিঠিতে কল্পনাকে প্রথম মানুষ আদমের স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'Imagination may be compared to Adam's dream–he awoke and found it truth' (to Bailey, 22nd November 1817)। কল্পনা যেন আদমের স্বপ্ন—সে জেগে উঠল দেখল তার স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে। কল্পনা ও তাঁর অতুলনীয় প্রতিবিম্বন মানবজীবন ও তার পুনরাবৃত্ত অন্তর্লীন বা আত্মিক চিন্তাসমূহের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। আদম স্বপ্ন দেখেছিল, এই স্বপ্নে কোনো বেদনার অনুভব ছিল না, তার বুকের থেকে একখানা পাঁজর নিয়ে ঈশ্বর ইভ অর্থাৎ প্রথম মানবীকে সৃষ্টি করছেন। যখন সে জাগল তখন দেখল ইভ সত্যিই তার অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত এবং স্বপ্নে তাকে যেমন সুন্দর দেখা গিয়েছিল সে অবিকল তেমনি। মিলটন তাঁর Paradise Lost অষ্টম খণ্ডে এই বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তারও আগে মিচেল্যাঞ্জেলো সিসটিন চ্যানেলে তাঁর শিল্পকার্যে ফুটিয়ে তুলেছেন আদমের জন্ম। এই স্বপ্ন ও হৃদয়পাঁজর ভেঙে রঙ্গময়ী কল্পনার মানসপ্রতিমার নির্মাণ ও কবিমানসের ঊর্ধ্বচারী অধিযাত্রার বর্ণনা পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার গানে—
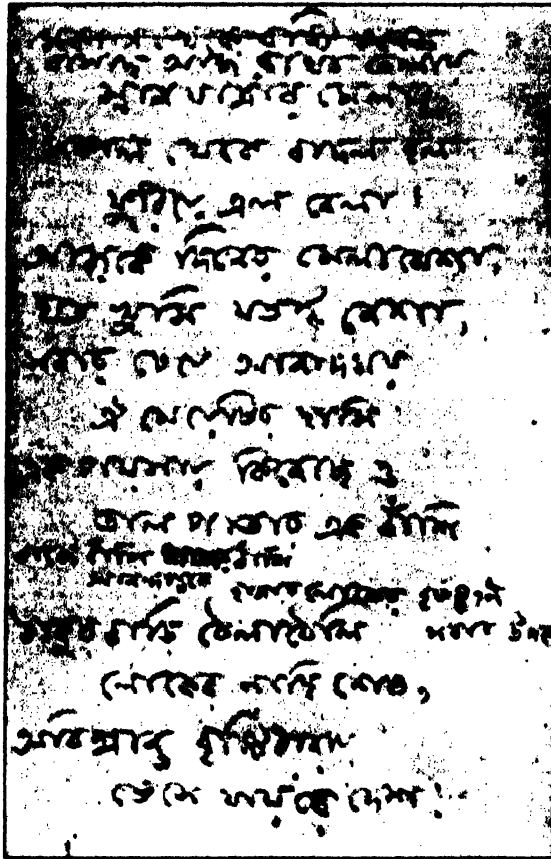
আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আমার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে।...

মানসের এই হতাশ বেদনাবোধ রোমান্টিকের নিয়তি, তবু স্বপ্নবুননের হাত এড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ একমাত্র এ পথেই যুক্তিবর্জিত কল্পনার স্বচ্ছ নাভিমূল দেখা যায়।

রোমান্টিক কবির ভিতরে ভিতরে একটা ছুটির তত্ত্ব কাজ করে। তিনি এই দৈনন্দিন কোলাহলময় দ্রুত ধাবমান জীবন থেকে বিদায় নিয়ে সৌন্দর্যের সুদূর নন্দনলোকে প্রস্থান করেন। এই সৌন্দর্যজগৎটি অবশ্য তাঁরই নির্মিত। সেখানে কল্পনার অযুত আধিপত্য তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। মূল কথা সৌন্দর্যরচনা করতে হ'লে বহিরঙ্গে এক অদ্ভুত অলসতাকে বরণ করে নিতে হবে, প্রাত্যহিকের 'ঘূর্ণাচক্র জনতাসঙ্ঘ'তে 'সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে' নামলে চলবে না। উক্ত বাক্যখণ্ডগুলি রবীন্দ্রনাথেরই। শেলি তাঁর Defence of Poetry-তে লিখেছিলেন, 'But poetry defeats the curse which binds us to be subjected to the accident of surrounding impressions'. পারিপার্শ্বিকে বন্দী হয়ে থাকার অভিশাপ থেকে কবিতা আমাদের মুক্ত করে। কবিতা আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় মুক্তির জগতে ছুটির জগতে ; সেখানে রূপের আর্দ্র বাষ্প ঘিরে ধরে সত্তাকে, সবকিছু হয়ে ওঠে নিঃশ্বাসময় ও লাবণ্যময়, জন্ম হয় সহমর্মিতার। পরিচিত পৃথিবীর চেনার-ঘোমটা খুলে খসে পড়ে, নগ্ন তন্দ্রার্পিত সৌন্দর্যকে বাধাহীনভাবে দেখা যায়, তার অবয়বের সুকুমার পরিমণ্ডল বা আত্মার দর্শন তখনই হয়। বাস্তবের অত্যাচারের হাত এড়িয়ে কল্পনার সতেজ জগতে ছুটির প্রার্থিত পরিমণ্ডলে প্রস্থান খুঁজে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের একটি গানের বিষয় হয়েছে—

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে
তখন ছিলেম বহুদূরে কিসের অন্বেষণে।
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে।

এখানে সৌন্দর্য অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা এবং তাকে হারিয়ে ফেলার বেদনা দুইই বর্ণিত। ছুটি ও কাজের দ্বন্দ্বের কথা এবং রোমান্টিক কবিহৃদয়ের চিরন্তন অন্তর্দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতও রয়েছে। বাস্তব ও কল্পনার সমীকরণের দুঃসাধ্যসাধনের প্রক্রিয়ায় ক্লান্তির জন্ম হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ও তার সমাধানের প্রয়াস পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। 'সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত / তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত / সারাদিন

সৌন্দর্যরচনা করতে হ'লে বহিরঙ্গে এক অদ্ভুত অলসতাকে বরণ করে নিতে হবে, প্রাত্যহিকের 'ঘূর্ণাচক্র জনতাসঙ্ঘ'তে 'সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে' নামলে চলবে না।

বাজাইলি বাঁশি'—রোমান্টিকের এই আত্মজীবনী শুধু কথার কথা নয় ; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক আনন্দ ও অনুতাপ, সুখ ও দুঃখ, হাসি ও দীর্ঘশ্বাস। রোমান্টিকের এই আত্মভাবনাকে 'escapism' বা 'পলায়নবাদ' আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখলে তা একটা বিরাট ভ্রান্তি বলেই পরিগণ্য হবে।

কবি যে বসন্ত-সংগীত রচনা করেছেন সেখানে তিনি জীবনের জন্য আদর্শের জন্য সৌন্দর্যের জন্য নবউদ্ভিন্ন জীবনবিকাশের অধীশ্বরের জন্য কোনো প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ রাখতে চাননি। সন্তোষকুমার সেনগুপ্তর কণ্ঠে এই অপূর্ব গানটি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান—

বাকি আমি রাখব না কিছুই—
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই।

এই গানটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে এক অনবদ্য রোমান্টিক আকুলতা, এই যে আপনাকে নিঃসম্বল উজাড় করে দেওয়ার বাসনা, বনভূমির ঋতুরাজ বসন্তের প্রতি আত্মনিবেদনের সংকেতে যার প্রকাশ তার ভিতর রোমান্টিক কবির সাহস, জীবনতৃষ্ণা এবং দুঃসাধ্য-সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাই দেখতে পাচ্ছি। প্রথম বাক্যটিতেই সব কথা বলা হয়ে গেছে। এ যেন কবি বর্ণিত 'Desire of the moth for the star', মথ ও জোনাকির নক্ষত্রের জন্য অনন্তপিপাসা অথবা এমার্সন তাঁর 'Self-Reliance' প্রবন্ধে যেমন বলেছিলেন, আমাদের নিজেদেরই চরম ও নিঃশেষরূপে চেষ্টারত হতে হবে, কর্মের উদারভূমিতে আত্মদান করতে হবে—সেই বক্তব্যেরই পুনর্নির্মাণ।

'But to the Man of Imagination. Nature is Imagination itself" (William Blake : পত্র), '... all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings' (William Wordsworth : Preface to Lyrical Ballads) ; 'The Secondary Imagination .....It disolves, diffuses, dissipates, in order to recreate ; or where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles to idealize and to unify.' (Biographia hiteraria ; Ch XIII ; Samuel Taylor Coleridge) ; 'I am certain of nothing but of the holiness of the Heart's affections and the truth of Imagination' (John Keats ; Letters to Benjamin Bailey) ; 'Man is an instrument over which a series of external and internal impressions are driven, like the alterations of an everchanging wind over an Aeolian lyre, which move it by their motion to everchanging melody.' (A Defence of Poetry : Percy Bysshe Shelley) ;–'A poem is the very image of life expressed in its eternal truths' (ওই) ;—কল্পনাশক্তিযুক্ত মানুষের কাছে প্রকৃতি স্বয়ং কল্পনা (ব্লেক) ; সব ভালো কবিতাই শক্তিশালী আবেগ-অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ (ওয়ার্ডসওয়ার্থ) ; এই কল্পনা ভেঙেচুরে গলিয়েবাঁকিয়ে ছড়িয়েমিশিয়ে নতুন করে সৃজন করে : অথবা যেখানে তা সম্ভব নয়, আদর্শায়িত করবার জন্য ঐক্যসুষমা আনবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে (কোলরিজ) ; হৃদয়ের ভালোবাসার মধ্যে যে পবিত্রতা আছে, কল্পনার মধ্যে যে সত্য আছে আমি শুধু তাকেই জানি (কিটস) ; মানুষ যেন এক গ্রিসদেশের গীতিময়ী বীণা, তার চিত্তের তারে তারে সব বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপসৌন্দর্যের ছাপ উচ্ছল বাতাসের মতো বহে যায়, সে তখন বেজে ওঠে নতুন নতুন সতত পরিবর্তনশীল ছন্দে গানে (শেলি)—এইসব মহাবাক্যে রোমান্টিক কবিতার যে প্রাণ-ধর্ম নির্দেশিত হয়েছে গীতবিতানের গানে গানে, কবিতা থেকে কবিতায় তার সম্প্রসারণ আছে।

কল্পনার অধীশ্বর রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, 'গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন ? কেননা গানের সুরের আলোকে এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারি নে। নিত্য অভ্যাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যালোকে আমাদের নিয়ে যায়—সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখেনি।' (তথ্য ও সত্য ; সাহিত্যের পথে)। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সুর' বলেছেন তারই নাম কল্পনা—দ্যুলোকভূলোক সঞ্চারিণী অঘটনপটিয়সী সেই প্রতিভাশক্তি যা কবির আত্মা, কবির জীবন। গান তাই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয়, গীতরচনা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। যখন দৈনন্দিন সুরের পাখায় ভর করে স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, জীবনের অর্থ বদলে যায়। গীতবিতানের অজস্র মূল্যবান গানগুলি তাই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলির এক হিসেবে কেন্দ্র হয়েই বিরাজ করছে। তাদের visual বা চাক্ষুষরূপ দেখে ও পাঠ

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সুর' বলেছেন তারই নাম কল্পনা—দ্যুলোকভূলোক সঞ্চারিণী অঘটনপটিয়সী সেই প্রতিভাশক্তি যা কবির আত্মা, কবির জীবন।

করে আমরা কাব্যরসিকেরা সহজেই পরিতৃপ্ত হতে পারি। তা ছাড়া বহু গান জীবনের শুরু থেকেই ক্রমাগত শুনে শুনে আমাদের কানের ভিতর সুরেতালে এমনভাবে বসে গেছে যে অন্তত রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে আমাদের গান থেকে কবিতায়, কবিতা থেকে গানে অবিরাম যাওয়া আসা সহজেই হয়ে থাকে। যে জীবনে কখনো সুরের সাধনা করার মাহেন্দ্রক্ষণ পায়নি, সে-ও অন্তত শূন্যহাতে ফিরবে না।

সুরের ইন্দ্রপাল জগৎ ও জীবনকে পালটে দেয়। আমাদের মানসে কল্পনার দিব্য আবির্ভাব ঘটে এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিবন্ধে যেমন বলেছেন 'পূজা' পর্যায়ের একটি গানেও তেমনি আগাগোড়া নিখুঁত করে বলেছেন—

> গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
> তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।

রোমান্টিকের কাছে প্রকৃতি জীবন্ত মানবিক সত্তা, প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃতিই হাত ধরে আমাদের জীবনরহস্যের অন্তঃপুরে নিয়ে যায়। যদি সবুজ গাছপালা-আকাশ-মাটি-জল না থাকত মানুষ তাহলে কী করে বাঁচত, তার চির অস্থির হৃদয়কে বুকে চেপে কে শান্ত করে রাখত, কে দিত তার সমস্ত ভালোবাসার স্থিরাশ্রয় ? ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ সবাই তাই প্রকৃতিসৌন্দর্যের একনিষ্ঠ স্তবকার। বাউল সুরে রচিত আমাদের সকলেরই খুব প্রিয় একটি গানে—যা সবচেয়ে শুনতে ভালো লাগে রবীন্দ্রসংগীতের রাজাবাউল শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে—রয়েছে প্রকৃতির সেই মধুশীতল 'pastoral' বা রাখালিয়া গীতি গোপগাথা—

> গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
> ও রে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধূলায় রে।
> ও যে আমায় ঘরের বাহির করে পায়ে পায়ে পায়ে ধরে
> ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে যায় রে কোন চুলায় রে।
> ও যে কোন বাঁকে কি ধন দেখাবে কোনখানে কী দায় ঠেকাবে
> কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবেই না কুলায় রে।

বিশ্বসংগীতের যদি একটি নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হয় তবে রবীন্দ্রনাথ সেখানে সেরাদের মধ্যে স্থান পাবেন।

বিশ্বসংগীতের যদি একটি নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হয় তবে রবীন্দ্রনাথ সেখানে সেরাদের মধ্যে স্থান পাবেন। বিটোফেন, বাখ, মোজার্ট, ব্রামস, শুবার্ট, শুমান, চাইকোভস্কি, হ্বাগনার প্রমুখের পৃথিবীর অমর সুরকার সংগীতবিদদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সাধনার তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়সে প্রথম ইয়োরোপ যান এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর ইয়োরোপের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীব্যক্তিত্ব হিসাবে ক্রমবর্ধমান হয়। পাশ্চাত্যসংগীত তিনি শুধু শোনেননি সে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিয়ানো বাজাতেন এবং রবীন্দ্রনাথ পিয়ানোর সুর ভেঙে কথা বসিয়ে গান রচনা করতেন। তিনি যখন ইংল্যান্ডে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আবাসে এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সান্নিধ্যে তখন টমাস মুর-রচিত 'আইরিশ মেলোডিজ'-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। 'Irish Melodies' থেকে প্রেরণা পেয়ে 'Won't you kiss me, Molly dear', 'Let us go to the garden, Maud' ইত্যাদি গানের আদর্শে পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে কবি তাঁর বিখ্যাত 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার চরণচিহ্ন', 'প্রাণে খুশীর তুফান উঠেছে', ইত্যাদি গানগুলি রচনা করেছিলেন। এসব শিল্পকর্মে রোমান্টিক কবিতার সাংগীতিকরূপই ফুটে উঠেছিল। ইয়োরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলছেন, 'কিন্তু আমি যখন য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি, তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক—ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে।'

রোমান্টিসিজমের মধ্যে রয়েছে বিবিধ উপাদান। রুশো এর অন্যতম উদ্গাতা, সমাজে নতুন নতুন প্রবণতার উদয়ের সময়ে এর আবির্ভাব। মানুষের মনে শুধু উদ্বেগ বাড়েনি, বেড়েছে আশা ও প্রত্যাশা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল প্রতিদিনের জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বর্ধিত ইচ্ছা। এর একটি প্রকাশ ঘটল প্রকৃতির প্রতি উৎসাহিত ভালোবাসায়, আর একটি প্রকাশ ঘটল সুদূর স্থান ও সুদূর সময় অর্থাৎ অতীতের প্রতি আকর্ষণে। কবিরা আশ্রয় নিলেন কল্পনার জগতে—তা মূলত তাঁদের হৃদয়ের গভীরতম বিশ্বাসের জগৎ। স্বদেশপ্রেম, দেশমৃত্তিকার প্রতি হয়ে উঠল রোমান্টিকতার এক বিশিষ্ট লক্ষণ। রোমান্টিক সুরস্রষ্টা সংগীতস্রষ্টা নিজেকে মনে করলেন সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ—মানুষের হয়ে মানুষের জন্যই তিনি সুর ও গান রচনা করছেন ; সমাজকে মনে হল তাঁর সৃজনপ্রতিভার মুক্তবিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। 'It is not surprising that this was above all an age of poetry. And in the mutual interaction of poetry and music, poetry was 'musicalised' in the search for new rhythamic and sound effects, while on the

other hand music became poetic." (Music through the Ages; The World of Music. Vol. 2.). আশ্চর্যের কথা নয় এ যুগ ছিল কবিতার যুগ, সবার আগে। কবিতা ও গানের মধ্যে গড়ে উঠল সহজ আদানপ্রদান। নতুন ছন্দ ও ধ্বনির প্রয়োজনে কবিতার সংগীতিকরণ ঘটল, অন্যদিকে গান হয়ে উঠল কাব্যিক। রোমান্টিক সুরস্রষ্টা হয়ে উঠলেন মূলত স্বরবিদ কবি। গান এবং অপেরাসংগীত বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কথা ও কবিতাকে অপরিহার্য বলে বরণ করে নিয়েছিল। সুরস্রষ্টারা আবার সাহিত্যের কাছে সমর্থন চাইলেন তাঁদের অর্গান অথবা পিয়ানোয় লিরিক মূর্ছনা অথবা সিম্ফনিসম্ভার ঘনীভূত করে তুলবার জন্য।

রবীন্দ্রসংগীতকে অবশ্যই বলা যেতে পারে কবিতার সংগীতিকরণ এবং সে কবিতা মূলত রোমান্টিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে বিশেষত তাঁর শ্যামা-চিত্রাঙ্গদা-শাপমোচন-তাসের দেশ প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের সঙ্গে হ্বাগনার (Wagner)-এর অপেরার কিছু মিল দেখা যায়। অনুমান করি জীবনের নানাসময়ে ইয়োরোপে অবস্থানকালে হ্বাগনারের 'তানহাউজের' (Tannhauser) প্রভৃতি অপেরা-র সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল। রিচার্ড হ্বাগনার জার্মান সংগীতবিদ, ১৮১৩ সালে লিপজিগে তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৮৮৩ সালে ভেনিসে। তিনি যে শিল্পকর্ম তৈরি করেছিলেন সেখানে নাট্যাভিনয়, নৃত্য, গান, কথা, যন্ত্রসংগীত সব সুন্দরভাবে মিলেমিশে গেছে। 'তানহাউজের' রচনার পরবর্তী সময়ে জুরিখে থাকাকালে হ্বাগনার নিজের সৃষ্টিকে 'new form of dramatic music.' 'নাট্যসংগীতের নব অবয়ব' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অপরাপর উল্লেখ্য গীতিআলেখ্য হচ্ছে Lohengrin, Tristan and Isolde ইত্যাদি। হ্বাগনারের এইসব অপেরার মতো রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি শিল্পসৃষ্টিকে অবশ্যই 'নাট্যসংগীতের নব অবয়ব' বলা যায় এবং এদের মধ্যে নৃত্য-গান-কথা-যন্ত্রসংগীত প্রভৃতির অনায়াস সহাবস্থানও লক্ষ করবার মতো। বস্তুত রোমান্টিকদের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল সর্বশিল্পের মধ্যে সমন্বয় ও আদানপ্রদানের পথ আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথের আর সব গানে যেমন ঘটেছে, তাঁর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে শুরু করে 'তাসের দেশ' প্রভৃতি গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যগুলিতেও তেমনই কবিতার সংগীতিকরণ পরিপূর্ণভাবেই ঘটেছে। সর্বাত্মক শিল্পের এমন রূপ সত্যিই মেলা ভার। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হিসেবে তাসের দেশের রাজপুত্রের গান কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

হেরো, সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্ত নামে
ঝিলিক মারে মেঘে। ইত্যাদি

একটা জিনিস লক্ষণীয় কবিতা দিয়ে এই যে গান তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে রোমান্টিকের দৈনন্দিন জীবন থেকে অব্যাহতি লাভের স্বপ্ন ও সুদূরের প্রতি আকর্ষণ অথবা দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি প্রাণের টান প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

রোমান্টিক কল্পনার একটা মূল কথাই হচ্ছে চির অশান্ত, চির অস্থির, নতুনের প্রত্যাশায় চির বুভুক্ষু কবিহৃদয়ের নিরন্তর বিশ্বপরিক্রমা ও স্থানান্তর যাত্রার আবেগ। শেলির 'স্কাইলার্ক' এই মৃত্যুহীন জীবনতৃষ্ণারই কাব্যপ্রতীক

Higher still and higher
From the earth thou springest
Like a cloud of fire,
The blue deep thou wingest,
And singest still dost soar,
and soaring ever singest
(*To a skylark*)

এই অগ্নিবিহঙ্গ ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে চলে যায়, তার সুরেলা কণ্ঠে স্থানান্তর যাত্রার আবেগই ধ্বনিত। এই পাখির সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন একটি পাখিকে রবীন্দ্রকাব্যে দেখছি ; হ্যাঁ, আমি তার 'বলাকা' কবিতাটির কথাই বলছি—

শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন পার হতে কোন পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে' :

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে একটি কবিতা কীভাবে গান হয়ে যায় তার উদাহরণ হিসেবে প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষার একটি গান আনুপূর্বিক তুলছি। এখানেও সেই রোমান্টিক আত্মের ভ্রমণপিপাসা কিন্তু প্রকাশটি মুক্তানিটোল স্বল্প-আয়তনিক—

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি !
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি
ওই গাঁথি গাঁথি।।
সুদূরের বীণার স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—

রোমান্টিক কল্পনার একটা মূল কথাই হচ্ছে চির অশান্ত, চির অস্থির, নতুনের প্রত্যাশায় চির বুভুক্ষু কবিহৃদয়ের নিরন্তর বিশ্বপরিক্রমা ও স্থানান্তর যাত্রার আবেগ।
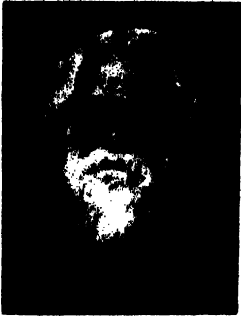
সে কোন উধাও হাওয়ার পাগলামিতে
পাখা ওদের উঠল মাতি।
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের পিছন পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা—
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন
মনোহরণ আঁধার রাতি।

পরিশেষে আরও একটি-দুটি কথা। রোমান্টিক কল্পনায় পৃথিবী ও প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণশীল এক ঐশী শক্তিকে বারবার দেখা গেছে। রোমান্টিকেরা সৃজনের মুহূর্তে নিজেদের ঈশ্বরতুল্য অমরত্বের অধিকারী মনে করেছেন, কল্পনার দূতিয়ালিতেই যেন মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগসাধন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলিতে আমরা রোমান্টিকের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য সম্পর্কিত সচেতনতার পরিচয় পাচ্ছি। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' (গীতাঞ্জলি) প্রভৃতি গান এখানে খুবই স্মরণযোগ্য। রোমান্টিকদের কাছে স্বদেশও সবসময় একটা বড়ো বাণীমূর্তি হয়ে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলি পড়লে এই সত্য ধরা পড়ে। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা / তোমাতে বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা'—কবির স্বদেশচেতনার মধ্যে যে উদার আন্তর্জাতিকতা আছে তাকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

অনেকে আছেন যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত শুনে যেমন আনন্দ পান, পাশাপাশি ইংরেজি গান শুনেও আনন্দ পান। তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন অনেক ইংরেজি গানে শুধু মেলোডির প্রাধান্য নেই পাশাপাশি কথারও প্রাধান্য আছে—সে সব গান মূলত বেশ ভালো লিরিক বা কবিতা। রবীন্দ্রসংগীতের মতোই সেখানে কথা ও গানের সহাবস্থান। এই রকম একটি মধুর রোমান্টিক গান যা বহুশ্রুত মনে পড়ছে। গায়িকা Lynn Anderson, গানটির প্রথম পংক্তি 'I beg your pardon I never promised you a rose garden'— 'আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি কখনো প্রতিজ্ঞা করিনি তোমাকে দেব গোলাপবাগান'—প্রেমিকার এই উক্তি প্রেমকে কল্পনা দিয়ে রাঙিয়েই প্রকাশ করছে। 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের বহু গানের কথাপুঞ্জই মনে পড়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদক ও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে একবার বলেছিলেন, বিটলসদের গানের আবেদন অনেকটা যেন রবীন্দ্রসংগীতেরই মতো। এই উক্তিতে কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন কিন্তু কথাটা তিনি মন্দ বলেননি।

হৃদয়জয়িতার কারণে রবীন্দ্রনাথের গান আরও বহুদিন বাঙালিকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, বাংলা ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে রবীন্দ্ররুচি ও বাঙালির রুচি প্রায় সমার্থক থাকবে।

বস্তুত জন লেনন, ম্যাকার্টিনি, হ্যারিসন ও রিংগো-র গানের দলের কাছে সুরের পাশাপাশি কথাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং রাদিচে এ জন্যই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে বিটলস গানের তুলনা দিয়েছিলেন। বিটলসদের গান সতেজ সুন্দর, তার আবেদন শৈল্পিক এবং গানের lyricগুলো বেশির ভাগ লেনন ও ম্যাকার্টিনি লিখেছেন। এইসব লিরিক অবশ্যই কাব্যগুণসমৃদ্ধ। একটু নমুনা পেশ করছি।

It's been a hard day's night,
And I have been working like a dog,
It's been a hard day's night
I should be sleeping like a log,
But when I get home to you,
I find the thing that you do,
Will make me feel alright.

এই গানটির কথায় অবশ্য রোমান্টিকতার বদলে আধুনিক কবিতার ছোঁয়া লেগেছে। যাহোক মানবতাবাদী জন লেনন যখন আশ্চর্য সুন্দর সতেজ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন 'Give peace a chance' তখন আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'শান্ত হে মুক্ত হে হে অনন্তপুণ্য/ করুণাঘন ধরণীতল কর কলংকশূন্য'—এবম্বিধ বাণীই মনে পড়ে যায়।

উপসংহারে শেষ কথা হিসেবে এটুকু বলতে পারি হৃদয়জয়িতার কারণে রবীন্দ্রনাথের গান আরও বহুদিন বাঙালিকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, বাংলা ভাষা ইত্যাদি ব্যাপারে রবীন্দ্ররুচি ও বাঙালির রুচি প্রায় সমার্থক থাকবে। কোনও জনবিরল স্থানে নির্বাসনে যেতে হলে শুধু গীতবিতান সঙ্গে নিতে পারলে অন্তত কবিতা পড়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, কবিতাকল্পনালতা পাশেই বিরাজ করবে। কৃতজ্ঞতা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে।

তথ্যনির্দেশ :

গীতবিতান—২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী
রবীন্দ্ররচনাবলী—৪র্থ খণ্ড, গান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সাহিত্য, সাহিত্যের পথে : রবীন্দ্রনাথ
A Companion to Romanticism : Blackwell Edition
সঞ্চয়িতা : রবীন্দ্রনাথ
English Literary Criticism—Romantic and Victorian. Ed. by Hoffman and Hynes.
The World of Music, Vol. 2.
The Beatles Lyrics : Warner Books.
Rose Garden Lyrics : Linn Anderson ; Internet থেকে সংগ্রহ
The Golden Treasury ; ed. by Francis T. Palgrave.

লেখক পরিচিতি : কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক

র • বী • ন্দ্র • স • ং • গী • ত

সংবেদনার শীর্ষবিন্দু রবীন্দ্রগান

কৃষ্ণা বসু

রবীন্দ্রসাহিত্যের সিংহভাগ অধিকার করে আছেন প্রকৃতি। প্রকৃতি তার অমোঘ, অনতিক্রম্য, অব্যর্থ ভূমিকাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃজন-ভুবনে সমুপস্থিত। খুব ছোটবেলার থেকেই প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর স্পর্শকাতর তীব্র অনুভূতিশীল মনটির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাঁর বহু রচনায়, বিশেষত 'জীবনস্মৃতি'তে। 'জীবন স্মৃতি'-র 'বাহিরে যাত্রা' অংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্ব জন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটা কয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার সেই জোয়ার ভাঁটার আসা যাওয়া, সেই কত রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণ বক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোধিত প্লাবন। এক একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে ; ওপারের গাছপালাগুলি কালো ; নদীর উপর কালো ছায়া ; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে ; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলির মধ্যে যা খুশি তাই করিয়া বেড়ায়।'

'জীবনস্মৃতি'র এই আশ্চর্য উচ্চারণগুলি একটি অনুভূতিশীল, কল্পনাপ্রবণ শিশু মনের ওপর প্রকৃতির প্রতিফলনের শব্দাবলি,—এই বালকটিই যে পরে একজন সুগভীর প্রকৃতি-প্রেমিক, আদ্যন্ত প্রকৃতি-সচেতন রূপদক্ষ শিল্পী হয়ে উঠবেন,—তারই পরিচয় ধরা রয়েছে এর ছত্রে ছত্রে।

আমাদের মতো মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত সংবেদনশীল বাঙালিদের নান্দনিক বোধের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান

এক পরম প্রাপ্তি, এক দুরন্ত আকর্ষণের বস্তু। আমাদের প্রকৃতি-বোধ, প্রকৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ ভালো লাগা, প্রতিক্রিয়া,—সবই এসেছে রবীন্দ্রনাথের গানের হাত ধরে। যখন নিবিড় আঁধার রাত্রে বর্ষণধারা নেমে আসে আকাশ থেকে তখন সেই বৃষ্টি-শ্রুতি-ধন্য সময়টুকুতে

● প্রতিদিন গঙ্গার সেই জোয়ার ভাঁটার আসা যাওয়া, সেই কত রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণ বক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোধিত প্লাবন।

তাঁর 'সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা'র অনুষঙ্গ কি আমাদের মনে পড়ে না? শরৎকালের শারদোৎসবের স্মৃতিমেদুর মুহূর্তে কি 'এসো শরতের অমল আলোর মহিমা'—আমাদের অনুভূতিকে ভালোলাগায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে তোলে না? আমাদের সমস্ত ঋতু সম্পর্কিত অনুভব ও উপলব্ধি রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গ ও স্মৃতিতে ভরা,—একথা অস্বীকার করবে কে? গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত পর্যন্ত ছয়টি ঋতুর যে বৈচিত্র্য বিস্তার ও বিস্ফার, তার অনুপুঙ্খ সংবেদনা কে শেখাল আমাদের—রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া? স্পর্শকাতর এবং ক্ষণস্থায়ী যে ঋতু, 'বসন্ত' তাকে কেন্দ্র করেও কত অপরূপ গানই না বিস্তারিত হয়েছে গীতবিতানের পাতায় পাতায়! যখন রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনের কাজে পূর্ববঙ্গে পতিসরে, শিলাইদহে, পদ্মা নদীর হাউসবোটে বাস করছেন, তখন খুব সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্রকৃতি তার উদার, বিস্তৃত, স্নেহশীল লেখাটিতে কবিকে ধারণ করেছিল। এই সময়ই ফলবান হয়ে উঠেছিল ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্র'-এ অপরূপ পত্রাবলি। তাঁর আশৈশব প্রকৃতি-প্রেমিক সত্তাটি তাঁর সমগ্র রচনার, তাঁর অধিকাংশ সংগীতের মূল প্রেরণাস্বরূপ। ছিন্নপত্র'-এর ১০ সংখ্যক চিঠিটিতে প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুভবের উচ্চারণ, আসুন পাঠক অনুসরণ করি,—'সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চারদিক অস্পষ্ট হয়ে আসে.... পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জমিয়ে দেয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারী একটা অবাস্তবিক মরীচিকা জগতের মতো বোধ হয়।' প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর অতিসূক্ষ্ম স্পর্শকাতর অনুভূতি ছিন্নপত্রের মতোই তাঁর অজস্র গানে অসংখ্য কবিতায় কতবার বারে বারে যে উদ্ভাসিত উচ্চারিত হয়েছে, তা আর বলে শেষ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় একটি বই ছিল কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যটি। সেখানে বর্ষাক্রান্ত অতীত ভারতের যে মোহময় ছবিগুলি আমরা পেয়ে যাই, তার একটা পরম্পরা তাঁর উপলব্ধির মধ্যে সজীব ও চিরপ্রবাহিত ছিল সারাজীবন। আমাদের কোনো অনুভূতিই আমাদের পরম্পরা বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় পুরোপুরি। প্রকৃতি সম্পর্কে যে সংবেদনা তাও এই উত্তরাধিকার ও পরম্পরাবোধ থেকেই এসেছে তাঁর গানে, তাঁর অনুভবী শিল্পাবলিতে। নিবিড় বর্ষার দিনটিতে তিনি যে প্রিয় সহচরীকে ডেকে বলেন—'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে।। / দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ— / কাজলনয়নে, যূথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।।' —তখন একথা কি বলে দেবার দরকার হয় যে কোনো আধুনিকা সহচরীর, সখীর জন্য এই বর্ষামন্দ্রিত আহ্বান বাক্য উচ্চারিত হয়নি, হয়েছে সেই অতীত ভারতের স্বপ্ন-সহচরীর জন্য। যিনি যূথীমালা গলে নীপবনে ছায়াবীথিতলে এসে বর্ষার মিলনে মিলিত হতেন। আমরা তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের গানে গানে এই পরম্পরা বোধকে খুঁজে পাব পর্যাপ্ত পরিমাণেই। যখন সুর ও শব্দের আশ্চর্য সমবায়ে আমাদের শ্রুতিধন্যকারী এই গান বাজে—'বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে, / কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে।। / যে মিলনের মালাগুলি ধূলায় মিশে হল ধূলি / গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে।।/'—এই বহু যুগের ওপারে থেকে যে আষাঢ় নেমে আসে কবির মনে, মননে, মেধায়, মজ্জায়, সে তো সেই পরম্পরা-বাহিত ভালোলাগা, সুদূর অতীতের 'কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে'-র, আজকের সর্বপ্রধান কবির সংগীতমালা বর্ষাবন্দনার প্রকৃতি-গান। যখন অন্য একটি প্রকৃতি পর্যায়ের গানে বেজে উঠতে দেখি এইসব চরণমালা, তখন বুঝতে পারি কবির মগ্নচৈতন্য অধিকার করে রেখেছে অতীত ভারতের সেই উত্তরাধিকারের অনুস্মৃতি, 'না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে / মনের কথা শয়ন দ্বারে।/ না হয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে/নীরবে এসে। /না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে। / কেন গো মিছে জাগাবে ওরে।।/''—এইসব ছবি, চিত্রমালা শিথিলকেশে মালতীকলি অথবা ফুলের ডোরে রাখী পরানোর অনুষঙ্গ কি আমাদের পুরানোদিনের ভারতবর্ষের মাঝখানটিতে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় না?—প্রকৃতিতে পরম্পরাযুক্ত গানগুলি ভিন্ন মাত্রায় যোজিত হয়ে যায়।

কবি সুন্দরের পূজারি। এ সুন্দর অন্তর-ঐশ্বর্যে সুন্দর। চিত্ত-ঐশ্বর্যের এই সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে যায়, মিশে যায়। কবি যখন শরৎকালের আলোতে সেই সুন্দরকে, চিরসুন্দরকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর যে মনটি বারে বারে বলেছে, মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছে,—'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'—সেই

কবি সুন্দরের পূজারি। এ সুন্দর অন্তর-ঐশ্বর্যে সুন্দর। চিত্ত-ঐশ্বর্যের এই সৌন্দর্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে যায়, মিশে যায়।

সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ প্রকাশ, পরম প্রকাশই তো হয়ে উঠেছে তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলিই,—'শরতের আলোতে সুন্দর আসে, / ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে, / হৃদয়-কুঞ্জবনে মঞ্জুরিল মধুর শেফালিকা।।/' অথবা কোনো সংগীতে শুনেছি নয়ন-ভুলানো সেই সুন্দরের বন্দনা রব,—'আমার নয়ন-ভুলানো এলে, / আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে। / শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে / শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে / নয়ন-ভুলানো এলে।। /'—এটা যে সুন্দরের জন্য স্তব ও বন্দনা গান কবি গেয়ে চলেছেন গানে গানে,—এই সুন্দরের বোধটি আসছে তাঁর রোমান্টিক কবিস্বভাব থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ব্যক্তিত্বটি যে একজন রোমান্টিক কবি-ব্যক্তিত্ব এ কথা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে ? তিনি নিজেই বলেছেন,—'এ গলিতে বাস মোর তবু আমি জাত-রোমান্টিক / একথা মানিয়া লই রসতীর্থ পথের পথিক।'—এই রসের তীর্থ-পথের পথিক-কবিটি প্রকৃতি পর্যায়ের, তাঁর গানে গানে সেই রোমান্টিক কবি সত্তাকেই তো আরতি করলেন। সেই যে গেয়েছিলেন,—'দূরে কোথায় দূরে দূরে / যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে—' সেই সুদূর যে তাঁর গানে পাগল করা বাঁশির তানে জেগে উঠল—'ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি ?'—সেই আকুতি তো একজন যথার্থ রোমান্টিকেরই আকুতি ! এই যে প্রকৃতির ভিতরে হৃদয়ের জেগে ওঠা, এই যে সুরের জন্য মন কেমন করা,—এসবই রোমান্টিক শিল্পীটির লক্ষণে আক্রান্ত, যে রোমান্টিকের সত্তা ও শর্ত ধরা রয়েছে প্রকৃতি পর্যায়ের গানে গানে,—এমনকী পূজা-প্রেম পর্যায়ের গানের ভিতরেও। 'প্রেম'-পর্যায়ের গানেও তো দেখছি সেই প্রকৃতি চেতনারই প্রক্ষেপ এবং প্রসার, প্রেম বিষয়ক একটি গানে এরকম রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি,—'মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা / পল্লবে পল্লবে প্রলাপিত কলরবে / প্রজাপতির পাখা দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায় / উৎসব-আমন্ত্রণে।' অথবা অন্য গানে,—'বউ কথা কও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে যে সারা / আজি বিভোর রাতে।'—প্রেম ও প্রকৃতি কি একাকার হয়ে যায়নি এই স্মৃতি-ধার্য, শ্রুতি-ধার্য গানে ? রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো একজন শিল্পী, এত ব্যাপক ও বিস্তৃত, গভীর ও গহন যাঁর কল্পনাশক্তি ও অনুভূতিশীলতা, তিনি যে তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ যে গানে, সেই গানে প্রকৃতির মতো অমোঘ, চিরকালীন, অব্যর্থ শক্তিকে ধরবেন, প্রকাশ করবেন, প্রসারিত করবেন,—এটিই তো প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ঘটনা। এত বেশি প্রকৃতিসচেতন শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের মতো আর কে ?

রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো একজন শিল্পী, এত ব্যাপক ও বিস্তৃত, গভীর ও গহন যাঁর কল্পনাশক্তি ও অনুভূতিশীলতা, তিনি যে তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ যে গানে, সেই গানে প্রকৃতির মতো অমোঘ, চিরকালীন, অব্যর্থ শক্তিকে ধরবেন, প্রকাশ করবেন, প্রসারিত করবেন,—এটিই তো প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক ঘটনা।

শান্তিনিকেতনের শালবন—বসন্তে কচিপাতায় জেগে উঠেছে। ছবি : কাজল বিশ্বাস

মানুষের অনুভবের অন্যতম একটি সুকুমার দিক হল, অফুরান একটি দিক হল তার প্রেম। সেই প্রেম এবং প্রকৃতি রবীন্দ্রগানে বহু ক্ষেত্রে একাকার, অন্তর্লীন হয়ে গিয়েছে, একটির থেকে অন্যটিকে ভিন্ন করা যায় না কোনোমতেই। যখন বাসন্তিক আবেগে কবি বলছেন, 'আজও বকুল আপনহারা হায়রে ফুল ফোটানো হয়নি সারা / সাজি ভরেনি / পথিক ওগো, থাকো থাকো।' এই গানের বাসন্তিক আকুতিতে প্রথমেই তাঁর অনুনয়,—''না যেয়ো না। যেয়ো নাকো/ মিলন-পিয়াসী মোর-কথা রাখো কথা রাখো।'—তখন কি প্রকৃতি আর প্রেম অভিন্ন হয়ে ওঠে না আমাদের মর্মরিত হৃদিতলে—আমাদের মগ্নচৈতন্যের রহস্যালোকে? যখন কবি আহ্বান করছেন নবীন প্রেমিক হৃদয়কে, প্রকৃতির গানেই, 'পিছন-পানের বাঁধন হতে চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে, / আপনাকে আজ দখিন হওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে।। / ' তখন প্রকৃতির গানই অন্য মাত্রা পেয়ে যায়, নতুনতর তাৎপর্যে প্রসারিত হয়ে পড়বে তাই-ই। যখন আকুতি-ভরা উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে তুই কী এনেছিস বল?' তখন শ্রাবণ পূর্ণিমার প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির আর্তি কি একই সঙ্গে মিশে গিয়ে এক ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যায় না? রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি তাই শুধুমাত্র পটভূমিকা রূপেই থাকেনি, পটভূমিকার পরোক্ষ ভূমিকা থেকে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে উঠেছে। যখন পূর্ণচাঁদের অপরূপ মায়া আকাশ থেকে অনিঃশেষ ছড়িয়ে পড়ে এই চেনা পৃথিবীতে, যখন সেই পূর্ণ চাঁদের ইন্দ্রজালে অভিভূত হয়ে পড়ে সকল হৃদয়, তখন সেই গান,—'পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে'—তখন সেই গানে প্রেমাতুর হৃদয় এবং বসন্ত পূর্ণিমার চাঁদের প্রকৃতি একত্রিত হয়ে রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির তাৎপর্যকে বহু গুণে প্রসারিত করে দেয়।

মানুষের অনুভবের অন্যতম একটি সুকুমার দিক হল, অফুরান একটি দিক হল তার প্রেম। সেই প্রেম এবং প্রকৃতি রবীন্দ্রগানে বহু ক্ষেত্রে একাকার, অন্তর্লীন হয়ে গিয়েছে, একটির থেকে অন্যটিকে ভিন্ন করা যায় না কোনোমতেই।

প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলি মূলত ছয়টি ঋতুতে বিস্তারিত করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের এ গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত,—ছয়টি ঋতুই স্ব স্ব ধর্মে, চারিত্রে আলাদা; তাদের এই রূপ বিভাজন প্রকৃতি পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ যতখানি ধরেছেন, তেমন আর কোথাও পাইনি আমরা এবং এ কথাও অনিবার্যভাবেই সত্য যে আমাদের সমস্ত ঋতুভাবনাই রবীন্দ্রগানের অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে, সম্পৃক্ত হয়েই রয়েছে, তাদের আলাদা

করাই যায় না। কিন্তু ঋতু অনুষঙ্গের চেয়েও বড় এক বিশ্বপ্রকৃতি আছে, যা ব্যাপ্ত, যা অসীম, যা অনন্তের অভিসারীও বটে। সেই ব্যাপ্ত, বিশাল প্রকৃতি তার অনন্ত বিস্তারিত কোলটি প্রসারিত করে বসে রয়েছেন অনাদিকাল থেকে,—সেই বিরাট প্রকৃতিও তার চিরকালীন আবেদন নিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে যথাযথ তাৎপর্য ধরা পড়েছে, যখন আমরা শুনতে পাই — 'বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে / স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে / নদী-নদে গিরি-গুহা পারাবারে / নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত-মধুরিমা / নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।'—তখন এই গানের বিস্তারিক মহাকালিক সুচিরকালীন ব্যাপ্তিটিকে মর্মে মর্মে অনুভব করতেই পারি আমরা। তখন ঋতুতে বিভাজিত হয়ে প্রকৃতি দেখা দেয় না, সর্ব ঋতুর ঊর্ধ্বে চিরকালীন আবেদনে ধন্য হয় অন্তর তল, অন্দর দেশ।

নানা অপূর্ণতায়, নানা সংক্ষোভে, উপবাসে, তৃষ্ণায় অতৃপ্তিতে মানব জীবনখানি কাটে, কেটে যায় আমাদের। সেইসব অপূর্ণ, অতৃপ্তির, শূন্যতার মাঝে এক অনুচ্চারিত হাহা ঘুরে বেড়ায় অন্তরলোকে। সেই কষ্টের বেদনার থেকে পরিত্রাণ আমাদের কাছে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত-প্রকৃতির উপস্থিতি। প্রকৃতি যেন রবীন্দ্রসংগীতে উপস্থিত থেকে আমাদের উপবাসী অন্তরের অন্ন হয়ে আসে, আমাদের তৃষ্ণাতুর প্রাণের তৃষ্ণার জল হয়ে দেখা দেয়, আমাদের সংক্ষোভময় হৃদয়ের শুশ্রূষা হয়ে, শান্তি হয়ে আসে সেই গান, পরম গান, শিল্পের চরম, সংবেদনার শীর্ষবিন্দু রবীন্দ্রগান, রবীন্দ্রগানে প্রকৃতি, পরমাপ্রকৃতি। মানব প্রকৃতি আর বাহিরপ্রকৃতি পরস্পরের বন্ধুতার হাতটি ধরে তখনই।

লেখক পরিচিতি : কবি ও অধ্যাপক

র•বী•ন্দ্র•স•ং•গী•ত

'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ! বুঝিয়ে দে !!'
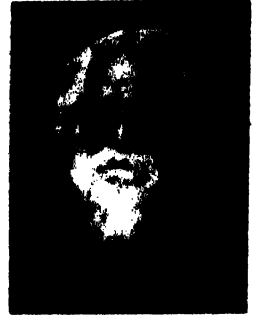
শাঁওলী মিত্র

রবীন্দ্রনাথের গান কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন আমাদের অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে, আমাদের বোধকে গভীরতর স্তরে নিয়ে চলে কখনো-কখনো। তাই আমাদের যে-কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর গান আমাদের পথ দেখায়। কথার কথা নয় এ বড়ো সত্য উপলব্ধি।

এ-কথা সত্যি—বাঙালি তার যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রসংগীতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শুধুই কি 'উৎসব-অনুষ্ঠান' ? সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের উদ্ধৃতি যেন অনিবার্য—নিত্যকার কথোপকথনেই। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙালির নাড়ির যোগ !

অবশ্য এ-সব ক্ষেত্রে অনেক সময়েই এমন ভুল উদ্ধৃতি ব্যবহার হয় যা যুগপৎ হাস্যকর এবং লজ্জার। আমার নিজের জীবনে এইরকম একটি অবিশ্বাস্য উদাহরণ আছে যা আজও ভুলতে পারি না। তখন আমি সবে অনার্স কোর্সে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি রবীন্দ্রভারতীতে। সেখানে ইংরেজি-বাংলা তো বটেই, ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃত কাব্যাংশ ও উপনিষদ অবশ্যপাঠ্য ছিল। আর সেই নিয়মটি আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল 'শিক্ষিত' হতে গেলে ইতিহাস এবং প্রাচীন কাব্য সম্পর্কে ধ্যানধারণা গড়ে নেওয়া সত্যিই তো খুব দরকার ! তা সে কথা যাক। একদিন আমাদের বাংলা কাব্যর ক্লাস নিচ্ছিলেন একজন নামী অধ্যাপক। বর্ষা ঋতু ! সেদিন কয়েকদিন বিরতি পর গরমের দুপুরে হঠাৎ মেঘ জমল আকাশে। আকাশ কালো করে এল ! অন্ধকার যেন সেই ভর দুপুরে ঝুপ করে নেমে এল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আনাচে-কানাচে। ছাত্রছাত্রীদের আর পড়ায় কখনো মন বসে ? সবাই জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় ! তারপর ছুটি চেয়ে বসে। অধ্যাপক সহাস্যে ও সস্নেহে বললেন,

বুঝতে পেরেছি। আর মন নেই পড়াতে ? তাই না ?—

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি।

বেশ টেনে টেনে কাব্য করে বললেন, সব ছাত্রছাত্রীরা ওই উদ্ধৃতি শুনে হেসে উঠল। অধ্যাপক ভাবলেন রসিকতাকে উপভোগ করেই এই হাসি ! সগর্বে ও সন্তুষ্ট চিত্তে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ! —অমন ঘন কালো অন্ধকারে রোদের হাসি তিনি যে কোথায় দেখতে পেলেন ! আসলে তাঁর অধিক মনযোগ ছিল 'আজ আমাদের ছুটি'-তে। বাকি পঙ্‌ক্তিগুলোর সঙ্গে সময়ের সঙ্গতি আছে কি না সে নিয়ে ভাববার প্রয়োজন বোধ করেন নি ! কিন্তু তিনি তো অধ্যাপক ! তাঁর কাছে তো আমরা পাঠ নেব !—আমার একবার মনে হল রবিঠাকুর নিঃশব্দে হাসছেন। আবার একথাও মনে হল বেঁচে থাকলে আজ ভদ্রলোক ঠিক আত্মহত্যা করতেন !—কিন্তু তাহলে তো আমাদের অসীম গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে হয়ে তাঁকে পদে পদে আত্মহত্যা করতে হত ! আমাদের ক্ষমতা কি কিছু কম ?

আর একটি আমার শোনা উদাহরণ। ঘটনাটি বোধহয় পঞ্চাশের দশকে ঘটে থাকবে। কোনো মফস্বল শহরে কিংবা গ্রামে কোনো এক উপলক্ষে এক নামকরা সাহিত্যিককে অতিথি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁকে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে বরণ করবার সময়ে ছোটো ছোটো মেয়েরা নেচে নেচে গেয়েছিল,

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ......

ভদ্রলোকের তো বিষম খাবার উপক্রম !—এইরকম প্রচুর ভুল ব্যবহার আজ এই মেট্রোপলিসের অভিজাত সভায়-সঙ্গতেও ঘটে থাকে। তার জন্য অন্যত্র যাবার প্রয়োজন হয় না !

আমাদের যে-কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর গান আমাদের পথ দেখায়। কথার কথা নয় এ বড়ো সত্য উপলব্ধি।
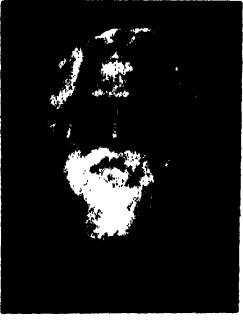
সেইরকম ভাবেই রবীন্দ্রনাথের গান বহু চলচ্চিত্রে এবং মঞ্চ প্রযোজনায় ব্যবহৃত হয়েছে—যেগুলো কখনো বা হাস্যকর, কখনো বিরক্তিকর। কিন্তু আজ সেইসব ভুল প্রয়োগ নিয়ে সমালোচনা করতে বসিনি। ইচ্ছেই করছে না তা করতে। আজ একটা উদাহরণ বলব—নিজের ভালোলাগার, নিজের কাজে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ। আর দুটি-তিনটি শ্রীশম্ভু মিত্র-র প্রযোজনায় সামান্য সংযোজন—গানের—যা দর্শক হিসাবে আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল।

*

আমার নিজের একটি বড়ো প্রিয় ভাবনা আছে। সেটা বহু বছরের। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ভাবনা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে মানব-মানবীর প্রেম নিয়ে যে ভাবনা ভেবেছিলেন তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। যে minority অজানাকে জানতে চায়—যাদের স্বভাব গড়পড়তা মানুষের মতো নয় সেইরকম দুটি নরনারী যদি পরস্পরকে ভালোবাসে সে-প্রেমের বন্ধন অন্য মাত্রার। বিবাহের বন্ধনে স্বাভাবিক সংসার তাদের জন্য নয়। এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে—'রবিবার' বা 'শেষকথা' গল্পে। 'শেষের কবিতা'-য় তো বটেই। 'বাঁশরী'-তেও। 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও.....' কবিতাটি বলে সেই প্রেম 'মৃত্যুঞ্জয়'। প্রতিদিনের 'ম্লান স্পর্শ'-তে তাকে অসম্মান করতে নেই। আমার অল্প বয়সে এ তত্ত্ব বুঝতে পারতাম না—তবু বড়ো নাড়া দিত। আজ যেন কিঞ্চিৎ ছুঁতে পারি ভাবনাটাকে ! কিছু- কিঞ্চিৎ বুঝতে পারি এর উৎস। বেশ কিছু বছর আগেই আমরা 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থনা করি। তাতে 'রবিবার', 'শেষের কবিতা' ও 'শেষ কথা'-র মূল পাত্রপাত্রীদের পাঠ-অভিনয় তো থাকেই। তার সঙ্গে এই মর্মে লিখিত কবিতা, গদ্যাংশ সবই উচ্চারিত হয়। এই 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম' অনুষ্ঠানের মূল সুরটি ফিরে ফিরে বাজে একটি গানে। বিভিন্ন লয়ে গানের বিভিন্ন অংশ বা পঙ্‌ক্তি বিশেষ-বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে গাওয়া হয়। গানটি হল--

হৃদয়ে অবিরত যে রক্তপাত হয়, যা বেশির ভাগ সময়েই মানুষকে একা বহন করতে হয় সেই বেদনা দিয়েই তো পদ্ম-আসন আঁকা হয় প্রিয়তম-র জন্য !

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখনও অগম গোপন
গহন মায়ায় পথ হারাইল
ওযে আমার নয়ন।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবে রে
নিভৃতবাণীর সন্ধান নাই যে রে।
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় মজে—আমার নয়ন।

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো
তার আভাসন
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে?
দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্মআসন
সে তোমারে কিছু বলে?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে
ব্যথা দিই মোর পেতে—
বাতাসে বাতাসে—
ব্যথা দিই মোর পেতে—
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে।
আমার নয়ন তব নয়নের
নিবিড় ছায়ায় মনের কথার
কুসুম কোরক খোঁজে।

এই গানটির মধ্যে নরনারীর প্রেমের অসীম ব্যাপ্তি আর অতল গভীরতা যেন ছেয়ে আছে—কথায় এবং সুরে যেন মাখামাখি হয়ে। আগে আমি এই গানটির হদিশ পাইনি। কিন্তু ১৯৯৯ সালে যখন আমরা 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম' পুনর্প্রস্তুত করলাম তখন এই গানটি যুক্ত করতে পেরে খুব ভালো লেগেছিল। ঘুরে-ফিরে বিভিন্ন অংশ এক-একটি বিশেষ প্রেক্ষিতে ব্যবহার করে মনে হল যেন সেই নাটকীয় আবেগে এক তীব্রতর মাত্রা যুক্ত হল। হৃদয়ে অবিরত যে রক্তপাত হয়, যা বেশির ভাগ সময়েই মানুষকে একা বহন করতে হয় সেই বেদনা দিয়েই তো পদ্ম-আসন আঁকা হয় প্রিয়তমর জন্য ! কিন্তু ক'টি ক্ষেত্রেই বা সেই পদ্ম-আসনটির মর্ম প্রিয়তমর কাছে পৌঁছয় ? বাঁশির সুরে যে-ব্যথা বাতাসে বাতাসে পেতে দিই, সেই অনন্ত বেদনার মাত্রা কি কারোর কাছে পৌঁছয় ? আমাদের 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম' অনুষ্ঠানটির মধ্যে মধ্যে গানের এই কথাগুলোই ঘোরে-ফেরে। এই গানটি তাই আমার জীবনে একটি চিরন্তন গান হয়ে রইল। অবিস্মরণীয় প্রাপ্তি।

এবারে দু-একটি আপাততুচ্ছ রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারের কথা আলোচনা করা যাক শম্ভু মিত্র-র বিভিন্ন প্রযোজনায়। এই ব্যবহারগুলো এত অনায়াস, এত সূক্ষ্ম যে এতদিন বাদে সবার মনে থাকা সম্ভব নয়। অথচ আমার মনে এগুলো খুব তীব্র হয়ে জেগে আছে—প্রায় বিঁধে থাকার মতো। হয়ত এক-একটি নাটক অসংখ্যবার দেখেছি বলে এবং শৈশব থেকে দেখেছি বলে মনে এত গভীর অভিঘাত থেকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রথমে 'রক্তকরবী' নাটকে একটি গানের সুরের ব্যবহারের কথা বলা যাক। নাটকটির মধ্যভাগ পেরিয়ে যাওয়ার পরে—সর্দারকে একজন মোড়ল এসে সংবাদ দিয়ে বলে—রঞ্জনকে শাসকশ্রেণির আমলাদের পক্ষে সামলানো আর সম্ভব হচ্ছে না ! নানান কৌশলে এবং রসিকতায় সে শাসকপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে এবং খোদাইকরেরা—যারা 'কীটের মত সুড়ঙ্গ খুদে চলত'—তারা আজ ওর কথায় নেচে উঠছে ! এই নাটকের একেবারে শেষে আমরা রঞ্জনের নিথর দেহ হয়ত দেখতে পাই কিন্তু চরিত্র হিসেবে সে কখনোই মঞ্চে আসে না। প্রথম থেকেই কিন্তু আমরা রঞ্জন সম্পর্কে অনেক কথোপকথন শুনি ! আর তার একটি ছবি আমাদের মনে তৈরি হয়ে যায় ! সে সুপুরুষ, সে সাহসী, সে বলবান। সে পূর্ণ যৌবনের প্রতীক। নাগাই নদীর স্রোত নিয়ে সে যেমন তোলপাড় করে, নন্দিনীর দেহটিকে নিয়েও সে তেমনি তোলপাড় করতে থাকে। লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভ্রূর মধ্যিখানে তীর মেরে সে হা হা করে হাসতে পারে। তার গায়ের জোর ওই শঙ্খিনী নদীর মতো। ওই নদীর মতোই সে হাসতে পারে এবং ভাঙতেও পারে। জীবন নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। এইরকম সব কথা তার সম্পর্কে আমরা শুনেছি। এই মোড়ল এবং সর্দার নিজেদের কথোপকথনের মধ্যেই রঞ্জনকে দেখতে পায়। সর্দার বলে,—'ঐ না রঞ্জন,— .....লুকোবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই।... একটা ভাঙা সারেঙ্গিও জোগাড় করেছে ...' অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে এই যক্ষপুরীতেই সারেঙ্গি নিয়ে চলেছে রঞ্জন। সব জেনেও, তার কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই বুঝতে পারি। কিন্তু তাকে দর্শক কি দেখতে পান ? সে-কথা রবীন্দ্রনাথ জানাননি। বোধ করি প্রযোজকের কল্পনার ওপরে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র রঞ্জনকে মঞ্চে আনেননি। কিন্তু ওই সারেঙ্গির উল্লেখটিকে যথাযোগ্য ব্যবহার করে নিয়েছেন। সর্দার এবং মোড়লের যখন কথোপকথন হচ্ছে রঞ্জনকে শায়েস্তা করবার জন্য—সেই সময়েই সারেঙ্গি বেজে উঠত অন্তরালে। সেই সুর শুনেই চকিতে সর্দার চাতালের ওপরে গিয়ে উঠতেন। এবং ভিতর-মঞ্চের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'আরে ! —ওই না রঞ্জন ? — .....' ইত্যাদি। মোড়লও তাঁর পিছু-পিছু যেত। তিনি নেমে এলে, মোড়লও নেমে আসত। কিন্তু কী সুর বাজত অন্তরালে ? সে হল রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের সুর। গানটি হল,—

বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও
বাঁধ ভেঙে দাও
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও।
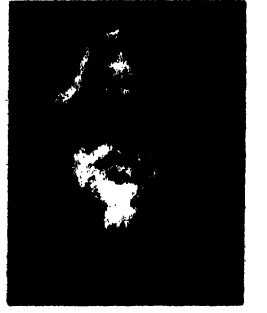
তখন এই গানটি জনমানসে খুব সুপরিচিত ছিল। আর তাই ওই দৃশ্যে রঞ্জনের মতো কারোর পক্ষে স্পর্ধা করে ওই গান বাজানো-তে এক বিশেষ অর্থ প্রকাশ পেত। যুক্ত হত নূতনতর মাত্রা ! আর তাই জন্যেই সারা শরীরে কেমন এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ত ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে যেত ওই দু'তিন কলি গানের সুর। সামান্য সময়ের জন্য সামান্য প্রয়োগ অসামান্য অভিঘাত তৈরি করত। যেসব দর্শকের একথা মনে আছে তাঁরা বোধ করি সহমত পোষণ করবেন।

দশচক্র

সেইরকমই একটি ছোট্টো প্রয়োগের কথা মনে পড়ে 'দশচক্র' নাটকে। আমার খুব ছোটোবেলাতে যখন 'দশচক্র' নাটকের অভিনয় হত তখন একটা গানের ব্যবহারের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সে গান—'আমি ভয় করব না ভয় করব না / দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না— /...'। সেইসময়ে প্রথম অঙ্কে প্রথম যখন মূল চরিত্র ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ মঞ্চে ঢুকছেন তখন এই গানটি গাইতে গাইতে ঢুকতেন। সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে। 'দশচক্র' নাটকটি—কেউ-কেউ হয়ত জানেন না—নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন-এর লেখা নাটক An Enemy of the People-এর রূপান্তর। যাঁরা এ-নাটকটি পড়েছেন তাঁরাও আন্দাজ করতে পারবেন এই গানটি কতটা সুপ্রযুক্ত হয়েছিল। আর যাঁরা সেই মঞ্চায়ন দেখেছেন তাঁরা তো জানেনই। পরে, পুনর্নির্মাণে এই গানটিই গাইতেন ডাঃ গুহ দ্বিতীয় অঙ্কে—রুগী দেখে ফিরে—একা-একা—নিজের মনে। এ-নাটকের ডাঃ গুহ মানুষটি আদ্যোপান্ত সৎ এবং সরল মানুষ। জীবনের পথ তাঁর কখনোই মসৃণ ছিল না। সারা জীবন বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন। বাবার অমতে ভালোবেসে একটি মেয়েকে বিয়ে করবার 'অপরাধ'-এ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র হতে হয়েছিল। কঠিন কষ্টে বয়সের চাইতেও বেশি বার্ধক্যের ছাপ তাঁর শরীরে। এতদিন বাদে দাদা অমলেন্দু গুহ তাঁর জমি জায়গায় নতুন গড়ে তোলা কলোনির মিউনিসিপ্যালিটির ডাক্তার হিসেবে চাকরি দিয়ে ডাক্তার-ভাইটিকে স্বভূমিতে ফিরিয়ে এনেছেন। যদিও ডাক্তার থাকেন একটি ভাড়া বাড়িতে। এই পটভূমিতেই এই নাটকের শুরু। সেই নাটকে মঞ্চে

সর্দার এবং মোড়লের যখন কথোপকথন হচ্ছে রঞ্জনকে শায়েস্তা করবার জন্য—সেই সময়েই সারেঙ্গি বেজে উঠত অন্তরালে। সেই সুর শুনেই চকিতে সর্দার চাতালের ওপরে গিয়ে উঠতেন।

ঢুকতেন ডাঃ গুহ এই গান গাইতে গাইতে। তাকে হয়ত ঠিক গাওয়া বলা যাবে না— ! বলা যেতে পারে—যথাসাধ্য সুরে প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করা। গান শোনানোর জন্য একেবারেই নয়। নিজেরই মনে গভীর বিশ্বাসে কথাগুলো সুরে বলবার চেষ্টা করা। মনে হত তাঁর চরিত্রের মধ্যে গানের ওই পঙ্‌ক্তিগুলো যেন প্রোথিত। এ-নাটকের এই ভালো মানুষ, সহৃদয়, বুদ্ধিমান মানুষটিকে কেবল তাঁর সততার জন্য চক্রান্তের শিকার হতে হয়। ডাক্তারের একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দাদার জমি-বাড়ি নিয়ে মুনাফা লোটার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল—আর সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুর আনুকূল্য কর্পূরের মতো উবে গেল। স্থানীয় যেসব যুবকদের আধুনিক এবং প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ডাক্তারকে মুগ্ধ করেছিল—দেখা গেল সেই সব তথাকথিত প্রগতিবাদীরা অনায়াসে ভিড়ে গেল মুনাফাবাজ অমলেন্দু গুহর দলে। এদের মিলিত চক্রান্ত ডাঃ গুহকে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগটুকু পর্যন্ত দিল না।—ডাক্তারের চাকরি চলে গেল, বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়বার নোটিশ ধরিয়ে দিলে,—এমন-কী মেয়ে মঞ্জুর স্কুলে পড়ানোর চাকরিটাও চলে গেল। লোকে—যে সাধারণ লোককে নিরাময় রাখবার জন্য তাঁর একক প্রাণপণ প্রয়াস—সেই তারাই ঢিল ছুঁড়ে ঘোষণা করে দিলে যে ডাঃ গুহ 'দেশের শত্রু'। শক্তিশালী শ্রেণি যখন জনমত-এর চাল চেলে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে চতুর খেলা খেলে—তখন সেই চাতুর্যকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে ডাঃ গুহ-র মতো মানুষ সর্বসমক্ষে বলতে পারেন 'সমাজের শত্রু হল Majority'। যে-majority শক্তিশালী শ্রেণিকে বিচার করে না, নিজেদের সচেতন করবার তাগিদ অনুভব করে না—অন্ধ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নিজেদের মতামত দেয়—সেই 'brute majority'। যাদের মতামত রাজনৈতিক নেতারা অথবা যে-কোনো শক্তিশালী শ্রেণি অনায়াসে গঠন করেন, ভাঙেন এবং সুবিধার্থে সহজেই বদলে ফেলেন,—সেই majority-র বিরুদ্ধে কথা বলেন ডাঃ গুহ—কিন্তু majority-রই স্বার্থে। আর শেষ অঙ্কে সমাজে সম্পূর্ণরূপে ব্রাত্য ডাঃ গুহ-র তৃতীয় আবিষ্কার হল—'যে-মানুষ একলা দাঁড়াতে ভয় পায় না—পৃথিবীতে তার জোরের কাছে কেউ নেই, কিছু নেই।' একটা ভারি ট্রাঙ্ক টানতে টানতে বিতাড়িত ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে এই কথা বলতে থাকেন। সেই মহত্ত্বের সামনে দর্শকের নানারকম প্রতিক্রিয়া হত—কেউ উচ্ছ্বসিত হতেন, কেউ অঝোরে কাঁদতেন, কেউ বা স্তব্ধ হয়ে যেতেন। তখন নিশ্চয়ই গোড়াতে ওই এক-দু'পঙ্‌ক্তি গান গাওয়ার কথা তাঁদের মনে থাকত না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে,—এই অভিজ্ঞতার পরে ডাঃ গুহ বেশ কিছুদিন তাঁদের সঙ্গ ছাড়েন নি। ফিরে ফিরে তাঁদের মনে পড়েছে ডাঃ গুহ মানুষটির কথা। তাঁর সারল্য, তাঁর জোর, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর ভালোত্ব ! আর তখন—আনমনা কোনো সময়ে হঠাৎ সেই সুরে-না-গাওয়া পংক্তিগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে তাঁর কাছেও, এ-কথা বুঝতে পেরে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান ! কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমি জানি সেই দর্শকের নিজের জীবনেই সত্য হয়ে উঠেছে ওই গান। এ আমার অভিজ্ঞতা। এবং তা বড্ডো স্পষ্ট ও সত্য। আর তাই এত বছর বাদে আজও আমার স্মৃতিতে ওই গানের অংশ উজ্জ্বল। আমাদের মধ্যে কারোর-কারোর উল্টে দেখতে ইচ্ছে করেছে গানের অন্য কলিগুলি। আমরা দেখেছি তাতে আছে—

> তরীখানা বাইতে গেলে
> মাঝে মাঝে তুফান মেলে
> তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না—
> আমি ভয় করব না
> ভয় করব না।

আর এই পঙ্‌ক্তিগুলো যখন মনে-মনেও উচ্চারণ করি তখনই—একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই—আমাদের ভেতরকার সত্তা, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য, সাহসী হয়ে ওঠে, প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ওই-যে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের ক্ষুদ্রতা ভুলে গিয়ে আমরা নিজেদের ছাড়িয়ে যাই—ওইখানেই আমাদের পরম প্রাপ্তি। আর সেইখানেই এই আপাততুচ্ছ সংযোজন এবং প্রয়োগ এত সার্থক হয়ে ওঠে।

সেই মহত্ত্বের সামনে দর্শকের নানারকম প্রতিক্রিয়া হত—কেউ উচ্ছ্বসিত হতেন, কেউ অঝোরে কাঁদতেন, কেউ বা স্তব্ধ হয়ে যেতেন। তখন নিশ্চয়ই গোড়াতে ওই এক-দু'পঙ্‌ক্তি গান গাওয়ার কথা তাঁদের মনে থাকত না।

রাজা

তেমনই রবীন্দ্রনাথেরই নাটক 'রাজা'-য় একটি গানের সংযোজন আমাদের বুকের ভেতরটাকে যেন মুচড়ে দিত ! একদম প্রথমদিকে এই গানটি গাওয়া হত না। কয়েক বছর বাদে হয়েছিল এই সংযোজন। ঠিক কবে এই 'আঁধার রাতে একলা পাগল...' গানটি যুক্ত হয়েছিল আমার জানা নেই।

শম্ভু মিত্র 'রাজা'-কে অন্ধকারের নাটক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন এ-কথা বহু আলোচিত। যে-অন্ধকারকে ঘিরে এ-নাটকের বিস্তৃতি সেই অন্ধকারকে মূল চরিত্র রাণী সুদর্শনা চিনতে পারে না। আলো থেকে অন্ধকার পরিক্রমা করেই আলোতে তার মুক্তি। এ-ই তার আত্মোপলব্ধির যাত্রা। প্রথম দৃশ্যের অন্ধকার কক্ষে সুদর্শনা চিৎকার করে উঠত—

—উঃ ! আলো আলো কই ?

বোঝা যেত—আলোর জন্য সত্যিই সে অস্থির হয়ে আছে। অধীর হয়ে সুরঙ্গমাকে বলত,

—কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে ?

সুরঙ্গমা বলত,

—তাহলে যে মা আলোও চিনবে না। আর অন্ধকারও চিনবে না।

অন্ধকার এবং আলোর যে ভারসাম্য আছে প্রকৃতির মধ্যে—তাই-ই আছে আমাদের জীবন জুড়ে। সেখানে আলো এবং অন্ধকার দুয়েরই গুরুত্ব সমান। আর তাই এই দুটিকেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু অন্ধকারকে স্বীকার করে নেওয়া তো সহজ নয়। 'অন্ধকার'-কে কি আমরা ঠিক করে চিনে নিতে পারি ? অন্ধকারকে ঠিক করে চিনতে না পারলে আমরা ক্রমশই অন্ধকারের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকি। ডুবে যেতে থাকি পঙ্কে। অথচ,—ওই অন্ধকারের মধ্যেই আছে প্রশান্তি। চোখ বন্ধ করলে যে অন্ধকার দেখতে পাই—সেই অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত মনকে সংহত করে যদি নিমগ্ন হতে পারি তবেই অনুভব করি ওই প্রশান্তিকে। যা আমাদের অনেক তুচ্ছতা থেকে রক্ষা করে। আর তা না হলে যতই ওই অন্ধকারকে অস্বীকার করতে চাই ততোই তার পঙ্কিলতা আমাদের গ্রাস করে। আর অন্ধকার যেন ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতর হয়ে ওঠে। সেই অন্ধকার 'ঝড়ের মেঘের মতো কালো', 'কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো'— ! সেই ভয়ঙ্কর ঝড় আমাদের জীবনটাকে তছনছ করতে থাকে ! অধৈর্য হয়ে, চঞ্চল হয়ে সুদর্শনা সেই ঝড়ের পথেই পা বাড়ায়—ভুল করে—বুঝতে না পেরে। গভীর রাতের অন্ধকারে তার রাজাকে ছেড়ে, সেই প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে শুষ্ক কঠিন পথে—যে পথের কাছে ভিক্ষুক এবং সম্রাজ্ঞী দুই-ই সমান। 'রাজা' নাটকে এই সময়ে ওই গানটি যুক্ত করা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে মঞ্চের আবছায়া আলোতে অনুভব হয় দুটি মানুষ যেন পথের ধুলোয় বসে আকুল হয়ে গাইছে,—

আমি যে তোর আলোর ছেলে
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে...

এই পঙ্‌ক্তি দু'টি দু'বার করে গাওয়া হত। এরা কারা, কেমন দেখতে কিছুই বুঝতে পারা যেত না। এদের কোন্ গভীর বেদনা থেকে কথাগুলো উৎসারিত হচ্ছে তা-ও আমরা জানতাম না। শুধু বুঝতাম অন্ধকারে তারা যেন কূলশূন্য সমুদ্রের অথই জলে পড়ে গেছে—মনে হত সীমাহীন অসহায়তায় তারা গাইছে—

আমি যে তোর আলোর ছেলে
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে—
মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে—
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।

চোখ বন্ধ করলে যে অন্ধকার দেখতে পাই—সেই অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত মনকে সংহত করে যদি নিমগ্ন হতে পারি তবেই অনুভব করি ওই প্রশান্তি-কে। যা আমাদের অনেক তুচ্ছতা থেকে রক্ষা করে।

তারা যখন 'বুঝিয়ে দে' উচ্চারণ করত, সেই উচ্চারণে অভিযোগ ছিল, অনুনয় ছিল, দাবি ছিল,—আরো হয়ত কত কী ছিল। তারা যখন গাইছে তখন সেই অন্ধকার মঞ্চে প্রবেশ করেছে দুই অবগুণ্ঠিতা রমণী। আর আমাদের তখুনিই মনে হয়েছে এরা সুদর্শনা-সুরঙ্গমা। তারা ওই আবছা আলোয় মঞ্চ অতিক্রম করে বেরিয়ে যেত ! খালি তাদের মধ্যে একজন—ওই গানের মগ্ন উচ্চারণ লক্ষ করে—একবার ফিরে তাকাত। তারপর বেরিয়ে যেত। আর আমাদের মনে হত ওই নারী নিশ্চয়ই সুদর্শনা। আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ভাবনা মাথায় এসে জড়ো হত,—কিন্তু গান তখনো চলত,—

অন্ধকারে অস্ত রবির লিপি লেখা
আমারে তার অর্থ শেখা—
তোর প্রাণের বাঁশির তান সে নানা
সেই আমারই ছিল জানা
আজ মরণবীণায় অজানা সুর নেব সেধে—
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে !
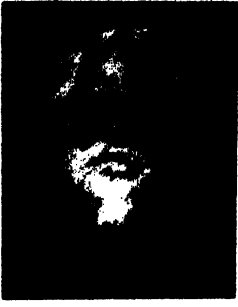
আমরা ভাবতাম এসব তো সুদর্শনারও কথা— ! সে-ও যে বুঝতে পারছে না কিছু। সেও যে সেই অন্ধকার থেকে পালাতে গিয়ে কূলশূন্য সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেছে। সে যে বুঝতে পারছে না—কেন তার সেই অন্ধকারের প্রতি এত বিতৃষ্ণা জন্মালো যে তার মধ্যে এত তীব্র এক প্রতিবাদ জন্ম নিল ! কেন এত অস্বীকার করবার প্রবণতা তৈরি হল ! কেন ওই 'শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার' আর 'প্রজাপতির মতো সুন্দর' সুবর্ণের এত আকর্ষণ তৈরি হল ! আর সেই মোহ তার মনে ঘৃণা তৈরি করল তার রাজা-র সম্পর্কে ! সেইখানেই তো শেষ হল না সব—সেইখানে হল শুরু— ! এক বিষম টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করল সুদর্শনা। 'শরীরের রক্ত নাচে' সুবর্ণর কথা মনে করে, আবার খুব করুণ হয়ে রাজা-র উদ্দেশে বলে, 'তুমি আমাকে জোর করে ধরে রেখে দাও না কেন ? তুমি আমাকে মারো না কেন ?' অর্থাৎ 'ভালো' এবং 'মন্দ'-র মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে সে স্থির করতে পারছে না—কোনটা তার পক্ষে ঠিক ! ভালো-র মধ্যে আছে প্রশান্তির আশ্রয়—যদিও কঠিন সেই প্রাপ্তি। আর মন্দ-র মধ্যে আছে নেশাগ্রস্ততা। তাই সে বলছে, 'মরি-মরব, তবু ফিরব না !' কিন্তু এই অন্ধকারে বেরিয়ে, তার ভয়ঙ্করতা অনুভব করে তার কি মনে হয় না,—

আমি যে তোর আলোর ছেলে—
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে?

এইবার কী করব একটু বুঝিয়ে দে! হ্যাঁ! বুঝিয়ে দিতে হবেই তোকে ! অস্তরবির শেষ রেখায় যে লিপিটুকু লেখা তার অর্থ তো তুই আমাকে শেখাস নি ! তাহলে কেমন করে অন্ধকার পেরিয়ে যেতে যেতে 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' চিনে নেব? 'আত্মোপলব্ধি'-র স্তরে পৌঁছবার আগে যে কেবলই অন্ধকার। সেই অন্ধকার সমুদ্রের অথই জলে তো আমরাও পড়ে যাই। আর অকস্মাৎ সেই অকূল অন্ধকারে আমরাও কি ছটফট করে বলে উঠি না—'এত আঁধার কেন?' আমরাও কি দাবি করি না যে ওই যে লিপি—'আমারে তার অর্থ শেখা!' প্রবল কষ্টে আমরাও বলে উঠি,—'বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে!' সেইখানে দর্শক হয়েও আমাদের সংযুক্তি ঘটে যায় গানের কথা আর সুরের সঙ্গে। যে কথা অনেক গভীরের, যে জিজ্ঞাসা গূঢ়—তাই সহজে প্রকাশ পায় গানে ! আমাদের অনেক অনুচ্চারিত এমন কী অননুভূত আবেগ তল বেয়ে উঠে আসে, হৃদয়ে মোচড় দেয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে আমাদের। বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ আমার নিজের আকৃতি হয়ে ওঠে। আমরাও চোখ বুজে বলি,—

'বুঝিয়ে দে ! বুঝিয়ে দে ! বুঝিয়ে দে !'

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নাট্যকার

'ভালো' এবং 'মন্দ'-র মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে সে স্থির করতে পারছে না—কোনটা তার পক্ষে ঠিক ! ভালো-র মধ্যে আছে প্রশান্তির আশ্রয়—যদিও কঠিন সেই প্রাপ্তি। আর মন্দ-র মধ্যে আছে নেশাগ্রস্ততা।

●

'গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ'

সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে যেমন আমার মনে হয়, আমার (এবং আমাদের) নাড়ির স্পন্দন বাঁধা আছে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে, তেমনই আমার (এবং আমাদের) হৃদয়ের প্রতিধ্বনিত রেখাচিত্র যেন আঁকা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের গানে।

হয়তো এই দুই বিকর্ষী (কতিপয় কাব্য-সমালোচকের মতে) কবিকে একবাক্যে উচ্চারণ করায় অনেক বিবাদের সূত্রপাত হবে—কিন্তু আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদের ঊর্ধ্বে সারসত্য এই যে, দুজনেই আশ্চর্যজনকভাবে, নিজের নিজের জোরে, আজও আমাদের পৃথিবীতে রয়ে গেছেন।

> তোমাকে দেখার মত চোখ নেই—তবু
> গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
> আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ,
>
> ....
>
> মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
> ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল ব'লে
> আজ তার মানবকে কি করে চেনাতে পারে কেউ ?
>
> *(জীবনানন্দ দাশ)*

রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেনাতে পারেন। শুধু চেনানো নয়, তিনি অচেনাকে চেনান। অনেক চেনাকে নতুন রূপে চেনান। আবার অনেক চেনাকে অচেনা করে তোলেন। অচেনার সামনে স্পর্ধিত করে তোলেন। এ সবই অবলীলায় ঘটে যায়। চিন-অচিনের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে সীমারেখাটা হারিয়ে যায় বুঝতে পারি না।

> চেনা ফুলের গন্ধ স্রোতে ফাগুন রাতের অন্ধকারে
> চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে

নিত্যকালের অচেনা ? চেনা ফুলের গন্ধ যদি, তা অচেনা হল কোন রসায়নাগারে ?

তবু, এ পর্যন্ত, গন্ধস্রোতে ভাসমান কবিমনের বিহ্বলতা বোঝা যায়। কিন্তু শেষ পঙ্‌ক্তিতে এসে যখন বলেন—

> পেয়ে যারে পাইনে, তারি পরশ পাই যে বারেবারে

তখন আর চেনা-অচেনার কোনো সার্বভৌম এলাকা রইল না। সমস্ত সার্বভৌমত্ব তছনছ হয়ে গেল। ফুল, ফাগুন, প্রিয়া এসব ছাপিয়ে গানটা উঠে গেল এক অভাবিত পরশ-কাতরতায় !

এসবটাই ঘটে চলে খুব অনায়াস সহজতায়। শুধু এ গানেই নয়। একটা অন্তর্লীন স্বতঃস্ফূর্ততায় সহজতা পায় তাঁর গান। বোধহয় গানে যা বলেন তা খুব বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলেন, গভীর প্রেমের জায়গা থেকে বলেন তাই এত মরমী, তাই এত বেদনা, তাই এত ঘন আনন্দ !

এক বিশাল ব্যক্তিত্ব তো ! চিন্তা-চেতনার ভার আছে। কিন্তু যখন গান বাঁধেন তখন একতারা হাতে আমার দেশের পথ ভোলা বাউল ! আমার দেশের কীর্তনিয়া, আমার দেশের মাঝি-মাল্লা হয়ে উঠতে কোথাও বাধা হয় না। শুধু বেরিয়ে আসে এক বিশিষ্টতা। কোন যাদুতে কে জানে !

প্রেমের গানেও এমন অনর্গল, অনাড়ম্বর প্রস্তাবনা রীতিমতো বিস্ময়কর ! অপ্রত্যক্ষের কথাও বলেছেন এত প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও লঘু-পাক না করে—সেও এক বিস্ময় ! তবু, প্রেম যেখানে গম্ভীর, সুদূরগামী সেখানে ব্যক্তিত্বের চাপ নয়—বেরিয়ে আসে এক ব্যক্তি-বিশিষ্টতা। কোন যাদুতে কে জানে—এত দূরবর্তী অথচ বুকের কত কাছে !

একটা অন্তর্লীন স্বতঃস্ফূর্ততায় সহজতা পায় তাঁর গান। বোধহয় গানে যা বলেন তা খুব বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলেন, গভীর প্রেমের জায়গা থেকে বলেন তাই এত মরমী, তাই এত বেদনা, তাই এত ঘন আনন্দ !

তাই তাঁর গান নিয়ে কোনো কথা লিখতেও বড়ো ভয় হয় ! গান তো গাইবার—শুনবার জিনিস। গেয়েও যে তার সমস্ত স্বরগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া কঠিন। শুনেও তো তার সমস্তটা শুষে নিঃশেষ করা যায় না ! লিখে বোঝানো যাবে কী ! বিশেষত আমার মতন একজন বার-দেউড়িয়ার পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। আমি নিশ্চিত, রবীন্দ্রনাথ যদি আমাকে তাঁর গান নিয়ে লিখতে দেখতেন, তাহলে নির্ঘাৎ তিনি বলতেন, ঢের হয়েছে—তুমি আর আমার গানের ওপরে তোমার বিশ্লেষণের রোলার চালিও না।

ওগুলোকে ওদের মতো থাকতে দাও। আর আমি বলতাম, আমরা তোমাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, আমাদের হক্ আছে। তাছাড়া এখন তো তুমি মুক্ত-বাজারে এসে পড়েছ ! যে মুক্তির 'তরঙ্গে বস্তুর বিপুল ভার হাল্কা হয়ে যায় !' আর আমরা 'সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে / তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ....'

কিন্তু কথাটা তো আমার 'বিশ্লেষণ' নয়। তাঁর গানে যে

> সৃষ্টি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে
> প্রাণের মাঝে ওই যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে,
> 'তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ'

—নাচতে নাচতে এসে যে আমাদের সার্বভৌমত্ব তছনছ করে দিয়ে চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথের গান সার্বভৌমত্ব তছনছ করার গান। বিশেষত তাঁর গানের ভেতর যখন প্রেমের ভুবন জেগে উঠছে—তখন আরও বেশি করে যেন ভেঙে পড়ছে আমাদের সার্বভৌম সীমানা। প্রেম-বিরহ, মিলন-বিচ্ছেদের তছনছে পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সুর ও বাণীর মাধ্যাকর্ষণের টানে যেন গড়ে উঠছে এক একটি গান। থামা নেই কোথাও। থামলেই যেন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়তে হবে। অতএব স্থিতি নেই—

রাতটা ছিল ঝড়ের। দুয়ার ছিল বন্ধ, কিন্তু পরশন মাত্রেই তো তা খুলে যেত।—তুমি ফিরে গেলে।

আমি তো তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম বসে বসে।—তবু তুমি ফিরে গেলে !

> হায়, শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি
> তব রথের ধ্বনি
> .....ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি......

কোনও স্তব্ধ প্রতীক্ষা নেই আর। কথা আর সুরের মাধ্যাকর্ষণে বাজতে থাকে শুধু 'শুনি নাই শুনি নাই' হাহাকার, আর দ্রুত অপসৃত রথের ধ্বনি।

প্রতীক্ষা এবং আগমন দুইই ছিল। তবু স্থিতি এলো না। কোথাও স্থিতি নেই—

> স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে
> আমার দ্বারে, হায়।
>
> আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
> তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায়।।

এখানে আমি কারও প্রতীক্ষায় ছিলাম না। আমি ছিলাম নিদ্রাতুর, তবু স্বস্তির অবকাশ নেই। দ্বারে ঘা মেরে তুমি ডেকে গেলে। আমি জাগি নাই, জাগি নাই গো ! আর তাই তুমি মিলালে অন্ধকারে !

এই এক অদ্ভুত জঙ্গমতা রবীন্দ্রনাথের গানে। আবহমান বহমানতায় যেন ধেয়ে চলা—

'তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে'—এই শ্রান্ত উচ্চারণে তিনি প্রেমিকার মুখ পানে চেয়ে বিরাম খুঁজছেন। কিন্তু গানটি শেষ হয় এই কথা বলে :

> আজকে জীবন সমর্পণের গান
> গাব নীরব অবসরে।।

বিরাম নেই, শুরু হবে আর একটি গান। বিরাম চেয়ে,—শুধু ক্ষণেক তরে কাছে একটু বসতে চাওয়ার অবসর চেয়ে তিনি যেখানে এসে থামেন, সেখানেই শুরু হয় আর এক যাত্রার। তাঁর গান যে সাঙ্গ হতে জানে না। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়—নীরব অবসরে তিনি যে-গান গাইবেন—সমর্পণের গান, সে-গান আমাদের 'অবসরের' সার্বভৌমত্বকে তছনছ করে দেবেই। তিনি গান শোনাবেন বলেই যে জেগে থাকেন। তাঁর হিয়া বিরাম জানে না যে !

তাই, রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ভাবতে গেলেই, আমার একটা কথা মনে হয়, কথা-সুর-তাল-লয়-ছন্দ মিলে যে অবয়বটি তৈরি হয় তারই নাম কি গান ? নাকি এসব মিলে আমাদের মনের মধ্যে যে সান্দ্র আবেদন ও নিগূঢ় আলোড়ন তৈরি হচ্ছে তার নাম গান ? মনে হয়, যদি তা হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথই আমাদের ঘুম-ভাঙানিয়া, আমাদের দুখ-জাগানিয়া। বুকে চমক লাগিয়ে তিনি আমাদের ডাকেন। আমাদের কাজের মাঝে-মাঝে কান্না-হাসির দোলা তিনি থামতে দেন না যে ! গানে-গানে পরশ করে, প্রাণ সুধায় ভরে তিনি সরে যান। কেবলি সরে যান। আমাদের ব্যথার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। জাগিয়ে রাখেন আমাদের ব্যথার স্বরূপ, যার মধ্যে দিয়ে আমরা খুঁজে পাই আমাদের প্রেমের স্বরূপ ! খুঁজে পাই আমাদের অনুভব-অনুভূতির জগৎ। হারিয়ে যাওয়া, ঝরে পড়া, মরচে ধরা, অনবধানতায় বিবশিত হয়ে পড়া মহার্ঘ চিত্তবৃত্তিগুলি টলটল করে জেগে উঠতে চায়। আসলে, দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু তুচ্ছ, ক্ষুদ্র—তার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমরা যে-মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াই, সে-মুখ আমাদের নিজস্ব অন্তর্গত মুখ নয়। সে-মুখ আমার মনগড়া। পাঁচজনের ইচ্ছামুখাপেক্ষী। পাঁচজনের ইচ্ছাশক্তি যত প্রবল হয় মুখোশ ততই নিটোল হয়। মুখ আর মুখোশের অভ্যস্ত সহাবস্থানটাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় রবীন্দ্রনাথের গান। অনুভব-অনুভূতির রেখায় রঙে টলটল করে ভেসে উঠতে চায় নিটোল মুখ বুকের ভেতরে।

রবীন্দ্রনাথের গান সার্বভৌমত্ব তছনছ করার গান। বিশেষত তাঁর গানের ভেতর যখন প্রেমের ভুবন জেগে উঠছে— তখন আরও বেশি করে যেন ভেঙে পড়ছে আমাদের সার্বভৌম সীমানা।
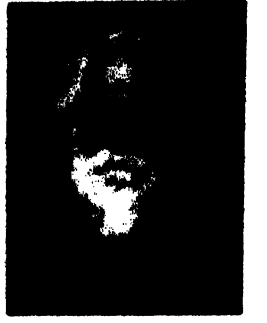
এইখানে রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বড়ো সার্থকতা বলে আমার মনে হয়। তিনি যে শুধু আমাদের অভ্যস্ত সার্বভৌমত্বটাকে নস্যাৎ করেন তাই নয়, একই সঙ্গে এক বহু স্তরিক ও বহুরৈখিক সার্বভৌমত্বের জন্ম দেন। যেখানে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হয়, হারিয়ে-যাওয়া-নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা হলে, খুঁজে পেলে তিনি আবার নিয়ে যান অন্য চেতনায়, অন্য বেদনায়—যেখানে আমার চেয়ে এক বড়ো আমির আভাস মেলে, যেখানে অনেক বড়ো করে হারানো যায়।

পিথাগোরাস কল্পনা করেছেন, গ্রহরাজির আবর্তনের ফলে আকাশে এক ধরনের শ্রবণাতীত শব্দ ধ্বনিত হয়, যাকে তিনি বলছেন Music of the sphere। রবীন্দ্রনাথ কি এই শ্রবণাতীত শব্দ শুনেছিলেন ? হয়তো অবান্তর প্রশ্ন, কিন্তু এ কথা অবান্তর নয় যে রবীন্দ্রনাথের গানে সেই শব্দের, সেই আলোক-সংঘর্ষের অনুরণন আমরা শুনতে পাই বারবার—

> আকাশ হতে আকাশ-পথে হাজার স্রোতে
> ঝরছে জগৎ ঝরনা ধারার মতো।
> আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে
> অবিরত।
> দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
> সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত।
> আমার হৃদয় তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত।

'Music of the sphere' তো কানে শোনার নয়! 'আমার' সঙ্গে ওই গাগনিক ঝরনা স্রোতের একটা জাগতিক সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উঠে আসছে গান। আর আমার হৃদয়তটে চূর্ণ হয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে সেই গান।

কি মহিমময় কল্পনা ! ঔপনিষদিক ধোঁয়াশা নয়। মানবিক স্পর্ধায় উচ্চারিত হয় : 'ঐ আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত !'

স্তর থেকে আরেক স্তরে, রেখা থেকে রেখান্তরে, কোণ থেকে দূরান্তরাল কোণে ছড়িয়ে যাচ্ছে গান।

> আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি ক'রে গাওগো
> আজ যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাওগো

বলতে বলতে আকস্মিক স্পর্শকাতরতায় বলে ওঠেন, হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি তুলে বনকে কাঁদায়—

> তেমনি আমার বুকের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদাও গো

এই উচ্চারণে, আমার অগীত আকাশও অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে ! আমার অধরা আকাশ ছলছল-চোখে চেয়ে থেকে ধরা দেয় যেন !

এই এক অদ্ভুত সঞ্চরমান রহস্য রবীন্দ্রনাথের গানে। সুর-তাল, রাগ-রাগিণী, লয়-ছন্দ, স্বর-বাণী এসবের মাত্রিকতা (Linearity) এবং যান্ত্রিকতা (Technicality) ছাপিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এক যাদুকর। যার সামনে বসে শুধু বলা যায়, 'সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো'—কোন আলোতে তোমার প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় এসেছিলে ? তোমার গানের ভুবনের কে সেই যাদুকর যে তার সঞ্জীবনী কুহকে আমাদের এমন করে সম্মোহিত করে যায় ? কে সে ?

রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা।
> কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।

রাতের অন্ধকারে সঙ্গীবিহীন একাকী পাখির মতন রবি ঠাকুরকেই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—আপন-হৃদয়-গহন-দ্বারে কান পেতে যার বারতা তুমি শোনো, যে তার বাণী গানের তানে লুকিয়ে তোমাকে পাঠায়, সে কে ?

উত্তর পাই না। পদে-পদে এই রকম মৌন নিরুচ্চার গহন-দ্বারের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ।

যতই দুয়ারে আঘাত করে শুধাই—কে ? কে সে ? ততই চারপাশ থেকে ভেসে আসতে থাকে গান ! গান গান আর গান ! গানের যেন কোনো আরম্ভ নেই, কোনো সমাপন নেই ! আবহমানকাল থেকে যেন চলে আসছে অনাগত কালের দিকে যাবে বলে। যেন ডেকে বলে যায় :

> সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলদারামালা
> তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান

গান ভেসে যায়—

> দিনের পথিক মনে রেখো,
> আমি চলেছিলেম রাতে
> সন্ধ্যা প্রদীপ নিয়ে হাতে

গান ভেসে যায়—

> 'গানের ভেলায় বেলা অবেলায় প্রাণের আশা
> ভোলা মনের স্রোতে ভাসা'

গান ছুটে যায়—

> গানের প্রদীপ তুই যে গানে চলবি ছুটে
> অকূল পানে চপল ঢেউয়ের আকুল তালে

গান ভেসে যায় গানের খোঁজে—প্রেমের খোঁজে—

> আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন
> যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীন
>
> মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন॥

তিনি যে শুধু আমাদের অভ্যস্ত সার্বভৌমত্বটাকে নস্যাৎ করেন তাই নয়, একই সঙ্গে এক বহু স্তরিক ও বহুরৈখিক সার্বভৌমত্বের জন্ম দেন। যেখানে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হয়, হারিয়ে-যাওয়া-নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ গানের ভিতর দিয়ে যখন প্রেমের সন্ধানে ফেরেন তখন এই একটা 'উদাসীন' জায়গা—যেটা বড়ো বেদনার মতো বাজে প্রাণে !

যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।

তাই ভেবেছিলাম, বেশ, সকাল হলে বলব। যখন তুমি থাকবে আমার পাশে।
ফুলের সুবাসে, পাখির গানে সকাল হল। তুমি আমার পাশে আছোও। তবু—

সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে যতই প্রয়াস করি পরান পণে

কিন্তু সে কী এমন কথা, যে কথা সুরের হোমানলে আঁধার-ক্ষণে জ্বলে ওঠে ? কী সে কথা যে কথাটি বলবার জন্য সারাটি জীবন নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কেটে যায় ! এবং সে কথাটি কেনই বা পরানপণ প্রয়াসেও আর সুরে বাজে না—যখন তুমি আছ আমার পাশে ?

যদি প্রেমই হয় (প্রেমই তো), তাহলে তোমার থাকা আর না থাকার মাঝে একটা তৃতীয় অস্তিত্ব তৈরি হচ্ছে। স্থিতিস্বস্তিহীন চলমান অস্তিত্ব। থাকা আর না থাকার মাঝে একটা অন্ধকার পরিখা—এই dimension থেকেই গড়ে উঠছে গান। হয়তো তুমি ছিলে না বলেই, আঁধার-ক্ষণের নিবিড় গহনতা ছিলো বলেই সুরের হোমানলে গান হয়ে জ্বলে উঠল আমার সেই কথাটি যে কথাটি যথার্থ ক্ষণে যথার্থ দোসরকে বলবার জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে নীরবে কাটানো যায় !

এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ভাবনার বিশিষ্টতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর কাব্যিক আধুনিকতা।

কিন্তু এমন যে 'কথা', সে কথা কি বলা যায় ? যায় না। রবীন্দ্রনাথ জানেন বলা গেলেই মিটে যায়। আর মিটে যাওয়া মানেই একটা স্বস্তি—সমাপন। আমাদের আয়ত্তাধীন সার্বভৌমত্বে বাঁধা পড়ে যায় তাঁর গান। কিন্তু তাঁর প্রেমকে যে চতুঃসীম সার্বভৌমত্বে বাঁধতে চান না তিনি। স্বস্তি দিতে চান না আমাদের। কেবলি ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চান। ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চান গানের সঞ্চরমান মূর্ছনায়।

এমন দিনে তারে বলা যায়

তপনহীন ঘন তমসায়

কিন্তু কী বলা যায় ? কোথাও বলা হয় না সে কথা। গানের মধ্যে, তবু, এই না বলা কথাটা এক দূরতিক্রম্য মহিমার দিকে চলে যাচ্ছে ! আয়োজন—আয়োজন—শুধু কথাটি বলবার আয়োজন ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠছে !

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
....
আঁধারে মিশে গেছে আর সব
....
এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়......

এই ঘনঘোর বর্ষার আঁধার যেন এক অশ্রুবাষ্পাতুর ছায়ার অবগুণ্ঠন, যে অবগুণ্ঠন ছাড়া 'কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' করা যায় না।

কিন্তু কথাটা যে কী সে-কথা কোথাও বলা হয় না বলেই বলার কথাটা এত গভীর করে ঘনিয়ে ওঠে মনের ভেতরে। আয়োজন যতই গহন হয়ে উঠছে বলার কথাটাও তত কথার বাইরে চলে যাচ্ছে। কথায় আর তাকে ধরা যাচ্ছে না। কথাটা যেন যুগ-যুগান্তর ধরে ভেসে আসছে, ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে অনাগত যুগের দিকে। 'যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে'—সেই কথাটি বলবার জন্য আর—এক জীবনের দিকে যেন যাওয়া যায়।

এই হল রবি ঠাকুরের গানে প্রেম। একটা দূরতিক্রম্য পরিক্রমণ—

পাগল পরান চলে গেয়ে
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা তোর দুলিয়ে দিয়ে না
ও তোর সুদূর ঘাটে চলরে বেয়ে.....

চলেছে, কেবলি চলেছে—

যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা, পথ হারানোর লাগল নেশা
অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা

আর—

সেই পথ হারানোর অধীর টানে অকূল পথ আপনি টানে
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।

পথের টানে শুধু যাওয়া আর যাওয়া !

তাই তাঁর জিজ্ঞাসা—

পথের শেষ কোথায় ?
শেষ কোথায় ?
কি আছে শেষে ?
এত কামনা এত সাধনা কোথায় মেশে
হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে....

হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।
ব্যথারও হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া—

তবু চলেছে নিরুদ্দেশে !

ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে
ভাব কেঁদে মরে—ভাঙা ভাষা

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা.....

এইসব পথ-চলার গানের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি নানান স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে বদলে বদলে যাচ্ছে। কিন্তু বহমানতা অব্যাহত।

আমাদের আয়ত্ত্বাধীন সার্বভৌমত্বে বাঁধা পড়ে যায় তাঁর গান। কিন্তু তাঁর প্রেমকে যে চতুঃসীম সার্বভৌমত্বে বাঁধতে চান না তিনি। স্বস্তি দিতে চান না আমাদের। কেবলি ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চান। ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চান গানের সঞ্চরমান মূর্ছনায়।

ভাঙা তরী, ভাঙা ভাষা, ভাঙা ফল, ভাঙা বল, ভাঙা বিশ্বাস, ভাঙা ভালোবাসা—তবু, শুধু যাওয়া আসা, তবু, শুধু স্রোতে ভাসা !

মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই
তবু, সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও
ব্যাকুল বাঁশরি
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি
আমি চঞ্চল হে।
আমি সুদূরের পিয়াসি.....

এই সুদূরের পিয়াস রবীন্দ্রনাথের গানে। কাছের নয়। সুদূরের।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যখন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের আনন্দকেই না, ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নতুন নৈশ্চিত্যের মধ্যে দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি তাকে যে অধরা, যে অলোকবাসী, যে কাছের থেকে ধরা দেয় না, দূরের থেকে ডাকে।'

রক্তকরবী নাটকে একটি নিবিড় ঘন মুহূর্তে নন্দিনী বিশুকে বলে, 'যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না—তারপরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলোতো।'

বিশু তখন গেয়ে ওঠে :

আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল, কোন অচেনার ধারে।

শুনেছি, শম্ভু মিত্র নির্দেশিত বহুরূপীর প্রযোজনায় এই অন্তরা থেকেই ধরা হত গানটি। পরে ফিরে আসত—

ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।

প্রেমে, বিরহে এই এক আশ্চর্য রহস্যের খেলা রবীন্দ্রনাথের গানে। কখনো প্রেমের আবরণে বেরিয়ে আসছে বিরহ, কখনো আবার বিরহের পথ ধরে জেগে উঠছে অত্যাশ্চর্য প্রেমের বিতান। তাঁর গানে আমাদের চেনা প্রেম, চেনা বিরহ কখন যে কোন কৌশলে অচেনার গরিমায় গরিমান্বিত হয়ে উঠছে—তার সম্যক দিশা পাওয়া যায় না। চেনা-অচেনা, ধরা-অধরার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় এবং বিমূর্ত জগৎ তৈরি হচ্ছে অথচ একই সঙ্গে সুরের অনতিরেক আবেগে, কথার সহজ সংবেদনায় তা বুকের এত কাছাকাছি যে সঞ্জীবিত না হয়ে উপায় থাকে না। আমাদের প্রেম-চেতনা, বিরহ-বেদনা একটা গরিমাময় অবস্থানের দিকে চলে যায়; দৈনন্দিন চেনা-জানা দুঃখ-বিচ্ছিন্নতার হাত ছেড়ে চলে যাই এক বৃহত্তর প্রেক্ষিতের পথে। যেখানে বিরহে কিছু হারাচ্ছে না। একটা অবস্থান তৈরি হচ্ছে—একটা সংযোজন কখনো কখনো।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে

রবীন্দ্র-গানে বিরহ-বিচ্ছেদ কখনোই আত্মকরুণা করে না। কেঁদে-কেটে আকাশ বাতাস ব্যাকুল করে না ! বরং কখনো কখনো প্রেমকে গভীরতর হয়ে ওঠার, নতুন করে বেঁচে ওঠার প্রেরণা দিয়ে যায়—

বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফলে হৃদয়ের নূতন বাণী
যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা
নয়নে আঁধার রবে ধেয়ানে আলোক রেখা।
সারাদিন সঙ্গোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি

যেমন প্রেমে, তেমনি বিরহেও কোথাও সমাপন নেই।

বিরাম হল আরামহীন যদিরে তোর ঘরে, না যদি রয় সাথি
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে, না যদি জ্বালে বাতি

তারকা আছে গগন কিনারায়।

আয় আয় নিজের আঁধার-কোণে ফিরে আয়। 'তারকা আছে গগন কিনারায়।' আত্মকরুণা নয় ! একটা অন্তর্মুখ জাগিয়ে তোলার গান। ওই তছনছে পটভূমি বা অন্ধকার পরিখা থেকে জেগে উঠছে এক তৃতীয় সত্তা, যে অনেকগুলো স্তরে বিস্তার করে যাচ্ছে সঞ্জীবনী প্রণোদন। এইজন্যেই আমার মনে হয়, রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম এত মহিমাত্মক !

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে এমন অনেক নিরুত্তর এলাকা আছে যেখানে আমার নিরেট করোটি ঠুকে কিম্বা দশ-আঙুলের যূথবদ্ধ মুঠো ঠুকে-ঠুকেও উত্তর পাই না, এমনকি প্রণোদনের মাঝেও আমার বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ মুক্তি মেলে না ! অনেক দুর্জ্ঞেয়, অনেক অজ্ঞেয় রহস্যাঞ্চল আছে তাঁর গানে—। বাহির আগুনে সুরের খেলায় খেলাতে খেলাতে নিয়ে চলে যায় যে কোন অন্তরীক্ষের অন্তঃপুরে ! সেখানে কেবলি 'জানি না'-র সামনে পড়ে যেতে হয়। এই 'জানি না' আমাদের কিন্তু নিকৃষ্টম্মন্য করে না, বা বুদ্ধির অহমিকায় আঘাত করে না। কেননা বাইরে থেকে আমাদের করোটিতে ঘা মেরে তো 'জানো না' বলে না ! না-জানাটা উঠে আসে অন্তঃপুরের মাঝখান থেকে। 'বাইরে থেকে কেমন করে জানবে, আমার তরীর মাঝখান থেকে তো তাকে দেখোনি'। স্বপন তরীর নেয়ে কে ? তাকে বাইরে থেকে জানা যায় না। সুদূর-ঘাটের নেশা যখন পালে হাওয়া লাগায়, তরীতে দোলা লাগিয়ে চরাচর দুলিয়ে দিয়ে যায়—তখন তরীর
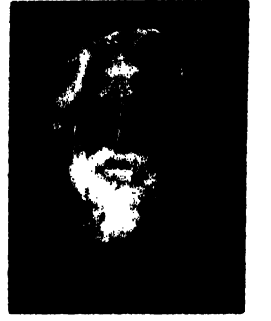
তাঁর গানে আমাদের চেনা প্রেম, চেনা বিরহ কখন যে কোন কৌশলে অচেনার গরিমায় গরিমান্বিত হয়ে উঠছে—তার সম্যক দিশা পাওয়া যায় না। চেনা-অচেনা, ধরা-অধরার মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় এবং বিমূর্ত জগৎ তৈরি হচ্ছে অথচ একই সঙ্গে সুরের অনতিরেক আবেগে, কথার সহজ সংবেদনায় তা বুকের এত কাছাকাছি যে সঞ্জীবিত না হয়ে উপায় থাকে না।
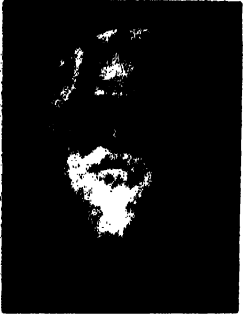
মাঝখান থেকে তাকে দেখতে হয়, নাহলে জানা যায় না।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানই তো উঠে আসছে অনেক না জানার বিস্ময় থেকে ! সেই বিস্ময় থেকেই ঘনীভূত হচ্ছে প্রেমের উপলব্ধি, গড়ে উঠছে গান।

> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান
> কান পেতেছি চোখ মেলেছি ধরার বুকে
> প্রাণ ঢেলেছি
> জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান.....

আকাশ-ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তারই মাঝখানে স্থান পাওয়ার বিস্ময়ে তাঁর গান জেগে উঠছে ! অনর্গল স্বীকারোক্তি তাঁর—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।'

ফুরোয় না বলেই তো এত গান ! এত অফুরান গান ! গানে এত অফুরান প্রেম। প্রেমে এত অফুরান বেদনা ! বেদনায় এত অফুরান চেতনা !

তাই রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের তুচ্ছ অহংবোধ থেকে যেমন, তেমনি দৈনন্দিন দীনতা ও আত্ম-গ্লানির হাত থেকে মুক্তি দেয়। নিজেকে জানার ভেতর দিয়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের একটা আদল গড়ে ওঠে। আমরা কোনো শিল্পকলার দ্বারস্থ হই কেন ? এই জন্যই তো ! বারে বারে বারে বারে তার কাছে যেতে যেতে সে আমাকে একটা উত্তুঙ্গ স্বরূপ দেবে। এবং চর্চায়-চর্চায় জাতি তার আত্ম-পরিচয় খুঁজে পাবে। রবীন্দ্রনাথে আছে সেই প্রাণ সেই উপাদান।

অনর্গল স্বীকারোক্তি তাঁর—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না' ফুরোয় না বলেই তো এত গান ! এত অফুরান গান ! গানে এত অফুরান প্রেম। প্রেমে এত অফুরান বেদনা ! বেদনায় এত অফুরান চেতনা !

যদিও আত্মপরিচয় অবলুপ্তির এবং ব্যক্তি বিশিষ্টতার উৎক্রান্তির কাল আজ। আমরা আমাদের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের গানকে এক অভ্যস্ত উপচার বানিয়ে ফেলেছি, তার চেয়ে নিগূঢ় কোনো চর্যার অধিষ্ঠান আমরা রাখিনি—ভেতরে বাইরে কোথাও জলসার বিনোদনে ঢেকে গেছে যত প্রাণ যত প্রণোদন।

তবু অত্যাশ্চর্য বাস্তব এই যে যখন এত 'আলস-বিলাস কুহক মোহে' পৃথিবী অন্ধ, এত 'প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা,' চারপাশে যখন 'চৌতালে-ধামারে, কে কোথায় ঘা মারে, তেরে কেটে মেরে কেটে—ধাঁ ধাঁ ধাঁইয়ে', তখনও রবীন্দ্রনাথের গান থেকে গেল।

তাইতো বলি,

> তোমাকে দেখার মত চোখ নেই—তবু
> গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
> আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।

তোমার গানের ভেতর দিয়ে জগৎকে হয়তো দেখি না, কিন্তু আমার নিজের আবেগ-অনুভূতি, আমার আলস-উদাস, আমার জেহাদ, আমার প্রেম, আবার বিরহ-আতুরতা, আমার নিবেদন, আমার বিদ্রোহ রূপ খুঁজে পায় তোমার ভাষায়।

যদিও তোমার অনুপ্রবেশ কখনো-কখনো অসহ্য ঠেকে। আমি চাই না আমার অনুভব-অনুভূতির সাম্রাজ্যে তোমার অভিব্যক্তির অনুপ্রবেশ। আমি আমার নিজের ভাষায় কাঁদতে চাই। আমি চাই আমার হাতের উত্তোলিত মুঠো থেকে বেরিয়ে আসুক আমার নিজের জেহাদের ভাষা। আমি চাই আমার নিরুদ্ধৃত প্রেমের চিঠিতে আমার প্রিয়া প্রেমের নতুন সংজ্ঞা খুঁজে পাক।

আমি চাই আমার নিজের ভাষা ! আমার নিজের অভিব্যক্তি ! যত চাই তত টের পাই ভাষাতে বাণীতে সুরে ছন্দে আর ওই অন্ধকার পরিখা থেকে জেগে-ওঠা তৃতীয় অস্তিত্বের উপস্থিতিতে বড়ো বিস্ময়করভাবে তুমি আছ ! তোমার সঙ্গে এই আমার দ্বন্দ্ব এই আমার বিরোধ !

হ্যাঁ বিরোধ-ই ! দ্বন্দ্বই ! তুমি থাকো, কিন্তু আমাকে আমার ভাষায়, আমার অভিব্যক্তিতে কথা বলতে দাও! আমাকে আচ্ছন্ন করে থেকো না। মানবো না তা, মানবো না।

মানবো না মানবো না বলতে বলতে যত দূরে সরে আসি ততই বুঝতে পারি আচ্ছন্নতা নয়, তুমি আশ্রয় হয়ে আছ ! আশ্রয় তো আচ্ছন্ন করে না ! সুরক্ষা দেয় ! বিকাশশীলতার হাওয়া বইয়ে দেয় ভেতরে-বাইরে ! সে হাওয়ায় আমার ভাষারা উড়তে পায় ! হাওয়ায় হাওয়ায় আমার অভিব্যক্তির গায়ে শিহরণ জাগে !

আমার প্রেমকে তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও গভীর গহন অন্তঃপুরে ! আমার বিরহ-আতুরতায় তুমি উদ্ভাসিত করে তোলো প্রেমের গরিমা ! আমার সাফল্যে তুমি নম্রতা দাও ! ব্যর্থতায় আমাকে ভারসাম্য দাও !—আমি খুঁজে পাই আমার নিজের মুখ—আমার অন্তর্মুখের আদল। আশ্রয় ছাড়া কে দিতে পারে সেই মুখ ?

আমি যখন অন্ধকার দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে মরতে বসি, তখন তুমি বন্ধুর মতো পিঠে হাত রাখো। বলো—'হোসনে হোসনে হোসনে দিশাহারা, নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা !'

সত্যিই তো, যখন

> 'কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ
> বহুদিন থেকে শান্তি নেই
> নীড় নেই—'
> 'তখন গভীর বিস্ময়ে টের পাই—তুমি
> আজও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ !'

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা

রবীন্দ্রসংগীতে তাল ও ছন্দ বৈচিত্র

মায়া সেন
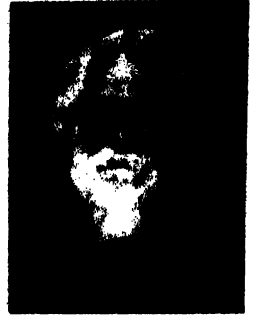
রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রের কবি। তাঁর রচনা বহু ধারায় প্রবাহিত। একাধারে কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা ও গান নিয়ে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। তবে তাঁর বহুপ্রকার রচনার মধ্যে গানকেই রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা হয়।

রবীন্দ্রসংগীত কথা ও সুরের মিলনের অপূর্ব সৃষ্টি। আবার সেই সংগীত বিভিন্ন তাল, ছন্দে বৈভবময় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সংগীতে (বিশেষ করে উত্তর ভারতে) যে সমস্ত তাল ব্যবহৃত হয়েছে, প্রায় সব তালই রবীন্দ্রনাথের গানে আছে।

গান রচনার সময় তাল, ছন্দ নিয়ে তিনি বহুরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর গানকে সমৃদ্ধশালী করেছেন।

বহু প্রচলিত তালকে ভেঙে তিনি অনেক নতুন তালের বা ছন্দের সৃষ্টি করেছেন। আবার একেবারে সংগীতের জগতে যেসব তালের বিশেষ অস্তিত্ব নেই সেই রকম নতুন ছন্দ ব্যবহার করে তিনি বহু নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন। যেমন :

প্রচলিত ১০ মাত্রার তাল ঝাঁপতালকে ছোটো করে ৫ মাত্রার তাল সৃষ্টি করেছেন। সেই তালের নাম অর্ধঝাঁপ।

৮ মাত্রার কাহারবাকে ভেঙে দ্বিমাত্রিক ছন্দে তিনি বহু গান লিখেছেন।

দাদরা ৬ মাত্রা ৩/৩ ছন্দ। মাঝের বিভাজনকে উঠিয়ে দিয়ে পুরো ৬ মাত্রার তালে গান লিখেছেন। অপ্রচলিত ৫ মাত্রার তালে ৩/২/ ছন্দ (ঝম্পক),

রবীন্দ্রসংগীত কথা ও সুরের মিলনের অপূর্ব সৃষ্টি। আবার সেই সংগীত বিভিন্ন তাল, ছন্দে বৈভবময় হয়ে উঠেছে।

অপ্রচলিত ৫ মাত্রার তালে ৩/২ ছন্দ (ঝম্পক), ৩/২/২/২ ৯ মাত্রার তাল নবতাল, ২/৪/৪/৪/৪ ১৮ মাত্রার তাল—নবপঞ্চতাল, ৩/২/২/৪ ১১ মাত্রার তাল—একাদশী ইত্যাদি বহু ছন্দের তাল সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন।

৩/২/২/২ ৯ মাত্রার তাল—নবতাল, ২/৪/৪/৪/৪ ১৮ মাত্রার তাল—নবপঞ্চতাল, ৩/২/২/৪ ১১ মাত্রার তাল—একাদশী ইত্যাদি বহু ছন্দের তাল সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন।

যতদূর সম্ভব সব তালের উল্লেখ করে গানের উদাহরণ দেখিয়ে তালগুলি সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করছি।

৪ মাত্রার তাল ২/২ ছন্দ—
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে

৫ মাত্রার তাল ৩/২ ছন্দ ঝম্পক—
যেতে যেতে একলা পথে

৫ মাত্রার তাল ২/৩ ছন্দ অর্ধঝাঁপ—
দীপ নিবে গেছে মম

৬ মাত্রার তাল ৩/৩ ছন্দ দাদরা—সুনীল সাগরে

৬ মাত্রার তাল টানা ছয় মাত্রা—
একটুকু ছোঁয়া লাগে

৬ মাত্রার তাল ৩/৩ ছন্দ—
আমি ফিরব না রে

৬ মাত্রার তাল ২/৪ ছন্দ ষষ্ঠী—
শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে

৬ মাত্রার তাল ৪/২ ছন্দ উল্টো ষষ্ঠী—
হৃদয় আমার প্রকাশ হল

৭ মাত্রার তাল ৩/২/২ ছন্দ তেওরা—
বিপুল তরঙ্গ রে

৭ মাত্রার তাল ৩/৪ ছন্দ—
তোমার গীতি, জাগাল স্মৃতি

৭ মাত্রার তাল ৩/২/২ ছন্দ রূপক—
হে মন তাঁরে দেখো

৮ মাত্রার তাল ৪/৪ ছন্দ কাহারবা—
সঘন গহন রাত্রি

৮ মাত্রার তাল ২/২/২/২ ছন্দ যৎ—
কেন জাগে না

৮ মাত্রার তাল ৩/২/৩ ছন্দ রূপকড়া—
গভীর রজনী

৯ মাত্রার তাল ৩/২/২/২ ছন্দ নবতাল—
নিবিড় ঘন আঁধারে

৯ মাত্রার তাল ৫/৪ ছন্দ—ব্যাকুল বকুলের ফুলে

৯ মাত্রার তাল ৬/৩ ছন্দ—যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে

৯ মাত্রার তাল টানা ৯ মাত্রা ছন্দ—
দুয়ার মোর পথপাশে

১০ মাত্রার তাল ২/৩/২/৩ ছন্দ ঝাঁপতাল—
মন মোহন গহন

১০ মাত্রার তাল ৫/৫ ছন্দ—ও দেখা দিয়ে যে

১০ মাত্রার তাল ৩/২/৩/২ ছন্দ—
পাখি বলে চাঁপা

১১ মাত্রার তাল ৩/২/২/৪ ছন্দ একাদশী—
দুয়ারে দাও মোরে

১১ মাত্রার তাল ৩/৪/৪ ছন্দ—
কাঁপিছে দেহলতা

১২ মাত্রার তাল ৩/৩/৩/৩ ছন্দ একতাল—
মন্দিরে মম কে

১২ মাত্রার তাল ৩/৩/৩/৩ ছন্দ খেমটা—
এরা পরকে আপন করে

১২ মাত্রার তাল ৩/৩/৩/৩ আড় খেমটা—
আমার প্রাণের পরে

১২ মাত্রার তাল ২/২/২/২/২/২ চৌতাল—
আজি মম মন চাহে

১২ মাত্রার তাল ৪/৪/৪ ছন্দ চতুর্মাত্রিক একতাল—
নয়ান ভাসিল জলে

১৪ মাত্রার তাল ২/৪/৪/৪ ছন্দ আড়া চৌতাল—
শুভ্র আসনে বিরাজে

১৪ মাত্রার তাল ৩/২/২/৩/৪ ধামার—
হরষে জাগো আজি

১৪ মাত্রার তাল ৩/৪/৩/৪ ছন্দ দীপচন্দী—
মেঘ বলেছে যাব যাব

১৫ মাত্রার তাল ৪/৪/৪/৩ ছন্দ পঞ্চম সওয়ারী—
আজি মোর দ্বারে

১৬ মাত্রার তাল ৪/৪/৪/৪ ছন্দ ত্রিতাল—
ডাকে বার বার ডাকে

১৬ মাত্রার তাল ৪/৪/৪/৪ ছন্দ ঢিমা ত্রিতাল—
আজি মম জীবনে

১৮ মাত্রার তাল ২/৪/৪/৪/৪ ছন্দ নবপঞ্চতাল—
জননী তোমার করুণ

তালফেরতা দাদরা/কাহারবা/ষষ্ঠী/ঝাঁপতাল—
নৃত্যের তালে তালে

রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত যত তাল আছে প্রায় সব তালেরই উল্লেখ করা হল।

এ ছাড়াও কিছু তাল আছে যেমন আড়াঠেকা, মধ্যমান ইত্যাদির উল্লেখ বারান্তরে করার অভিপ্রায় রইল।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী

রবীন্দ্রসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
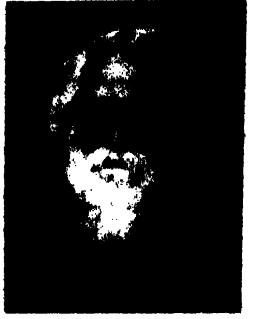
আমাদের বাল্যকালে অর্থাৎ ছয় দশক আগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ এবং রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞদের মধ্যে সম্প্রীতির কিছুটা অভাব ছিল। অধিকাংশ শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ মনে করতেন রবীন্দ্র-সংগীতটা খুব উচ্চমানের সংগীত নয়, গলা একটু ভালো হলে কিছুদিন হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেই গাওয়া যায়। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞরাও এইজন্য তাঁদের ওপর খুব প্রীত ছিলেন না।

গত ছয় দশকে এই দুই সংগীতের ধারার মধ্যে পারস্পরিক মূল্যবোধ এবং আদানপ্রদান অনেকটাই বেড়েছে। প্রথমে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা এবং কণ্ঠসাধনের অনুশীলন করলে শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, রাগপ্রধান, নজরুলগীতি এমন কি লোকসংগীত ও পল্লিগীতি সবই যে অনেক ভালোভাবে গাওয়া যায়, এই সত্যটি আজ অনেকাংশেই স্বীকৃত। ফলে এইসব সংগীতের শিক্ষার্থীদেরও কিছুটা শাস্ত্রীয় গায়নের অনুশীলন করানো হচ্ছে, রবীন্দ্রসংগীতের পাঠক্রমের মধ্যেও শাস্ত্রীয় সংগীত ঢুকেছে।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে, বিশেষত রাগভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে এমন কিছু কিছু

প্রথমে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা এবং কণ্ঠসাধনের অনুশীলন করলে শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, রাগপ্রধান, নজরুলগীতি এমন কি লোকসংগীত ও পল্লিগীতি সবই যে অনেক ভালোভাবে গাওয়া যায়, এই সত্যটি আজ অনেকাংশেই স্বীকৃত।

উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ

সুন্দর ও অকল্পনীয় স্বরসমষ্টি রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন, যেগুলিকে বুঝতে পারলে এবং আহরণ করে শাস্ত্রীয় সংগীতে ব্যবহার করলে তাকে অনেকভাবে সমৃদ্ধ করা যায়, এ তথ্যটি শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞরা, বিশেষ করে কিছু কিছু যন্ত্রসংগীতশিল্পী আজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কেউ কেউ এই কাজে মনোনিবেশও করছেন।

যন্ত্রীদের মধ্যে হুবহু রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজাবার প্রচলন অধিকাংশত গিটার, ইলেক্‌ট্রিক গিটার, বাঁশি ইত্যাদি যন্ত্রে ছিল। সেতার সরোদ ইত্যাদি যন্ত্রে রবীন্দ্রসংগীত বাজাবার বিষয়ে প্রথম পথিকৃৎ ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ। তিনি সর্বপ্রথম সেতারে 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' গানটি রেকর্ড করেন এবং প্রায় হুবহু গানের স্বরলিপির অনুসরণেই করেন।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বিভিন্ন গুরুর কাছে (যার মধ্যে যদুভট্ট প্রধান) রীতিমত শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি যে শাস্ত্রীয় সংগীতের গভীরে কতখানি প্রবেশ করেছিলেন অনেক শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ সে সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নন। রাগের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত সুন্দর (সময় সময় অকল্পনীয়) স্বরসমষ্টি তিনি খুঁজে বার করেছিলেন যেগুলিকে আহরণ করে ঠিকমতো ব্যবহার করলে অনেক অশ্রুতপূর্ব বন্দিশ বা রচনা তৈরি করা সম্ভব। এটা ঠিক যে তাঁর রাগভিত্তিক গানেতেও কোনো কোনো সময় তিনি রাগের রাস্তায় ঠিকঠাক চলেননি, অন্যদিকে চলে গেছেন, কিন্তু সেটা মোটেই রাগজ্ঞানের অভাবে নয়। নিজের সাংগীতিক কল্পনার নির্দেশে এবং এই সব ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ রসসৃষ্টি করেছেন, গানটিকে সংস্কার করে ঠিকঠাক রাগের রাস্তায় নিয়ে এলে সে রস অন্তর্হিত হবে।

যে সমস্ত হিন্দুস্থানি গানের অনুসরণে কবিগুরু নিজের রাগভিত্তিক গান ('ভাঙ্গা গান') সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলিকে নিয়ে এবং তার থেকে রচিত রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ আজকাল মনোমুগ্ধকর অনেক অনুষ্ঠান করছেন। যন্ত্রেও অনেক অনন্য বন্দিশ তৈরি হচ্ছে, গানগুলির বিশেষ বিশেষ অংশ ব্যবহার করে। এই রচনাগুলি হুবহু রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজানোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, শাস্ত্রীয় যন্ত্রসংগীতের যে কোনো বন্দিশের মতোই এগুলিকে বিস্তার এবং গান ইত্যাদি সহযোগে বাজানো যেতে পারে। শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এটি একটি বিশাল দান।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

যে সমস্ত হিন্দুস্থানি গানের অনুসরণে কবিগুরু নিজের রাগভিত্তিক গান ('ভাঙ্গা গান') সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলিকে নিয়ে এবং তার থেকে রচিত রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ আজকাল মনোমুগ্ধকর অনেক অনুষ্ঠান করছেন।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট সরোদবাদক

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রগানে রাগরাগিণী এবং রী শৈলী

প্রদীপকুমার ঘোষ

বাংলার শ্রেষ্ঠ সংগীতশাস্ত্রী প্রয়াত ডঃ বিমল রায় মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথ এবং রাগরাগিণী' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন[১] :

'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছোটগল্পের প্রথম শ্রেণীর লেখক। স্বল্প-কথায় তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ নভেলের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতেন। নিবিড় বাঁধুনি ও সংক্ষিপ্ততা ছিল তাঁর মহৎ গুণ। এই গুণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গানেও। চার মিনিটের গানে তিনি অনেক কিছু বলে গিয়েছেন, যা চুপ করে বসে ভাববার, বিশ্লেষণ করবার। শুধু ভাল লাগার, খারাপ লাগার বা অনুযোগের ব্যাপার নয়। মননশীলতা যে-গানের জন্মদাতা, সে-গানের রসভোগ করার জন্য মননশীল শ্রোতার প্রয়োজন।'

যথার্থই, রবীন্দ্রসংগীতকে বুঝতে গেলে মননশীলতা ব্যতীত সম্ভব নয়। শুধুমাত্র থিয়োরি কিংবা গায়কদের মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একথা বোধহয় কবি নিজেও ভালোভাবে বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই নিজের সম্বন্ধে বলতে পেরেছেন[২] :

> 'যে-সব বই লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বই লিখি নি; সংগীত সম্বন্ধে আমার মাস্টারপীস্‌টা সেই অলিখিত রচনার রত্নভাণ্ডাগারে রয়ে গেল। আমার সব মত যদি নিজেই স্পষ্ট করে লিখে দিয়ে যাব তবে যারা থীসিস্ লিখে খ্যাতি অর্জন করবে তাদের যে বঞ্চিত করা হবে। সেই-সব অনাগতকালের থীসিস-রচয়িতার কল্পচ্ছবি আমার মনের সামনে ভাসছে, তারা একাগ্রচিত্তে অতীতের আবর্জনাকুণ্ড থেকে জীর্ণ বাণীর ছিন্ন অংশ ঘেঁটে বের করে তার প্লট তৈরি করছে—যে অংশ পাওয়া যাচ্ছে না সেইটেতেই তাদের মহোল্লাস। আমি তাদের আশীর্বাদভাজন হতে চাই।'

কিন্তু, রবীন্দ্রগান নিয়ে গবেষণা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ, বিভিন্ন গীতশৈলী, অসংখ্য রাগরাগিণী, স্বদেশি-বিদেশি নানা সুর সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কাউকে আলাদা করে চেনা খুবই মুশকিল। তাদের একটাই পরিচয় হয়ে দাঁড়ালো—গান, রবীন্দ্রগান। নতুন সৃষ্টির তাগিদে রবীন্দ্রনাথের এই যে মিশ্রণের প্রচেষ্টা, এটা তাঁর সহজাত গুণ। শুধু মিশ্রণ নয়, তার সঙ্গে ছিল আশ্চর্য এক প্রতিভা, **আত্মীকরণ করার অমিত প্রতিভা**। যা তাঁর সকল সংগীতসৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ ভাবরাজ্যে পৌঁছে দিত। শ্রোতার মননশীলতা ছাড়া ওই ভাবরাজ্যে পৌঁছে রসাস্বাদন করা সম্ভব নয়। তথাপি গবেষক, সমালোচক ও লেখকগণ মাঝেমধ্যেই কবির সৃষ্ট সংগীতকে নানা দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে পোস্টমর্টেম করে বিচার করতে চেয়েছেন। সেসব চুলচেরা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে তাঁরা কখনও সিদ্ধান্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি বাল্যকাল থেকেই বিষ্ণুপুরী রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধ্রুপদ-শৈলী ও বিষ্ণুপুর ঘরানার রাগ-রাগিণী, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই,

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসংগীতকে বুঝতে গেলে মননশীলতা ব্যতীত সম্ভব নয়। শুধুমাত্র থিয়োরি কিংবা গায়কদের মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।
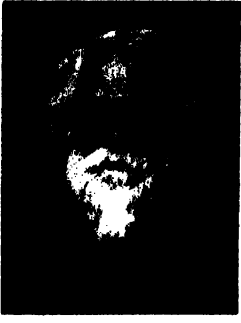
ব্যবহার করেছেন। কেউ বা সংগীতের নানা উপাদানে কবির জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়েও বিরূপ মন্তব্য করতে কসুর করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট কটূক্তি শুনেছেন এবং সময় সময়ে ধৈর্যের পরীক্ষায়ও পরাস্ত হয়েছেন। প্রতিবাদীও হয়েছেন। কবির ভাষাতেই শোনা যাক্ তাঁর প্রতিবাদের কথা—

১. 'কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো। কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, ...।'[৮]

২. 'বাংলাদেশে আমার নামে অনেক প্রবাদ প্রচলিত; তারই অন্তর্গত একটি জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষী-দল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ-সহ দূর ভাবীশতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না। হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে।'[৯]

৩. 'যদিও আমার গান নিয়ে বচসার অন্ত নেই, তবু সেটা আমার মনকে নাড়া লাগায় না। তার একটা কারণ, সুরের সমগ্রতা নিয়ে কাটাছেঁড়া করা চলে না। মনের মধ্যে ওর যে প্রেরণা সে ব্যাখ্যার অতীত। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নিয়ে যে-সব যাচনদারেরা গানের আঙ্গিক বিচার করেন, কোনোদিন সেই-সব গানের মহাজনদের ওস্তাদিকে আমি আমলই দিই নি; এ সম্বন্ধে জাত-খোয়ানো কলঙ্ককে আমি অঙ্গের ভূষণ বলে মেনে নিয়েছি। কলার সকল বিভাগে আমি ব্রাত্য, বিশেষভাবে গানের বিভাগে। গানে আমার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা আমার নিতান্ত জানা—তার চেয়ে বেশি জানা গানের ভিতর দিয়ে অব্যবহিত আনন্দের সহজ বোধ। এই সহজ আনন্দের নিশ্চিত উপলব্ধির উপরে বাঁধা আইনের করক্ষেপ আমাকে একটুও নাড়াতে পারে নি। এখানে আমি উদ্ধত, আমি স্পর্ধিত আমার আন্তরিক অধিকারের জোরে। বচনের অতীত বলেই গানের অনির্বচনীয়তা আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করতে পারে, যদি তার মধ্যে থাকে আইনের চেয়ে বড়ো আইন। গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌঁছয়।'[৯]

কবির উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে তাঁর হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর ব্যাপারে জ্ঞান ও ভাবনা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট নিশ্চিত হতে পারি। প্রথমত, কবির কাছে সাংগীতিক 'রাগ' শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। তার সঙ্গে কৌশলসর্বস্ব ওস্তাদদের রাগ-বোধের মিল নেই। বাদী, সংবাদী, ঠাট, জাতি ইত্যাদি বিচিত্র লক্ষণ-সমন্বিত যে-রাগ ওস্তাদি-বোধ দ্বারা প্রকাশিত হয়—কবির মতে তাতে ভাবের অভাব থাকে। কবির কাছে 'রাগ' হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ভাব। তাই তো তিনি বলেছেন—'রাগরাগিনীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়।'[৮] **সুরের দিক থেকে এই 'ভাব' প্রকাশ করতে হলে স্বরাশ্রিত অভিনয়ের প্রয়োজন হয়।** সে অভিনয় স্বরের উচ্চারণ-ভঙ্গি বা কাকু, বিচিত্র অলংকার এবং ধ্বনির কম্পন, আন্দোলন, স্পর্শন, গমক ইত্যাদির প্রয়োগ খুবই জরুরি। এই প্রয়োগ অবশ্যই পরিমিতভাবে করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন—'Art is never an exhibition but a revelation. exhibition-এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা ব'লে একটা পদার্থ আছে, চলার চেয়ে তার মূল্য কম নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরি। ওস্তাদী গানে সেই জরুরি নেই, ... অথচ সকল আর্টেই সেই অনিবার্যতা আছে, এবং উপাদান-প্রয়োগে তার সংযম ও বাছাই আছে।'[১]

খ্রিস্টজন্মের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সংগীত দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান ছিল। একটিকে বলা হত 'গান্ধর্ব' বা 'মার্গ' এবং অপরটির নাম 'দেশী' অর্থাৎ আঞ্চলিক। শেষোক্ত ধারার তিনটি স্বতন্ত্র রূপ ছিল, যথা—অভিজাত বা নাগরিক, গ্রাম্য, এবং উপজাতীয় বা আদিম।

এবার ভারতীয় সংগীত-ইতিহাসের পাতা ওলটানো যেতে পারে। একটু পুরনো, কিন্তু খুবই জরুরি। খ্রিস্টজন্মের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় সংগীত দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান ছিল। একটিকে বলা হত 'গান্ধর্ব' বা 'মার্গ' এবং অপরটির নাম 'দেশী' অর্থাৎ আঞ্চলিক। শেষোক্ত ধারার তিনটি স্বতন্ত্র রূপ ছিল, যথা—অভিজাত বা নাগরিক, গ্রাম্য, এবং উপজাতীয় বা আদিম। অভিজাত বা নাগরিক সংগীতেরও আবার তিনটি প্রকার ছিল [যেহেতু নগর ছিল তিন প্রকার, যথা—মন্দিরাশ্রিত নগর, দুর্গ-আশ্রিত রাজধানী নগর, এবং বাণিজ্যিক নগর]। এই তিন প্রকার নাগরিক সংগীতের মধ্যে **মন্দিরাশ্রিত নগরে 'প্রবন্ধ' (Composition) সংগীত প্রচলিত ছিল।** প্রবন্ধ-সংগীতের তিনটি ধারা ছিল, যথা—(১) **গীত-প্রবন্ধ**, (২) **বাদ্য-প্রবন্ধ** (তত, আনদ্ধ ও সুষির), এবং (৩) **নৃত্য-প্রবন্ধ**। মন্দিরের পুরোহিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানী নটেরা এই প্রবন্ধ বা কম্পোজিশনগুলি রচনা করতেন এবং নাটমন্দিরে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সেগুলি অব্যবসায়িক সংগীত-শিল্পীরা পরিবেশন করতেন। এই কম্পোজিশনগুলি অনেক ক্ষেত্রে নাট্যাকারে বা পালাকারে সাজিয়ে নর্তন সহ পরিবেশন করা হত। কবি জয়দেবের **'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্'** এমনি এক প্রবন্ধ-সংগীত যা গীত-বাদ্য-নৃত্য 'নাট্যের মালায়' গ্রথিত। এখানে একটা
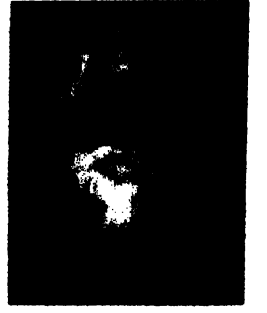
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, **প্রাচীন 'গীত-প্রবন্ধ' (Lyrical compositions) সর্বদাই রাগাশ্রিত।** প্রাচীনকালে রাগাশ্রিত এই গীত-প্রবন্ধগুলিকে 'পদ-গান' বলার রেওয়াজ ছিল, যেমন—'চর্যাপদ' গান, 'বিষ্ণুপদ' গান ইত্যাদি। **'প্রবন্ধ' যেহেতু মন্দিরাশ্রিত নগরের অভিজাত সংগীত, সেহেতু এটি ধর্মীয় প্রকৃতির সংগীত। এই জাতীয় সংগীতের মূল-রচনাটিকে নিয়ে** [যা সংগীত-রচয়িতাদের সৃষ্টি] **গায়ক-বাদক-নর্তকেরা খুশিমতন বিস্তার বা ভাঙাচোরা করতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী গানগুলিও 'প্রবন্ধ'** [অর্থাৎ কম্পোজিশন] **পর্যায়ভুক্ত।** সেসব রচনাকে কোনো গায়কেরই নৈতিক অধিকার নেই নিজের খুশিমতন বিস্তারসহ গাওয়া। সহজ-সরল সাদামাটা ভজন-জাতীয় পদ গান বা গীত-প্রবন্ধ বলেই শিল্পীকে দরদ দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে গাইলেই গানের ভাবটি প্রকটিত হবে। সেখানে ওস্তাদি করার কোনো জায়গা নেই। এবার শুনুন রবীন্দ্রনাথ কী বলছেন :

১. ' ... ... আজকালকার অনেক রেডিয়ো-গায়কও অহংকার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি-সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন।'[৮]

২. ' ... ... গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারও গলায় মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না। আমার যদি গলা থাকত তা হলে হয়তো বা বোঝাতে পারতুম কী জিনিস আমার মনে আছে। আমার গান অনেকেই গায়, কিন্তু নিরাশ হই শুনে।'[৯]

৩. ' ... ... আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয় এইটি তোমরা কোরো। আরো হাজারো গান হয়তো আছে—তাদের মাটি করে দাও-না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি—তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন হয় যে, আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের মুখে নষ্ট হচ্ছে, এ যেন অসহ্য। ... ... বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ—এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো—এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব।'[১০]

হ্যাঁ, এই 'দরদ' আর 'রস'-বোধই রবীন্দ্রগানের সবকিছু। এই জন্যই প্রয়াত সংগীতশাস্ত্রী ডঃ বিমল রায় মহাশয় বলেছিলেন, 'মননশীলতা যে গানের জন্মদাতা, সে-গানের রসভোগ করার জন্য মননশীল শ্রোতার প্রয়োজন।'

এবার আসা যাক অভিজাত বা নাগরিক সংগীতের দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে। এ জাতীয় সংগীত রাজ-দরবারে লালিত হয়। মূল 'কম্পোজিশন' বা প্রবন্ধ পরিবেশন করার পর সুরবিস্তার, পদ-বিস্তার, ছন্দ-বিস্তার ইত্যাদি ক্রিয়া আবশ্যিকভাবে পালিত হয়। **ধ্রুপদ, ধমার, খয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ইত্যাদি কর্মের (অর্থাৎ শৈলীর) গানগুলি সবই দরবারাশ্রিত নাগরিক গান, যার বিস্তারক্রিয়াটি মুখ্য উপজীব্য।** তাছাড়া মন্দিরাশ্রিত গীত-প্রবন্ধ বা পদগানগুলি, অর্থাৎ পদগুলি রচনা করতেন মন্দিরের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায়। এই কারণে এই পদগুলির গঠন, অন্তর্নিহিত ভাব এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে অল্পশিক্ষিত বা সাধারণ-শিক্ষিত **পেশাদার দরবারী গায়কদের দ্বারা রচিত** বন্দীশ্ বা গেয়-পদ অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট। প্রবন্ধ-গানগুলি সহজ-সরলভাবে গাওয়া হত, যা কিছু বৈশিষ্ট্য সবই প্রবন্ধকার নিজেই তার সুরে ও ছন্দে আরোপিত করতেন। প্রাচীনকালে প্রবন্ধকারদের **'বাগ্-গেয়কার'** বলা হত। প্রবন্ধে 'রাগ' ব্যবহৃত হলেও গায়কদের কৌশল দেখাবার কোনো অবকাশ ছিল না। অথচ দরবারাশ্রিত শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় শৈলীর গানগুলি রাগাশ্রিত হলেও বিস্তারক্রিয়া ছিল আবশ্যিক। **শাস্ত্রীয় দরবারী গানে** [যেমন—ধ্রুপদ, ধমার, খ্যাল ইত্যাদি] **রাগের শাস্ত্রীয় লক্ষণগুলি খুব নিষ্ঠাসহকারে পালন করা হত।** সে রাগ শুদ্ধ, সালগ অথবা সংকীর্ণ যাই হোক না কেন। **বিস্তারযোগ্য বলে দরবারী গান কাব্যসংগীতের হয় না।** উপশাস্ত্রীয় সংগীতে রাগ-রাগিণীর শাস্ত্রীয় লক্ষণ ঠিক ঠিক মানা না হলেও বিস্তার-ক্রিয়াকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা যায় না।

কিন্তু, **গীত-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রাগের লক্ষণ-সমন্বিত বিশুদ্ধতা যে রাখতেই হবে তার কোনো মাথার দিব্যি ছিল না। গীত-প্রবন্ধ কাব্য-সংগীত।** তাই, কাব্যের ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য রাগটিকে শুদ্ধ রাখা হবে, না মিশ্র রাখা হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রবন্ধকার বা কম্পোজারের ওপর। রবীন্দ্রগান প্রবন্ধানুসারী বলেই কবি স্পর্ধিত উক্তি করতে পেরেছেন[১১]—

> 'আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ, যে, তাহার নিকটে অমনতরো অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি স্থল বিশেষে মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় কিম্বা মন্দ শুনায় না, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন—আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমন কী ঘুষ খাইয়াছি যে তাহার এত গোলামি করিতে হইবে।'

একেবারে **খাঁটিকথা। প্রবন্ধ বা কম্পোজিশন যে ধ্রুপদ-ধমার-খয়াল শ্রেণির দরবারী শৈলীর গান নয়—একথাটা তথাকথিত তাত্ত্বিকেরা প্রায়ই ভুলে যান।** দক্ষিণ

প্রাচীনকালে প্রবন্ধকারদের 'বাগ্-গেয়কার' বলা হত। প্রবন্ধে 'রাগ' ব্যবহৃত হলেও গায়কদের কৌশল দেখাবার কোনো অবকাশ ছিল না। অথচ দরবারাশ্রিত শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় শৈলীর গানগুলি রাগাশ্রিত হলেও বিস্তারক্রিয়া ছিল আবশ্যিক।

বাংলাদেশে চর্যাপদের যুগে গীত-প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছু প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ বাংলায় সে-সময়ে রাগগুলি ছিল পদগানের উপযোগী। ফলে, রচয়িতারা আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত রাগগুলির মোটামুটি একটা কাঠামো বজায় রেখে দু-একটি স্বরের সংযুক্তিকরণ-বিযুক্তিকরণ করতেন।

ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল কম্পোজিশনগুলির কথা ভেবে দেখুন। ত্যাগরাজ, শ্যামাশাস্ত্রী, মুত্তুস্বামী দীক্ষিতর প্রভৃতি কম্পোজারদের রচনাগুলি রাগাশ্রিত হয়েও প্রায়শ গানে রাগ-বহির্ভূত 'অন্য স্বরম' ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে কিন্তু দক্ষিণী সংগীত-সমালোচকরা ত্যাগরাজ প্রভৃতিদের বিরূপ সমালোচনায় বিদ্ধ করেননি, যেমন নিত্যদিন বিদ্ধ হতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে। **গীত-প্রবন্ধের বিধি** অনুসারে প্রবন্ধের শীর্ষদেশে রাগ ও তালের উল্লেখ করতেই হতো। **কিন্তু, সেখানে রাগের মানেটা ধ্রুপদ-ধমার-খয়ালের মতন নয়।** অথচ, প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র ও সংগীতরীতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানার্জন ছাড়াই, রবীন্দ্রনাথের কম্পোজিশনে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর রূপ নিয়ে, অবাঞ্ছিত বাগবিতণ্ডা করেন তথাকথিত উস্তাদেরা। এ জিনিস কবির জীবিতকালে যেমন ছিল, মৃত্যুর পরেও তা বিন্দুমাত্র কমেনি। গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কম্পোজিশনের শীর্ষদেশে, প্রবন্ধরীতি অনুসারে, রাগ ও তালের নামোল্লেখ করলেও পরবর্তীকালে সমালোচকদের বিদ্যের দৌড় দেখে ওই প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দুটি পত্রে জানিয়েছেন[১১] :

১. 'গানের কাগজে রাগ-রাগিণীর নাম-নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে।'

২. ' ... ... ওস্তাদরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তারপরে যদি নামেরও ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়?'

তথাকথিত ক্রিটিকেরা রবীন্দ্রনাথের রাগরাগিণী প্রয়োগের ব্যাপারে দুটি সরলীকৃত সমাধান-সূত্র প্রায়শই আমাদের দিয়ে থাকেন। একটি হচ্ছে, বিষ্ণুপুর ঘরানার রাগ। এবং অপরটি হচ্ছে রবীন্দ্রসৃষ্ট রাগ। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এইরকম সরলীকৃত সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই গবেষণার পরিপন্থী। প্রচুর খোঁজ-খবর ও অনুসন্ধান না করে এ রকম সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে আমাদের কোনোভাবেই সাহায্য করবে না।

বাংলাদেশে চর্যাপদের যুগে গীত-প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছু প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ বাংলায় সে-সময়ে রাগগুলি ছিল পদগানের উপযোগী। ফলে, রচয়িতারা আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত রাগগুলির মোটামুটি একটা কাঠামো বজায় রেখে দু-একটি স্বরের সংযুক্তিকরণ-বিযুক্তিকরণ করতেন। **'দেশী' বা আঞ্চলিক রাগ-রাগিণীর ক্ষেত্রে সেটা দোষের ছিল না।** পঃ সোমনাথের লেখা **'রাগ-বিবোধ'** (১৬০৯ খ্রিঃ) প্রভৃতি পড়লে এই সত্য সম্বন্ধে আপনারা নিঃসন্দিহান হতে পারবেন। যাই হোক, চর্যাপদ-গানের অন্তিমকালে বাংলায় কর্ণাটদেশীয় 'সেন' রাজারা রাজত্ব করতে আসেন। ফলে, তাঁদের রাজত্বকালে **অনেক কর্ণাটিক রাগ বাঙ্গালিরা আত্মস্থ করে।** ফলে, বল্লাল সেনের আমল থেকে বাংলায় দুরকম রাগ-প্রকৃতি প্রচলিত রইল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

প্রবন্ধগানের যুগ থেকে বাংলা শুদ্ধ-মধ্যমের 'টোড়ী' (স-ন্ঋ-জ্ঞ-ম-প-দ-ন) প্রচলিত ছিল। তারপরে কর্ণাটকী **'হনুমত্-টোড়ী'** (হিন্দুস্থানী ভৈরব থাট, অর্থাৎ স-ন্ঋ-জ্ঞ-ম-প-দ-ণ) বাঙ্গালিদের উচ্চারণ দোষে দুষ্ট হয়ে কারো কারোর কাছে শুধুমাত্র 'টোড়ী' অথবা 'তোড়ী'-তে রূপান্তরিত হল। বহু পরবর্তীকালে, রবীন্দ্রগানের সমালোচকরা হিন্দুস্থানী বা ভাতখণ্ডের জ্ঞানে স্নাত হয়ে একে 'ভৈরবী' রাগ হিসেবে সনাক্ত করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গানে একে 'তোড়ী' রাগ হিসেবে উল্লেখ করতে দেখে তাঁরা নাক কুঁচকে নিজেদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। যাই হোক্, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙ্গালিরা, উস্তাদবর্গের কৃপায়, 'কড়ি-মা' সমন্বিত 'টোড়ী' রাগ (স-ন্ঋ-জ্ঞ-ম্ম-প-দ-ন) লাভ করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, **প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে রাগ-রাগিণীর ব্যাপারে বাংলায় তিনটি মত প্রচলিত ছিল**, যথা—(ক) **প্রাচীন মত**, যা প্রবন্ধে ব্যবহৃত হত; (খ) **কর্ণাটকী মত**, যা তৎকালীন বাংলা পদ-কীর্তনে, নাটগীতে এবং অন্যান্য নাগরিক গানে ব্যবহার করা হত; এবং (গ) **হিন্দুস্থানী মত**, যা ১৮শ শতকের দ্বিতীয়-অর্ধ থেকে নাগরিক বাংলা গানে ব্যবহার্য ছিল এবং যা সেনী, বেতিয়া, গোয়ালিয়র, আগ্রা প্রভৃতি ঘরানা ভেদে একই রাগের ভিন্ন ভিন্ন রাগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হত। বিষ্ণুপুরীরা এবং বাংলার প্রাচীন কীর্তনীয়ারা পূর্বোক্ত (ক) ও (খ) শ্রেণির রাগ-রাগিণী অনুসরণ করতো। কারণ, তখন হিন্দুস্থানী পদ্ধতি বাংলায় প্রচলিত হয়নি। **পরবর্তীকালে, বিশেষত ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিষ্ণুপুরের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সংগীতগুণী অন্যান্য সংগীত-ঘরানায় সংগীতশিক্ষা পেয়ে আপন আপন গ্রন্থে অন্য ঘরানার বন্দীশগুলি স্বরলিপি সহ সংকলিত করেছেন। তার মানে এই নয় যে, সংকলিত ওই গানগুলি সবই বিষ্ণুপুর ঘরানার গান কিংবা রাগ-রাগিণী।** রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তাঁর অনুজ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাদিতে সংকলিত রবীন্দ্রসংগীতের মূলগানগুলি দেখে **ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষ্ণুপুরী মতকে অনুসরণ করেছিলেন।** খুব কম লোকই জানেন, তানসেন পরম্পরার হৈদর খাঁ থেকে সৃষ্ট বেতিয়া ঘরানার গুরুপ্রসাদের শিষ্য ছিলেন

সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। পাথুরেঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবার-গুণী ছিলেন বান্দা সেতার-ঘরানার উমরাও খাঁ-র শিষ্য সজ্জাদ মুহম্মদ। এঁর শিষ্য ছিলেন বিষ্ণুপুরী নীলমাধব চক্রবর্তী, যাঁর অন্যতম শিষ্য হলেন সংগীতনায়ক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে আরেকটি কথা সাধারণ সংগীতপ্রেমীদের জানিয়ে রাখি। ঘরানা পদ্ধতিতে সংগীতশিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, কোনো শিক্ষার্থীই তাঁর পূর্বতন ঘরানার সংগীত পরিবেশন রীতি, বর্তমানে যে-ঘরানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে প্রয়োগ করতে পারবেন না। অর্থাৎ, বর্তমানে একজন শিক্ষকের কাছে গান বা বাজনা শিখতে শিখতে অন্য কোনো ঘরানার শিক্ষকের রীতি অনুসরণ করা শুধু যে অনৈতিক তা নয়, এ অভ্যাস বরদাস্তও করা হয় না সংগীত-সমাজে।

পুরনো দিনে অর্থাৎ বিষ্ণুপুর ধ্রুপদ-রীতির প্রবর্তক সংগীতাচার্য রামশংকর ভট্টাচার্যের (১৭৬১-১৮৫৩ খ্রিঃ) সময়কালে **বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের যে সরল অথচ ভাবগম্ভীর রূপ** [প্রাচীন গীত-প্রবন্ধ অনুসারী] প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে এই ঘরানার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সংগীতগুণীদের অন্যান্য ঘরানায় তালিম নেওয়ার ফলে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের প্রাচীন রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। **রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরী রীতিকে খুবই পছন্দ করতেন তার সরল অথচ ভাবগম্ভীর রূপের জন্য।** এ জাতীয় ধ্রুপদ-শৈলীকে সংগীতশাস্ত্রে **'ডগর-বাণী'** বা **'ডাগুরী বান'** বলা হয়েছে। হিন্দুস্থানী সংগীতের উস্তাদরা এ জাতীয় সাদামাটা গীতশৈলীকে **'হভেলী'** স্টাইলরূপে চিহ্নিত করে থাকেন। **গুরুদেবের গানও 'হভেলী' শৈলীর পর্যায়ে পড়ে।** আর, এই মিল থাকার জন্যই তিনি পরবর্তীকালে গোপেশ্বরবাবুর খোঁজ করেছিলেন—

'শান্তিনিকেতনে হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করি। ... ... তখনই আবিষ্কার করা গেল বাংলাদেশে একমাত্র হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদ আছেন শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর। আর যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ তাঁর সমকক্ষ নন, এবং অনেকে তাঁরই আত্মীয়। আমি তাঁকেও শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কাজের জন্যে পেতে ইচ্ছা করেছিলুম। ... ...

যাঁরা সংগীতব্যবসায়ী নন, বাংলাদেশে তাঁদের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ কেউ আছেন কি না সে কথা বলা কঠিন। ... ...

... ... গোপেশ্বরবাবুর গানের স্টাইলটা বিষ্ণুপুরী বলে কেউ কেউ তাঁর ওস্তাদিতে কলঙ্ক আরোপ করে থাকেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রদেশভেদে সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েছে। বৈদর্ভী রীতি, গৌড়ীয় রীতি প্রভৃতি রীতির বিশিষ্টতা তিরস্কৃত হয় নি। ... ... তেমনই হিন্দুস্থানী গান বাংলাদেশে যদি কোনো বিশেষ রীতি অবলম্বন করে থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হবে। সেই রীতির মধ্যেও যে উৎকর্ষের স্থান নেই তা বলা চলে না। যদুভট্টের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিষ্ণুপুরী রীতিতেই; রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিমদেশী শ্রোতারা যদি এই রীতির গান পছন্দ নাও করে, তবে সেটাকেই চরম বিচার বলে মেনে নেওয়া চলে না। রসবোধ সম্বন্ধে মতভেদ অভ্যাসের পার্থক্যের উপর কম নির্ভর করে না। এমনও যদি ঘটে যে, কোনো বিশেষ গায়কের মুখে বিষ্ণুপুরী রীতির গান সত্যই প্রশংসাযোগ্য না হয়ে থাকে, তাতে সাধারণভাবে বিষ্ণুপুরী রীতিকে নিন্দা করা উচিত হয় না। শত শত গায়ক আছে যারা হিন্দুস্থানী দস্তুর-মতোই গান গেয়ে শ্রোতাদেরকে পীড়িত করে, সেজন্যে হিন্দুস্থানী রীতিকে কেউ দায়ী করে না।'[১০]

কোনো কোনো রবীন্দ্রানুরাগী লেখক, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখদের সম্পর্কের কারণে, তৎসহ সংগীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা দেখে ধারণা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরী স্টাইল অনুসরণ করেই তাঁর স্বকীয় সংগীতরীতি সৃষ্টি করেছেন। একজন সংগীত-গবেষকের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না নিম্নলিখিত কারণে—

১. জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সংগীতচর্চার ব্যাপারে সবচেয়ে প্রভাব যাঁর বেশি ছিল তিনি হলেন **বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী** (১৮০৪-১৯০০ খ্রিঃ)। বিষ্ণু সেনীয়া রীতির ধ্রুপদ শিখেছিলেন হসনু খাঁ এবং দিলাবর খাঁ-র কাছে। সেনীয়া রীতির ধ্রুপদ ছিল **'গওরহারী'** বা গোয়ালিয়রী বানের ধ্রুপদ, **যার চলন ছিল সরল, মীড় ও আঁস নামক অলংকার সমন্বিত।** গমকের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত পরিমিত। **রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ গানেই এই সেনীয়া রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।** ঠাকুর পরিবারের বহু সদস্যই এঁর কাছে গান শিখেছিলেন।

২. রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় এসেছিলেন **যদুভট্ট** (১৮৪০-১৮৮৩ খ্রিঃ)। ইনি প্রথম জীবনে মাত্র বছর তিনেক ধ্রুপদ শিখেছিলেন বিষ্ণুপুরী শৈলীর প্রবক্তা রামশংকর ভট্টাচার্যের (১৭৬১-১৮৫৩ খ্রিঃ) কাছে। তারপর তিনি সুদীর্ঘকাল তালিম নিয়েছিলেন **খাণ্ডার-বানের গায়ক গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮০৮-১৮৭৪ খ্রিঃ)** কাছে। খাণ্ডার বানের গান বীর-রসাত্মক হলেও তাতে মধুর গমক, ছুট এবং অল্প-পরিমাণ মীড়, আঁস প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, **যদুভট্ট যখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে সংগীত-শিক্ষক হয়ে যোগদান করেন (আনুমানিক ১৮৭৩ খ্রিঃ), তখন কিন্তু তিনি আর বিষ্ণুপুরী-গায়ক নন, ছিলেন মিশ্রী-ঘরানার**

রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুপুরী রীতিকে খুবই পছন্দ করতেন তার সরল অথচ ভাবগম্ভীর রূপের জন্য। এ জাতীয় ধ্রুপদ-শৈলীকে সংগীতশাস্ত্রে 'ডগর-বাণী' বা 'ডাগুরী বান' বলা হয়েছে।

[কারণ, গঙ্গানারায়ণ ছিলেন দিল্লী-ঘরানার মীর নসীরামের ছাত্র] খাণ্ডার-বানীর গায়ক। যদুভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বছর দেড়-দুই ছিলেন।

৩ যদুভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে ত্রিপুরা রাজদরবারে যোগদানের সময় (১৮৭৫ খ্রিঃ) কিংবা কয়েকমাস আগে বরোদা রাজ-দরবারের প্রখ্যাত ধ্রুপদী ও বীণকার মৌলা বক্স (১৮৩৩-১৮৯৬ খ্রিঃ) ঠাকুরবাড়িতে আসেন এবং ১৮৭৫ সালের 'হিন্দুমেলা' বার্ষিক উৎসবে বক্তা এবং গায়ক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর কাছে শেখা কিছু ধ্রুপদ ঠাকুরবাড়ির মনীষীরা তাঁদের ব্রহ্মসংগীত রচনায় অনুসরণ করেন। মৌলা বখস্ কোনোভাবেই বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন না। মৌলা বক্সের সংগীতগুরু ছিলেন ঘসীট খাঁ। মৌলা বখস্ কিছুকাল পাথুরেঘাটার সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারেও ছিলেন।

৪. মৌলা বখস্ কোলকাতা ত্যাগ করে বরোদায় চলে যাবার পর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আসেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩-১৯২৪ খ্রিঃ)। বাল্যকালে সংগীতের হাতেখড়ি বিষ্ণুপুর ঘরানার অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩২-১৮৯৬ খ্রিঃ) কাছে। তারপর ১৮৭৮-৭৯ সালে রাধিকাপ্রসাদ কোলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু এর ঠিক আগে যদুভট্ট প্রায় একবছর তাঁর স্বগ্রাম বিষ্ণুপুরে অবস্থান কালে, রাধিকাপ্রসাদের পিতা এবং যদুভট্টের অন্তরঙ্গ বন্ধু জগৎচাঁদের অনুরোধক্রমে যদুভট্ট সামান্য দু-চারটি ধ্রুপদ শিখিয়েছিলেন রাধিকাপ্রসাদকে। এটি মোটামুটি ১৮৭৭ সালের ঘটনা। সেই সময় যদুভট্ট আর বিষ্ণুপুরী রীতিতে গান গাইতেন না। বঙ্গসমাজে তখন তিনি খাণ্ডার বানীর গায়করূপে অতি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। কোলকাতায় আসার পর রাধিকাপ্রসাদ বেতিয়া ঘরানার ভ্রাতৃদ্বয় শিবনারায়ণ মিশ্র এবং গুরুপ্রসাদ মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের কাছে তিনি ১৮৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত একটানা তালিম নেন। অতএব, প্রমাণিত হয় রাধিকাপ্রসাদের 'বিষ্ণুপুরী শিক্ষা' গোপেশ্বর ও রামপ্রসন্নের পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খুব অল্পকাল। সুতরাং রাধিকাপ্রসাদ বিষ্ণুপুরের মানুষ হলেও 'বিষ্ণুপুর ঘরানার' প্রতিভূরূপে চিহ্নিত হতে পারেন না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ওপর বিষ্ণুপুরী প্রভাব, বিশেষত রাগরাগিণী রূপ এবং ধ্রুপদাঙ্গ ভাঙা গানের ক্ষেত্রে, খুব বেশি থাকা সম্ভব নয়। অন্তত ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত, যতদিন না তিনি জোড়াসাঁকোর পাট চুকিয়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হচ্ছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ওপর বিষ্ণুপুরী প্রভাব, বিশেষত রাগরাগিণী রূপ এবং ধ্রুপদাঙ্গ ভাঙা গানের ক্ষেত্রে, খুব বেশি থাকা সম্ভব নয়। অন্তত ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত, যতদিন না তিনি জোড়াসাঁকোর পাট চুকিয়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা হচ্ছেন। তবে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর বিষ্ণুপুরী প্রভাব পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ি ছাপিয়ে জোড়াসাঁকোতে তার ছিটেফোঁটা পড়েনি এমন নয়। প্রাচীন বিষ্ণুপুরী স্টাইল বুঝতে হলে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী রচিত এবং ঝিঁঝিট রাগ ও চৌতালে নিবদ্ধ 'ভেরো রি নয়নবান' গানটিকে ভেঙে রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি মধুর রূপে' (স্বরবিতান ২২) গানটি মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। বুঝতে হবে, মীড়-আঁশ-স্পর্শন-আন্দোলন ইত্যাদি অলংকার সমন্বিত রবীন্দ্র-শৈলীর সঙ্গে তার তফাতটা কোথায় !

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে, তখনও গানের শিক্ষক প্রয়োজন হয়নি। কারণ, এই কাজের ভার তিনি স্বহস্তে রেখেছিলেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬ খ্রিঃ) পৌত্র এবং দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬২-১৯২২ খ্রিঃ) পুত্র সংগীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫ খ্রিঃ) ও কবি অজিত চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮ খ্রিঃ)। তারপর ১৯১৩-১৪ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন মহারাষ্ট্রীয় ধ্রুপদ-খয়াল্ প্রভৃতির গায়ক এবং বীণ-বাদক ভীমরাও হসুরকর (শাস্ত্রী)। ইনি গোয়ালিয়র ঘরানার শিল্পী ছিলেন। তারপরে আসেন ১৯১৯ সালে বিষ্ণুপুরের গায়ক নকুলেশ্বর গোস্বামী। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়েস ৫৮ বছর। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ সুরকার ও গীতিকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই নতুন করে তাঁর বিষ্ণুপুরী স্টাইল রপ্ত করার দরকার হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১। রবীন্দ্রনাথ এবং রাগরাগিণী—ড. বিমল রায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা। ২য় সংখ্যা।
২। সুর ও সংগীত—সংগীতচিন্তা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ১২৬।
৩। সংগীত ও ভাব। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৯৯ সং। পৃঃ ২৬৮-২৬৯।
৪। সুর ও সংগতি। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৩০।
৫। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্রাংশ। সংগীতচিন্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২০১।
৬। সংগীত ও ভাব। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২।
৭। সুর ও সংগতি। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১৩১-১৩২।
৮। জানকীনাথ বসুকে লেখা পত্র। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৫০।
৯। আলাপ-আলোচনা। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ১১৮।
১০। অভিভাষণ। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৬১-২৬২।
১১। সংগীত ও ভাব। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৯।
১২। বিবিধ প্রসঙ্গ : পত্রে। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৪৫।
১৩। বিবিধ প্রসঙ্গে। সংগীতচিন্তা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৩১-২৩৩।

লেখক পরিচিতি : সংগীত বিশেষজ্ঞ, প্রাবন্ধিক

রবীন্দ্রসংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব

দিনেন্দ্র চৌধুরী

লোকসংগীত পারম্পরিক চেতনায় আচ্ছন্ন হওয়ার গুণাবলী নিয়েই তার প্রাচীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবেগ অনুভূতির ব্যাপ্ত প্রকাশে তার শাশ্বত প্রাণশক্তি জাতির মনে সক্রিয় থেকে একটি সার্থক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সুর ভাব ভাষা আর আঞ্চলিকতার আদর্শ নিয়ে তাঁদের রচনা সম্পদে ঋদ্ধ করেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরবর্তী প্রজন্মের রচয়িতাগণ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লোকসংগীত সম্পর্কে আত্মিক সংযোগ ঘটে পল্লীবাংলায় অবস্থানকালে। পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের লোকগান শ্রবণ ও সংগ্রহ প্রয়াস তখন থেকে তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হয়। ওই সব অঞ্চলে জমিদারি দেখভালের আসরে অনেক বাউল ফকির লোকগীতি

গায়কের বা শৌখিন ধারার গায়কবৃন্দের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের পরিবেশিত গান তত্ত্ব সুর আর অনাড়ম্বর অথচ ঐতিহ্যমণ্ডিত গায়নশৈলী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে, একথা সুবিদিত।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনায় তিনি বাউলের সুর আরোপ করে এক নতুন ধারার সংগীত সৃজনে সক্ষম হন, রাগরাগিণীর সঙ্গে লোকসংগীতের প্রাণময় ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়ে। রবীন্দ্রসংগীত তাই স্বমহিম বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বাউল গানের মোহময় সৌন্দর্য তাঁকে এতটাই আবিষ্ট করেছিল যে, তার প্রভাব উপেক্ষিত না হয়ে শুধুমাত্র অনুকৃতির জালে আবদ্ধ হয়নি, পরন্তু বৈদগ্ধ্য, চিন্তা ও মননের স্বাক্ষর রেখেছে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। ভাবের গভীরতায়, ভাষার সারল্যে, সুরের অনুপম মাধুর্যে ও নান্দনিকতায় যা অতুলনীয় শিল্পকীর্তিরূপে কালজয়ী।

বৃহৎ বাংলার বিভিন্ন সাধকমণ্ডলীর সাধনধারা এবং সংগীতের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতি বিশ্বাস আবার নিরীশ্বরবাদীদের সাধন প্রক্রিয়া, জীবনচর্যা নিয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসার কথা মুদ্রিত হয়েছে নানা গ্রন্থে। বাউল গানের নিজস্ব কোনও সুর নেই। সাধনার তত্ত্বাদি বিধৃত কথাবস্তুকে ভিত্তি করেই তার বিস্তার, যা আঞ্চলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার বাউল ফকির সাধনার এক উজ্জ্বল পর্বরূপে গণ্য হয়। এই সময়ের বিখ্যাত সাধক লালন ফকির, দ্বিজ কানাই, গগন হরকরা, হাসন রাজা, কাঙাল হরিনাথ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নাম। এঁদের রচিত গানের সুরে আঞ্চলিকতাভিত্তিক নিজস্ব একটি স্টাইল বা প্যাটার্ন গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে সকলেই বাউল সাধনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন নয়, কেউ কেউ শৌখিন ধারার গান লিখেও প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকার অর্জন করেন।

মূলত কুষ্টিয়ার কাঙাল হরিনাথ, যিনি 'ফিকির চাঁদ' নামে সমধিক পরিচিত, তাঁকে ঘিরে একটি শখের বাউল দলের সৃষ্টি হয়। যার মধ্যে জলধর সেন,

জীবনের বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনায় তিনি বাউলের সুর আরোপ করে এক নতুন ধারার সংগীত সৃজনে সক্ষম হন, রাগরাগিণীর সঙ্গে লোকসংগীতের প্রাণময় ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়ে। রবীন্দ্রসংগীত তাই স্বমহিম বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়, গোলক বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও মীর মশারফ হোসেন ছিলেন অন্যতম। ফিকির চাঁদ ভনিতায় সকল গানের রচয়িতা তিনি ছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের রচনা ও ফিকিরচাঁদী গানরূপে পরিচয় লাভ করেছিল, সাম্প্রতিক কিছু আলোচনায় সে সব তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ফিকিরচাঁদী গানের সুরের প্রভাব সব থেকে বেশি বলে মনে হয়। কিছু গানের ভাব, রস, ভাষা ও সুরের আলোচনায় তা প্রকটিত।

কাঙালের সুরে প্রভাবিত রবীন্দ্রগান :

কাঙাল : *ভোলামন কি করিতে কি করিলি*
সুধা বলে গরল খেলি

রবীন্দ্র : *আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—*
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।

কাঙাল : *আমারে পাগল করে যে জন পালায়*
কোথা গেলে পাব যে তায়

রবীন্দ্র : *যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়,*
দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,

কাঙাল : *বসায়ে সখের মেলা রসের খেলা*
দিন দুই চার খেললে ভালো

রবীন্দ্র : (ক) *হৃদয়ের এ কূল, ও কূল, দু কূল ভেসে যায়,*
হায় সজনি,
(খ) *নিশিদিন ভরসা রাখিস,*
ওরে মন, হবেই হবে।

কাঙাল : *যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে*
তবে কি আর এমন ক'রে লুকিয়ে থাকতে পারতে

রবীন্দ্র : *ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে পরান খুলে,*
ডাক্ ডাক্ ডাক্ ফিরে ফিরে
দেখব কেমন রয় সে ভুলে।।

ভাবানুসরণে মিল :

কাঙাল : *ঐ দেখো ডুবলো বেলা ভাঙলো খেলা*
দেখে খেলা বাড়ী চলো

রবীন্দ্র : *যখন ভাঙল মিলন-মেলা*

কাঙাল : *হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হলো*
পার করো আমারে

রবীন্দ্র : *দিনের শেষে ঘুমের দেশে*
ঘোমটা পরা ঐ ছায়ায়
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ....
ওরে আর আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন শেষের শেষ খেয়ায় ......ইত্যাদি।

একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে অনেক কিছু শুনতে হয়, জানতে হয়, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে হয়। সৃষ্টিকর্মে কখন অবচেতন থেকে সংগৃহীত সেই সব সম্পদ নেমে আসে তা বুঝি স্রষ্টার নিজেরও অজ্ঞাত থাকে।

এখানে একটি কথা বলা সংগত হবে। ভাঙা গান বা উৎস সংগীত অর্থে মূল গানের অবিকল অনুসরণ নয়। কোনও স্রষ্টা তা সচেতনভাবে করেনওনি। একজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে অনেক কিছু শুনতে হয়, জানতে হয়, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে হয়। সৃষ্টিকর্মে কখন অবচেতন থেকে সংগৃহীত সেই সব সম্পদ নেমে আসে তা বুঝি স্রষ্টার নিজেরও অজ্ঞাত থাকে। এভাবেই পারম্পর্যের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়েই এক-একটি সুর শৈলীকে অবলম্বন করে নতুন রঙে রসে ভাবে সাজিয়েছেন তাঁর বিপুল সংগীত ভাণ্ডার।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা যদি আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন রচিত একটি গান :

(ক) *দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা*
তারে ধরি ধরি মনে করে ধরতে গেলে ধরা দেয় না

এ গানের সুরের অনুরূপ অন্য একটি বিখ্যাত গান :

(খ) *যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী*
ও সব বিমল তটে রূপের হাটে বিকাও নীলকান্তমণি

এই সুরের আদলে নির্মিত রবীন্দ্র গান :

(ক) *ভেঙে মোর ঘরের চাবি*
নিয়ে যাবি কে আমারে

(খ) *আমারে কে নিবি ভাই*
সঁপিতে চাই আপনারে

[*বিসর্জন নাটকের গান।*]

শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ কিংবা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম' গ্রন্থে এ রকম অজস্র গানের উল্লেখ রয়েছে। সময়ান্তরে মঞ্চে, রেকর্ডে, রেডিওয় বা অনুষ্ঠানে শিল্পীরা তা পরিবেশন করেছেন।

এ ছাড়া সুভাষ চৌধুরী পরিচালিত এইচ এম ভি প্রকাশিত 'রূপান্তরী' (৪ খণ্ডে) নামীয় ভাঙা গানের সঙ্কলনটি একটি মূল্যবান সংযোজন। এতে প্রচলিত ধারণার প্রেক্ষিতে রচিত প্রায় সব কটি গানই রেকর্ডে বিধৃত হয়েছে।

দীন বাউল ভণিতায় গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি মৃত্যু চেতনার গান :

বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে
শ্মশান ঘাটে যাচ্ছো চলে।

সুরগত মিল আছে কাঙালের গানে, যা পূর্বে উল্লিখিত :

বসায়ে সখের মেলা রসের খেলা
দিন দুই চার খেললে ভালো।
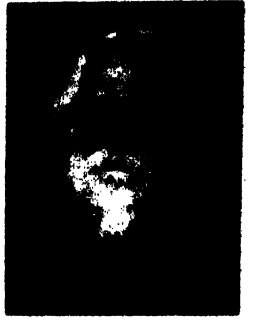
রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ডঃ অরুণ বসুর ভাষায় 'বিভাসের স্বর-বিন্যাস-প্রণালী যা অসংখ্য লৌকিক গানে বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। ...এই ধরনের বহু গানে আবার আশ্চর্য নৈপুণ্যে একদিকে সারি গানের ভঙ্গি ও অন্যদিকে কীর্তনের ভঙ্গিকে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন।'

(ক) বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে,
(খ) ওলো সই ওলো সই
(গ) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
(ঘ) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
(ঙ) এই যে তোমার প্রেম ওগো, ইত্যাদি।

শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ বলছেন, 'দেশি সুরের সাহায্যে যে সব গান লিখলেন তার মধ্যে দেখলাম তার প্রায় সবই কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরে রচিত।'

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে	:	*মিশ্র কীর্তন*
আমিই শুধু রইনু বাকি	:	*রামপ্রসাদী*
আমি জেনে শুনে তবু	:	*কীর্তন*
শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি	:	*রামপ্রসাদী*
সুখে আছি—	:	*মিশ্র কীর্তন*
একবার মা বলিয়া ডাক	:	*চপ কীর্তন*
আমরা মিলেছি আজ	:	*রামপ্রসাদী*
আমি নিশি নিশি কত রচিব	:	*চপ কীর্তন*
ওগো এত প্রেম আশা	:	*কীর্তন*
আমারে কে নিবি ভাই	:	*বাউল-কীর্তনাঙ্গ*
খ্যাপা, তুই আছিস আপন	:	*বাউল*
হৃদয়ের একূল ওকূল	:	*বাউল কীর্তনাঙ্গ*
এসো এসো ফিরে এসো	:	*কীর্তন*

কবিয়ালদের গানকে একদা 'নাগরিক লোকসংগীত' অভিধায় ভূষিত করা হত। উপরোক্ত অনেকগুলি গানেই কবিগানের কিছু অনুভূতির মিশ্রণ ঘটেছে কি না, তেমন কোনও আলোচনা চোখে পড়েনি। সখী সংবাদ, শ্যামাবিষয়ক। আগমনী বা রামপ্রসাদী ধারাটি এই ধারার অন্তর্গত মনে হতে বাধা কোথায় ?

প্রধানত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে (১৯০৫) বাউল আঙ্গিকে প্রস্তুত করে বহু স্বদেশি উদ্দীপনামূলক গান তিনি রচনা করেছিলেন। অন্যত্র পাশ্চাত্য সুরধারায় তাঁর গান নির্মাণ পর্ব চলতে থাকলেও স্বদেশি গানের ক্ষেত্রে স্বভূমের গানের সুরকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন হয়তো যে গান সহজেই মনের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে এবং আত্মীয়তার মেলবন্ধন ঘটাতে অধিকতর কার্যকরী হবে, এই ভেবে।।

গানের বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণ-গৌর কিংবা ঈশ্বর চিন্তার অধিকারকে তিনি পরিহার করে মানবিক বোধ ও মূল্যায়নে সাজিয়েছেন গানগুলি। যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান হিসেবে পরিচিত।

মূল গান	:	*মন মাঝি সামাল সামাল*
রবীন্দ্র	:	*এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে*
মূল গান	:	*হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে*
রবীন্দ্র	:	*যদি তোর ডাক শুনে কেউ*
মূল গান	:	*ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে*
রবীন্দ্র	:	*যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক*
মূল গান	:	*আমার গৌর কেন কেঁদে এলো*
রবীন্দ্র	:	*ও আমার দেশের মাটি*
মূল গান	:	*আমি কোথায় পাব তারে*
রবীন্দ্র	:	*আমার সোনার বাংলা*
মূলগান	:	*সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না (সাযুজ্যমূলক)*
রবীন্দ্র	:	*আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে*
মূল গান	:	*ভাদুর আগমনে (সাযুজ্যমূলক)* *মা কি তুই পরের দ্বারে*
রবীন্দ্র	:	*ছি ছি, চোখের জলে*
মূলগান	:	*আমার এই দেহতরী কি দিয়ে* *বানালে গুরু ধন*
রবীন্দ্র	:	*যে তোরে পাগল বলে*

এছাড়া বহু গান লৌকিক সুরধারা আত্মস্থ করে নিজস্ব কম্পোজিশনরূপে বিস্তার ঘটিয়েছেন। এতে প্রাদেশিক সুরের প্রতিফলনও স্পষ্টতই মিলেমিশে গেছে। ডঃ অরুণ বসু বলছেন, 'সার্থক জনম আমার'— ভৈরবীতে নিবদ্ধ তালছাড়া ভঙ্গিতে মৌলিক গান।

যদিও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভৈরবীর প্রভাব খুবই প্রকটভাবে বিদ্যমান। তবে ভৈরবীতে নিবদ্ধ পাঞ্জাব প্রদেশের তালহীন 'হীর'-এর সুরধারা উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত এবং পাঞ্জাবি টপ্পার আলঙ্কারিক লক্ষণগুলিও উপেক্ষা করার মতো নয়।

এরূপ ভাব, রস, সুর বা ভাষায় বাঁধুনির সাযুজ্যমূলক আরও অনেক গানের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ডঃ অরুণ বসু বলেন, এই ১৩২৯ সালের এক বর্ষণব্যথিত আষাঢ়ে (৩২ আষাঢ়) আত্রাই নদীর বুকে কবি লিখলেন স্মরণীয় বাউল সুরের গান 'আমি কান পেতে রই।' লালনের একটি গানে আছে

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে
ও সে ফুলে ভাবনগরে কী শোভা করেছে।
কারণ বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একূল ওকূল
শ্বেত বরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সে ফুলের মধুর আশে ঘুরতেছে।

দিনমণি ভণিতাযুক্ত এক লোককবির 'বলো কোন গুরুর করো অন্বেষণ' অন্তিম স্তবকে আছে

গানের বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণ-গৌর কিংবা ঈশ্বর চিন্তার অধিকারকে তিনি পরিহার করে মানবিক বোধ ও মূল্যায়নে সাজিয়েছেন গানগুলি।
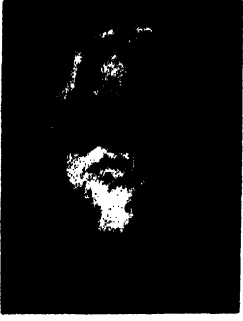
আমার হৃৎপদ্মে নীলপদ্ম আছে
নীলপদ্মতে বজ্র সোনার পদ্ম ফুটে রয়েছে এমন।

সেই গোপন হৃৎপদ্মটির সন্ধান কবিও দিয়েছেন আশ্চর্যভাবে তাঁর গানে

ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি
নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন রাতের পাখি গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে।

ডঃ বসু আরও বলছেন, 'এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়, নিঃসংশয়ও নয়। কিন্তু বাউল ভঙ্গির গানের ধারাবাহিকতা লক্ষ করার জন্য এই প্রাথমিক তালিকাই যথেষ্ট।'

রবীন্দ্র অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর ডঃ ভবতোষ দত্ত বলছেন, 'ডিসেম্বর, ১৯২৫ ভারতীয় দর্শন মহাসম্মেলনে The philosophy of our people নামে তাঁর ভাষণে বাউলদের দর্শন বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা উপনিষদ, ষড় দর্শন, কিংবা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ইত্যাদি শাস্ত্রাশ্রিত তত্ত্ব নিয়েই গড়ে উঠেছে। কিন্তু কেউ বলেননি যে শাস্ত্র দর্শনের বাইরে তথাকথিত অশিক্ষিত লোকসমাজে তত্ত্বচিন্তার একটা ধারা প্রচলিত আছে। ...১৯৩১ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ The Religion of man নামে যে বক্তৃতা দেন তার সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেন— What struck me in their simple song was a religion expression that was neither grossly concrete, full of crude details nor metaphysical in its varified transcendeatalism. At the same time it was alive with emotional sincerity. It spoke of an intense yearning of the heart for the devine which is in man and in temple or scriptures in images and symbols.'

সেই মনের মানুষের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজার দুটি গান উল্লেখ করে লিখেছেন, 'It is the village poet of East Bengal who preaches in a song the philosophical doctrine that universe has its reality in its relation to the person.'

'Great men think alike' বলে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন রচয়িতার গানে ভাবগত তত্ত্বগত মিল দেখেও।

'Great men think alike' বলে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটির সত্যতা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন রচয়িতার গানে ভাবগত তত্ত্বগত মিল দেখেও।

হাসন রাজা : *আপন চিনিলে খোদা চিনা যায়*
হাসন রাজায় আপন চিনিয়ে
এই গান গায়।

রবীন্দ্রনাথ : *আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না*
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

১৯৩১-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ-মূলক হিবার্ট বক্তৃতায় Religion of man বক্তৃতায় হাসন রাজার দুটি গানের উল্লেখ করেন

হাসন : *মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন*
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদরা।

রবীন্দ্র কবিতা : *আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ*
চুনী উঠলো রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠলো আলো পুবে পশ্চিমে
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর
সুন্দর হলো সে।

হাসন : *আপনার রূপ দেখিলাম রে*
আমার মাঝত্ বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে।

রবীন্দ্র : *আপন হতে বাহির হয়ে সামনে দাঁড়া*
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।

জার্মান দার্শনিক একহার্ট বলছেন, 'If I were not, God would not be.'ও-বাংলার সাধক কবি জালালউদ্দিনের গানে আছে

জালাল : *আমি বিনা কেবা তুমি দয়াল সাঁই*
যদি আমি না-ই থাকি তবে তোমার জায়গা ভবে নাই।

রবীন্দ্র concept-এ সেই প্রতিধ্বনি—

আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে
তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। লৌকিক উদ্যান : লোকগীতি সংখ্যা : ১৯৯৭
'তোমায় নতুন করে পাব বলে'
—ডঃ অরুণ বসু

২। হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী : বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৯২
—মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
'ভূমিকা' ডঃ ভবতোষ দত্ত

৩। হাসন উদাস : প্রবন্ধ : যুবমানস— দিনেন্দ্র চৌধুরী

লেখক পরিচিতি : লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগীত রচয়িতা

য়ুরোপীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথ

গৌতম ঘোষ
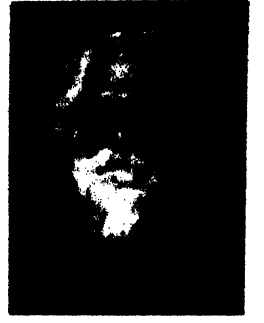
বিলেত প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু আইরিশ, স্কটিশ ইত্যাদি গান আহরণ করে সেগুলির রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন বাংলা গানে। ইন্দিরা দেবী প্রমুখেরা তার তালিকা করে গেছেন এবং মূল গানগুলি শোনাও যায় এখন। কিন্তু এই খানবিশেক বিদেশি সুরেই তো রবীন্দ্রগান গণ্ডি বেঁধে থাকেনি, পাশ্চাত্য আঙ্গিকে তাঁর গানে ইতস্তত আনাচ কানাচে ছড়ানো। রবীন্দ্রগানের মূল ভিত্তিটা ভারতীয় রাগ সংগীত ও লোকাশ্রিত সংগীতের ওপর হলেও এর রচনাগত প্রকরণ বেশ কিছুটা বিদেশি আঙ্গিকে বাঁধা। বিশেষভাবে যদি রচনাগুলি অবলোকন করা যায় তো দেখা যাবে স্বরসংস্থাপনের বিধি, মাত্রা বিভাজন, স্বরসম্বাদ, নির্দিষ্ট স্বরের ওপর এসে থামা যাকে আমরা Cadence বলে থাকি, বিভাগ বা Bar-এর সুবিন্যস্তকরণ—এ সবই পাশ্চাত্য আঙ্গিকে গড়েছেন তিনি। আসলে রাগরাগিণী প্রচলিতভাবে গাওয়া আর নিবদ্ধ একটি রচনা বা কম্পোজিশন গাওয়া দুটোয় ফারাক আছে। ওই কম্পোজিশনটি তৈরি করতে গেলেই গঠনার্থে কিছু শর্ত মানতে হচ্ছে। ওই বিধিগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় নয়। সাধারণভাবে স্থায়ী দুটি অন্তরা, একটি সঞ্চারী—এই অন্তরা সঞ্চারীর ভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয়। এমনটা তৎকালীন প্রসেনিয়ম থিয়েটারেরও ছিল, বিষয়বস্তু ভাব ভাষা দেশজ হলে আঙ্গিকটা বিদেশি।

এই যে গানের ফর্ম তা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে তাঁর পূর্বসূরিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই রূপ নিয়েছে। মূলত দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই এগুলি সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য গানের আবহাওয়াটা ঠাকুর বাড়িতে প্রথমাবধি ছিল এবং তা আমদানি করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের ইংলন্ড যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন একজন জর্মন মিউজিসিয়ান। তাঁকে দ্বারকানাথ এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্গান কেনবার সময় ব্যারেলগুলিকে ভারতীয় সুরোপযোগী করে নেওয়ার জন্য। সেই ১৮৪৩ নাগাদ সম্ভবত প্রথম ভারতীয় হিসেবে ব্যারেল অর্গান কিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। দেবেন্দ্রনাথও বাজাতেন পিয়ানো ও অর্গান। শিখতে যেতেন বিডন স্ট্রিটে। আর গৃহশিক্ষকের কাছে শিখতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইংলিশ ফ্লুটও বাজাতেন। প্রসঙ্গত বলা, আজকে যে স্বরবিতান থেকে আমরা রবীন্দ্রসংগীত আহরণ করি সেই স্বরলিপির মূল পরিকল্পনা কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথেরই। দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুজনেই স্টাফ নোটেশন পড়তে পারতেন এবং পাশ্চাত্য সংগীত বুঝতেন। রবীন্দ্রনাথেরও এ সম্পর্কে যারপরনাই আগ্রহ ছিল। প্রথম বয়সে কোনও বিদেশি অপেরা এলেই তা শুনতে যেতেন। এবং তাঁর প্রথম রচিত গান 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' গানটি বিদেশি অপেরার গানের আদলে। বিদেশি সংগীত শেখার আগ্রহ কেমন ছিল তা তাঁর স্মৃতিচারণেই আছে। সুন্দর ছবিতে ভরা টমাস ম্যুরের আইরিশ মেলোডিস নামে বইটি কেমনভাবে সুদূর বিলেতে পাঠিয়ে দিত এবং গানগুলি শেখার জন্য ব্যাকুল করে তুলত। পরবর্তীকালে বিলেতে পড়তে গিয়ে তাঁর সংগীত শিক্ষায় ওই গানগুলিও ছিল। সেই হল তাঁর সুররচনার প্রথম ধাপ। সে সময়ে পাশ্চাত্য সংগীতের বিবিধ গুণগুলি অনুধাবন করে তাঁর মনে হয়েছিল—'আমাদের সংগীত মৃতশাস্ত্র'। কিংবা 'ইহার পর গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে য়ুরোপীয় সংগীতের রস পাইতে লাগিলাম ... ... য়ুরোপীয় সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত।'

এই যে পূর্বাপর আগ্রহবোধ ও জিগীষা সেটিই পরবর্তী জীবনে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্নরূপী রচনার মধ্যে ছাপ ফেলে গেছে। এই ঠাকুরবাড়ির লোকজনেরাই তালের যে মাত্রারাজি তা গুনতে শেখান Horizontally বা আনুভূমিকভাবে। সচরাচর আমরা মাত্রা গুনি খাড়াভাবে, আঙুলের এক দুই তিন চার কর গুনে বা Vertically। কিন্তু এঁরা পাশ্চাত্য রীতিতে অভ্যস্ত থাকার দরুন বিদেশি রীতিতেই গুনতেন এবং এভাবে

পাশ্চাত্য গানের আবহাওয়াটা ঠাকুর বাড়িতে প্রথমাবধি ছিল এবং তা আমদানি করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথের ইংলন্ড যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন একজন জর্মন মিউজিসিয়ান। তাঁকে দ্বারকানাথ এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

গোনার ফলে রবীন্দ্রনাথ কথার প্রয়োজনে ছন্দের প্রয়োজন তালের মাত্রার সংখ্যা যোগ করতে করতে অন্য তাল সৃষ্টি করে ফেলেছেন। যেমন:

৫ + ২ + ২ + ২ = ১১ মাত্রা

কিংবা বিদেশি Waltz-এর তিন মাত্রাকে ষষ্ঠীতে ভেঙে নিয়েছেন—১২, ১২৩৪ বা ১২—এভাবে প্রাণ ভরিয়ে তৃষা বা মম চিত্তে এরকমই তো গান। রবীন্দ্রনাথের গানেই প্রথম লয় নির্ধারিক চিহ্ন বা Metro nome mark ব্যবহৃত হয় যেমন r = ৮, r = ৪, r = ২ ইত্যাদি। অর্থাৎ একজন মানুষ স্পষ্টভাবে ও দ্রুতগতিতে যদি এক থেকে আট পর্যন্ত গুণে যায় এবং এর যে কাল বা সময় সেটিকে যদি এককভাবে ধরে তবে সেটি হবে বিলম্বিত লয়। এভাবেই r = ২ বা দুই হবে অতিদ্রুত লয়। এগুলি অবশ্য বর্তমান স্বরলিপিতে থাকে না। এর ধারণাটা কিন্তু বিদেশ থেকে নেওয়া। এই মার্ক দেখেই বোঝা যায় কোনটি কোন লয়ে। রবীন্দ্রনাথ কোন গানটি কোন Pitch বা কোন উচ্চতায় হবে তার নির্দেশ করে যাননি। কিন্তু রবীন্দ্রগানের স্কেল কী তা বোঝা যায়। ওই অপেরা শোনার অভিজ্ঞতার দরুন ভয়েসিং-এর বিষয়টিও তাঁর দখলে ছিল। আমরা জানি কণ্ঠে তিনটি রেজিস্টার আছে Chest, Throat ও Head। তিনি তাঁর গান এই মন্দ্র রেজিস্টারেই বেঁধেছিলেন। এটি গানের জাত বা Timbre। যেমন বেটোফেনের ফিফথ সিমফনি সি মাইনরেই ঠিক শোনাবে অন্যত্র নয়, তেমনই রবীন্দ্রগানও ওই এ কিংবা বি ফ্ল্যাটেই সুন্দরভাবে প্রকাশ পাবে, ডি কিংবা ই-তে গাইলে গানের আবেদনই হারিয়ে যাবে। অবশ্য নাটকের গানগুলি নাটকের সংলাপের পিচ অনুযায়ী হয়।

স্বরসম্বাদ অর্থাৎ পরস্পর স্বরের যে হারমোনিক রিলেশন তাও তাঁর গানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানা হয়েছে, কোনও স্বর কিন্তু আন্দাজে লাগানো নয়। তার মধ্যেও যুক্তি আছে। পাশ্চাত্য স্বরলিপি পড়তে পারার দরুন প্রতিটি স্বর তাঁর কাছে আলাদা আলাদা চরিত্র নিয়ে আসত।

স্বরসম্বাদ অর্থাৎ পরস্পর স্বরের যে হারমোনিক রিলেশন তাও তাঁর গানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানা হয়েছে, কোনও স্বর কিন্তু আন্দাজে লাগানো নয়। তার মধ্যেও যুক্তি আছে। পাশ্চাত্য স্বরলিপি পড়তে পারার দরুন প্রতিটি স্বর তাঁর কাছে আলাদা আলাদা চরিত্র নিয়ে আসত। তারা নিছকই কোমল নিষাদ বা তীব্র মধ্যম নয়। স্বরগঠনের কৌশল দেখে বোঝা যায় টোন সেমিটোনের বিষয়আশয়ও বুঝতেন নইলে মূলতানের তীব্র মধ্যমকে এক সেমিটোন কমিয়ে কীভাবে গানের (নাই রস নাই / যাবার বেলা শেষ কথাটি) অন্তরায় পটদীপে নিয়ে আসেন। কীভাবে 'ডুবি অমৃতপাথারে' গানটিতে ললিতের কড়ি মধ্যমকে চড়িয়ে বর্জিত স্বর পঞ্চমে সংস্থাপিত করে রাগ বদল করে নিয়ে গেছেন ভৈরবে। এই যে রূপান্তর এটি তাঁর অসাধারণ স্বর চেনার ক্ষমতা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। পঙ্কজ মল্লিকের লেখায় পড়েছিলাম—তখন রবীন্দ্রনাথের বার্ধক্যজনিত কারণে শ্রবণক্ষমতা কিছুটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এক এস্রাজ বাদকের বাজনা শুনিয়ে পঙ্কজ মল্লিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, এটা কী রাগ ? কানে না শোনার হেতু বিব্রত রবীন্দ্রনাথ বলেন আবার রাগটি বাজাতে। এবার পঙ্কজ মল্লিক দেখেন গুরুদেবের চোখ স্থির হয়ে আছে এস্রাজ বাদকের আঙুলের ওপর। শুধু পর্দার ওপর আঙুলের যাওয়া আসা দেখেই উনি বলে দিলেন এটি 'ইমনকল্যাণ'। বিদেশি ধাঁচে লম্বা লম্বা ছুট উনিই প্রথম প্রবর্তন করেন অবশ্যই ভারতীয়ত্বে আত্মকরণ করে। 'হে মাধবী দ্বিধা কেন'—এই দ্বিধা চড়ির সা থেকে সটান নেমে আসে অতিকোমল গান্ধারে। 'সে কোন বনের হরিণ' এতেও 'সে কোন' কথা দুটি উপরের সা থেকে নামে শুদ্ধ গান্ধারে, আবার 'বনের' কথাটিতে যায় মা থেকে চড়ি সা। এগুলি সবই এককালে পিয়ানোতে বসার সুফল। 'সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে' শুনলে মনে হয় না পিয়ানো বাজছে? আমি চিনি গো চিনি, তোমার হল শুরু, বড় আশা করে, আলো আমার আলো, প্রাণ চায় এমন অনেক বহুশ্রুত গানগুলি বিদেশি গড়নেই করা তা শুনলেই বোঝা যাবে। 'বাঁধ ভেঙে দাও'-এর দাও কথাটিতে একটি করে স্বর ক্রমপর্যায়ে নেমে আসে গানটির মূল চালিকাশক্তি ওই অবনমনেই, এটাও তো বিদেশি ধাঁচ। 'সহেনা যাতনা' গানটি একেবারে মডার্ন কর্ড প্রগেশনের ওপর ভিত্তি করে লেখা। সেভেনথ কর্ডের এতো ভাল উদাহরণ হয় না। এরকম প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যাবে কিন্তু তাই বলে তিনি যে পাশ্চাত্যসংগীতনির্ভর ছিলেন তা কখনোই নয়। সুন্দর কিছু আহরণের পক্ষে ছিলেন তিনি। তাঁর কথায় মানুষের সঙ্গে মানুষেরই তো মিশল চলে বনমানুষের তো নয়। অনেকের ধারণা সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুরের ভূমিকা নিয়ে তিনি পুরোটাই ভারতীয়ত্বের পক্ষে ছিলেন, তা কিন্তু নয়। তাঁর উক্তি দিয়েই শেষ করি।

'আমার বিশ্বাস আমাদের সংগীতে বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দপ্তরের লোহার সিন্দুক হইতে মুক্ত করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া বড় করিয়া ব্যবহার করিতে শিখিব।' য়ুরোপীয় সাহিত্যচর্চা প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অনেক দিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে, য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমনই হত তা হলে নিঃসন্দেহেই প্রাচ্যসংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হত।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপক

রবীন্দ্রনাথের গানে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গানের প্রভাব

সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বিচিত্র গানের ধারা রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সেই আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন—

'বাংলাদেশের আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু একেবারে বিলীন হয়নি।'

এই 'ম্লান হয়ে আসা' আলোতে কবি কতটা আলোকিত হয়েছিলেন নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই জায়গাটিতে পৌছানোর চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর এই সময়টি ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংগীতিক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সময়। কবিগানের অবসানপর্বে বাংলার নাগরিক জীবন তখন টপ্পা-ঢপ্-যাত্রা-পাঁচালির সুরে আত্মবিহ্বল ধ্রুপদের চর্চায় আত্মসমাহিত, আর অন্যদিকে শৌখিন বাউলগানের সুরে মুগ্ধ, ব্রহ্মসংগীতের নতুন আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত—সংগীতের এই নবজাগরণ পর্বেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তখনও কবিতার পৃথক সত্তা স্থিরীকৃত হয়নি। কাব্যরচয়িতা এবং গীতিকারের তালিকায় একই নাম। সুরহীন গীতিকবিতা অপেক্ষা কাব্যসংগীত রচনার দিকে কবিদের ঝোঁক বেশি দেখা যাচ্ছিল। কারণ সংগীতের সুর যে মানুষকে বেশি নাড়া দেয় এবং সে হিসেবে একজন কবির চেয়ে একজন সংগীতকার বেশি সমাদর পান এ বিষয়টা কবিদের কাছে ক্রমশ গ্রহণীয় বলে মনে হচ্ছিল। বস্তুত গীতিকবিতা ও সংগীত এই দুই ধারা যখন পরস্পরের সহযোগী, বাংলা সংগীতের সেই মহামিলনক্ষণে আবির্ভূত হলেন সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ। তিনি সংগীত ও ভাব প্রবন্ধে বলেছেন যে, ভাব প্রকাশই সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাগরাগিণীর ক্রিয়াকলাপ নয়। তাঁর মতে, গায়করা সংগীতকে যে আসন দেন কবি তার চেয়ে সংগীতকে উচ্চ আসন দান করেন—

'তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলো চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমরভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।'

(সংগীত ও ভাব প্রবন্ধ / সংগীত চিন্তা, পৃঃ ২৭২)

বাংলা সংগীতের সেই মহামিলনক্ষণে আবির্ভূত হলেন সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ। তিনি সংগীত ও ভাব প্রবন্ধে বলেছেন যে, ভাব প্রকাশই সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাগরাগিণীর ক্রিয়াকলাপ নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গান প্রকৃত কাব্যসংগীত হয়ে উঠেছিল নিধুবাবুর রচনায়। তারই পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথে। 'আমাদের সংগীত' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেছেন,—

> 'বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই। ......এই জন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। ...অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গানরচনা অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।' *(সংগীত চিন্তা, পৃঃ ৬৯)*

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কথা ও সুর, গীতিকবিতা ও সংগীত যখন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সময়ে পরস্পরের সহযোগী, তখনই সংগীতকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের রামপ্রসাদী, কবিগান, পাঁচালি, টপ্পা ইত্যাদি বিভিন্ন গানে প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতকে কখনও সুরে, কখনও ছন্দে, কখনও ভাষায়, কখনও ভাবে—এমনই নানা বৈচিত্রে ভরিয়ে তুলেছেন।

রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে স্বরাঘাতপ্রধান এক লৌকিক ছন্দকেই বেশি ব্যবহার করেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই লৌকিক ছন্দ এখনও পর্যন্ত বাংলা কাব্যসংগীতের প্রধান বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও এই অনভিজাত ছন্দকেই তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন।

বাংলা গানের ছন্দ মুক্তি পেয়েছিল রামপ্রসাদের হাতে—প্রবোধচন্দ্র সেনের এই মন্তব্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় যে আধুনিক কাব্যসংগীতের ছন্দ প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল রামপ্রসাদের কাব্যে। রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে স্বরাঘাতপ্রধান এক লৌকিক ছন্দকেই বেশি ব্যবহার করেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই লৌকিক ছন্দ এখনও পর্যন্ত বাংলা কাব্যসংগীতের প্রধান বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও এই অনভিজাত ছন্দকেই তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। গানগুলি ভক্তিভাবের প্রগাঢ়তায় এবং ধর্মভাবের আন্তরিকতায় এমনভাবে গাঁথা হয়েছে যাতে এই ছন্দ তার সঙ্গে মিলেমিশে এক অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে প্রতিটি পর্যায় থেকে—

পূজা—গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি।
প্রেম—আসা যাওয়ার পথের ধারে
প্রকৃতি—বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা
বিচিত্র—কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে

ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন,

> '.....অনেক নতুন ছন্দ, ছন্দের অনেক নতুন ভঙ্গি কবি তাঁর গানের ভিতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রসংগীত বাংলা ছন্দের একটি বিরাট ভাণ্ডার। ছান্দসিকের অনেক উদাহরণই গীতবিতান অতি সহজে জোগান দিতে পারে।'
> *(সূত্র : বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, অরুণকুমার বসু, পৃঃ ৩২৫)*

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীতে অন্যান্য অনেক ছন্দ তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেছেন।*

কবিগান, কথকতা, টপ্পা, পাঁচালি ইত্যাদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয় ছিল। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক সংগীতচর্চা ও গায়কদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগে এই সমস্ত গীতরূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটেছিল।

বাল্য বয়সে কৃষ্ণযাত্রায়, কিশোরী চাটুজ্জের পাঁচালির সুরে মধুকানের ঢপ কীর্তনে এবং নিধুবাবুর টপ্পা-কবিগান-সখীসংবাদ-বিরহ গানে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বীকার করেছেন—

> 'একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম। সাহিত্য-রচনার প্রচলিত পাশ্চাত্য বিধির কথা স্মরণ করে উদ্বেল আনন্দকে লজ্জিত হয়ে সংযত করিনি তো।'
> *(শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীতচিন্তা, পৃঃ ৭৬)*

একই প্রবন্ধে কবি কিশোর বয়সে পাওয়া এই সব লোকায়ত তথা জনপ্রিয় গীতরূপ ও সুরগুলির প্রভাবের কথা স্মরণ করেছেন কৃতজ্ঞচিত্তেই। এই প্রসঙ্গে তিনি নিধুবাবুর টপ্পা ইত্যাদি উল্লেখ করে ('ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে', 'মনে রইল, সই, মনের বেদনা') মন্তব্য করেছেন,

> '—এ যে অত্যন্ত বাঙালির গান। বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় অত্যন্ত তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান আপনি সৃষ্টি না করে বাঁচে নি।' *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫)*

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতগুলিতে উনবিংশ শতকের মধ্য ও শেষভাগের বিভিন্ন কবির রচিত প্রেমসংগীতগুলির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ঠাকুরবাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ, সংগীতপ্রেমী আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্য ইত্যাদি তৎকালীন কাব্যসংগীত সম্পর্কে কবিকে উদাসীন রাখতে পারেনি।

নিধুবাবুর গান—ভালবাসিবে বলে ভালোবাসিনে—গানটি থেকে আমরা পেলাম—'আজ তোমারে দেখতে এলেম'—কবির এই রচনাটি।

নিধুবাবুর টপ্পা—নয়ন পাগল সই করিল আমারে
যত দেখি তথাপি আশ নাহি পুরে।

এই প্রসঙ্গে বলি, কবিদের কাছে প্রেমসংগীত রচনায় প্রেমিকার নয়ন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

রাধামোহন সেনের গানে আছে 'কটাক্ষে মরি ওলো
কটাক্ষে তরি আমি তোমার।'

কালী মির্জার রচনা—

'পাসরিতে চাই তারে না যায় পাসরা

আমারে মজালে আমার নয়ানেরই তারা।'

রবীন্দ্রনাথের 'নয়ন' অনুষঙ্গে অনেক গান আছে। আমার নয়ন, তুমি কোন কাননের ফুল, আমার মন চেয়ে রয় ইত্যাদি।

গানের ভাষায় লোকায়ত বাণীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়—ভাগাইনু, গেনু, লুটেপুটে, জাগাইনু। বহু গানে এ ধরনের বাণীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। 'সখী' কথাটির প্রয়োগ পাওয়া যায় বহু গানে— সখী ওই বুঝি বাঁশি বাজে, সখী বহে গেল বেলা, ওলো সই, ওলো সই ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের সখী সংবলিত কিছু কিছু গানে 'সখীসংবাদ'-এর গানের প্রভাব আছে। এ ছাড়া—আজ তোমারে দেখতে এলেম

অনেক দিনের পরে।

—এ গানে সখীসংবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে কোনওটিতে সুরগত, কোথাও বিষয়গত ইত্যাদি প্রভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে।

দাশরথি রায়—নন্দী গিরিনন্দিনী ত্রিলোকের নয়ন

রবীন্দ্রনাথ রচিত—সারা বরষ দেখিনে মা

দাশরথি রায়—কর কর নৃত্য নৃত্যকালী

রবীন্দ্রনাথ রচিত—উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে

কথকতার ভঙ্গিতে কবির রচনা—

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে

রচনারীতিগত মিল দেখতে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও।

দাশরথি রায়ের একটি চিতেন—

(সেই) হেরি ধারা পথ থাকয়ে যেমত

তৃষিত চাতকজনা

রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন—

'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে'

আমি নিশিদিন কত রচিব শয়ন।

গানের ভাষায় ভাবগত মিল—

হরু ঠাকুরের একটি গানের অংশবিশেষ—

সই দেখ নিজ করে প্রাণপণ করে গাঁথিলাম এ কুসুম হার
একী নিরানন্দ বিনে সে গোবিন্দ হেন মালা গলে দিব কার।

তুলনা করলে দেখা যায়—কবির 'আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে' গানটির শেষ অংশের সঙ্গে এর মিল আছে—

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরান সে গান শুনাব কারে আর/আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলমালা কাহারে পরাব ফুলহার॥

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে শোনা একটি গান—

তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিল।

এটি হয়ে গেল— আমি চিনি গো চিনি তোমারে

ওগো বিদেশিনী।

এ গানের প্রেরণা সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

এমন অনেক গানে উনিশ শতকের বহু গানের প্রভাব বিভিন্নভাবে পড়েছে। এ ছাড়া কীর্তন বাউল গানে রবীন্দ্রনাথ যে কতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এ ব্যাপারে সামান্য কিছু আলোচনা করা যেতে পারে আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রয়োজনে।

বাংলাদেশে নিজস্ব সুর এবং ঢঙে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের আরও কিছু নতুন সৃষ্টির প্রকাশ ধরা পড়েছে—যাকে বলা যায় 'রাবীন্দ্রিক কীর্তন' এবং 'রাবীন্দ্রিক বাউল'। এ হল বাংলার কীর্তন ও পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুরের মিশ্রণে গঠিত এক বিশেষ সুরের গান। এতে শুধুমাত্র বাউলের তাল নয়, তেওড়া ঝাঁপতালও স্থান পেয়েছে।

বাংলার নিজস্ব সুরের প্রভাবে প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের সংখ্যা কমবেশি দুশো। সুরের ও ভাবের বৈচিত্রে তিনি সমকালীন সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বাউলদের গানের ভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা থেকে বড়ো ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। বাউলদের সুরের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই কবি তাঁর গানে ধ্রুপদের মতো চারটি অংশ রেখেছেন—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

বাউলদের সুরের সহজ ভাব তাঁদের 'মনের মানুষ'-এর প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে আকুল করে তুলেছিল।

বাংলার লোকসংগীত কবিকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল বিশেষত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়টিতে, যখন রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঁচিশটি স্বদেশ-ভাবাত্মক সংগীত লিখেছিলেন 'বাউল' নামের একটি সংকলনে (১৩১২ ব.)। গানগুলিতে ছিল বাউল, কীর্তন, সারি ইত্যাদি দেশি সুরগুলি।

সারি	—	এবার তোর মরা গাঙে
বাউল	—	আমার সোনার বাংলা
	—	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
	—	যদি তোর ডাক শুনে কেউ
ঢপ্ কীর্তন	—	বাংলার মাটি বাংলার জল
ভাওয়াইয়া	—	যে তোরে পাগল বলে

মনোহরশাহী কীর্তন—রইল বলে রাখলে কারে ইত্যাদি।

'আমার সোনার বাংলা' গানটির মূল বাউল গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। .....

বাউলদের সুরের সহজ ভাব তাঁদের 'মনের মানুষ'-এর প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে আকুল করে তুলেছিল।

178 June, 1928.

26. Tuesday [178—188]

Samvat.—9 Ashar (Sudee), 1985. Beng.—12 Asar. Nabami, 9-21

কাঙাল যে জন শুধু চায়
পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উদাসী সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তার সাধনায় ঐ মানিক
পথে পথে যায় ছড়ায়ে;
ভিক্ষার ঝুলি, ...
চারিদিকে ফিরে চড়ায়ে।
হায়রে ভিক্ষু, হায়রে,
নিঃস্বজনের দুঃখদানের
বন্ধু, ছিঁড়িস তারে॥

কবিজীবনের পরম বাণীটি একমাত্র সংগীতের মধ্য দিয়েই তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন। আর তাই 'রবীন্দ্রসংগীত' আমাদের কাছে এক বিপুল বিস্ময় !

'অন্তরতর হৃদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল।''*

বাউল গানের এই মূল আবেগটুকুকে তিনি আরোপ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর স্বদেশি গানে।

রবীন্দ্রনাথের কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে দেশি সুরে রচিত গানগুলির প্রায় সবকটি কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরে রচিত যেমন—

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে—মিশ্র কীর্তন সুর
আমিই শুধু রইনু বাকি—রামপ্রসাদী
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি—কীর্তনের সুর
শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা—রামপ্রসাদী ইত্যাদি

কবি তিরিশ বছর বয়সে জমিদারি তদারকির কাজে গিয়েছিলেন। সেই সময় দুটি বাউল সুরের গান পেলেও বেশির ভাগই কলকাতায় প্রভাবিত কীর্তনের সুরে সৃষ্ট। উচ্চাঙ্গের কীর্তনে আখর বা কথাবিস্তারের প্রাচুর্য ছিল। এই ধরনের গান বেশি রচিত হয়নি—

ও হে জীবন বল্লভ .....।
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি। ইত্যাদি।

সংগীতের প্রভাবই আমাদের জীবনে সর্বাধিক। বিচিত্রগামী রবীন্দ্রপ্রতিভা কথা-সাহিত্য নাটক ইতিহাস শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ সর্বত্র প্রসারিত হলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজের শুধুমাত্র 'কবি-পরিচয়'কে সত্য বলে মেনেছেন। কবিজীবনের পরম বাণীটি একমাত্র সংগীতের মধ্য দিয়েই তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন। আর তাই 'রবীন্দ্রসংগীত' আমাদের কাছে এক বিপুল বিস্ময় ! মানব জীবনের জটিল রহস্যকে এই একটি শব্দের মধ্যে কী অনায়াসে তিনি ছন্দোবদ্ধ করেছেন তাও এক পরম বিস্ময় ! আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'রবীন্দ্রসংগীত' সম্পর্কে যে-কোনও আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এ কথা যথার্থ।

আকর-গ্রন্থ :

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত—অরুণকুমার বসু, ১৩৮৪, শ্রীপঞ্চমী

৩। রবীন্দ্রসংগীত-বিচিত্রা—শান্তিদেব ঘোষ, ৫ম মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৭

৪। রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ, ৫ম সংস্করণ, ১৯০১

৫। সংগীতচিন্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯২-২৫ বৈশাখ

৬। বাঙালির গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী, সম্পা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা আকাদেমি সং., ২০০১ এপ্রিল

৭। গীতবিতান ২য় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৯১, আশ্বিন

৮। ভারতীয় সংগীতের কথা—প্রভাতকুমার গোস্বামী, পরিবর্ধিত ৩য় সং., ১৯৮২, ডিসেম্বর

৯। বাংলা সংগীতের ধারা—শুভ গুহঠাকুরতা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৯৬, বৈশাখ

১০। রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন—ড. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৪

১১। বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক—রাজ্যেশ্বর মিত্র

১২। রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশ চেতনা—ড. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৬

প্রবন্ধ :

১৩। বাংলা টপ্পা ও রবীন্দ্রসৃষ্টিতে তার প্রভাব—সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা / বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৪১-৪৩ ১৪০৯, ২৫ বৈশাখ

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপক

ভাঙা গানে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা

দেবারতি সোম

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুত্র-কন্যাদের সংগীত শিক্ষা বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ঘরানার সংগীতজ্ঞগণ নিয়মিত আসতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য— বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পারিবারিক শিক্ষক।
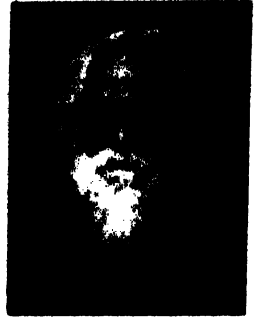
বাংলা সংগীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের গান এক অন্য ও অনন্য সংযোজন। তেরো বছর বয়স থেকে শুরু করে আমৃত্যু রচনা করেছেন অসংখ্য গান—প্রায় দু-হাজারের কিছু বেশি। এই সংগীতকৃতির প্রায় এক-দশমাংশ গান রচিত হয়েছে কখনও হিন্দুস্থানি রাগসংগীত, কখনও বাংলার লোকসংগীত, কখনও বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত, কখনও বা পাশ্চাত্য সংগীত ভেঙে। এই ধরনের গানগুলি একটি সুস্পষ্ট ধারায় বিন্যস্ত, যাকে বলে 'ভাঙা গান'। এই বিষয়ে একটি আকর গ্রন্থ রয়েছে : 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী-সঙ্গম'—রচয়িতা শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। এই গ্রন্থে ইন্দিরা দেবী বলছেন, 'গান ভাঙা দুরকম হতে পারে—এক, পরের সুরে নিজের কথা বসানো ; দুই, পরের কথায় নিজের সুর বসানো। এক্ষেত্রে পরের সুরে নিজের কথা বসাবার দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়।......'

বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত ধ্রুপদিয়া রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

এই সূত্রে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বসূরি আত্মীয়-স্বজনেরা উচ্চাঙ্গসংগীতের কাব্য- অবয়বসংলগ্ন সুর ও ছন্দকে আদর্শ করে গান লিখেছেন। ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গসংগীতের পরিবেশে মানুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুত্র-কন্যাদের সংগীত শিক্ষা বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন। ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ঘরানার সংগীতজ্ঞগণ নিয়মিত আসতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য—বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পারিবারিক শিক্ষক। তা ছাড়া আসতেন পিতৃবন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ। এঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা নিয়মিতভাবে সংগীত শিক্ষা করলেও রবীন্দ্রনাথ কখনওই প্রথাবদ্ধ শিক্ষাগ্রহণ

করেননি। আড়াল-আবডাল থেকে তিনি লুকিয়ে-চুরিয়ে গান শুনতেন। ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ দেখতেন যে, তাঁর দাদারা প্রায় প্রত্যেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট, তানসেন প্রমুখ সংগীতগুণীদের গীত হিন্দি গান ভেঙে বাংলায় গান রচনা করছেন। সেগুলি প্রায় সবই ব্রহ্মসংগীত। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 'বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকাল-সন্ধ্যার উৎসবে আমোদে উপাসনা মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রমুখ গুণীর রচিত গানগুলি আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়।' রবীন্দ্রনাথও ছোটোবেলা থেকে এই ধারা মেনেই গান রচনা শুরু করেন। প্রথম হিন্দি ভাঙা গান রচনা করেন ১৯ বছর বয়সে—'এই যে হেরি গো দেবী' [বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের গান]। মূল গানটি একটি হিন্দি খেয়াল 'মনকী কমলদল খোঁলিয়া।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগের রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য তান প্রয়োগ করেননি, সুরের স্বাধীন লীলাবিলাসকে তাঁর গানে আদৌ প্রশ্রয় দেননি এবং ছন্দের রাজা হয়েও গানে ছন্দের অলংকরণ অনুমোদন করেননি। আলাপ-বিস্তার, তান ও লয়কারী বহির্ভূত কোন্ ক্ল্যাসিকাল রীতিতে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে-তিনি যে রীতিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা একমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রহ্মসংগীতের মধ্যেই।

আগেই বলা হয়েছে যে, ঠাকুর পরিবারে ব্রহ্মসংগীত রচনার তাগিদে বিভিন্ন উচ্চাঙ্গসংগীতের সুর অনুসরণ করার যে-প্রথা প্রচলিত ছিল রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বেশ কয়েকটি প্রিয় উচ্চাঙ্গসংগীত একাধিকবার ভাঙা হয়েছিল। একটি দৃষ্টান্ত—'রুম ঝুম বরখে' [কাফি / সুরফাক্তা] ভেঙে রচিত হয়েছিল : 'দীন হীন ভকতে' [কাফি / সুরফাক্তা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর], 'তুমি হে ভরসা মম' [কাফি / ঝাঁপতাল—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর] এবং 'শূন্যহাতে ফিরি হে' [কাফি / সুরফাক্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]।

ভাঙা গান প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম'-এ জানাচ্ছেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে যেখানে যে ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশ-বিদেশ থেকে যেসব গান আহরণ করে তাঁকে এনে দিয়েছেন তার প্রায় সবগুলিই তিনি গ্রহণ করেছেন—একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এইভাবেই তাঁর উচ্চাঙ্গসংগীত, লোকসংগীত, বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত বা পাশ্চাত্য সংগীত ভাঙা গানগুলি রচিত হয়েছে।

ভাঙা গানগুলি বিশেষত ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা জাতীয় গানগুলির অধিকাংশই ব্রহ্মসংগীত বা পূজা পর্যায়ের গান। সুতরাং গান ভাঙার অন্যতম উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মসংগীত রচনা—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এছাড়া লক্ষণীয় যে লোকসংগীত-ভাঙা গানগুলি সবই 'স্বদেশ' পর্যায়ের গান। আর বিলাতিগান-ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতগুলির অধিকাংশই গীতিনাট্যের গান। তা ছাড়াও 'পূজা' ও 'প্রেম' পর্যায়ের গানও আছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সংগীত-ভাঙা গানগুলি 'প্রকৃতি' ও 'পূজা' পর্যায়ের গান।

এই নিবন্ধের বিষয় : 'ভাঙা-গানে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা'। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের মূল গান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীতগুলিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা কতখানি তার আলোচনা। প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভাগে স্বল্প কয়েকটি উদাহরণসহ বিষয়টির গভীরে যাওয়া যেতে পারে।

ভাঙা গানের ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে ধ্রুপদ গানের কথা। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ধ্রুপদ সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুল গভীরতা, আর একদিকে তার আত্মদমন সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।' ধ্রুপদ গানের যে সমস্ত রীতিনীতি ও নিয়ম আছে, তার মধ্যে—বাঁট (দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি), তান ও আলাপ তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর গানে কথা ও সুরের ভারসাম্যের কথা মনে রেখেই তিনি হয়তো এইরকম করেছিলেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখা যায় যে, তাঁর ধ্রুপদ-ভাঙা গানে মূলত ঈশ্বর আরাধনা ও প্রকৃতি বর্ণনা স্থান পেয়েছে। মূল গানে যদি বিধৃত থাকে রাজার গুণগান বা ঋতুর বর্ণনা রবীন্দ্র-ধ্রুপদ গানে তাই পরিণত হয়, 'পূজা'-য়। অর্থাৎ সুরের কাঠামো গ্রহণ করলেও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ঘটে যায় আমূল পরিবর্তন। গানের কাঠামোতে তিনি ধ্রুপদের চারতুক—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষত তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ গানে এমনকি পরবর্তী কাব্যসংগীতেও সঞ্চারীর প্রয়োগটি ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীতেরই অবদান। তাছাড়া ধ্রুপদের গাম্ভীর্য ও

গানের কাঠামোতে তিনি ধ্রুপদের চারতুক—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষত তাঁর ধ্রুপদাঙ্গ গানে এমনকি পরবর্তী কাব্যসংগীতেও সঞ্চারীর প্রয়োগটি ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীতেরই অবদান। তাছাড়া ধ্রুপদের গাম্ভীর্য ও শান্তরূপটি তাঁর গানেরও একটা চরিত্রলক্ষণ।

বিষ্ণু চক্রবর্তী

শান্তরূপটি তাঁর গানেরও একটা চরিত্রলক্ষণ। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ সংগীত রচনার ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরী রীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন। এই ধারণার বিপরীতে অন্য একটা অভিমত পাওয়া যায় দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' ও অমলকুমার মিত্র রচিত 'রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত রাগসংগীত' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, বাল্যকালে তাঁদের বাড়িতে গোয়ালিয়র, মোরাদাবাদ, অযোধ্যা থেকে ওস্তাদ আসতেন। এছাড়াও বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট প্রমুখেরা ঠাকুরবাড়ির সংগীতাচার্য ছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউই বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। একমাত্র যদুভট্ট বিষ্ণুপুরের লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি পনেরো বছর বয়সে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে খাণ্ডারবানী ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তিনি খাণ্ডারবানী ধ্রুপদের গায়ক ছিলেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদের আকর গ্রন্থ— 'সংগীত মঞ্জরী', 'সংগীত চন্দ্রিকা' (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশ পায় যথাক্রমে ১৯০৭, ১৯০৯ এবং ১৯১৪ সালে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুর ঘরানার আকর গ্রন্থগুলি কবির ৪৬ বছর বয়স থেকে কাজে লেগেছিল—যখন গান ভাঙা প্রায় শেষ। অপর যে দুজন সংগীতগুণীর সংস্পর্শে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই শ্যামসুন্দর মিশ্র ও রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, উভয়েই ছিলেন বেতিয়া ঘরানার গায়ক। সুতরাং এঁদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর ঘরানার কোনও সম্পর্ক নেই এবং বিষ্ণুপুর ঘরানায় যে কয়েকটি রাগের বৈশিষ্ট্য দাবি করা হয় তা আসলে পশ্চিমে উদ্ভূত। তবে ৪৯ বছর বয়সে লেখা 'হে নিখিলভারধারণ' গানটি বিষ্ণুপুরী গৌড় রাগের মতো হয়ে গেছে। এটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগা-যোগের পরই রচিত হয়েছিল। তাছাড়া কবি বিষ্ণুপুর ঘরানাজাত কিছু মূল গানও ভেঙেছিলেন। যেমন— 'আজু বহত পবন সুমন্দ'—'আজি বহিছে বসন্তপবন', 'অজ্ঞান তম নিকরে'—'সংশয় তিমির মাঝে', 'শ্যামকো দরশন নাহি'—'সংসারে কোন ভয় নাহি'। যা হোক সবদিক বিচার করে একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ নয়, সেনিয়া, বেতিয়া প্রভৃতি ঘরানার ধ্রুপদ শুনেছিলেন এবং তাদের প্রভাব তাঁর গানে পড়েছিল।

> *একমাত্র যদুভট্ট বিষ্ণুপুরের লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি পনেরো বছর বয়সে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে খাণ্ডারবানী ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তিনি খাণ্ডারবানী ধ্রুপদের গায়ক ছিলেন।*

রবীন্দ্রনাথ প্রথম ধ্রুপদ-ভাঙা গান রচনা করেন ২১ বছর বয়সে—'সঘন গহন ছাইল / গহন ঘন

ছাইল'। মূল গানটি হল—'ইন্দ্রহুঁ কী আশয়ারি'। উভয়েরই রাগ গৌড়মল্লার। মূল গানটি ১২ মাত্রার চৌতালে নিবদ্ধ, রবীন্দ্রসংগীতটি বাঁধা হয়েছে ১৬ মাত্রার ত্রিতালে। অতএব ছন্দগত একটা বড়ো রকমের পার্থক্য রয়েছে। মূল গানটি স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ—চারকলিযুক্ত। অপরপক্ষে রবীন্দ্রসংগীতটি দুকলিবিশিষ্ট—স্থায়ী ও অন্তরা। মূল গানটির বিষয়বস্তু বর্ষাঋতুর বর্ণনা ও তৎসহ প্রিয়জন বিরহ। রবীন্দ্রসংগীতে বর্ষাপ্রকৃতির নিবিড় বর্ণনার সঙ্গে মিশে আছে এক অজানা আশঙ্কা। উভয়ের মধ্যে বিষয়গত মিল থাকলেও ভাবগত সাদৃশ্য নেই। সুরগত পার্থক্যও রয়েছে দুটি গানে। রবীন্দ্রনাথের গানটিতে মন্দ্রসপ্তকের ব্যবহার বেশি থাকলেও মূল গানটিতে মন্দ্রসপ্তকের ব্যবহার তেমন মেলে না। যেমন—রবীন্দ্রসংগীতটির স্থায়ী অংশটির শুরু মন্দ্রসপ্তকের মাধ্যমে—

প্‌ প্‌
I প্‌া ণ্‌া প্‌া ণ্‌া | প্‌া ম্‌া ম্‌া ম্‌া I
I গ হ ন ঘ | ন ছা ই ল I

ন্‌
| প্‌া ন্‌া ন্‌া ন্‌া | সা -। সা সা I
| গ গ ন ঘ | না ০ ই য়া I

....

মূলগানটির স্থায়ী অংশ—

সা ণধা | -ণধা ণমা | -পা র্সা II
ই ন্দ্র০ | ০০ হুঁ০ | ০ কি II

I র্সা র্সধা | -ণপা পমা | -পা মজ্ঞা |
I আ শ০ | ০০ য়া০ | ০ রি০ |

ম
জ্ঞা মা | রা রা | সা -। I
পা পি | য় ন | কে ০ I

........ইত্যাদি।

আবার বেশ কিছু গানে সুর অবিকৃত থাকলেও বিষয়বস্তুর পার্থক্য ঘটে গেছে অনেকখানি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'শ্যামকো দরশন নাহি' [ইমনকল্যাণ / আড়াচৌতাল] ভাঙা 'সংসারে কোন ভয় নাহি'। মূল গানটিতে রাধার কৃষ্ণবিরহের বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতটি 'পূজা' পর্যায়ের 'বিবিধ' উপপর্যায়ের অন্তর্গত। এ গানে কবি জানাচ্ছেন : 'সংসারে কোন ভয় নাহি নাহি'। কেননা, তাঁর (ঈশ্বরের) 'অভয় শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে', 'দিবানিশি সুখে শোকে লোকে লোকান্তরে'। আর একটি গান—'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল', মূল গান 'প্রচণ্ড গর্জন সজল' [ভূপালি / সুরফাক্তা]। মূল গানটিতে বর্ষা ঋতুর আগমন ও এক বিরহীর কথা বলা হয়েছে, এখানে প্রবল প্রতাপে বর্ষা আসে। অপরপক্ষে, 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্গত 'দুঃখ' উপপর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতটিতে দুর্দিন বা দুঃসময় আসে প্রচণ্ড গর্জনে। এখানে রবীন্দ্রনাথ দুর্দিনকে বর্ষার ভয়াবহ রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে এই ভয়কে ত্যাগ করতে বলেছেন কবি। কেননা 'অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত / মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ।'

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল গানের সঙ্গে সুরগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রসংগীতে কোনও কোনও জায়গায় কিছু পরিবর্তিত সুরের ব্যবহার লক্ষণীয়। বিষয়বস্তুর পার্থক্য তো আছেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এই গানটির কথা—'আজি বহিছে বসন্তপবন' [বাহার / তেওরা], মূলগান-'আজু বহত সুগন্ধ পবন'। উভয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুর যথেষ্ট ফারাক। মূল গানটি প্রকৃতি বিষয়ক। এখানে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা বিধৃত। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের গানে শুধু অনুষঙ্গ হিসাবে বসন্ত আসে। গানটির মূল বিষয় ঈশ্বর-আরাধনা। গানটি 'পূজা' পর্যায়েরই 'উৎসব' উপপর্যায়ের। সুরযোজনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুরের চলনে মিল থাকলেও স্বরবিন্যাসের ক্ষেত্রে, স্বরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি গানের মধ্যে প্রভেদ আছে। স্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের শেষে মূল গানটিতে সোজা 'না র্সা ণা ধা'— স্বরসমষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে রবীন্দ্রসংগীতে 'র্সর্রা র্সা ণধা পধা'—এই স্বরসমষ্টির ব্যবহার হয়েছে। মূল গানের অন্তরা ও আভোগে কোনও পরিবর্তিত সুরের ব্যবহার নেই। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে অন্তরা ও আভোগ দ্বিতীয়বার গাইবার সময় পরিবর্তিত সুরের প্রয়োগ লক্ষণীয় :

রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরা :

[র্সা র্রা র্সা র্রা -র্জ্ঞা]
ধা না [[| না র্সা না | র্সা -। | র্সা র্সা I
জ্ব লে [[| তো মা র | আ ০ | লো ক I

রবীন্দ্রসংগীতের আভোগ :

[র্সা র্রা র্সা র্রা -র্জ্ঞা র্রা]
ধা না [[| না র্সা না | র্সা -। | র্সা র্সা I
উ ঠে [[| স জ নে | প্রা ন্‌ | ত রে I

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল গানের সঙ্গে সুরগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রসংগীতে কোনও কোনও জায়গায় কিছু পরিবর্তিত সুরের ব্যবহার লক্ষণীয়। বিষয়বস্তুর পার্থক্য তো আছেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এই গানটির কথা— 'আজি বহিছে বসন্তপবন'

মূল গানের অন্তরা :

II	না	না	না	না	না	না	- র্সা	I
II	ক	হি	কো	য়ে	লি	য়া	০	I

মূল গানের আভোগ :

না	না	I	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
শু	নি	I	শ্র	ব	ণ	র	ব	র	ঙ্গ	I

....

৪৯ বছর বয়সে লেখা 'প্রথম আদি তব শক্তি' [দীপক / সুরফাক্তা]—মূল গান 'প্রথম আদ শিবশক্তি [সোহিনী / সুরফাক্তা]। মূল গানে সংগীত সম্পর্কিত বর্ণনা আছে ; আর আছে ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরের কথাও। রবীন্দ্রসংগীতে সেই পরমেশ্বরের কথা, যিনি আদিকবিও। সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দুটি গানের রাগ ভিন্ন। কিন্তু তবুও দুটি গানের মধ্যে সুরগত কাঠামোয় মিল আছে। কারণ উভয় রাগেই পঞ্চম বর্জিত স্বর। কোমল ঋষভ দুই রাগেই ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র তীব্র মধ্যম সোহিনী রাগে ব্যবহৃত হলেও দীপক রাগে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয়। সেই কারণেই যেমন মিল দেখা গেছে, তেমনই স্বাভাবিকভাবেই কিছু অমিল আছে স্বরবিন্যাসে।

এবার 'ধামার' গানের কথা। শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের গান ধামার তালে গীত হয় বলে এর নাম ধামার। রবীন্দ্রনাথ মূল ধামার গান ভেঙে বেশ কিছু গান রচনা করেন। ধামার গান ধ্রুপদের রাগে গীত হয়। অতএব এ-গান ধ্রুপদাঙ্গীয়। ২২ বছর বয়সে প্রথম ধামার-ভাঙা গান পাওয়া যায় আর শেষ ধামার-ভাঙা গানটি ৪৮ বছর বয়সে। ধ্রুপদ-ভাঙা গানের সংখ্যার তুলনায় এর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। মাত্র ১৪টি। এই শৈলীর গানেও যেমন বিষয়গত পার্থক্য আছে, তেমনই সুরগত প্রভেদও বর্তমান। তবে সুরগত মিলও পাওয়া যায়—যেমন এই গানে—'বীণা বাজাও হে' [পূরবী / ধামার]—মূল গান 'বীণ বজাই রে' [পূরবী / ধামার]। কিন্তু বিষয়বস্তুর তফাত আছে যথেষ্ট। দুটি গানেই বীণা বাজানোর কথা বলা হয়েছে। মূল গানটির অর্থ হল—বীণাধ্বনির মধুরতা মনকে আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রসংগীতেও বীণা বাজানোর কথা বলা হয়েছে। তবে সেই বীণা পরমেশ্বরের। পরমেশ্বরের কাছে কবির প্রার্থনা : সুখে দুঃখে বিপদে আমার অন্তরে তোমার বীণার আনন্দিত তান শোনাও। অতএব দুটি গানে 'বীণা' শব্দটির দুরকম ভাব। দেখা যাচ্ছে যে, এই শৈলীর গানগুলির মধ্যে বিষয়গত বৈসাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনই সুরগত দিক থেকেও অমিল রয়েছে ; যদিও রাগের মিল থাকার দরুন সুরের কাঠামোর কিছুটা মিল দেখা যায়।

হিন্দি-ভাঙা গানের পরবর্তী শ্রেণিবিভাগ 'খেয়াল-ভাঙা গান'। খেয়াল-ভাঙা গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনাবশ্যক তান-কর্তব কোনও কালেই প্রয়োগ করেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য : '.....সংগীতেরও এইরকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর একটি হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলাদেশে। কোনও সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'।' রবীন্দ্রসংগীতে রাগবিস্তারের কোনও অবকাশ নেই। কণ্ঠ, উচ্চারণ ও অভিব্যক্তি দিয়েই যথার্থ ভাবরূপটি প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথ অনেক হিন্দি খেয়াল গান ভেঙে গান রচনা করেছেন। তবে ধ্রুপদ গানের তুলনায় তা সংখ্যায় অনেক কম। প্রথম খেয়াল-ভাঙা গান রচিত হয় ১৯ বছর বয়সে এবং শেষ খেয়াল-ভাঙা গান ৭৮ বছর বয়সকালে। খেয়াল-ভাঙা গানের মোট সংখ্যা ৬২। দেখা যায় যে, একই খেয়াল ভেঙে বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ—'মনকী কমলদল খোলিয়া' খেয়ালটি ভেঙে 'এই যে হেরি গো দেবী', 'এ কী হরষ হেরি কাননে', 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল' রচিত হয়েছে। আর একটি খেয়াল গান 'হাল মে রবে রবা' ভেঙে রচিত হয়েছে 'হা কী দশা হল আমার' ও 'হায় একী সমাপন'। আবার ৩৫ বছর বয়সে 'নইরে মা বরণ' গানটি ভেঙে রচনা করেন দুটি গান 'হৃদয়-আবরণ খুলে গেল' ও 'এ কি করুণা করুণাময়।'

খেয়াল-ভাঙা গানেও বিষয়বস্তুর বৈসাদৃশ্য সুপ্রকাশিত। রাগের মিল থাকার দরুন সুরগত কাঠামোয় কিছুটা সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু স্বরবিন্যাসের পার্থক্যও প্রচুর আছে গানগুলির মধ্যে। এক্ষেত্রে কবির ৩২ বছর বয়সে লেখা একটি গানের কথা বলা যায়, গানটি হল—'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। মূল গানটি হল, 'লাগি মোরে ঠুমক' [মালকোষ / ত্রিতাল]। রবীন্দ্রসংগীতটি মিশ্র মালকোষ রাগাশ্রয়ী, তাল ত্রিতাল। মূল গানটি দুই কলিবিশিষ্ট হলেও রবীন্দ্রসংগীতটি চার কলিবিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসবের গান ধামার তালে গীত হয় বলে এর নাম ধামার। রবীন্দ্রনাথ মূল ধামার গান ভেঙে বেশ কিছু গান রচনা করেন। ধামার গান ধ্রুপদের রাগে গীত হয়। অতএব এ-গান ধ্রুপদাঙ্গীয়। ২২ বছর বয়সে প্রথম ধামার-ভাঙা গান পাওয়া যায় আর শেষ ধামার-ভাঙা গানটি ৪৮ বছর বয়সে।

মূল গানটি প্রেম বিষয়ক। রবীন্দ্রসংগীতটি 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্গত 'আনন্দ' উপপর্যায়ের গান। গানটির মূল ভাবার্থই হল 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। অতএব, দুটি গানের মধ্যে ভাবগত বা বিষয়গত কোনও মিলই পাওয়া যায় না। সুরগত দিক থেকে দেখা যায় যে, মূল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতটির সুরের চলনে অনেকটাই মেলে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতটিতে কড়ি মধ্যম ও কোমল ঋষভের ব্যবহার দেখা যায়। এই কারণেই গানটিকে মিশ্র মালকোষ রাগাশ্রিত বলা হয়। কড়ি মধ্যমের ব্যবহার 'জীবনে কিরণে' ও 'শূন্য জীবনে' কথা দুটিতে দেখা যায়—

ম জ্ঞা ণ্মা মা মণ্মা | ম জ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা - মজ্ঞা II
জী ব নে কি০ | র ণে০ "আ০ ০০" IIII
ম জ্ঞা - ণ্মা মা মণ্মা | ম জ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা - মজ্ঞা IIII
শূ ন্ ন জী০ | ব নে০ "আ০ ০০"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রসংগীতটির একটি সুরান্তর শুদ্ধ মালকোষ রাগে প্রচলিত আছে।

সুরগত অমিলের প্রসঙ্গে একটি বিশিষ্ট গানের কথা মনে আসে—'সমুখে শান্তিপারাবার' [পূরবী / কাহারবা]। মূল গানটি হল, 'লাইরি মোরে শ্যাম' [পূরবী / ত্রিতাল]। ইন্দিরা দেবী সংগৃহীত মূল গানটির রচয়িতার নাম বদ্রিদাস সুকুল। গানটিতে কৃষ্ণের লীলার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীতটি 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের গান। গানটি স্মরণোৎসবে গীত হয়। ঈশ্বরকে এখানে 'মুক্তিদাতা' ও 'চিরসাথি' বলা হয়েছে। তাঁর ক্ষমা, দয়া চিরযাত্রার পাথেয় হোক—এই-ই কবির ইচ্ছা। কবির নির্ভীক অন্তর মর্তের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মহাঅজানার পরিচয় জানবে তাঁরই আশীর্বাদ। ফলত নিতান্ত তরল ভাবাপন্ন মূল গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতটির কোনও বিষয়গত বা ভাবগত সাদৃশ্য নেই। সুরগত তেমন কোনও মিলও নেই দুটি গানের মধ্যে। কেবলমাত্র 'লাইরি মোরে শ্যাম ইঁদোরিয়া' কথাটির সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের 'সমুখে শান্তিপারাবার' কথাটির সুরের মিলের একটি আভাস পাওয়া যায়—

II সা ঋ গা -া | -ম -গা গণ্মাপা গা |
লা ই রি ০ | ০ ০ মো০০ রে |

পা -ণ্মাপা ণ্মাপদা পণ্মা | গ মা গা -া -া I
শ্যা ০ ০ ম ০ ০ ই০ | দো রি ০ ০ I

II সা রা গা -া | গা -পা পা -া I
স মু খে ০ | শা ন্ তি ০ I

পা -ণ্মা পা -ণ্মা গা -মা -গা -া I
পা ০ রা ০ বা ০ ০ র I

এ সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীর বক্তব্য "এই গানের আরম্ভের সঙ্গে 'সমুখে শান্তিপারাবার'-এর আরম্ভের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এইটুকু মাত্র। কবি নিজের খাতায়ও তার ইঙ্গিত করেছেন।" 'সমুখে শান্তি পারাবার'-এ দার্শনিক ভাবাপন্ন আত্মোপলব্ধির সুর ধ্বনিত হয়েছে। গানটির সুরের চলনও তদনুরূপ করার প্রয়োজনেই কবি মূল গানের সুরের কোনওপ্রকার চলন এই গানে গ্রহণ করেননি বলে মনে হয়।

হিন্দি-ভাঙা গানের টপ্পা, তেলেনা ও ভজনশৈলীর গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ খুব কম গানই এই তিন শৈলীর গান থেকে ভেঙেছেন। তেলেনা ও টপ্পা-ভাঙা গান সর্বসমেত ৫টি করে ও ভজন ভেঙে ২টি গান রচনা করেছেন।

হিন্দি-ভাঙা গানের টপ্পা, তেলেনা ও ভজনশৈলীর গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ খুব কম গানই এই তিন শৈলীর গান থেকে ভেঙেছেন। তেলেনা ও টপ্পা-ভাঙা গান সর্বসমেত ৫টি করে ও ভজন ভেঙে ২টি গান রচনা করেছেন।

টপ্পা একপ্রকার প্রেমসংগীত যা শোরি মিয়ার উদ্‌ভাবন। রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-ভাঙা গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শোরী মিএগার দ্রুত তান বা জমজমা প্রভৃতি অলংকরণের সেই বাহুল্য নেই অথবা একই কথার অংশকে হেরফের করার আতিশয্য নেই। এই বাহুল্য নেই বলেই রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানগুলি স্বতন্ত্র মর্যাদা পাবার যোগ্য। টপ্পা গানকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানে অলংকরণ হিসাবে দেখা যায় একই স্বরের আন্দোলন যা বাংলা কাব্যগীতির ভাবকে শ্রোতাদের সামনে পরিস্ফুট করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। এছাড়া দু-একটি গানে তানের সীমিত ব্যবহার থাকায় সেই গানগুলি বাংলা কাব্যসংগীতের ভাণ্ডার ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। মূল টপ্পার বিষয় 'প্রেম' যা রবীন্দ্রসংগীতে 'পূজা'র গানে পর্যবসিত হয়েছে। টপ্পা-ভাঙা গান প্রথম রচিত হয় ২৩ বছর বয়সে ও শেষ রচিত হয় ৩৮ বছর বয়সে। এরপর কবি আর একটিও পাঞ্জাবি টপ্পা-ভাঙা গান রচনা করেননি। অন্যান্য গান অর্থাৎ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল এমনকি ঠুংরি গানের চেয়েও হিন্দি-ভাঙা টপ্পার সংখ্যা অনেক কম—এই পরিসংখ্যান আমাদের বিস্মিত করে। 'এ পরবাসে রবে কে'—'ও মিয়াঁ বেজানেওয়ালে' [সিন্ধু / মধ্যমান], 'কে বসিলে আজি'—'বে পরিজাঁ তাড়ে [সিন্ধু / মধ্যমান],

'হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল'—'মিঞা বে মানুলে' [ঝিঁঝিট / মধ্যমান] প্রভৃতি গানগুলি পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে, রাগের এক হওয়ার কারণে সুরগত কাঠামোয় একটি মিল দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতগুলির সঙ্গে মূল গানগুলির কোনও সাদৃশ্যই চোখে পড়ে না। ভজন ও তেলেনা-ভাঙা গানগুলির ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করা যায়।

ঠুংরি-ভাঙা গানের আলোচনায় দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ মূল ঠুংরি গানের অনুসরণে বেশ কিছু গান রচনা করেন—সর্বসমেত ১০টি। রাগের ক্ষেত্রে এমনকি তালের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায় এই গানগুলির মধ্যে। এমনকি কাজরী গানের শৈলীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঠুংরি-ভাঙা প্রথম গানটি লেখেন ২২ বছর বয়সে এবং শেষ গানটি ৬৯ বছর বয়সে। এই শৈলীর গান রচনায় কোনও ধারাবাহিকতা লক্ষিত হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১০টি ঠুংরি ভাঙা গানের মধ্যে কেবল 'খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো' ও 'ওগো দেখি আঁখি তুলে' গান দুটির মূল গানের পাঠ ও স্বরলিপি পাওয়া যায়। এই গান দুটির সম্পর্কে স্বল্প আলোচনা করা যেতে পারে। 'ওগো দেখি আঁখি তুলে' গানটির রাগ ও তাল যথাক্রমে মিশ্রসুরট ও দাদরা। মূল গানটি 'গরয়ার, ন হো সাকী'-র রাগ ও তাল যথাক্রমে মিশ্রসুরট ও পোস্তাতাল (ধীরে)। অতএব তালের দিক থেকে দুটি গানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলা যায় যে, মূল গানটির বিষয় প্রেম। অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীতটি 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের গান ; বিষয়ও প্রেম। তাই বিষয়গতভাবে মোটামুটিভাবে একটা মিল আছে। সুরগত দিক থেকে দুটি গানের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে। উপরন্তু দুটি গানের চলন আলাদা। অপর গান 'খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো'-র গানটির রাগ তিলককামোদ (মিশ্র) ও তাল যৎ। মূল গানটির 'মহারাজা কেবারিয়া খোল' রাগ তিলককামোদ (মিশ্র) ও তাল কাওয়ালি। এই মূল গানটি রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন সাহানা দেবীর কাছে। মূল গানটি কাজরী গান। বর্ষার সবল পটভূমিকায় প্রেমিকার আর্তি এখানে ধ্বনিত। রবীন্দ্রসংগীতটি গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের 'পূজা ও প্রার্থনা'র গান। এখানে 'খেলার সাথি' বলতে কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং ভাবগত-বিষয়গত কোনও মিলই নেই গান দুটির মধ্যে। সুরগত দিক থেকে বলা যায় যে, দুটি গানের মধ্যে চলনের মিল দেখা গেলেও সুরবিন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন মিল পাওয়া যায় না। মূল গানটির স্বরবিন্যাস অপেক্ষাকৃত সরল রবীন্দ্রসংগীতের স্বরবিন্যাসের তুলনায়।

৬৯ বছর বয়সে লেখা একটি গানের আলোচনার মধ্য দিয়েই হিন্দি-ভাঙা গানের পর্বটি শেষ করা যেতে পারে। গানটি হল—'কখন দিলে পরায়ে'। মূল গানটি হল 'কিন্ হে দেখা কান্‌হাইয়া'। মূল গানটি সম্পর্কে শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণাণ বলেছেন যে, এই গানটির সুরের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'কখন দিলে পরায়ে'-র সুর দেন। কিন্তু কথা সুরের অঙ্গাঙ্গী যোগ হচ্ছে না মনে করে স্বরের পরিবর্তন করেন। গানটিতে শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীতটি প্রেম পর্যায়ের অন্তর্গত। ফলত বিষয়বস্তু বা ভাবগত—কোনও দিক থেকেই দুটি গানের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের বক্তব্য স্মরণযোগ্য : 'হিন্দি কথায় রাগিনী ছিল ভৈরবী। কিন্তু সুরে ও ছন্দে একটি লঘু চপলতার প্রকাশ ছিল, তা বাংলা-কথার সঙ্গে মানায় না দেখে সুর বদল ক'রে করলেন পিলু-বাঁরোয়া এবং গতি হল অনেক ধীর। এই সুরটি আজকাল চলতি।'

উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলা যেতে পারে যে, 'কিন্ হে দেখা কান্‌হাইয়া' গানটি কোনওমতেই 'কখন দিলে পরায়ে'-র মূল গান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। বরং বলা যায় যে, মূল গানটি রবীন্দ্রসংগীতটির উপলক্ষ মাত্র।

এবার আসা যাক লোকসংগীত প্রসঙ্গে। বাংলার দেশি বা লোকসংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তা লিখিতরূপে প্রকাশ পায় ১২৯০ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়। শিলাইদহে বাসকালীন প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গে তাঁর সঙ্গে বাউলদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মুখে বাউল গান ছাড়া সারি ও ভাটিয়ালি গানও শোনেন। ৪৪ বছর বয়সে কবি লোকসংগীত-ভাঙা গানগুলি রচনা করেন। সেই সময় চলছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ভাঙা গানগুলির সবই স্বদেশ পর্যায়ভুক্ত। সুরগত মিল থাকলেও স্বরবিন্যাসের পার্থক্য চোখে পড়ে। ভাঙা গানের দুটি দৃষ্টান্ত—গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব, তারে'-র গানটির আদর্শে রচিত হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা'। একটি সারিগান 'মনমাঝি সামাল সামাল'-এর আদর্শে রচিত হয়েছে 'এবার তোর মরা

ঠুংরি-ভাঙা গানের আলোচনায় দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ মূল ঠুংরি গানের অনুসরণে বেশ কিছু গান রচনা করেন—সর্বসমেত ১০টি। রাগের ক্ষেত্রে এমনকি তালের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায় এই গানগুলির মধ্যে।
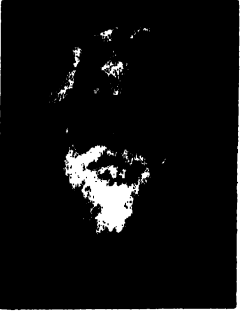
গাঙে বান এসেছে'। উপরোক্ত দুটি গানেই বাউলের ভাবাদর্শ স্বাজাত্যবোধে পরিণত হয়েছে।

হিন্দুস্থানি সংগীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে বাংলা প্রাচীন গান ও বিভিন্ন প্রদেশের গানের সুরকে, যেমন—গুজরাটি, কর্ণাটকি, মহীশূরি, তামিল, পাঞ্জাবি ইত্যাদি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন সময়ে তিনি নানা প্রদেশের গান শোনেন ও গান ভাঙার ক্ষেত্রে কাজে লাগান। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী সাবিত্রী কৃষ্ণাণের মুখে তামিল ভাষায় রামদাস ও ত্যাগরাজের ভজন শুনে তিনি প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক গান রচনা করেন। যেমন—'বৃন্দাবন লোলা' গানটি রামদাসের ভজন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত 'নীলাঞ্জনছায়া' প্রেম পর্যায়ের গান। এতে বর্ষার একটি বিস্তৃত অনুষঙ্গ আছে। দক্ষিণী গানগুলির কোনও মুদ্রিত স্বরলিপি না পাবার জন্য বিস্তৃতভাবে সুরগত বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে উভয়ের মধ্যে সুরগত চলনের একটা মিল আছে। কর্ণাটকি গান 'সখী বা বা' ভেঙে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'বড়ো আশা করে'। দেব-দেবীর বর্ণনাত্মক গান পূজার গানে পরিণত হয়েছে। কর্ণাটকি গান ভাঙা হলেও রবীন্দ্রসংগীতটির সুরে পাশ্চাত্য সুরের চলনের একটা আভাস পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থানি সংগীত ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনার ক্ষেত্রে বাংলা প্রাচীন গান ও বিভিন্ন প্রদেশের গানের সুরকে, যেমন—গুজরাটি, কর্ণাটকি, মহীশূরি, তামিল, পাঞ্জাবি ইত্যাদি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন সময়ে তিনি নানা প্রদেশের গান শোনেন ও গান ভাঙার ক্ষেত্রে কাজে লাগান।

ভাঙা গানের শেষ পর্যায় হল পাশ্চাত্য গান। ছোটোবেলায় কবির পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে জানাশোনা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাধ্যমে। তবে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে প্রথমবার বিলেতে গিয়ে। বিলেত থেকে ফিরে গীতিনাট্য রচনার সময়েই কবি পাশ্চাত্য গান ভাঙেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য গানের প্রভাবে গান তৈরি করলেও পরবর্তী জীবনে প্রত্যক্ষভাবে কোনও বিলিতি গান ভেঙে গান সৃষ্টি করেননি। যুদ্ধ বিজয়ের গান, প্রেমিকার গান, বীররসাত্মক গানগুলি ভেঙে তিনি বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গান রচনা করেন। এ ছাড়া প্রেম পর্যায়ের গান ও একটি ব্রহ্মসংগীতও আছে। একটি আইরিশ গান 'go where glory waits thee' ভেঙে চারটি ভিন্ন ধরনের গান রচনা করেন। গানগুলি হল :

(১) 'মরি ও কাহার বাছা'—বাল্মীকিপ্রতিভা
(২) 'মানা না মানিলি'—কালমৃগয়া,
(৩) 'আহা আজি এ বসন্তে'—মায়ার খেলা,
(৪) 'ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়'—ব্রহ্মসংগীত।

পাশ্চাত্য-ভাঙা গানগুলির সঙ্গে মূল গানগুলির সুরগত কাঠামোর মিল যথেষ্ট বর্তমান। তবে কোনও কোনও রবীন্দ্রসংগীতে মূল গানের তুলনায় স্বরবিন্যাসের জটিলতা বেশি।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রকাশিত যে, এক অতুলনীয় স্রষ্টা কীভাবে সামান্য উপাদান গ্রহণ করে নতুন দিকে চলে যেতে পারেন। উপহার দিতে পারেন একেবারে নতুন সৃষ্টি। সাঙ্গীতিক কিংবা সাহিত্যগত—যে কোনও দিক দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানগুলি বিশিষ্ট—স্বাতন্ত্রে ভাস্বর। 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানগুলি সংশ্লিষ্ট মূলগানের হুবহু অনুকরণ'—প্রচলিত এই মত যে ঠিক নয় তা উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টতই ধরা পড়ে। হিন্দুস্তানী সংগীত সম্পর্কে তাঁর মনের ভাব ছিল : 'শিখব পাওয়ার জন্যে, ওস্তাদি করবার জন্যে নয়'। তারই পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এই ভাঙা গানগুলিতে। 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানগুলির মূল্যায়নে হিন্দুস্তানী গানের কিছু উপাদানের আভাস পাওয়া যাবে, কিন্তু তার প্রকাশে যে সৃজনশীলতা যে সৃষ্টিসুখের উল্লাস ধরা রইল তা সামঞ্জস্যের এক অন্যতর স্তর, সেখানে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ-অনুরাগের মিল।' এখানেই 'ভাঙা গানে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা'।

তথ্যসূত্র :

১। **সংগীতচিন্তা**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। **জীবনস্মৃতি**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। **ধ্রুপদ প্রসঙ্গে**—ডঃ বিমল রায়, সম্পাদনা ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ
৪। **বিষ্ণুপুর ঘরানা**—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৫। **রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত রাগসংগীত**—অমলকুমার মিত্র
৬। **রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও বিষ্ণুপুর ঘরানা** —দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৭। **গীত সূত্রসার** (১ম ও ২য় খণ্ড)—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
৮। **রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ** (১ম খণ্ড)—প্রফুল্লকুমার দাস
৯। **রবীন্দ্রসংগীত**—শান্তিদেব ঘোষ
১০। **রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা** (৩য় খণ্ড) —প্রফুল্লকুমার দাস
১১। **শতগান**—সরলাদেবী চৌধুরানী
১২। **বিলাতি গান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত** —ডঃ অনুরাধা পালচৌধুরী
১৩। **রবীন্দ্রসংগীতে উপাদান আর প্রকাশ** —সুভাষ চৌধুরী—দেশ

এবং

১৪। সাবিত্রী দেবী কর্তৃক গীত গানগুলি ও ইন্দিরা দেবী সংগৃহীত গানগুলির পাঠ ও স্বরলিপি শ্রীমতী সুপূর্ণা চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

লেখক পরিচিতি : *প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী*

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সংগীতে বীরভূমের নিসর্গ ও লোকসংস্কৃতি

মাধবী ঘোষ

বীরভূম বা বীরভূমির ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। সংগীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বীরভূমের দান কম নয়। মধ্যযুগে জয়দেব, চণ্ডীদাস, নিত্যানন্দ, বীরচন্দ্র ব্যামাক্ষেপা প্রমুখ বৈষ্ণবসাধক ও শাক্তসাধকদের সাধনপীঠ ও লীলাভূমি এই বীরভূম জেলা। আবার বিংশ শতকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টিকর্মে সমগ্র বাংলার সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। তারাশঙ্করের অনেক লেখায় বীরভূমের প্রচলিত বহু লোকসংগীতের ও লোকসংস্কৃতির কথা পাই। তাঁর 'হাঁসুলিবাঁকের-উপকথা' ও 'কবি' উপন্যাসের মধ্যে বীরভূমের ভাঁজো কবিগান, ঝুমুর এইসব লোকসংগীতের পরিচয় পাই।

সৌজন্যে : দেশ পত্রিকা

এই জেলার বেশ কিছু অঞ্চল বর্ণহিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী ও অনুন্নত-সম্প্রদায় অধ্যুষিত। এই সম্প্রদায়গুলি ধর্মীয়পূজা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য বিভিন্নরকম সংগীতের প্রচলন ঘটিয়েছিল। বাউল, ভাদু, পটুয়া, বোলান, আলকাপ, মনসার পালা, ঝুমুর, ভাঁজো, তোষলা, বিয়েরগান, রায়বেঁশে সাঁওতালি নৃত্যগীত, কবি, ডাঙ্গালেগান ইত্যাদি হল বীরভূমের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোকসংগীত।

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের তখন থেকেই শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু হয়। শান্তিনিকেতনের আশপাশ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিভিন্নধরনের লোকসংগীতের প্রচলন আগেও ছিল, এখনও আছে। তাঁর গানে যে লোকসংগীতের প্রভাব পড়েছিল তা কি শুধুই পূর্ববাংলার লোকসংগীতের ধারা ? বীরভূমের লোকসংগীত সম্বন্ধে তাঁর কি একটুও উৎসাহ ছিল না ? রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, আলাপ-আলোচনায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারি যে বীরভূমের সংস্কৃতি, নিসর্গ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিজন, শিল্পকলা, সংগীত প্রভৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল।

আমেরিকায় 'The Touch Stone' পত্রিকায় (Feb 1921) প্রকাশিত Marguerite-Wilkinson ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাক্ষাৎকারের এক জায়গায় Wilkinson যখন প্রশ্ন করছেন—

> 'I have heard that your poems are often sung and chanted by the people of your country', said I, 'that is true, is it not ?'[১]

তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> 'Yes', he said, 'it is true. Our people

রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, আলাপ-আলোচনায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারি যে বীরভূমের সংস্কৃতি, নিসর্গ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিজন, শিল্পকলা, সংগীত প্রভৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল।

love poetry. I know villagers in my neighbourhood, who after their day's work in the field, gather under the stars before some hut and sing in Chorus till mid-night devotional songs belonging to the best lyrical literature of their language.'[২]

Wilkinson রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করছেন—

'If the people enjoy singing your poems is it because they are like folk poetry ?'[৩]

তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন,

'Some of my poems are like folk poetry,' said Dr. Tagore, 'but some are in the romantic style and some in the classical style.'

এতসব কথা জোড়াসাঁকো সম্বন্ধে নয়, শিলাইদহ সম্বন্ধেও নয়, শান্তিনিকেতন ও তার আশপাশ অঞ্চল সম্বন্ধে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ গানকে অভিজাত বলেই আখ্যা দিয়েছেন কারণ তা লিরিকধর্মী। অনভিজাত সংগীতবলে গ্রামীণ গানকে তিনি অশ্রদ্ধা করেননি।

শান্তিনিকেতনের আশপাশ অঞ্চলের সাঁওতালদের পল্লিতে তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি অনেকবার গিয়েছিলেন এবং তাদের সমবেত নাচগান উপভোগ করেছিলেন। এ বিষয়ে সুধীরচন্দ্র করের **'কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ'** গ্রন্থ থেকে একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

কবিকে যোগ দিতে দেখেছিলেন সাঁওতালদের বাঁধনা পরবে। ১৯২৯ সাল হবে—সংলীর রাণীসাহেবা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ; পৌষ-সংক্রান্তি পড়েছিল সেই সময়েই। শান্তিনিকতেন থেকে শ্রীনিকেতনের পথে প্রথম সাঁওতাল পাড়াটির প্রাঙ্গণে চলেছে সাঁওতালদের জাতীয় উৎসব। রাণীকে নিয়ে কবি মোটরযোগে সেখানে যান এবং নাচগান দেখে শুনে ফিরে আসেন।[৪]

কোলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারদিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। সেখানকার মানুষ যারা সাঁওতাল, সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি।

তাঁর কবিতায়, প্রবন্ধে, গানে সাঁওতালদের সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ রয়েছে। তার থেকে আমরা জানতে পারি তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিচয়। তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন—

'কোলকাতা থেকে নির্বাসন নিয়েছি শান্তিনিকেতনে। চারদিকে তার পল্লীর আবেষ্টনী। সেখানকার মানুষ যারা সাঁওতাল, সত্যপরতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর। ভালোবাসি তাদের আমি।'

পুনশ্চ কাব্যের 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় সাঁওতাল রমণীর সুন্দর প্রসঙ্গ আছে—

'বাবু ডেকেছিস কেনে ?'
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে ?'
আমি বললেম 'এই জন্যেই।'[৫]

'ওগো সাঁওতালী ছেলে' গানে বর্ষার মেঘের রূপক হচ্ছে (metaphor) সাঁওতালি ছেলে।

অবশ্য শৈশবে কবি মহর্ষির সঙ্গে এখানে যে এসেছিলেন সে আসায় তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তৎকালীন উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে, রাতের আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে। বীরভূমকে তখন তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর আপন চেতনায় আপনার মতো করে। আঞ্চলিক লোকসমাজ তখন তাঁদের বিদগ্ধ চিত্তে ছিল অবান্তর।

প্রকৃতির নিরাভরণ সৌন্দর্য ও নির্জনতাই ছিল তাঁদের আদর্শ ও ঈপ্সিত। শুধু সমাজসংস্কৃতি সংগীত নয়, এই অঞ্চলের নিসর্গ ও কবির অন্তরে জাগিয়েছে প্রেরণা, তাঁর সৃষ্টির কাজে। পুনশ্চ, বীথিকা, শেষসপ্তক, পত্রপুট, সানাই প্রভৃতি কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে তার দৃষ্টান্ত মিলবে।

পুনশ্চ কাব্যের খোয়াই কবিতায় এ অঞ্চলের বিশিষ্ট নিসর্গ চিত্রিত। দু-একটি নির্বাচিত অংশ—

'মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতাল পাড়া ;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘপথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজশাড়ির প্রান্তে কুটিল-রেখায়।
....
পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়
তারি একধারে ছেদ পড়েছে উত্তরদিকে,
মাটি গেছে ক্ষয়ে
দেখা দিয়েছে
উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়—
পৃথিবীর আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন,
খেলার নদী।
....
এসেছিলেম বালককালে
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝির্‌ঝির্‌ ঝর্নার ধারায়
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্যকথা,

খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুরবেলায় আপনমনে একলা।

....

এই শালবন, এই একলা মেজাজের তালগাছ,
ওই সবুজমাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি
এর পানে অনেকদিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল দিনে আর আমার বাদল গানে
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।[৬]

দেখা যাচ্ছে এখানকার নিসর্গ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে অলক্ষে মিশে আছে।

পুনশ্চ কাব্যে কোপাই কবিতাতেও দেখা যায় কোপাইকে নিয়ে কবির মনোরাজ্যের কত ধরনের কল্পনার বাণীময়রূপ।

তারপরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ
দেখা যায় অদূরে।
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।

অনার্য তার নামখানি
কতকালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।

....

অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকির ঘেঁষাঘেঁষি।

....

ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ার আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।

বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।

তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন ;
এ দুইয়েই তার শোভা—
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে
সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।[৭]

সানাই কাব্যের 'সানাই' কবিতাটিই দেখুন না, উদীচীতে বসে ১৯৪০-এর ৪ জানুয়ারি লেখা—

গোরুর গাড়ির সারি হাটের রাস্তায়
রাশি রাশি ধুলো উড়ে যায়,
রাঙা রাগে
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে।
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধূম্র হাত
ঊর্ধ্বে তুলি, কলঙ্কিত করিছে প্রভাত।
ধান-পচানির গন্ধে
বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
মিশাইছে বিষ।
থেকে থেকে রেলগাড়ি মাঠের ওপারে দেয় শিস।
দুই প্রহরের ঘণ্টা বাজে।

সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান,
কী নিবিড় ঐক্যমন্ত্র করিছে সে দান।[৮]

এই কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির কথা পাচ্ছি, রাস্তার ধুলো, গোরুর গাড়ি, বোলপুরের ধানকলের ধোঁয়া ও ধানপচানির গন্ধ, রেলগাড়ির বাঁশি ইত্যাদি। কিন্তু সানাই-এর সারঙের সুর কবির অন্তরকে বাস্তবের অসংগতির ঊর্ধ্বে উঠিয়ে নিয়েছে।

পুনশ্চ কাব্যে কোপাই কবিতাতেও দেখা যায় কোপাইকে নিয়ে কবির মনোরাজ্যের কত ধরনের কল্পনার বাণীময়রূপ।

সুরুলের কুঠিবাড়িতে বসে ১৩২১ সালে ২৯ পৌষ লিখেছেন বলাকার ১৮নং কবিতাটি—

'ওরে মন
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্তগগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।[৯]

পারিপার্শ্বিক বা আঞ্চলিক কোনো বর্ণনা নয়, অনন্তে মহাবিশ্বে কবির সত্তা বিস্তৃতি লাভ করেছে কুঠি বাড়িতে বসেই। কখনো কখনো আবার আঞ্চলিক প্রকৃতি ও নিসর্গই কবির কাব্যেও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

তার একটি নিদর্শন—

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড়দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের পরে।

এখানে যে শালবনের কথা বলা হয়েছে তা শুধু এই শালবীথি নয়, উত্তরায়ণের পশ্চিম বারান্দা থেকে দেখা যেত যে দূরের শালবন, সাঁওতালপল্লি তার কথা।

শারদোৎসব নাটকে ঠাকুরদা বালকদলকে বলছে 'ওরে বাঁদরগুলো চল তোদের একবার পারুলডাঙা মাঠটা ঘুরিয়ে আনি।' পারুলডাঙা গ্রাম সেটা বড়ো কথা নয়, পারুলডাঙা নামের মধ্যে যে কাব্যিক মাধুর্য আছে সেটা কবি অনুভব করেছেন (১৯০৮-০৯)।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি বীরভূমের বহু বাউলের গান শুনেছিলেন। সে আমলে যখন দেশভাগ হয়নি তখন এক অঞ্চলের সংস্কৃতির সঙ্গে আর এক অঞ্চলের সংস্কৃতির আদানপ্রদান ছিল। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' গানটি মূলত লালন-ফকিরের হলেও রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের রাস্তায় কোনো এক বাউলের কণ্ঠে তা শুনেছিলেন।[১০]

বীরভূম জেলার বাউলদের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। এই সাধক সম্প্রদায়ের সাধনভজন প্রণালী সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে ক্ষিতিমোহন সেন কবিকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। বিশু দাস ও গোপাল ক্ষেপা এই দুজন বাউল নিয়মিত আশ্রমে এসে তাঁকে বাউলগান শুনিয়ে যেত। কবি তাঁর কবিতায়, গানে, নাটকে, উপন্যাসে এই বাউলদের নানাপ্রসঙ্গ এনেছেন। পত্রপুট কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতায় তিনি বাউলের সঙ্গে নিজের সাধর্ম্যকে একাকার করে ফেলেছেন—

'কবি আমি ওদের দলে'[১১]

পত্রপুট কাব্যের ৫নং কবিতার একেবারে শেষ স্তবকে যে রূপকল্পের সৃষ্টি তিনি করেছেন সেটি একেবারে একেলে বাউলের। ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে বসে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন।

এর শেষ স্তবকটি দেখুন—

কেরোসিনের দোকানের সামনে
চোখে পড়ল একজন একেলে বাউল।

তালি দেওয়া আলখাল্লার উপরে
কোমরে-বাঁধা একটা বাঁয়া

পারিপার্শ্বিক বা আঞ্চলিক কোনো বর্ণনা নয়, অনন্তে মহাবিশ্বে কবির সত্তা বিস্তৃতি লাভ করেছে কুঠি বাড়িতে বসেই। কখনো কখনো আবার আঞ্চলিক প্রকৃতি ও নিসর্গই কবির কাব্যেও সুন্দরভাবে ফুটে

শ্রীনিকেতন যাবার পথে: বিখ্যাত শালবীথি

লোক জমেছে চারিদিকে।

হাসলেম, দেখলাম অদ্ভুতেরও সংগতি আছে এইখানে,
এও এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।
ওকে ডেকে নিলেম জানালার কাছে,
ও গাইতে লাগল—
হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে
সবাই ধরে টানে আমায়, এই যে গো এইখানে।[১২]

শেষ সপ্তকের ৪১ সংখ্যক কবিতাটির অংশবিশেষ দেখুন—

'নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী
পাঁচরঙের তালি দেওয়া আল-খাল্লা পরে।
এসো আমার অমানীবন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে
তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না।[১৩]

ফাল্গুনী নাটকে রবীন্দ্রনাথ নিজে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় গান ও নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের ৭ পৌষের মেলা প্রথম বসে ১৮৯৫ সালে। প্রথম বছরের মেলাতেই বাউলগানের আসর বসে—তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায়। তারপর থেকে শতাধিক বছর ধরে বাউলগানের আসর বসছে। রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই পৌষমেলায় বাউলদের সমাবেশ ঘটত এবং আজও ঘটে।

আচার্য গুরুসদয় দত্ত বাংলার তথা বীরভূমের বীরত্বপূর্ণ হারিয়ে যাওয়া লোকনৃত্য রায়বেঁশের পুনরাবিষ্কার করেন। তিনি ১৯৩১ সালে যখন বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন 'গানের সাজি' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরিচায়িকা অংশে তাঁর গ্রামীণ নৃত্যগীত প্রসারণের প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। গুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টায় রায়বেঁশে নৃত্য যখন পুনরুজ্জীবন লাভ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাফল্য কামনা করে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

'আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেছেন, এরকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ।....পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষের সহচরী। আমাদের দেশেরও চিত্তদৌর্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক, সার্থক হোক।[১৪]

(১৩৩৭ সালে ২৭শে ফাল্গুনের চিঠি)

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আচার্য গুরুসদয় দত্তকে রায়বেঁশে ও অন্যান্য নাচ দেখানোর জন্য আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথের সামনে রায়বেঁশে নৃত্যগীত প্রদর্শিত হয়। তিনি নাচ দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর রচিত গীতিনাটকে এই নৃত্যপদ্ধতিকে গ্রহণ করেন। 'নবীন' নাটকে এই নাচ যুক্ত হয়েছে।[১৫] রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন পুরুষদের দলবদ্ধ নাচ হল এই রায়বেঁশে নৃত্য।

বীরভূমের মাল সম্প্রদায়ের লোকেরা পট নিয়ে উত্তরায়ণে আসত। গুরুদেবকে পটের খেলা ও পটের গান শোনাত। বীরভূমের এই পটুয়াদের ও পটুয়গানের তিনি প্রশংসা করেছেন।

পাশ্চাত্যের মানুষকে এ অঞ্চলের সংগীত কী রকম আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ পাই ফ্রান্সের মাদাম লেভি ও হাঙ্গেরি থেকে আগত অধ্যাপক Gigula Germanus-এর স্ত্রীর ডাইরি থেকে।

২১.৭.৮৯ শান্তিনিকেতনের উদয়নগৃহে ফরাসিভাষার মাদাম লেভির ডাইরি বাংলায় অনুবাদ করে 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গগুলি পাঠসমেত আলোচনা করেছিলেন। সেখান থেকে জানতে পারি সিলভাঁ-লেভি যখন শান্তিনিকেতনে পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন সেইসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ও তাঁর স্ত্রী মাদাম লেভিকে জয়দেবের মেলাতে বাউলগান শোনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত ১৯২১-২২। তাঁরা মেলাতে অনেক বাউলের গান শুনেছিলেন। বাউলের আসর উপভোগ করেছিলেন। অনেক বাউলের নাম সেখানে পাই। তার মধ্যে গোপালক্ষেপার নাম উল্লেখযোগ্য।

'গিউলা গেরমানুষ' হাঙ্গেরিয়ান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক হিসাবে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। 'ইসলামিক-স্টাডিজ' এখানে তিনি প্রবর্তন করেন। তাঁর সহধর্মিনী হাঙ্গেরিয়ান ভাষায় একটি বই লেখেন। এই গ্রন্থে আমরা যা পাই তার মধ্যে উল্লেখ্য শান্তিনিকেতনের আশপাশ অঞ্চলের গ্রাম বিশেষ করে সাঁওতালদের নাচগান তাঁদের যে আকৃষ্ট করেছিল সেই বিষয়।

মনোহরসাহী কীর্তনের যে ধারা এখন বর্তমান তা বীরভূমের ময়নাডাল, বর্ধমানের কান্দরা ও শ্রীখণ্ডে প্রচলিত। এই তিনটি কেন্দ্র হচ্ছে মনোহরসাহী কীর্তনের প্রাচীন সংগীতকেন্দ্র। মনোহরসাহী কীর্তনের পদ্ধতি ও রীতি এখনও ধরে রেখেছে ময়নাডালের কীর্তনীয়া নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুরের বংশধরেরা। এককালে বিদেশি গবেষক ও ময়নাডালের কীর্তনে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছে। Arnold Bake যখন ভারতীয় সংগীতে গবেষণার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, সেইসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মনোহরসাহী
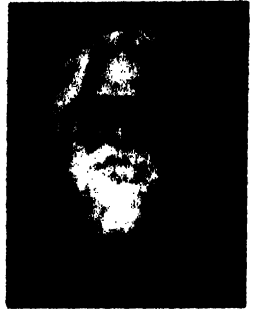
শান্তিনিকেতনের ৭ পৌষের মেলা প্রথম বসে ১৮৯৫ সালে। প্রথম বছরের মেলাতেই বাউলগানের আসর বসে— তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায়। তারপর থেকে শতাধিক বছর ধরে বাউলগানের আসর বসছে। রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই পৌষমেলায় বাউলদের সমাবেশ ঘটত এবং আজও ঘটে।
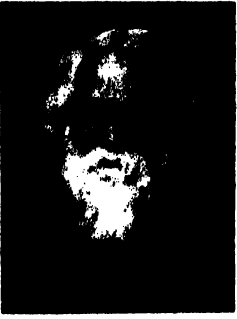
কীর্তন সম্পর্কে জানার জন্য ময়নাডালে পাঠিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে তিনি কীর্তন শিক্ষা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যের গানে মনোহরসাহী কীর্তনের সুর গ্রহণ করেছেন। ময়নাডাল অঞ্চলের মনোহরসাহী কীর্তনের দু-এক কলির সুরের স্বরলিপি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল—

'শচীর নন্দন নাথ দয়া কর মোরে হে
এই কৃপা কর প্রভু যেন তোমায় না পাসরি হে।

II গা গা -া I -া রা সরা I গা গা [ম]পা I [প]মা গা -া I
শ চী ০ র্ ন ০ন দ ন ০ না থ ০

I পা পা -া I পা পা -মা I মা মা -া I মা -পা -[ম]গা I
দ য়া ০ ক র ০ মো রে ০ হে ০ ০

I র্সা -া -া I র্সা র্সা -া I না না -া I ধপাপা ধা I
এ ০ ই কৃ পা ০ ক র ০ প্রভু যে ন

I না র্সা -া I পা ধা -া I পা মা -া I পা -[ম]গা -া II
তো মা য় না পা ০ স রি ০ হে ০ ০

এই সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্যের কয়েকটি গানের সুরে মিল লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল—হায়রে নূপুর, এই পেটিকা আমার, তোমায় দেখে-মনে প্রভৃতি।

হায় রে, হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যাজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।

II গা -মা -পা I -ধা -না -[ধ]না I ধপা -া -া I পা -ধা -পমা I
হা ০ ০ ০ ০ য় রে ০ ০ ০ ০ ০০

I মা -া পা I মা -পধা [ধ]পা I মগা -া -া I -া -া মা I
হা ০ য় রে ০০ নূ পু০ ০ ০ ০ র্ তার্

I মা পা পা I পা ধা না I পা ধা পধা I -না -ধা -না I
ক রু ণ চ র ণ্ ত্য জি লি০ ০ ০ ০

I -[প]ধা-পা -া I -া -া র্সা I না র্সা র্সা I না র্সা না I
০ ০ ০ ০ ০ তার্ ক রু ণ চ র ণ

I ধা না [প]ধা I পা ধা পা I মা পা মা I -পধা [ধ]পা পা I
ত্য জি লি হা রা লি ক ল গু ০ন্ জ ন

I মগা -া -া I -া -া -া I
সু০ ০ ০ ০ ০ র্

লোকসংগীতের একটি প্রধান অংশ প্রেমসংগীত। তার বিষয়বস্তু সাধারণত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু প্রেমসংগীত রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের পটভূমিকায় রচিত। বীরভূম জেলার প্রচলিত লোকসংগীত হল ঝুমুর। ঝুমুর মূলত প্রেমসংগীত। এর বিষয়বস্তুতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রধানত স্থান পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ে রচিত গানের সঙ্গে ঝুমুর গানের রচনা ও ভাবগত সাদৃশ্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে।

নিম্নে একটি ঝুমুর গানের উল্লেখ করলাম—

অতির সকালবেলায়
বাঁশিটা বাজাচ্ছে কালা
আয় কাঁখে কলসি লেয় রাধা
বাঁশি শুনতে গো যমুনাকে যায়॥
বাঁশি শুনতে গো, বাঁশি শুনতে, যমুনাকে যায়
কাঁখে কলসি লেয় রাধা
বাঁশি শুনতে গো যমুনাকে যায়॥

বাঁশির রূপকল্প রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রেমপর্যায়ের গানেও যথেষ্ট আছে, যেমন—

সাঁওতাল রমণী

বীরভূম জেলার প্রচলিত লোকসংগীত হল ঝুমুর। ঝুমুর মূলত প্রেমসংগীত। এর বিষয়বস্তুতে রাধাকৃষ্ণে প্রেমলীলা প্রধানত স্থান পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমপর্যায়ে রচিত গানের সঙ্গে ঝুমুর গানের রচনা ও ভাবগত সাদৃশ্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে।

কবি সামগ্রিকভাবে লোকসংগীতের মাধুর্যটুকু, নির্যাসটুকু নিয়েছেন ও তাকে নিজের বৈদগ্ধে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের সমীক্ষা খুবই মূল্যবান।

'রবীন্দ্রনাথের বাউল, ভাটিয়াল মার্জিত ও ভদ্র ভাষা তো ভদ্র বটেই, স্বরবর্ণের সুদীর্ঘ টান, উচ্চারণের পাড়াগেঁয়ে ভাব একেবারে নেই। অর্থাৎ রুরালিজম্ বা গ্রামীণতার এখানে নিতান্তই অভাব।' *(ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলি)*

পল্লি প্রকৃতি প্রবন্ধে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব, শিল্পভাণ্ডার উদবোধন, হলকর্ষণ, ভুবনডাঙায় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাষণ এইসব নানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধে এমন একটি ভাষণে কবি বলেছেন—

'এসো তোমরা প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে আমাদের সহযোগী হও। তা হলেই সার্থক হবে আমাদের উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ হয়ে সবল হয়ে উঠুক। গানে, গীতে, কাব্যে, কথায় অনুষ্ঠানে, আনন্দে, শিক্ষায়, দীক্ষায় চিত্ত জাগুক।'[১৬]

আশ্রমে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ যে উৎসবগুলি পালন করতেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, শারদোৎসব, পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব, বসন্তোৎসব ইত্যাদি। শ্রীনিকেতনের 'হলকর্ষণ' ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে 'অরণ্যদেবতা' ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আজকের এই উৎসবের দুটি অঙ্গ। প্রথমত হলকর্ষণ—হলকর্ষণে আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্য, শস্যের জন্য; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বসুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্য আমরা কিছু ফিরিয়ে দিই যেন, ধরনীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তার ক্ষতবেদনা নিবারণে আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি এই অনুষ্ঠানের ফলে চারিদিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে শস্যে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।'[১৭]

তার 'বনবাণী' (১৯২৮) কাব্যগ্রন্থের 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' শিরোনামে যে গানগুলি রচিত—

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ।

অথবা

আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি-বালক তরুদল
মানবের স্নেহসঙ্গ নে
চল্ আমাদের ঘরে চল্।
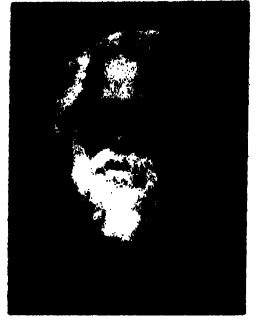
ওগো শোনো কে বাজায়
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি
বঁধুর হাসি মধুরগানে প্রাণের পানে ভেসে যায়
ওগো শোনো কে বাজায়।

অথবা

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে
আমার ঘরে কেহ নাহি যে
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে

বা

এখনো তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশি শুনেছি
মনপ্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি মুরতি কালো তা না দেখা ভালো
সখী বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি॥

প্রেমবৈচিত্র সম্পন্ন রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এমনই বহু প্রেমসংগীত রচনা করেছেন।

কবি সামগ্রিকভাবে লোকসংগীতের মাধুর্যটুকু, নির্যাসটুকু নিয়েছেন ও তাকে নিজের বৈদগ্ধে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের সমীক্ষা খুবই মূল্যবান।

শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল।

শ্রীনিকেতনের আর একটি অভিভাষণে কবির বক্তব্য—

সৃষ্টিকার্যে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য পল্লীশিল্প পল্লীগান পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে।[১৮]

'যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে।'[১৯]

শ্রীনিকেতনে আরও একদিনের ভাষণে কবি বলেছেন—'এই ক-খানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে—সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল ক-খানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি বলব এই ক-খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।[২০]

সূত্রনির্দেশ :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা, ১৩৯২, পৃ ৩২৯
২। তদেব
৩। তদেব
৪। সুধীরচন্দ্র কর : কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২০৭
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুনশ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৬১, পৃ ৫১-৫২
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুনশ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৬১, পৃ ১১-১২
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুনশ্চ, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৬১, পৃ ৫-৭
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সানাই, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃ ৭৩৭
৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা, রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃ ৪৯৫
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা, ১৩৯২, পৃ ২৪৫
১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, ১৯৬১, পৃ ৩৭৭
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃ ৩৬১
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক, রবীন্দ্ররচনাবলী ৩য় খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃ ২০৯
১৪। গুরুসদয় দত্ত : ব্রতচারী পরিচয়, ১৩৪৭, পৃ ৭৪-৭৫
১৫। শান্তিদেব ঘোষ : সুরের আগুন, অমৃত, সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ ২৩-২৪
১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃ ৫২৪
১৭। তদেব : পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ ৩৭৩
১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ ৩৭৫
১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, পঃ বঃ সরকার, পৃ ৫৩৪
২০। তদেব ; পৃ ৫৪০

লেখক পরিচিতি : বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের অধ্যাপক

ছবি : কাজল বিশ্বাস

শান্তিনিকেতনের আশপাশের সাঁওতালপল্লী

রবীন্দ্রসংগীতে ছন্দ ও তাল : রসের দ্যোতক

সুরেন মুখোপাধ্যায়

সংগীতের ছন্দ ও তাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট নিজস্ব ভাবনা ছিল। সেই চিন্তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ সকলের আগে ছন্দকে সুর বলে মনে করেছেন। "গানের ছন্দ গানের সুরই।" সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বিষয় হল বৈদিক সামিক যুগ থেকে ভারতীয় সংগীতের যে ভাবনা, তার সঙ্গে রবীন্দ্র ভাবনার এক আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই যোগসূত্রের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি, কিন্তু উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করলে দেখা যাবে বৈদিক সামিক যুগে গান ও আবৃত্তির ছন্দ তাল একই ভঙ্গিতে চলত। তবে সে যুগে কাব্যছন্দের চেয়ে গানের তালের ব্যাপকতা বেশি ছিল। মার্গতালের দীর্ঘমাত্রিক চচ্চৎপুট, চাচপুট ইত্যাদি তাল গানের পরিধিকে বাড়িয়ে দিত। এর পরবর্তীকালে দেশি সংগীতের সময়ে ও কাব্যের যে সমস্ত ছন্দ গানে প্রযুক্ত হত, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আর্যা, ক্রৌঞ্চপদা, তোটক, বৃত্ত, চচ্চরী, দ্বিপদী, গাথা ইত্যাদি। এগুলিও বৈদিক পরবর্তীকালে ছন্দ ও তালের মিলনকেই চিহ্নিত করেছে। তৎকালে গীত শাস্ত্রজ্ঞরাও কাব্যের ছন্দকে সুর ছন্দ বা তাল হিসাবে প্রয়োগ করতেন। তোটক, পঞ্চচামর, বৃত্ত বা মন্দাক্রান্তা ছন্দের চলন রীতিতে গানও গাইতেন তৎকালের গীত কুশলীরা। দক্ষিণ ভারতের গীতপদ্ধতিতে কাব্যছন্দ ব্যবহারের রীতি এখনও প্রচলিত আছে। এরপরে উত্তর ভারতীয় সংগীতে এল ওস্তাদদের রাজত্ব। কলার চেয়ে কৈবল্যই প্রাধান্য পেল। আমাদের সংগীতে কতকগুলি বাঁধা কাল নির্দিষ্ট হল, গানকে তার শাসন মেনেই চলতে হত। তিন তাল এবং এক ফাঁকের মধ্যে গানকে ঘোরাফেরা করতে হত। কবিতার ছন্দের যে নিয়ম, গানের তালের বেলায় সে নিয়মের রীতি অচল হয়ে পড়ল। ফলত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পর্বের এই

তৎকালে গীত শাস্ত্রজ্ঞরাও কাব্যের ছন্দকে সুর ছন্দ বা তাল হিসাবে প্রয়োগ করতেন।
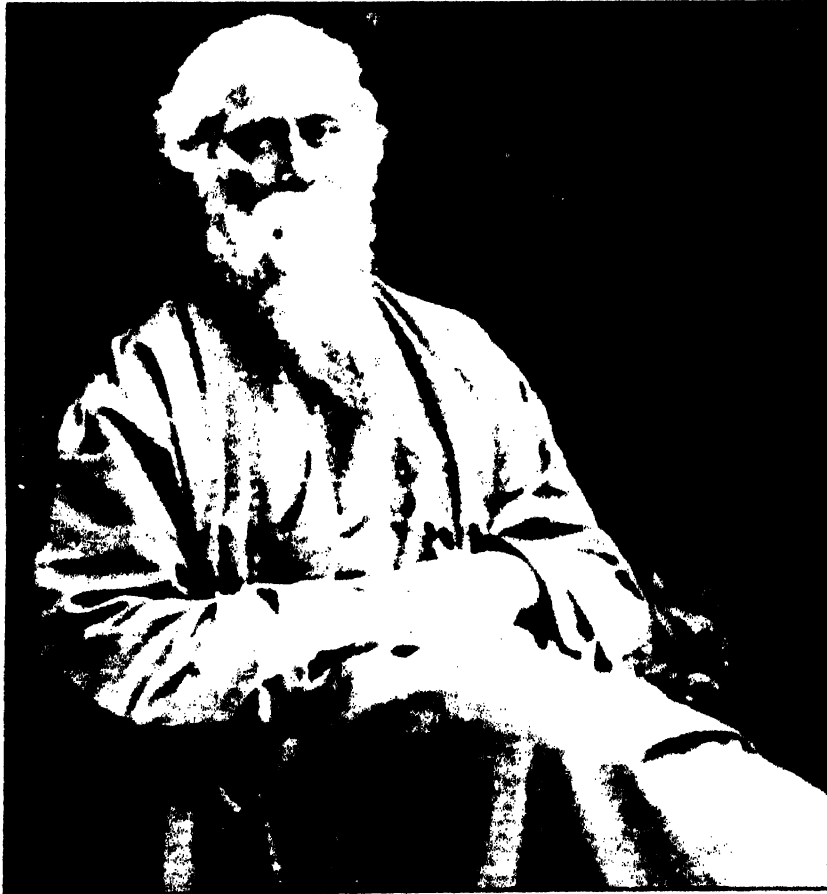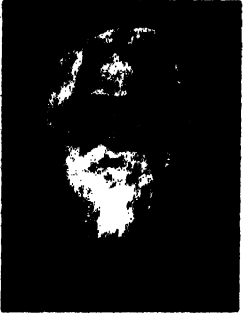
ছন্দ বৈচিত্র্যে যে বিপুল সম্ভাবনা বাংলা ও হিন্দিকে সমৃদ্ধ করতে পারত, তা অধরাই থেকে গেল। ছান্দিক রবীন্দ্রনাথ গানের তালের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিমতায় ব্যথিত হয়েছিলেন। এই কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—'কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সে নিয়মে গানে চলবে এই ভরসা করে গান বাঁধতে চাইলেম।'—ছন্দ এবং তাল যে প্রকৃতপক্ষে এক, তারই নিদর্শনস্বরূপ তিনি এগারো মাত্রা ও নয় মাত্রার তাল রচনা করে দেখালেন এবং সেই ছন্দকে প্রচলিত তালের নির্দিষ্ট রীতির ব্যতিক্রম করেও বিন্যস্ত করা যায়, তারও নিদর্শন দেখালেন। 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর' গানটি এগারো মাত্রার ছন্দ ও তালে রচিত, এর একটি অংশে সাত, অন্য অংশে চার মাত্রা। ব্যাকুল বকুলের ফুলে, যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে এবং দুয়ার মোর পথ পাশে গানগুলি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। আবার মাত্রা বিভাগের অসমতায় প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম হিসাবে দেখানো হয়েছে 'বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে' গানটি। প্রকৃতপক্ষে এই রচনার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তার প্রয়োগ নতুন করে বাংলা গানে তুলে ধরলেন। তুলে ধরলেন শাস্ত্রীয় সংগীতের মহত্তর দিকটি। তুলে ধরলেন প্রচলিত তালের সংস্কৃত ছন্দকে। আমাদের সংগীত ভাবনায় নতুন করে লাগিয়ে দিলেন অরুণরেখা। অজস্র গান নির্মাণ করলেন বর্তমান তাল রীতিতে, যাঁর ছন্দটি নির্ধারিত হয়েছিল সংস্কৃত বা প্রাকৃত পর্বে। এই পরীক্ষার ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা পেলাম তালফেরতা আশ্রিত তোটক ছন্দ নির্ভর—'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া'র মতো আরও কিছু গান। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, এই গানটির প্রারম্ভিক অংশে তোটক ছন্দ সুস্পষ্ট হলেও, সঞ্চারী পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই ছন্দের নিয়ম ভেঙে দিয়েছেন। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তালের মধ্যেও অন্য তালের অনুপ্রবেশের প্রয়োজন হয়েছে। গানটির ছন্দ বিন্যাসের পদ্ধতিটি দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা হল। সংগীত সচেতন যে কোনও ব্যক্তি এই বিন্যাস দেখলে সহজেই বুঝে নিতে পারবেন তোটক ছন্দ প্রয়োগকালে কী তাল ব্যবহৃত হয়েছে এবং যেখানে ছন্দের প্রচলিত নিয়ম ভেঙেছেন, সেখানেই বা কী তাল ব্যবহৃত হয়েছে।

এই পরীক্ষার ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা পেলাম তালফেরতা আশ্রিত তোটক ছন্দ নির্ভর—'মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া'র মতো আরও কিছু গান।

মধু ০ । গন্ধে ভ । রা মৃদু । স্নিগ্ধ ছা । য়া নীপ।
কুঞ্জ ত । লে শ্যাম । কান্তি ম । য়ী কোন।
স্বপ্ন মা । য়া ফিরে । বৃষ্টি জ । লে
পিয়ে উচ্ছল । তরল প্র । লয় মদি । রা
উন্ মুখ রত । রঙ্গিনী । ধায় অধী । রা
কার নির্ভীক । মূর্তি ত । রঙ্গ দো । লে
ক ল মন্দ্র রো । লে
এই্ তারাহারা । নিঃসীম । অন্ধকা । রে
কার্ তরণী চ্ । লে।।

লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে উন্, কার্, এই প্রভৃতি স্থানে বসন্তের ব্যবহারে তোটকের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার 'তরল প্র', 'লয় মদি', 'মুখর ত', 'তরণী চ' প্রভৃতি পর্বে তোটকের বিন্যাস ভেঙে দিয়ে ভাষার গতিবেগ সঞ্চারের জন্য চারটি লঘু ধ্বনি স্থাপন করা হয়েছে। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে জলস্রোতের উচ্ছল কলধ্বনির মতো ভাষা লঘু যুক্ত দলকে আশ্রয় করে ছুটে চলেছে। চারমাত্রা নির্ভর কাহারবা তালের দ্বিগুণ লয় গানের সুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গানকে সংবেদনার চরম প্রান্তে উপনীত করেছে।

ছন্দ ও তাল মানুষের অন্তর্ভাবের বহিঃপ্রকাশ। বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্রই ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সুন্দর-অসুন্দরের মধ্য দিয়ে ছন্দ বা তাল ধ্বনিত হচ্ছে। প্রত্যেক দুটি মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ফলে যেমন একটি প্রাণ অন্য প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে, কবিতার ছন্দের ক্ষেত্রেও একটি ছন্দ আর একটি ছন্দকে প্রভাবিত করে, কোনও গানের মধ্যে তাল প্রক্রিয়াতেও এই কাজটি অনুষ্ঠিত হয়। 'মধু গন্ধে ভরা' গানটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আবার ভাষার কাব্য-ছন্দটি গানের মধ্যে ভাব প্রয়োগের উপযুক্ত মনে না হলে সুরকার বাণীর কাব্যছন্দটির বদলে ভাবানুগ তালের আমদানি করেন। এই প্রসঙ্গে ছন্দ ও তাল দুটি শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রধানত ছন্দ শব্দটি কাব্যে এবং তাল শব্দটি গানে ব্যবহৃত হয়। তবে তাল হবে গানের কথার ছন্দ নিরপেক্ষ। তালের জগৎ সুরকে নিয়ে। ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় ব্যবহৃত হয়, তাতে নিয়মের কোনও শৈথিল্য দেখানো সম্ভবপর নয়। গানের ক্ষেত্রে ছন্দটা তালের আকারে তালবাদ্যের সাহায্যে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। সেইজন্য মার্গ সংগীতে গায়ক গানের বাণীর ছন্দকে অতিক্রম করে আপনমনে তাল বিহার করে শেষে সমে এসে তালকে মিলিয়ে দেন। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে ছন্দ বোঝা না গেলেও গাণিতিক নিয়মে ঠেকার মধ্য দিয়ে ছন্দের রূপটি ঠিকই থাকে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনও অভিযোগ নেই। তিনি বিশ্বাস করেছেন ছন্দের নিজস্ব ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন ছন্দের দোলা যে মনে বিভিন্ন রসের জন্ম দেয় এ বিষয়েও তিনি একমত ছিলেন। তাঁর আপত্তি সেইখানেই যেখানে তালের বৃত্তটা শৃঙ্খলের মতো গানের পায়ে বেড়ি পরাতে উদ্যত হয়। আসলে শুধু ছন্দের বৈচিত্র্যসাধন বা সুর
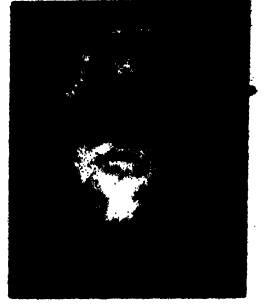
বিস্তারের অবকাশ রক্ষার জন্য নয়, ভাবের প্রাধান্য রক্ষার জন্যও রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নিয়ম ভেঙেছেন। সাধারণভাবে রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ বৈচিত্র হল কাব্য-ছন্দের বৈচিত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বা গানে ছন্দকে সুরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই ভালোবাসতেন, সেইজন্য রবীন্দ্রসংগীতের সুরে মার্গ সংগীতের কোনও তান কর্তব লক্ষ করা যায় না। সহজ চেতনায় সুর এবং কথার প্রেক্ষাপটে তান কর্তব একটি গানে যতটা প্রযুক্ত হতে পারে, তার বেশি ভার কখনও সুরের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করেননি। কথা ও সুরের অর্ধ-নারীশ্বর রূপ নির্মাণেই তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। এইজন্য দাদরা, কাহারবা, তেওড়া ঝাঁপতাল, ঝম্পক, ইত্যাদি তালের মাত্রা বিভিন্ন গানের বাণীর ছন্দ মাত্রার মাপের সঙ্গে একেবারে মিলে গেছে। কিছু উদাহরণ-সহযোগে আলোচনা করলে বিষয়টি আরও সহজ হয়ে উঠবে আশা করা যায়—

তিন মাত্রার পর্ব বিভাগ ও তাল

(১) আকাশ । আমার । ভরল । আলোয়
আকাশ । আমি০ । ভরব । গানে০

(২) যখন । পড়বে । না মোর । পায়ের । চিনহ । এই বা । টে।

(৩) প্রতিদি । ন হায় । এ সে ফি । রে যায় । কে০০ । ০ সখী।

(৪) প্রান্ত গ । নে মোর । শিরীষ । শাখার । ফা গু ন ।
মা সে ০ । কী উ চ্ছ্ । ছা সে ০।

চার মাত্রার ছন্দ ও তাল

(১) খরবায়ু । বয় বেগে । চারিদিক । ছায় মেঘে

(২) উদ্বেল । উত্ত রোল । য মু না র । কল লোল।
ক ম পিত । বেণু বনে। ম ল য়ে র । চু ম ব ন।
আ লো নব । প ল ল বে । নব ভন । উল লোল।
অ শো কের । শা খা ঘেরি । বল্লরী । ব ন্ধ ন।

পাঁচ মাত্রার ছন্দ ও তাল

পাঁচ মাত্রার ছন্দ রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল সবচেয়ে বেশি। অজস্র গান ধরা আছে সরাসরি এই ছন্দের বিভাজনে।

(১) নিবিড় : অমা । তিমির : হতে । বাহির : হল।
জোয়ার : স্রোতে । শুক্লা : রাতে । চাঁদের : তর । ণী

(২) শ্রাবণ : ঘন । গহন : মোহে । গোপন : তব । চরণ : ফেলে।
নিশার : মত । নীরব : ও হে । সবার : দিঠি । এড়ায়ে : এলে।

(৩) পেয়েছি : ছুটি । বিদায় : দেহো । ভাই
সবারে : আমি । প্রণাম : করে । যাই।

পাঁচমাত্রার এই বিভাজনকে এক রেখে কেবল একটিমাত্র মাত্রার হেরফের ঘটিয়ে ঝাঁপতালে বেঁধেছেন—

তিমি : রময় । নিবি : ড়নিশা । না০ : হিরে।
না ০ : হি দি শা ।

তবে মাত্রার এই ধরনের হেরফের ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি পরীক্ষা করেননি।

সাত মাত্রার ছন্দ ও তাল

(১) খাঁচার : পাখি : ছিল । সোনার : খাঁচা : টিতে ।
বনের : পাখি : ছিল । বনে
একদা : কি ক : রিয়া । মিলন : হল : দোঁহে।
কি ছিল : বিধা : তার । মনে।

(২) হৃদয়ে : মন: দ্রিল । ডমরু : গুরু : গুরু ।
ঘনমে : ঘের : ভ্রূকু । কুটিল : কুন : চিত ।
হলরো : মান : চিত । বনব নান : তরে ।

(৩) ধ্বনিল: আহ্: বান । মধুর: গম : ভীর ।
প্রভাত : অম : বর । মাঝে
দিকেদি : গন : তরে । ভুবন : মন : দিরে।
শানতি : সম : গীত । বাজে।

নয় মাত্রার ছন্দ ও তাল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নয় মাত্রার ছন্দের বিভাজনও তিনি করে দেখিয়েছেন নানাভাবে। রবীন্দ্রনাথ যে ছয়টি নতুন তাল বাংলা গানে ব্যবহার করেছিলেন, এই নয় মাত্রার তাল তার অন্যতম। এই তালেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল কাব্যছন্দকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংগীতের ভাবকে প্রকাশ করা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে (বিশেষত প্রাক্ রবীন্দ্র পর্বের বাংলা গানে) গানকে যথাসম্ভব শাস্ত্রসম্মত করতে গিয়ে, প্রচলিত তালে বাঁধতে গিয়ে, বাণীর অঙ্গহানি ঘটেছে, কাব্যছন্দের বিকৃতি ঘটেছে, কাব্যের ভাবসম্পদকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। গানের কাব্যাংশকে মর্যাদা দিতে হলে, এমন তাল ব্যবহার করতে হবে যাতে সুর যোজনার পরে গানের ভাব ক্ষুণ্ণ না হয়। এরই প্রয়োজনে নয় মাত্রার তাল। নয় মাত্রার কাব্যছন্দ ও তাল রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, ৫।৪, ৬।৩, ৩।৩।৩, ছন্দ কবিতার ক্ষেত্রে এলেও বাংলা গানে তার ব্যবহার ছিল না। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে এই তালকে ব্যবহার করলেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন উত্তর ভারতীয় তালে নয় মাত্রার ব্যবহার না থাকলেও দক্ষিণ

রবীন্দ্রনাথ যে ছয়টি নতুন তাল বাংলা গানে ব্যবহার করেছিলেন। এই নয় মাত্রার তাল তার অন্যতম। এই তালেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল কাব্যছন্দকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংগীতের ভাবকে প্রকাশ করা।

ভারতীয় কর্ণাটি সংগীতে এই নয় মাত্রার ছন্দের ব্যবহার আছে। তবে তার বিন্যাস অন্য রকম। দক্ষিণ ভারতীয় 'দুষ্কর' তালের ছন্দ বিন্যাস ৫।২।২ এবং ফূল তালের ২।৭, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ছন্দ বিভাজনটি লক্ষ করি :—

(১) দুয়ার : মোর . পথ . পাশে । সদাই : তারে : খুলে : রাখি। (৫ + ৪)

(২) ব্যাকুল : বকুলের ফুলে । ভ্রমর : মরে পথ ভুলে (৩ + ৬)

(৩) যে কাঁদনে হিয়া : কাঁদিছে । সে কাঁদনে হিয়া কাঁদিল (৬ + ৩)

(৪) আঁধার : রজনী : পোহাল । জগৎ : পূরিল : পুলকে (৩ + ৩ + ৩)

দশ মাত্রার তালের শাস্ত্রীয় নিদর্শন ঝাঁপতাল। এর ছন্দ বিভাজন ২/৩/২/৩, এছাড়াও আছে ধ্রুপদী সুর ফাঁক তাল, এর শাস্ত্রীয় বিভাজন ৪।২।৪। এইসব প্রচলিত তালের ছন্দে অজস্র গান রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এর ব্যতিক্রমে উল্লেখ করার মতো একটি গান পাই। সে গানের ছন্দ ৫। ৫, গানটি হল—

দেখা দিয়ে যে : চলে গেল ও । (৫ + ৫)
চুপি চুপি কি : বলে গেল ও ।

রবীন্দ্রসৃষ্ট একাদশী তালের ছন্দ ব্যবহার প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে আছে। রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে দুটি গানের উল্লেখ করেছেন। একটি কাব্যছন্দে দশ মাত্রা। তবে গানের তাল বিভাজনের ক্ষেত্রে এটি এগারো মাত্রায় বর্ধিত হয়েছে। এই গানের তালের মাত্রা বিন্যাস ৩ + ২ + ২ + ৪ । তালের চলনটি হল —দুয়ারে : দাও : মোরে : রাংখিয়া।

রবীন্দ্রনাথ আরও দেখিয়েছেন কবিতার ছন্দ এবং গানের ছন্দ এগারো মাত্রাতেও এক হতে পারে। এই তালের পর্ব বিভাজন ৩ + ৪ + ৪। গানের চলন হল কাঁপিছে : দেহলতা : থরথর। বাংলা গানে এগারো মাত্রার ঠেকায় কোনো গান এর আগে ছিল না। অবশ্য দক্ষিণী সংগীতে মণিতাল, বিন্দু তাল ও নীল তাল নামে এগারো মাত্রার তাল আছে।

বাংলা গানে এগারো মাত্রার ঠেকায় কোনো গান এর আগে ছিল না। অবশ্য দক্ষিণী সংগীতে মণিতাল, বিন্দু তাল ও নীল তাল নামে এগারো মাত্রার তাল আছে।

আলোচনাকে এইভাবে বিস্তৃত করলে দেখা যাবে, ছন্দ ও তাল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কাব্যছন্দকে তিনি সরাসরি গানের তালে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাচ্ছেন—'অর্থ, ধ্বনি, বাঁধুনি, ভাব সব মিলিয়ে কবিতা। এর কোনও একটি উপাদান কবিতা নয়, সব মিলিয়ে সেই চমৎকারিত্বের আবির্ভাব, যেটি কবিতার প্রাণ। গানেও ঠিক তাই। গানের কথা, ধ্বনি, সুরের ছন্দ, ভাব এইসব মিলে গান।'' সেই উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতের গতি সাবলীল রাখার জন্য এবং কাব্যাংশকে মর্যাদা দেওয়ার অনুপ্রেরণায় নিত্যনতুন পথের অনুসন্ধান চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও তাল ভাবনার এটিই হল বিশেষত্ব। আসলে রবীন্দ্রনাথ সুরের ক্ষেত্রে যতখানি স্পর্শকাতর ছিলেন, তালের ক্ষেত্রেও ততটাই সচেতন ছিলেন। তাল বলতে তিনি নিছক মাত্রা বোঝেননি, এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি গানের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও বাণী অনুসারী 'লয়' এর প্রসঙ্গও এনেছেন। মনোজ্ঞ এই আলোচনার এক স্থানে তিনি বলেছেন, যেমন সুর, তেমনই তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যক। তাঁর মতে—'সঙ্গীতের কথার বন্ধন সুর এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাল নির্বাচন করা উচিত। তাল আপনা থেকেই বাণী ও সুরের ভাবকে অনুসরণ করবে।' সম্পূর্ণ গানের বাণীর ভিত্তিতেই তাল ও লয় নির্বাচিত হবে। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানে আমরা যেমন দু রকম তালের প্রয়োগ দেখেছি তেমনই সংগীতে ভাবের প্রয়োজনে একই গানে 'লয়' এর পরিবর্তন লক্ষ করেছি। নৃত্যনাট্যগুলিতে আবার তাল, ছন্দ এবং লয় নির্ধারিত হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নৃত্যছন্দ ও গতি অনুসারে। আবার একই গান দুবার দুরকম তাল ও ছন্দে গাওয়া হয়েছে যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে—(কাহারবা ও ষষ্ঠী তাল)।

।। ২ ।।

প্রাচীন ভারতীয় সংগীত ধারায় দেশি সংগীতের পর্ব থেকেই ছন্দ এবং তাল নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছে। দেশি সংগীত অর্থে কাব্যসংগীত। সেকালেও কাব্যের গুরুত্ব বেশি হওয়ার দরুন দেশি সংগীত কাব্যছন্দেই আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাকৃত পর্বের গানেও প্রায় শতাধিক দেশি তালের অস্তিত্ব ছিল। সংগীত শাস্ত্রে দেখা যায় অনেক কাব্যছন্দ এবং তাল একই। তৎকালে আর্যা ছন্দে যে গান গাওয়া হত তা আর্যা নামেই প্রচলিত ছিল। এছাড়াও সেকালে এক ধরনের গান পরিবেশিত হত যার ছন্দ ও তাল একই ছিল এবং এতে গায়কদের ইচ্ছানুসারে ছন্দ ও তাল নির্দেশিত হত। এই গানকে বলা হত বৃত্ত। দেশি সংগীতের উদ্দেশ্যই ছিল গানের তালের সঙ্গে ছন্দকে একাত্ম করে গানের ভাবকে পরিস্ফুট করা। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ পদ, তাল, সুর, ছন্দ সবকিছুকেই সুন্দরের প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন। এটিকে তিনি প্রথম জীবনে বলেছেন ভাব, জীবনের মধ্যপর্বে ভাবরূপ এবং অন্তিম পর্বে বলেছেন রূপ। রবীন্দ্রনাথ যখন গানের আলোচনা প্রসঙ্গে ছন্দ ও তালের বিচার

করেছেন তখন সৌন্দর্যের বিচারে ভাবকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। গানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— "ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া লওয়া আবশ্যক, নাহলে তাহারা ভাবকে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার বোধহয় আমাদের সঙ্গীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়।'—রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের মধ্যে অবশ্য সুর ও তালের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা খুব স্পষ্ট হয়নি। সুরের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। নানাভাবে রাগ মিশ্রণ, বিসম প্রকৃতির রাগ মিশ্রণ, প্রচলিত রাগের স্বর পরিবর্তন, কীর্তন ও বাউল সংগীতকে নানাভাবে রাগসংগীতের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে নানা সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তালের ক্ষেত্রেও ছন্দ অনুসারী কিছু তালকে বাংলা গানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, কিন্তু তালের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানে সম্ না দেখিয়ে অন্যত্র সম্ দেখাবার কী যুক্তি তিনি গ্রহণ করেছেন তা খুব সুস্পষ্ট হল না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সম্ পরিবর্তনের দ্বারা অতীত অনাঘাতকে বোঝাতে চেয়েছেন, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অনাঘাত আছে, বিশেষ করে প্রাচীন বাংলা গানে আড্ডা, যৎ, তিলওয়ারা, বিলম্বিত ত্রিতাল, খেম্‌টা প্রভৃতি তালে সম্ একস্থানে নির্দিষ্ট থাকেনি। বরং রবীন্দ্রনাথই তাঁর গানে সম্-এর স্থান নির্দিষ্ট রেখেছেন। তবে মনে হয় সুর বিস্তার (খেয়ালাঙ্গের সুরে আকার বিস্তার বা বোল বিস্তারের কথা নয়) করতে গেলে স্বভাবতই কোনও কোনও একমাত্রিক কাব্যছন্দ সুরের ক্ষেত্রে তিন চার বা তার অধিক মাত্রায় গড়িয়ে যায়। নীলাঞ্জন ছায়া, বন্ধু রহো রহো এ কি করুণা করুণাময়, এসো শরতের অমল মহিমা যে কারণে শেষ পর্যন্ত চতুর্মাত্রিক তালে স্বরলিপিবদ্ধ থাকলেও গানগুলিকে তালছাড়াভাবে পরিবেশন করে গানগুলি প্রাণস্পর্শী করা হয়। একদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কাব্যছন্দকে বাংলা তালের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে তেমনই সংগীতের ভাবরূপের কথা স্মরণ করে কথাকে সাঙ্গীতিক ছন্দ সীমার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সংগীত রীতিতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে মাত্রার স্থায়িত্বকাল সুরের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখা হত। আমাদের দেশি সংগীত বরাবরই লিরিক ধর্মী, এইজন্য বাণীর ভাবপ্রকাশে যতটুকু ছন্দের প্রয়োজন তাকে মেনে নেওয়ার কথা আমাদের সংগীত শাস্ত্রে স্বীকার করা হয়েছে। কেউ যদি তোটক বা পঞ্চচামর ছন্দে গান করতে আগ্রহী হতেন তবে অনায়াসে সেই ছন্দ অবলম্বন করে তালে সংগীত পরিবেশন করতে পারতেন, তাকে এক তাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতালে যে গান করে কোনোক্রমে সম্ দেখাতে হবে এমন কোনো বাধা- বাধ্যকতা ছিল না। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে এই পদ্ধতি আজও লক্ষ করা যায়। এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। আর সম্ভবত এরই প্রকাশ ঘটেছে গদ্য গানে। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভাবপ্রকাশ। প্রথম যুগের ছন্দোবদ্ধ কবিতা থেকে অন্ত্যযুগের ছন্দ ছুট কবিতায় যেমন তার বিবর্তন, তেমনই প্রথম যুগের তালবদ্ধ গান থেকে তালছাড়া গানেও তাঁর অভিযান। গদ্য কবিতার ছন্দ সহজে কানে ধরা পড়ে না, কিন্তু গদ্য গানের সুর হৃদয়ের দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে যায়। কাব্য ছন্দহীন গদ্য ছন্দের গান এবং অভিনয়ের চরম রূপ দেখা যায় চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যে। সুর এসে গদ্যময়তাকে ঢেকে দেয়, ছন্দে ফুটে ওঠে নৃত্যরূপ।

শুধু একটি গণ্ডূষ জল
আহা নিলেন তাহার করপুটের কমল কলিকায়
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র
এই যে নাচে এই যে নাচে তরঙ্গ তাহার
আমার জীবন জুড়ে নাচে
টলোমলো করে আমার প্রাণ
আমার জীবন জুড়ে নাচে
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি
একটি গণ্ডূষ জল
আমার জন্ম জন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল

গদ্যের সোজা রাস্তা কীভাবে এত ছন্দোময় হয়ে ওঠে এইটা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। ভাষার দিক থেকে এ যেমন আড়ম্বরশূন্য, সুরের দিক থেকেও তেমনই নিরাভরণ মধুর। আমাদের দেশের সংগীতের গঠন প্রকৃতি পাশ্চাত্য সিম্ফনির মতো নয়। এতে কাব্যের প্রয়োজনে তালের রূপান্তর ঘটেছে বটে কিন্তু রস মাধুর্যে হানি ঘটায়নি। তবে পাশ্চাত্য সিম্ফনির মতো না হলেও বাণীর ভাবপ্রকাশকে যথাযথ করবার তাগিদেই প্রাচীন ভারতে সংগীতের সীমানা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আলাপের রীতি এমনভাবে নির্দিষ্ট ছিল যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিস্মৃতি না ঘটে। প্রাচীন জাতি গানের দশটি লক্ষণ ছিল। কোথায় কোন মূর্ছনা, কীভাবে আরোহণ, কী প্রক্রিয়ায় অবরোহণ, কোন স্বরে আরম্ভ, কোন স্বরে শেষ, কতকগুলি স্বর ব্যবহৃত হবে, কোন ছন্দ ব্যবহৃত হবে, কটি অক্ষরে একটি পদ এবং কত পদে একটি গান সম্পূর্ণ হবে এ সবই শাস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল। এসবের ভগ্নাবশেষ হলেও

একদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কাব্যছন্দকে বাংলা তালের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে তেমনই সংগীতের ভাবরূপের কথা স্মরণ করে কথাকে সাঙ্গীতিক ছন্দ সীমার নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিয়েছেন।
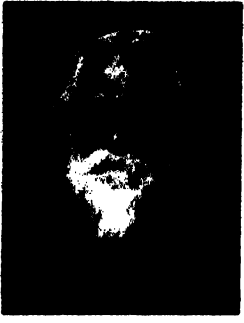
কিছু চিহ্ন ধ্রুবপদের মধ্যে মিশে আছে। বস্তুত সেকালের কড়াকড়িটা কিছু অংশে এতই বেশি ছিল যে বহু গীত পদ্ধতি এই অতিরিক্ত শৃঙ্খলার জন্যই হারিয়ে গেছে। আর এই কঠিন নিয়মানুবর্তিতার বিষময় পরিণাম হল বিশৃঙ্খলা। আর এই বিশৃঙ্খলার পর্ব শেষ হলে দেখা গেল গান আর শাস্ত্রজ্ঞ বিষয় রইল না। গান হয়ে গেল ওস্তাদদের ঘরানার সম্পত্তি। ঝাঁপতাল, একতাল, ত্রিতালে কাব্যছন্দকে উপেক্ষা করে সম্ দেখানোর মধ্যেই হারিয়ে গেল উত্তর ভারতের সংগীত। গানের ভাব নিয়ে ছন্দ নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষার দিন শেষ হয়ে গেল। এর বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ছন্দ চিন্তাকে স্বকীয় পরিকল্পনায় আবার নতুন করে তুলে ধরলেন। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন তাল, ছন্দ, যতি, লয়, মাত্রা, গতি ইত্যাদি বিষয়গুলির দ্বারাই আমাদের পরিব্যাপ্ত কালকে একটি বৃত্তের মধ্যে আনা হয়। এই বৃত্তের শেষ প্রান্ত অথবা শুরুটা সম্। প্রকৃতপক্ষে এইজন্যেই সম্ দেখানোর প্রয়োজন জরুরি। সম্ সুমিতি ও সংযমের প্রতিনিধি হয়ে আসুক, শাসন বা বন্ধন হয়ে নয়, এই ছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা। সম্ একটি নির্দিষ্ট স্থানের স্বাভাবিক বিরাম। এই বিরাম দিয়েই স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ গানের এই চারটি বর্গের বাঁধুনি থেকে গানে মুক্তি আসে। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে সতর্ক ছিলেন বলেই তিনি নিজের গানে সম্ এর স্থান নির্দিষ্ট রেখেছেন। গানের আলোচনা প্রসঙ্গে এই জন্যেই তিনি বলেছেন— 'আমরা শাসন মানব কিন্তু অত্যাচার মানব না, কেননা যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাইরের জিনিস নয়, তা বিশ্বের বলেই তা আমাদের আপনার। যে নিয়ম ওস্তাদের তা আমাদের ভিতরে নেই, বাইরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করে বা ভয় করে বা দায়ে পড়ে মানতে হয়। এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা থেকে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করতে থাকবে।'

এটাই রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির প্রেক্ষাপট। ছন্দ বা তাল মানুষের অন্তর্ভাবের বহিঃপ্রকাশ। ছন্দের কাজ হল অন্তরের ছন্দকে সুরের মধ্য দিয়ে অনুপ্রাণিত করা। ছন্দ ও তাল এই দুটিই রসের দ্যোতক। শান্ত ও করুণ রসের ছন্দ শ্লথ গতি। বীর, রৌদ্র ও ভয়ানক রসের দ্যোতক দ্রুতগতি। ছন্দ ও তাল নিয়েই জীবন বৃত্ত। তালের বৃত্ত দিয়ে সুরের ব্যাপ্তিকে নির্দিষ্ট করে ছোটো ছোটো প্রবন্ধে সাজানোর মধ্য দিয়েই ভাবের নিজস্ব ছন্দ প্রকাশিত হয়। সুরের রঞ্জন শক্তিকে তাল মার্জিত করে প্রকাশ করে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন সংগীতের ভাবকে লক্ষ করে। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনাই নতুন করে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের পণ্ডিত বা ওস্তাদ ছিলেন না, ছিলেন সংগীতের আচার্য।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

রবীন্দ্রসংগীতে প্রাচীন কাব্যের অনুষঙ্গ

বুলবুল সেনগুপ্ত
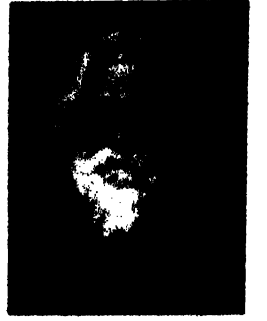
প্রাচীন কাব্য ও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের কথা কবির নিজের লেখায়, কবিতায় ও গানে এতই স্পষ্ট যে কোনো রবীন্দ্রপ্রেমী তা সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। ভানুসিংহের পদাবলীকে বাদ দিয়েও গীতবিতানের অন্য অনেক গানেই 'রাধা', 'সে' বা 'কে' সর্বনামের আড়ালে 'কৃষ্ণ', 'যমুনা', 'মথুরা', 'বাঁশি', 'বৃন্দাবন', 'অভিসার', 'কুঞ্জকুটির', 'শ্যামলতমাল'—সবকিছুর ব্যাপক উপস্থিতি আমাদের চোখে পড়ে। এমনকী পদাবলীতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ, যা কেবল পদাবলী সাহিত্যেই সচরাচর দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন স্বাদের গানেও প্রবেশ লাভ করেছে। (এ প্রসঙ্গে 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে' বা 'সবাই তোমায় তাই পুছে, ইত্যাদি পংক্তিগুলি আমাদের মনে পড়তে পারে।) বিষয়টির আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত। তবে এই আলোচনাটিকে আমরা আপাতত বেঁধে রাখতে চাই রবীন্দ্রনাথের গানে জয়দেব ও কালিদাসের রচনার ছায়াপাতের আংশিক সীমানায়।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের শব্দঝংকার ও ছন্দ-গৌরব কিশোর রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল, এ কথা আমরা জানি। তবু 'কেকাধ্বনি'তে দেখি লিখছেন ''জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়।' কিন্তু সত্যিই কি শেষ হয় ? জয়দেবকে কি তিনি ভুলেছিলেন উত্তরজীবনেও ? শেষের কবিতায় তবে কেন পাই 'ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্' ? (১৯৷৪) আসল কথা হল ছন্দ, শব্দ, বাক্য বা ভাব—যা কিছু শ্রেয়, তাকেই কবি নিয়েছেন দুহাত পেতে। রুচি-বহির্ভূতকে বর্জন করেছেন সুকৌশলে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের গরিমা—আমাদের পরম প্রাপ্তি।

ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম পদটিই ধরা যাক।

'বসন্ত আওল রে !
মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী, হৃদয় প্রাণ মম হরষে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখদহন সব দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্তসমীরণ, মরমে ফুটই ফুল,
মরমকুঞ্জ-'পর বোলই কুহুকুহু অহরহ কোকিলকুল।
কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম, হৃদিবসন্ত সো মাধা !'

এই সঙ্গেই জয়দেবের তৃতীয় গীতের ৩৮ সংখ্যক পদ মনে পড়তে পারে।

'উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ
প্রাপ্ত প্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥

'মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরেরা যে উন্মীলিত আম্রমুকুলদলকে কম্পিত করছে তাতে ক্রীড়ারত কোকিলদের কলকাকলি কানে বিষ বর্ষণ করছে। পথিকেরা কল্পনায় ক্ষণকালের জন্য পাওয়া প্রাণসমা প্রিয়ার আগমনের আনন্দে এখন দিনগুলো কোনরকমে (অতিকষ্টে) কাটাচ্ছে।'

(সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ষষ্ঠ খণ্ড নব পত্র প্রকাশন, পৃঃ ১৬৮)

আপাত-সাদৃশ্যের মধ্যে ভাবের কী দুস্তর ব্যবধান। ভানুসিংহের রাধা নিখিলের বসন্তে হর্ষান্বিত, তাঁর মর্মকুঞ্জে কোকিলকুল মুখরিত। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি তাঁর হৃদিবসন্ত প্রিয়তম মাধবের বিরহে 'দুখিনী'। এই পদ রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের রচনা*, কিন্তু রাধার প্রেমানুভূতির এই অতলস্পর্শী বেদনার উচ্চারণে তার আভাসমাত্র নেই। এখানে কিশোর ভানু জয়দেবকে অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছেন। ভানুসিংহের পদাবলীর বেশ কিছু গানে অবশ্য আমরা গীতগোবিন্দের শব্দঝংকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। যেমন 'নিন্দতিচন্দনমিন্দুকিরণ' (*গীত ৮, পদ ২*) ইত্যাদির প্রতিধ্বনি আমরা শুনেছি 'চন্দ্রমায় নিন্দিছে'

এমনকী পদাবলীতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ, যা কেবল পদাবলী সাহিত্যেই সচরাচর দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন স্বাদের গানেও প্রবেশ লাভ করেছে।

---

* প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কালানুক্রমিক সূচি অনুযায়ী আলোচ্য গানটি রবীন্দ্রনাথের ২৩ বছর বয়সের রচনা।

(গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে)-র মধ্যে। 'গীতগোবিন্দ'র 'রাধামুগ্ধ-মুখারবিন্দ' (*গীত ১১, পদ ২০*) ভানুসিংহের পদাবলীতে হয়েছে 'শ্যামকো পদারবিন্দ'। 'পদারবিন্দ' কথাটিও জয়দেব ব্যবহার করেছেন ১৮ নং গীতের ১১ নং পদে। গীতবিতানের অন্য অনেক গানে হঠাৎ হঠাৎ গীতগোবিন্দের শব্দঝংকারের অনুরণন অনেক সময় আমরা অনুভব করি। সেরকমই কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত করছি।

গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকে বর্ষার মেঘাবৃত আকাশ ও 'বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ'র যে বর্ণনা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের গানে তার খানিকটা ছায়া আমরা দেখেছি বই কি ?

'শ্যামলতমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায় গোধূলি ক্ষণে
(*প্রকৃতি গান ১০৬*)

অনিবার্যভাবেই গীতগোবিন্দের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে আমাদের মনে। দ্বিতীয় গীতের 'অমল কমল' (*পদ ২১*) এই শব্দবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল খুব বেশি। তাঁর অনেক গানে আমরা একে পেয়েছি, যেমন 'আলোর অমল কমলখানি' বা 'অমল কমল সহজে জলের কোলে', 'অমল কমল মাঝে' (বাজে বাজে রম্যবীণা) ইত্যাদি।

'কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে, জয়দেবের এই রচনা তৃতীয় গীতের ২৮ নং পদে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মায়ার খেলা গীতিনাট্যের 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' গানটিতে একে প্রায় অপরিবর্তিত-ভাবেই পেয়েছি। 'অলিকুল' শব্দটিও জয়দেবের এবং রবীন্দ্রনাথের দুজনেরই প্রিয় ছিল বলে মনে হয়।

গীতগোবিন্দের চতুর্থ গীতের কিছু শব্দগুচ্ছ 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ৪২নং পদে রয়েছে—

'কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদন সরোজম্॥

এই গীতেরই ৪৪ নং পদের 'মঞ্জুলবঞ্জুল কুঞ্জগতং' থেকেও অনুপ্রাসের কিছু অনুপ্রেরণা আমাদের কবি পেয়েছিলেন বলে ধারণা হয়। 'চলে যায় মরি হায়' গানটির 'পুলকিত আম্রবীথি' আমাদের মনে পড়ায় গীতগোবিন্দের তৃতীয় গীতের ৩৪ নং পদের 'পুলকিত মুকুলিতচূতে'।

গীতগোবিন্দের মালবরাগ ও যতিতালে গেয় ত্রয়োদশ গীতটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়' গানটির অনেক কথাই খুঁজে পাই, একটু অন্য ভাবে।

গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকে বর্ষার মেঘাবৃত আকাশ ও 'বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ'র যে বর্ণনা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের গানে তার খানিকটা ছায়া আমরা দেখেছি বই কি ?

জয়দেব বলেছেন,

'মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্
যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা' ॥ ৩॥

রবীন্দ্রনাথের গানে—

কেন নয়নের জল হয়েছে বিফল নয়নে ?

জয়দেবের গীতে—

'কুসুম সুকুমার তনুমতনুমতনুশরলীলয়া
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষম শীলয়া' ॥ ৮॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ'—এটুকুই যথেষ্ট। যমুনাপারে রাধার ব্যর্থ অভিসার রবীন্দ্রনাথের সংযত প্রকাশভঙ্গিতে ও ভৈরবী সুরের আশ্রয়ে গাঢ়তর বেদনা সঞ্চার করে।

গীতগোবিন্দের দুটি শব্দবন্ধ 'সজলজলদ' (*গীত ১৬, পদ ৩৩*) ও 'ভুজবন্ধন' (*গীত ১৯, পদ ৩*) রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তাঁর 'এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে' গানটিতে।

জয়দেবের ছন্দনৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথকে যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল সে কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। সংস্কৃতে রচিত গীতগোবিন্দের গানেই জয়দেব সংস্কৃত ছন্দের বিদায় ঘোষণা করে স্বাগত জানিয়েছিলেন অপভ্রংশ ছন্দকে। বাংলা ছন্দ বিকাশে তাঁর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অনেকটাই সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। জয়দেব নানা দৈর্ঘ্যের চরণ রচনা করেছেন, আবার দুই বা এক ছত্রের শ্লোকও রচনা করেছেন। মাঝখানে মিল থাকায় সেই এক ছত্র শ্লোকের পূর্ণতা পেয়েছে। জয়দেবের গীতগুলির চলন প্রধানত চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক। পঞ্চমাত্রিক চলন রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিল। ঝম্পক তালের প্রবর্তনায় এর ভূমিকা কতখানি কে বলতে পারে ? গীতগোবিন্দের 'বদসি যদি / কিঞ্চিদপি / দন্তরুচি / কৌমুদী' (*গীত ১৯/১*) পঞ্চমাত্রিক চলনের দৃষ্টান্ত। জয়দেবের পঞ্চকলপর্বের ত্রিপদীর অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী'....—এমন কথা অনেকেই বলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে কী বলেছেন দেখা যাক। সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য ঘটে। যথা—

বঁদসি। কিঞ্চিদপি । দন্তরুচি । কৌমুদী।
হঁরতি দর । তিমিরমতি । ঘোরম্।'

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষম মাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃত ভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালোবাসিতেন, এই জন্য উপরের উদ্ধৃত শ্লোকাংশটি যথেষ্ট ভালো দৃষ্টান্ত নহে। তবু ইহাতে আমার কথাটি বুঝা যাইবে।'[২]

রবীন্দ্রসংগীতে অন্যান্য নতুন ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জয়দেবের গীতের কোনো প্রভাব ছিল কিনা জানতে কৌতূহল হয়।

আমাদের প্রাচীন কবিদের মধ্যে কালিদাসই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের হৃদয় অধিকার করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। শুধু রচনার উৎকর্ষে নয়, ভাব ও আদর্শের গুণেও কালিদাস বারবার প্রশংসিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের লেখায়। অনুসৃত হয়েছেন কখনো কখনো, এমন বলাও ভুল নয়। কালিদাসকে যে কতবার কতভাবে তিনি স্মরণ করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা—এইসব রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য, প্রেম ও কল্যাণের সহাবস্থান লক্ষ করে বলেছেন 'ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য, শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান, তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এইজন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান্ ও বিস্ময়কর।'[৩] ভারতবর্ষীয় ধারণায় প্রেমের এই মহৎ আদর্শের ছবি রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে আমরা দেখেছি। আর মেঘদূত ? তিনি মনে করতেন যে নববর্ষার একমাত্র কাব্যই হল মেঘদূত, যার তুলনা কোথাও নেই। বর্ষার নবীন মেঘকে তিনি বলেছেন 'শত শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ।' তাঁর বর্ষার অসংখ্য গানে তাই আমরা খুঁজে পাই কালিদাসের ছন্দ, মেঘদূতের অনুষঙ্গ। বিরহী যক্ষের মতোই তিনি প্রবাসিনী প্রিয়ার উদ্দেশে গেয়েছেন 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে, ওগো প্রবাসিনী স্বপনে তব তাহার বারতা কি পেলে' ?

আমরা একটু দেখে নিতে পারি মেঘদূত কাব্য কীভাবে স্পর্শ করে গেছে রবীন্দ্রনাথের বাদল দিনের গানগুলিকে। তবে এ কথা ভুললেও চলবে না যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আঁকা সেসব চিত্র এক নতুন দিগন্তে আমাদের উত্তীর্ণ করে। মেঘদূতে আমরা পেয়েছি—

"গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ।।

(*পূর্বমেঘ ৩৮*)

নিশাঅভিসারিকার পথ দেখাতে মেঘের প্রিয়া বিদ্যুৎ যেন একটু ঝলসে ওঠে, বারিবর্ষণ বা গর্জন না করে মেঘ যেন যক্ষের এই অনুরোধ পালন করে ! আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন

'বিজুলির চমকনে মিলে আলো ক্ষণে ক্ষণে
ক্ষণে ক্ষণে পথ ভোলে উদাসিনী।' (*প্রকৃতি ১১৭*)

এই উদাসিনী কে ? কবির মন-উপবনে যার অভিসার, এই সেই বিরহিণী, কবির রক্তে যার নূপুর গুঞ্জরিত। এই বিরহিণীর অভিসারের চিত্রটি তাই স্বতন্ত্র, অনবদ্য।

মেঘকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করার আগে যক্ষ মেঘের প্রশস্তি করে বলেছে,

'প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ' (*পূর্ব-৮*)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে' (*প্রকৃতি ২৬*)। শ্যামলসুন্দরের তাপহরা সঙ্গসুধায় বিরহিণীর মিলনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথ ধরিত্রীকেও তাঁর গানে অভিসারসাজে সজ্জিতা করে গেয়েছেন

'ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে,
যেন কার উত্তরীয়ের পরশের হরষ লেগে।'

(*প্রকৃতি ১০২*)

অভিসারিকা ধরণীকে তাই তিনি বলেন—

'ঘিরেছিস মাথায় বসন কদমের কুসুম ডোরে
সেজেছিস নয়নপাতে নীলিমার কাজল প'রে।' (*ঐ*)

কালিদাসের যক্ষ মেঘকে একথাও বলেছে 'ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি'—কৃষিফল তোমারই অধীন (*পূর্বমেঘ ১৬*)। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বর্ষার গানে এ তথ্যটি জানাতে ভোলেননি। 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়' গানটিতে বলেছেন—

'দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।'

কারণ মেঘ ইন্দ্রের প্রধান সহচর। মেঘদূতে যক্ষ বলেছে 'জানামি ত্বাং প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ' (*পূর্বমেঘ ৬*)।

রবীন্দ্রনাথ একটি গানে বলেছেন 'বাদলের ধারা ঝরে ঝরো ঝরো, আউষের খেত জলে ভরো ভরো' (*প্রকৃতি ১০৮*) অন্য একটি গানে বলেছেন 'তোমার মন্ত্রবলে, পাষাণ গলে ফসল ফলে" (*প্রকৃতি ৫৮*)।

আমরা একটু দেখে নিতে পারি মেঘদূত কাব্য কীভাবে স্পর্শ করে গেছে রবীন্দ্রনাথের বাদল দিনের গানগুলিকে। তবে এ কথা ভুললেও চলবে না যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আঁকা সেসব চিত্র এক নতুন দিগন্তে আমাদের উত্তীর্ণ করে।
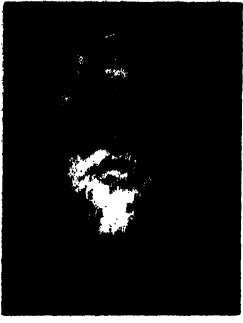
মেঘকে যক্ষ বলেছিল 'তুমি সন্তপ্তের শরণ'—'সন্তাপ্তানাং ত্বমসি শরণং'—(*পূর্বমেঘ ৭*)। বর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিখিলের সন্তাপভঞ্জন'—তৃষ্ণার শান্তি (*প্রকৃতি ১১৬*) কখনো বলেছেন 'ভুবন ভরসা' অথবা 'করুণাঘন'।

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে ব্যবহৃত কিছু চিত্রকল্পে মেঘদূতের কথা আমাদের মনে আসে। যদিও সে সবের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে অসামান্য করে তুলেছেন। যেমন 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গানটিতে যখন পাই 'ক্লান্ততড়িতবধূ-তন্দ্রাগতা'—তখন আমাদের মেঘদূতের 'খিন্নবিদ্যুৎকলত্র' (*পূর্বমেঘ ৩৯*) মনে পড়ে যায়। যক্ষ মেঘকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল তার প্রিয়া বিদ্যুতের ক্লান্তি দূর করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চঞ্চল মেঘকে অনুরোধ করছেন বিদায় না নিতে, যদিও তার তড়িতবধূ ক্লান্ত, তন্দ্রাগতা। কিন্তু ধরণী বর্ষণের বিরহশঙ্কায় কম্পিত, তাই তার করুণ মর্মরধ্বনি শুনে মেঘের কাছে তাঁর অনুরোধ। তিনি বলছেন ওগো পথিক মেঘ, ধৈর্য মানো। তোমার কণ্ঠের বরমাল্য এখনো অম্লান, মালতী এখনো তোমার চরণে প্রণতা, তার গন্ধনিবেদনের বেদনায় বিধুর।

মেঘদূতের 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং লোলাপাঙ্গৈঃ...লোচনৈঃ' (*পূর্বমেঘ ২৮*)—এই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানে দেখা যায়। 'কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক ললনা, জনপদবধূ তড়িতচকিতনয়না' ছাড়াও অন্যান্য গানে ললনার অপাঙ্গকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (আঁখি তোমার তড়িতবৎ)। বিদ্যুতের আরো বিচিত্র উপমাও রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা পেয়েছি। 'ওই আসে ওই অতি' গানটির মধ্যে মেঘদূতের বহু অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মেঘদূতের 'ময়ূরং.... গুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথা :' (*পূর্বমেঘ ৪৫*)-এর ছায়া দেখি

'গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপি কেকা-কলরবে বিহরে'-র মধ্যে।

অথবা 'শিঞ্জাবলয়সুভগৈঃ নর্তিতঃ....নীলকণ্ঠ'-এর প্রতিধ্বনি শুনি এই দুটি ছত্রে

'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া'।

এই চিত্রটির কবির অন্য গানেও পেয়েছি (নাচ শ্যামা তালে তালে) সেখানে ময়ূরের স্থানটি নিয়েছে শ্যামা পাখি। পূর্বোক্ত গানের (ওই আসে ওই অতি) 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা' আমাদের মনে আনে মেঘদূতের 'পাদন্যাসে ক্বনিতরশনাঃ' (*পূর্বমেঘ ৩৬*)।

কালিদাস মেঘদূতে 'আবদ্ধমালাঃ...খে...বলাকাঃ' (*পূর্ব ৯*), 'মানসোৎকাঃ....নভসি....রাজহংসাঃ (*পূর্ব ১১*)'—এইসব চিত্রের মাধ্যমে মানসযাত্রী হংসবলাকার যে রূপ এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথের বর্ষাসংগীতেও সেগুলিকে আমরা পাই নানা উৎপ্রেক্ষায়। যেমন—'মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে, (*প্রকৃতি ১২২*) বা 'আমার গানের হংসবলাকা- পাঁতি' (*প্রকৃতি ১২৫*) অথবা 'আকাশ পথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে' (*প্রকৃতি ৪১*)—এ রকম অনেক গানে।

মেঘদূতের 'শ্যামজম্বুবনান্তাঃ' (*পূর্বমেঘ ২৪*) আমাদের 'নীলাঞ্জনছায়া' গানটিতে লুকিয়ে আছে, যদিও গানটির অবস্থান প্রেম পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ সে গানে বলেছেন,

'জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।' গানটিতে মন্থর নব নীল মেঘের বর্ণনায় মনে হয় এটি প্রকৃতি পর্যায়ে স্থান পেলেই বুঝি ভালো হত। প্রকৃতি পর্যায়ের 'বহু যুগের ওপার হতে'—আর একটি গান, সেখানে স্পষ্টভাবেই কবি রেবানদীর তীরে ঘনায়মান মেঘের উল্লেখ করে প্রাচীন যুগের কবিকে স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'মালবিকা অনিমিখে, চেয়েছিল পথের দিকে, সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।'

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানের 'মেঘের মৃদঙ্গ', 'মুরজ', 'স্নিগ্ধচ্ছায়া', 'পুলকিত কদম্ব' 'জনপদবধূ', 'বৃষ্টির সুবাস বাতাস' ইত্যাদি ভাব বা কথাগুলিও আমাদের মনে মেঘদূতের স্মৃতি আনে নানা ভাবে। কালিদাসের 'মেঘদূত' ছিল রবীন্দ্রমানসে পরিব্যাপ্ত, রবীন্দ্রচেতনায় প্রোথিত। এই কাব্যের ও কবির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সদাই সরব। তাঁর বর্ষার গানগুলিও সে ভালোবাসার চিহ্ন বহন করছে অনেকটাই।

যক্ষ মেঘকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল তার প্রিয়া বিদ্যুতের ক্লান্তি দূর করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চঞ্চল মেঘকে অনুরোধ করছেন বিদায় না নিতে, যদিও তার তড়িতবধূ ক্লান্ত, তন্দ্রাগতা।

সূত্রনির্দেশ :

১. রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ৭৩৩
২. তদেব, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ১৪৬
৩. তদেব, ত্রয়োদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ৬৬২ (১৭)

লেখক পরিচিতি : সংগীতশিল্পী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপক

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গান

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

ক্রোচের অনুসরণে আর্ট বা শিল্পকে যদি প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে বলতেই হচ্ছে—নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, একই সঙ্গে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এবং এগুলি এমন এক সৃষ্টি যার নজির আর কোথাও নেই। এমন হতে পারে—আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ত্রৌর্যত্রিক নাট্যকলা বলতে যা বোঝাতো, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য হয়তো তারই আধুনিক রূপ। অনেক সময় নৃত্যনাট্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে কথাকলি ও কাবুকীর কথা বলা হয়। তাছাড়া, নর্তকদের জন্যে লেখা ডবলিউ বি ইয়েটসের চারটি নাটকের কথাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এক সৃষ্টি, যার সঙ্গে এদের তুলনা চলে না। বাহ্যত, এগুলি নাটকের আধারে নৃত্য-গীতি-সমন্বিত বিশেষ এক ধরনের নাট্যকলা। তথাপি, নৃত্য ও গানকে আশ্রয় করে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির প্রকৃতি রূপকল্প ও আঙ্গিক একেবারেই পৃথক, অতুলনীয়।

এবং, সাধারণভাবে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের কিংবা তার গানের আলোচনায় আবশ্যিকভাবেই তাঁর গীতিনাট্যের কথা প্রথমেই মনে পড়বে। পড়তে বাধ্য। কারণ, বাহ্যত গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির স্বরলিপি

নৃত্যনাট্যগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ, একই সঙ্গে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এবং এগুলি এমন এক সৃষ্টি যার নজির আর কোথাও নেই।

সমেত মুদ্রিত চেহারা অভিন্ন বলে মনে হতে পারে, যেহেতু তারা মূলত গান-নির্ভর। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গীতিনাট্যে যেখানে আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে (কোথাও কোথাও নৃত্যের আঙ্গিকেও) গানগুলিকে রূপ দিতে হয়, নৃত্যনাট্যে সেখানে গানগুলি রূপায়িত হয় নাচের মাধ্যমে। অবিশ্যি অন্য এক উল্লেখযোগ্য তফাত আছে। আসলে, গীতিনাট্যের গান সংলাপের গীতিময় রূপ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ নিজেরা গেয়ে অভিনয় করেন। গীতিনাট্যের অভিনয়ের এইটেই দস্তুর। অন্যদিকে, নৃত্যনাট্যের গানগুলি মঞ্চের একপ্রান্তে অথবা পিছনে উপবিষ্ট গায়ক-গায়িকারা গেয়ে থাকেন, নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যের মাধ্যমে গানকে রূপায়িত করেন। উপস্থাপনা-পদ্ধতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মৌল পার্থক্য এই। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—গানই হচ্ছে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সাধারণ ধর্ম এবং উপাদান। গীতিনাট্যের গানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং গীতিনাট্যগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। কিন্তু, নৃত্যনাট্য বা তার গান সম্পর্কে তেমন আলোচনা তাঁর কাছ থেকে পাইনি। বস্তুত, নৃত্যনাট্যের গানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা যে-কোনও অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের পিছনে এক দীর্ঘ ইতিহাস নিহিত আছে, অতঃপর, এই কথাটা উল্লেখ করা দরকার। এই ইতিহাস একই সঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের এবং গানের বিবর্তনের ইতিহাস। নাটকের দিক থেকে—গীতিনাট্য দিয়ে যার শুরু, তার সমাপ্তি নৃত্যনাট্যে ; মাঝখানে, নৃত্যনাট্যে পৌঁছোবার আগে বিভিন্ন ধরনের নাটক লিখেছেন, একথা সবাই জানেন। তাঁর নাট্যধারা ধাপে ধাপে শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্যে গিয়ে পরিণতি লাভ করেছে। স্মরণ করা যায়—১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা'য় নৃত্যকে সর্বপ্রথম নাটকের পক্ষে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেন। তাসের দেশ, শাপমোচনে এবং আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে নৃত্যকে প্রাধান্য দিয়ে অবশেষে নৃত্যসর্বস্ব নাট্যকলা নৃত্যনাট্যে পৌঁছোলেন। পাশাপাশি, গানের মাধ্যমে অভিনয়ের শৈলীকে অনুসরণ করে গীতিনাট্যগুলির ভিতর দিয়ে গানের অভিনয়যোগ্যতা ও গানকে নাটকের আধারে প্রয়োগের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের, তারপর দেখা গেল—তিনি তাঁর নাট্যধারায় গানকে প্রায় অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন। এবং, নাটকে গানের উপযোগিতার এই আদর্শই শেষ পর্যন্ত নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিধৃত হয়ে নৃত্যকেন্দ্রিক গানসর্বস্ব এক নতুন নাট্যকলা সৃষ্টি করলেন। এর মাঝখানে তিনি অবশ্য সাধারণভাবে তাঁর গান রচনা করে গেছেন নিরন্তর অনলসভাবে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরম পরিণতি যেমন নৃত্যনাট্যে, তেমনি, বিবর্তন সূত্রে, তাঁর গানের পরিণতিও নৃত্যনাট্যের গানে। বস্তুত, রবীন্দ্র নাটক ও গানের বিবর্তনের সূত্র ধরেই নৃত্যনাট্যের গানের আলোচনা করা দরকার, নইলে তার স্বরূপ বোঝা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরম পরিণতি যেমন নৃত্যনাট্যে, তেমনি, বিবর্তন সূত্রে, তাঁর গানের পরিণতিও নৃত্যনাট্যের গানে।

২

মূল আলোচনার যোগসূত্র হিসেবে, মাঝখানে, সংগীত-স্রষ্টা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা অপরিহার্য। তাঁর আত্মজীবনী ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার শুধু আভিজাত্যেই নয়, সাহিত্য-সংগীত চর্চার ক্ষেত্রেও উনিশ শতকের কলকাতায় একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

ঠাকুরবাড়িতে একদিকে যেমন ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয় বড়ালের মতো কবিদের যাতায়াত ছিল, অন্যদিকে তেমনি শ্রীকণ্ঠ, বিষ্ণুচরণ, যদু ভট্ট প্রমুখ ধ্রুপদী ঘরানার গায়কদের ঠাঁই হয়েছিল। এর সঙ্গে, অন্যান্য ধনী পরিবারের মতো ঠাকুরবাড়িতে পিয়ানোর সঙ্গে গান গাওয়ার চল ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানো বাজনার সঙ্গী থাকতেন নিয়মিত। এর বাইরে, তখনকার কলকাতায় টপ্পার জনপ্রিয়তা সম্ভবত তুঙ্গে পৌঁছেছিল। অন্যদিকে, ব্রাহ্ম সমাজের যেকোন অনুষ্ঠানে রাগাশ্রয়ী গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।

তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে থাকতে অপেরা ও স্কচ সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী তাঁর স্মৃতিকথায় য়ুরোপীয় সংগীতে কীভাবে কবির হাতেখড়ি হয়েছিল, তা ধরে রেখেছেন। আরও পরে, পরবর্তীকালে তিনি বাউল গানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে তিনি আড়াল-আবডাল থেকে ওইসব গানের স্বাদ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চর্চা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর ধাতে ছিল না। না থাকলেও, ওই সব গান তাঁর স্মৃতিকে আপ্লুত থেকে সমবেতভাবে গান রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফল হয়েছে এই—প্রথাগতভাবে সংগীতচর্চার অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথ খোলা মনে গানের বিভিন্ন ধারাকে আত্মস্থ করেছিলেন এবং তার ওপর নির্ভর করে যে বিশিষ্ট সংগীত সৃষ্টি করেছেন তারই নাম রবীন্দ্রসংগীত।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গানের সুরারোপের পরিচয় নিতে গেলে দেখা যাবে যে, তিনি তখন রাগ-রাগিণীভিত্তিক গান রচনা করেছেন এবং তখনকার গানে রাগরাগিণীর শুদ্ধতা বজায় আছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যের গান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে এই গীতিনাট্যের গানের সুরারোপ তাঁর। সুরারোপ ছাড়া, তাঁর বেশির ভাগ গান ধ্রুপদের অনুসরণে চার তুকের আঙ্গিকে রচিত। পরে তিনি শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত সংগীতের উপাদানের সংমিশ্রণে গান রচনার এক নতুন ধারা গড়ে তুলেছেন। তিনি কখনও কখনও হয়তো কোনও বিশেষ গানের আদর্শ সামনে রেখে গান রচনা করেছেন। কিন্তু, অনেকটা যৌগিক ধাতুর মতো, বিভিন্ন ধারার গানের সমবায়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের গানের সুরারোপ সেই রকমের এক নতুন সৃষ্টি।

লক্ষ করলে দেখব রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান প্রায়শই সমান্তরালভাবে চলেছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের ক্ষেত্রে প্রথাগত রচনারীতি মেনে চলেছেন। তখনও চার তুকের আঙ্গিকেই তিনি গান লিখেছেন। 'বলাকা'য় পৌঁছে তিনি প্রথাগত ছন্দোবদ্ধ ভেঙে মুক্তকে মুক্তবন্ধ অথবা ফ্রি ভার্সের প্রবর্তন করলেন। তারও পরে, আঠারো বছর পেরিয়ে 'পুনশ্চ' কাব্যে গদ্যছন্দে কথাভাষা ও কথ্যরীতিকে যে নতুন কাব্যকলা ও কাব্যশৈলী সৃষ্টি করলেন, তার অব্যবহিত প্রভাব দেখা গেল তাঁর গানের ক্ষেত্রেও। গদ্যছন্দে রচিত কাব্যসৃষ্টির অভিজ্ঞতাকে কবি অবশেষে চরমভাবে কাজে লাগিয়েছেন নৃত্যনাট্যের গানে।

৩

রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্যের গানের বৈশিষ্ট্য কথ্যভাষাকেন্দ্রিক সংলাপ-ধর্মিতা। নৃত্যনাট্যের গানের প্রকৃতিও তাই, যেন রূপান্তরিত হয়ে এই সংলাপধর্মিতার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। এই সংলাপ-ধর্মিতার প্রয়োজনেই নৃত্য-নাট্যের গানের ছাঁচ বদলেছে, যদিও প্রথাগত

'বাল্মীকি প্রতিভা'-র অভিনয় হচ্ছে ঠাকুরবাড়িতে। 'বাল্মীকি'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

গদ্যছন্দে রচিত কাব্যসৃষ্টির অভিজ্ঞতাকে কবি অবশেষে চরমভাবে কাজে লাগিয়েছেন নৃত্যনাট্যের গানে।

চার তুকে রচিত বেশ কিছু গান তিনটি নৃত্যনাট্যেই আছে। যেমন,

১। শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে, রোদন-ভরা এ বসন্ত, কেটেছে একেলা বিরহের বেলা, সঙ্কোচের বিহ্বলতা, অশান্তি আজ হানলো (চিত্রাঙ্গদা)।

২। মায়াবন বিহারিণী হরিণী, জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া, (শ্যামা)।

৩। দই চাই গো দৈ চাই, কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে, মাটি তোদের ডাক দিয়েছে, চক্ষে আমার তৃষ্ণা (চণ্ডালিকা)।

লক্ষ করার বিষয় এই যে, প্রথাগত চার তুকে রচিত হলেও এই ধরনের গানও সংলাপধর্মিতা-বঞ্চিত নয়। এবং যেহেতু নৃত্যনাট্যের গান প্রকৃতপক্ষে সংলাপ, সেই কারণেই, উপরোক্ত গানগুলি ছাড়া অন্য সব গানে নির্দিষ্ট কোনও ছাঁচ ব্যবহৃত হয়নি, পাত্রপাত্রীর অভিব্যক্তি অনুসারেই সেগুলি রচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু নির্বাচিত গানের উল্লেখ করা যেতে পারে :

১। অর্জুন। অহো কী দুঃসহ স্পর্ধা,
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
কোথা তার আশ্রয় !
চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন ! তুমি অর্জুন !
বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়
অর্জুন। হাহা হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়।
অহো কী অদ্ভুত কৌতুক !

(চিত্রাঙ্গদা)

২। অনুচর। সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো
শেষকালে এই ঠাঁই
ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।
মা। কেন গো কী চাই।
অনুচর। রানীমার পোড়া পাখি কোথায় উড়ে গেছে—
সেই নিদারুণ শোকে
ঘুম নেই তার চোখে,
ও চারণের বউ।
ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে,
ও চারণের বউ।

(চণ্ডালিকা)

৩। প্রহরী, দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে
বলো বলো।
সখীগণ। আমরা আহিরিণী, সারা হল বিকিকিনি
দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে।
প্রহরী। ঘাটে বসে হোথা ওকে।
সখীগণ। সাথী মোদের ও যে নেয়ে—
যেতে হবে দূর পারে,
এনেছি তাই ডেকে তারে।
নিয়ে যাবে তরী বেয়ে
সাক্ষী মোদের ও যে নেয়ে—
ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না,
মিনতি করি,
ওগো প্রহরী।

উদ্ধৃত গানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—সংলাপের স্বচ্ছতার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ কথ্য বা মৌখিক রীতির ছাঁচ ব্যবহার করেছেন নৃত্যনাট্যের গানে। এই মৌখিক রীতির ছাঁচেই নৃত্যনাট্যের গান রচিত হয়েছে।

৪

তিনটি নৃত্যনাট্যের উৎস যথাক্রমে দুটি নাটক (চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা) এবং একটি কবিতা (শ্যামা)। কীভাবে রবীন্দ্রনাথ মূল উৎসকে গানে রূপান্তরিত করেছেন, তা প্রসঙ্গত দেখানো যায় :

১। চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ ?
অর্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।
চিত্রাঙ্গদা। কুৎসিত, কুরূপ। এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।

নৃত্যনাট্যের গানে এর রূপান্তর :

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ।
অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।
শুনি স্নেহে সে নারী
বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী।
জান যদি বলো প্রিয়ে,
বলো তার কথা।

সব গানে নির্দিষ্ট কোনও ছাঁচ ব্যবহৃত হয়নি, পাত্রপাত্রীর অভিব্যক্তি অনুসারেই সেগুলি রচিত হয়েছে।
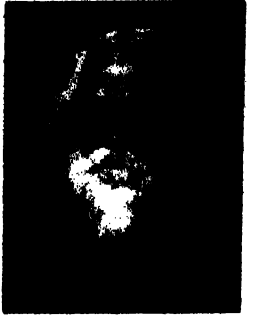
চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরু যুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য
কীণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ
কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাই শঙ্কা,
নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গির সংগীতলীলা
ইঙ্গিতছন্দমধুর।

পয়ার ছন্দে লিখিত 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের কবিতাকল্প সংলাপকে কীভাবে চোদ্দ মাত্রার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে নৃত্যনাট্যের নৃত্যোপযোগী গানে রূপান্তরিত করেছেন। আলোচ্য দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। রূপান্তরিত গানে সাধুভাষার ঠাট সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করেই তার মধ্যে সংলাপধর্মিতা ও মৌখিক ভঙ্গির ছাঁচ গড়ে তোলা হয়েছে।

'চণ্ডালিকা' থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যাক :

মা। কিসের ডাক
প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও।'
মা। পোড়া কপাল ! তোকে বলেছে 'জল দাও।' কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ ?
প্রকৃতি। তাই তো বললেন, তিনি আমার আপন জাতেরই।

বিশুদ্ধ গদ্যে লিখিত (মাঝে মাঝে গান) এই নাট্যাংশের নৃত্যনাট্যের গানে রূপান্তর হয়েছে এইভাবে :

মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।
কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে,
আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া।
প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে
জল দাও, জল দাও।
মা। পোড়া কপাল আমার !
কে বলেছে তোকে 'জল দাও' !
সে কি তোর আপন জাতের কেউ।

গদ্যে লিখিত মূল উৎস 'চণ্ডালিকা' নাটকের মা ও প্রকৃতির কথোপকথনের কীভাবে পরিবর্তন ঘটেছে নৃত্যনাট্যের গানে—এর মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। বস্তুত, 'চণ্ডালিকা'র গদ্যবাহী সংলাপের গানে পরিণত হওয়ার বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয়। গদ্যবাহী সংলাপকেও যে নৃত্যবাহী গানে রূপান্তরিত করা যায়, এ তারই উদাহরণ।

একই সঙ্গে, 'পরিশোধ' কবিতার 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের গানে রূপান্তরের বিষয়টি উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপিত করা যাক :

সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, 'আহা মরি মরি !
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে ! শীঘ্র যা লো সহচরী
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে ; বন্দী সাথে লয়ে
এক বার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে
দয়া করি !'

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের গানে এর রূপান্তর উদ্ধৃত করা গেল :

শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার
আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি।

এখানেও, উৎস-কবিতার চোদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দের বন্ধনে গাঁথা চরণগুলিকে বেড়ি থেকে মুক্তি দিয়ে, পঙ্‌ক্তিগুলিকে ভেঙে, সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন করে নৃত্যনাট্যের গানের রূপ দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাব্যময়তা সত্ত্বেও এর মধ্যে সংলাপের মৌখিক ভঙ্গি সঞ্চারিত হয়েছে।

বস্তুত 'বলাকা' কাব্যে প্রথাগত ছন্দের কাঠামো ভেঙে এবং 'পুনশ্চ' কাব্যে যেমন 'অসংকুচিত গদ্যরীতি'তে 'কাব্যের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব' করে প্রকৃত অর্থেই কাব্যকে মুক্তি দিয়েছেন। তেমনি, একইভাবে গানকে মুক্তি দিয়েছেন নৃত্যনাট্যের গানে, বিশেষত 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের গানের মধ্যে। গানের কাঠামো ভেঙেচুরে

'চণ্ডালিকা'র গদ্যবাহী সংলাপের গানে পরিণত হওয়ার বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয়। গদ্যবাহী সংলাপকেও যে নৃত্যবাহী গানে রূপান্তরিত করা যায়, এ তারই উদাহরণ।
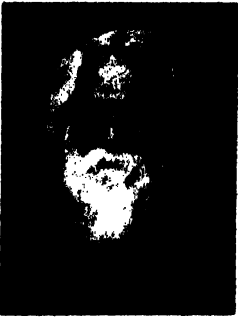
বন্ধনমুক্ত যে আঙ্গিক সৃষ্টি হয়েছে নৃত্যনাট্যের গানে, তা যেকোনও অর্থে সংগীতের ইতিহাসে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রসঙ্গত একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে রবীন্দ্রসংগীতের ধারাটি ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে অবশেষে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গানের ভিতরে এভাবেই পরিণতি লাভ করেছে।

৫

নৃত্যনাট্যের গানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন প্রথাগত কাঠামো ভেঙেছেন, গানের কথাকে কথ্যরীতির অনুসারী করতে চেষ্টা করেছেন, সুরের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রথাগত সুরারোপের ঐতিহ্য অস্বীকার করেছেন। গানের কথা ও সুর সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্য অনেক জায়গায় অনেকের সঙ্গে আলোচনায় তুলে ধরেছেন। তাঁর অভিমত এই যে গানের কথা ও সুর অনন্য। তাঁর সব গান এই প্রেরণায় রচিত এবং সেই জন্যেই তাঁর গানে কথা ও সুরের একটা অবিচ্ছেদ্য সাযুজ্য সৃষ্টি হয়েছে। গীতিনাট্যের গানের সুরারোপ করার সময় তিনি এই আদর্শ মেনেছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে রাগরাগিণী-ভিত্তিক সুরের শুদ্ধতা রক্ষার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। যেমন, হালকা চালের গানে (আঃ বেঁচেছি এখন, আজকে তবে মিলে, এখন করব কী বল্, দেখো হো ঠাকুর, ইত্যাদি) প্রায় আবশ্যিকভাবেই সিন্ধু, কাফি, অথবা পিলু ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি, 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে'-তে বসেছে মল্লার, কোথায় জুড়াতে আছে-র সঙ্গে বেহাগ। রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্যায়ের গানেও রাগরাগিণীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নৃত্যনাট্যের গানে সুরারোপের এই প্রবণতা প্রায় অবলুপ্ত। সেখানে সুরারোপের লক্ষ্য সংলাপের অন্তর্নিহিত কথ্যরীতি ও আবেগকে যথাযথভাবে সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করা।

নৃত্যনাট্যের গানে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন প্রথাগত কাঠামো ভেঙেছেন, গানের কথাকে কথ্যরীতির অনুসারী করতে চেষ্টা করেছেন, সুরের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রথাগত সুরারোপের ঐতিহ্য অস্বীকার করেছেন।

যাই হোক, নৃত্যনাট্যের সুরারোপের বিষয়টি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেতে পারে :

(ক) **চিত্রাঙ্গদা** থেকে

মোহিনী মায়া এল,—মিশ্র ভৈরব
গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে—মিশ্র মল্লার
বঁধু, কোন্ আলো—সিন্ধু ভৈরবী
শুনি ক্ষণে ক্ষণে—কাফি-টোড়ি
দে তোরা আমায়—মিশ্র ভৈরবী
আমার এই রিক্ত ডালি—মিশ্র খাম্বাজ
মণিপুর নৃপদুহিতা—মিশ্র ইমন
তৃষ্ণার শান্তি—মিশ্র বেহাগ

(খ) **চণ্ডালিকা** থেকে

নব বসন্তের দানের ডালি—মিশ্র ভৈরব
ও গো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে—মিশ্র কাফি
যে আমারে পাঠাল—মিশ্র বসন্ত
যে মানব আমি—মিশ্র ভৈরবী
চক্ষে আমার তৃষ্ণা—মিশ্র মল্লার
বাছা তুই যে আমার—মিশ্র কেদারা
ঘন কালো মেঘ—মিশ্র মল্লার
ওরে পাষাণী,—মিশ্র কাফি
কল্যাণ হোক তব,—মিশ্র ভৈরবী

(গ) **শ্যামা** থেকে

তুমি ইন্দ্রমণির হার এনেছ—মিশ্র (বাউল কীর্তনাঙ্গ ভৈরব)
হে বিরহী, হায়—মিশ্র বেহাগ
মায়াবনবিহারিণী হরিণী—ইমন-কল্যাণ
জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা—মিশ্র ভৈরবী
ধরা সে যে দেয় নাই—মিশ্র খাম্বাজ
আহা মরি মরি,—ইমন-কল্যাণ
এ কী খেলা হে সুন্দরী—পরজ বসন্ত
ক্ষমা করো নাথ,—কাফি সিন্ধু
ক্ষমিতে পারিলাম না যে—দেশ-মল্লার

ওপরে, তিনটি নৃত্যনাট্যের নির্বাচিত গানের সুরারোপে যেসব রাগরাগিণীর উল্লেখ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট গানের সুর বিশ্লেষণ করে, সে বিষয়ে প্রথমেই বলা দরকার যে এই সব রাগরাগিণী কোনও অবস্থাতেই বিশুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হয়নি, হয়েছে মিশ্ররূপে। স্বরবিন্যাস বিশ্লেষণ করে রাগরাগিণীর একটা আভাস পাওয়া গেলেও একথা বলা যাবে না যে গানগুলির সুরারোপের সময় কবি রাগরাগিণীর কথা মনে রেখে সুর দিয়েছেন। বস্তুত, নৃত্যনাট্যের গানের সুরারোপের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ স্বাধীনতা নিয়েছেন। আগেই বলেছি, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সুরের ভিতর দিয়ে সংলাপের অন্তর্নিহিত আবেগকে ও অভিব্যক্তিকে রূপ দেওয়া। তার প্রয়োজনে সুর যেভাবে ধরা দিয়েছে কবির কাছে, সেইভাবেই গানগুলি সুরান্বিত হয়েছে। ফলে, প্রথাগত
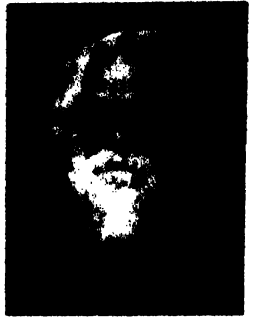
মানদণ্ডে এই সুরারোপ বিচার করা যায় না। এইভাবেই, সুরারোপের ক্ষেত্রেও নৃত্যনাট্যের গানে একটা নতুন আদর্শ গড়ে উঠেছে।

সুরারোপের বাইরে নৃত্যনাট্যের গানগুলি কীভাবে গাইতে হয় অর্থাৎ গায়কীর প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক। বলা বাহুল্য এই গায়কী স্বরলিপির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে না, তার জন্যে যে পরম্পরা তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন নিয়ে কিংবা তাঁরই পরিচালনায়—তা অনুসরণ করে গানগুলি গাইতে হবে। এবং তার জন্যে গানের তাল ও লয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। নৃত্যনাট্যে এমন অনেক গান আছে যার মধ্যে বিশেষভাবে লয়ের পরিবর্তনের একটা ব্যাপার আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, গায়কীর দিক থেকে। গীতিনাট্যের গান যেমন বাঁধাধরা তাল-লয়ে গাওয়া চলে না, অভিনয়ের অভিব্যক্তি অনুসারে গাইতে হয়, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রেও তেমনি একটি আদর্শ আছে, পার্থক্য হচ্ছে গীতাভিনয়ের বদলে নৃত্যাভিনয়ের। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি, এ নতুন জন্ম, আহা মরি, মরি, ইত্যাদি গানের কথা স্মরণ করা যায়। তাছাড়া, বেশ কিছু গান আছে যেগুলি বিনা তালে (নির্দিষ্ট তাল বজায় না রেখে) বা বিলম্বিত লয়ে গাইতে হয়। যেমন, বুক যে ফেটে যায়, হায় এ কী সমাপন। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের শেষ গান 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে' বিনা তালে ও বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হলে বজ্রসেনের মর্মবেদনা ও অনুশোচনার অভিব্যক্তি ঠিকমতো প্রকাশ পাবে, নইলে নয়।

৬

১৯৩৫ সালের ১৩ জুলাই তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে বলেছেন—'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পারে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে।' কবির এই মন্তব্য নৃত্যনাট্যের গানের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক।

গানের একটা ভাবের দিক আছে। হাজার হোক—হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রকাশ করাই তো তার কৃত্য, বৃহত্তর অর্থে সব শিল্পের। তার একটা রূপের দিকও আছে। গান একদিকে বাক্-শিল্প, অন্যদিকে সুর-শিল্প, সাদামাটাভাবে বলতে গেলে কথা ও সুরের মিলনে সৃষ্ট এক শিল্পরূপ। গানের কথা ও সুর নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন, বলেছেন : 'কথা ও সুর' এবং 'সুর ও সঙ্গতি' থেকে তা জানা যায়। ক্রোচে জানতেন, রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু বলি, যেভাবে বলি—তা আসলে প্রকাশ, আর প্রকাশ মানেই রূপায়ণ অর্থাৎ রূপের প্রকাশ। শব্দের যেমন একটা বাচিক ও বাহ্যিক রূপ আছে সুরেরও তেমনি একটা রূপ আছে, রং বা বর্ণও আছে। সংগীত রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব স্বর-সপ্তকের অর্থাৎ সা থেকে নি-এর প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত যে বর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন, তা আসলে স্বরের বা সুরের রূপ। তাছাড়া, আমাদের প্রাচীন চিত্রশিল্পে বিশেষভাবে রাজস্থানি চিত্রশিল্পে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণীর যে চিত্ররূপ দেখানো হয়েছে তাও আসলে সুরেরই রূপ। বস্তুত, আমরা যা দেখি তা প্রকৃতপক্ষে একটি রূপকেই প্রত্যক্ষ করি। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। উপনিষদও রূপের কথাই বলেছে, অনিন্দ্য তা আনন্দময় অমৃতের। এ সবই রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতির মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে। এবং এই অনুভূতি থেকেই জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বললেন—তাঁর শেষ বয়সের গান রূপ দেবার জন্যে। এই উপলব্ধি এবং শিল্প সম্পর্কে তাঁর প্রত্যয় তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে সৃষ্টির অন্যান্য দিক পাশে রেখে ছবি-আঁকার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এবং এই প্রেরণাতেই গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন নৃত্যের জগতে, যেহেতু নৃত্যই হচ্ছে শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।

গানের কথা প্রকৃতপক্ষে তার শরীর এবং কবিতারই আরএক রূপ। কবিতার কথা বলতে গিয়ে মালার্মে দেগাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে যে—কবিতা লিখবে শব্দ দিয়ে ভাব দিয়ে নয়। শব্দের মধ্যে যে সংগীতের গুণ আছে মালার্মে তার কথাই বলতে চেয়েছিলেন ওই মন্তব্যের মধ্যে। পাশাপাশি, সিসিল ডে লিউইস বলেছেন কবিতা হচ্ছে একটি ছবি—শব্দ দিয়ে রচিত ছবি। সুতরাং গানের কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে দুটি মৌলিক উপাদান আছে—সংগীতময়তা ও চিত্রধর্মিতা। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গানের কথাও এই দুটি উপাদানে ভরপুর এবং লিউইসের তত্ত্ব অনুসারে আদ্যোপান্ত ছবি অর্থাৎ ছবির মালা। এবং কবি যে বলেছেন—তাঁর শেষ বয়সের গান রূপ দেবার জন্যে। এই বিশ্লেষণ থেকে তার যাথার্থ্য বুঝতে পারা যাবে।

গীতিনাট্যের গান যেমন বাঁধাধরা তাল-লয়ে গাওয়া চলে না, অভিনয়ের অভিব্যক্তি অনুসারে গাইতে হয়, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রেও তেমনি একটি আদর্শ আছে, পার্থক্য হচ্ছে গীতাভিনয়ের বদলে নৃত্যাভিনয়ের।

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গানের সুর ও কথার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, তার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তা উল্লেখ করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যখন নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করছিলেন, তখন প্রতিমা দেবী প্রায় সব সময় কবির কাছে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর কাছে শুনেছিলাম— বিশেষ বিশেষ এক-একটি নৃত্যছন্দ ও নৃত্যশৈলীর আদর্শ বা ছাঁচ সামনে রেখে, রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের গান রচনা করে যেতেন। এক কথায়, নৃত্যের আদর্শ ও প্রেরণায় নৃত্যনাট্যের গান রচিত হয়েছে অর্থাৎ নৃত্যনাট্যের গানের রচনাগত ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে নৃত্যভিত্তিক। ফলে, গানের ভাষাশৈলী, ছন্দ, সুরারোপ—সব কিছুই নৃত্যকেন্দ্রিক এবং নৃত্যোপযোগী। তাই শুধুমাত্র কানে শুনে নৃত্যনাট্যের গানের পরিপূর্ণ আস্বাদন কখনোই সম্ভব নয়, যেহেতু তা চোখে দেখারও বিষয়। বস্তুত, নৃত্যনাট্যের গান শ্রাব্য-দৃশ্য অনুভূতিসাপেক্ষ এক অনির্বচনীয় সৃষ্টি এবং এখানেই নৃত্যনাট্যের গানের স্বাতন্ত্র্য।

নৃত্যশৈলী, নৃত্যছন্দ বা নৃত্যের আঙ্গিক অনুসরণে কীভাবে নৃত্যনাট্যের গান রচিত হয়েছে উদাহরণ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা যাক। 'না না না বন্ধু', স্পষ্টতই নৃত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক তেহাইয়ের ওপর রচিত। 'গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে' গানটি যে শিকারি নৃত্যের আঙ্গিকে রচিত, তা না বললেও চলে। তেমনি, 'দই চাই গো, দই চাই', 'সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো' গান দুটির পিছনে আছে লোকনৃত্যের শৈলী। 'হো, এল এল এল রে' গানটি রচিত হয়েছে দলবদ্ধ নৃত্যের আঙ্গিক অনুসরণে। তিনটি নৃত্যনাট্যের গানগুলি পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় কীভাবে নৃত্যশৈলী ও নৃত্যের আঙ্গিকের আদর্শে তারা রচিত হয়েছে।

নৃত্যের আদর্শ ও প্রেরণায় নৃত্যনাট্যের গান রচিত হয়েছে অর্থাৎ নৃত্যনাট্যের গানের রচনাগত ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে নৃত্যভিত্তিক। ফলে, গানের ভাষাশৈলী, ছন্দ, সুরারোপ—সব কিছুই নৃত্যকেন্দ্রিক এবং নৃত্যোপযোগী।

কথা, সুর ও নৃত্যের ত্রয়ী মাত্রার অবিচ্ছেদ্য ছন্দে রচিত নৃত্যনাট্যের গান কী রূপ পরিগ্রহ করেছে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে'। গানটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তন্বী দেহলতার নৃত্যভঙ্গিমায় এই গানটি যে কী অনির্বচনীয় রূপ সৃষ্টি করতে পারে—চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারবেন। সৃষ্টিরাজ্যের ধাতু : যুবতী নারীর যন্ত্রণাকাতর আত্মগ্লানির অভিব্যক্তি যে কত সুন্দর হতে পারে গানটি তারই উদাহরণ। এই গানে কথার ভূমিকা চিত্রাঙ্গদার ব্যাকুল আকুতি ও বেদনাকে বাঙময় রূপ দেওয়া, সুরের ভূমিকা এই বাঙময় রূপকে উদঘাটিত করা এবং নৃত্যের ভূমিকা তাকে ছন্দোময় করে তোলা। এই ত্রৈমাসিক উপাদানের সমবায়ে যে মূর্ত অবিভাজ্য ছন্দোময়তা সৃষ্টি হয়েছে, যা নাট্যকলা হিসেবে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের মর্মরূপ, তা শাব্দিক ভাষায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা অসম্ভব।

৭

আমি ঠিক জানি না কখনও তা সম্ভব হবে কিনা কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের কথা ও নৃত্য বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গানগুলির সুর যন্ত্র-সংগীতে আদ্যোপান্ত ধরে রাখা হয়েছে এবং বিশুদ্ধ সেই সুর-প্রবাহের ভিতর দিয়ে রচিত ঐকতান হয়ে উঠেছে বেটোফেনের সোনাটা কিংবা ষষ্ঠ ও নবম সিমফনির সমতুল অনির্বচনীয় এক সংগীত সৃষ্টি—যার বিশ্বজনীন আবেদন রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের সুরপ্রবাহকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। গানের কথা অর্থাৎ ভাষা অনেক সময় ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের কাছে সংগীতের পরিপূর্ণ আস্বাদন ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্র-সংগীতে বিধৃত সুরের সেই সীমাবদ্ধতা নেই। স্ত্রাভিন্‌স্‌কি যদি কখনও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের গানের সুরসৃষ্টির সন্ধান পেতেন—ঐকতান হিসেবে নিঃসন্দেহে তিনি তার মধ্যে সংগীত তত্ত্বের এক নতুন মাত্রা খুঁজে পেতেন।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান

স্বপন সোম
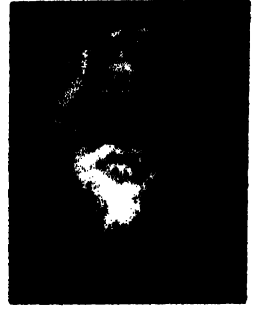
১৯৩১ : বাংলা ছায়াছবির ক্ষেত্রে দিকচিহ্নবিশেষ। নির্বাক যুগ শেষ। ছবি সবাক হল। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত সবাক চলচ্চিত্র 'জামাইষষ্ঠী' (মুক্তি : ২৫.০৪.১৯৩১), পরিচালক—অমর চৌধুরী। ১৯৩১-এ মুক্তি পেল আরও পাঁচটি ছবি, ১৯৩২-এ নটি, ১৯৩৩-এ এগারোটি ... এইভাবে প্রতি বছরই ছায়াছবির সংখ্যা বেড়েই চলল। নাটকে যেমন সংগীতের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল নাটকেরই প্রয়োজনে আবার দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের কথা ভেবেও, মোটামুটি সেই পথ ধরেই বাংলা চলচ্চিত্রেও সংগীতের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল ছবি সবাক হওয়ার কিছু পর থেকেই। দর্শকসাধারণের প্রতিক্রিয়ায় ছবিতে

প্রমথেশ বড়ুয়া ও কানন দেবী

নাটকে যেমন সংগীতের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল নাটকেরই প্রয়োজনে আবার দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের কথা ভেবেও, মোটামুটি সেই পথ ধরেই বাংলা চলচ্চিত্রেও সংগীতের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল ছবি সবাক হওয়ার কিছু পর থেকেই।

গানের চাহিদা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। এই প্রয়োজন মেটাতে একঝাঁক নতুন গীতিকার-সুরকার এলেন বাংলা গানের জগতে। এই গীতিকার-সুরকাররা কিন্তু সব পৃথক ব্যক্তি : এই ধরনটা পুরনো যুগের থেকে আলাদা এবং কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই প্যাটার্নটাই গান তৈরির ক্ষেত্রে রয়ে গেল—একেবারে হাল আমলে অবশ্য 'একই ব্যক্তি একাধারে গীতিকার-সুরকার-শিল্পী' এই ধরনটা আবার অনেকটা ফিরে এসেছে। যা হোক, গত শতকের তিনের দশকে একদিকে সিনেমায় ব্যবহৃত গান অর্থাৎ সিনেমার গান, অন্যদিকে রেকর্ডের মৌলিক আধুনিক গান (রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা গানের ক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তিকরভাবেই এই 'আধুনিক' অভীধাটি চালু হয়েছিল, চালু করেছিল কলকাতা বেতার ১৯৩০ সালেই) সমান্তরাল ধারায় এগিয়ে চলল। অন্যান্য গীতিকার-সুরকারের গানের মতো রবীন্দ্রসংগীতেরও অচিরেই আবির্ভাব ঘটল বাংলা চলচ্চিত্রে সেই তিনের দশকে এবং এই নতুন শতকে পৌঁছেও দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহারে ভাঁটার টান পড়েনি। নতুন শতকে নতুন মানুষের নতুন ভাবনায় তৈরি ছায়াছবিতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক সেই রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দিষ্ট। বিষয়টি বহুধাবিস্তৃত : বহু চলচ্চিত্রে অসংখ্য রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার ঘটেছে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে। তার পূর্ণ সবিস্তার বিচার-বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের অবসরে স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়। শুধু একটা রূপরেখা আঁকার নম্র প্রয়াস এখানে রইল।

অন্যান্য গীতিকার-সুরকারের গানের মতো রবীন্দ্রসংগীতেরও অচিরেই আবির্ভাব ঘটল বাংলা চলচ্চিত্রে সেই তিনের দশকে এবং এই নতুন শতকে পৌঁছেও দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহারে ভাঁটার টান পড়েনি। নতুন শতকে নতুন মানুষের নতুন ভাবনায় তৈরি ছায়াছবিতে আজও সমান প্রাসঙ্গিক সেই রবীন্দ্রনাথের গান।

২

ডিস্ক-রেকর্ডে ধৃত প্রথম রবীন্দ্রসংগীত সম্ভবত ১৯০৫ সালে 'নিকোল' রেকর্ডে পি সি বোসের গাওয়া 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'। তারপর দু-তিন দশকের সময়সীমায় বিভিন্ন শিল্পীর রেকর্ডে অন্যান্য গীতিকার সুরকারের গানের সঙ্গে রবিবাবুর গানও স্থান পেয়েছিল কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথা-সুরের বিকৃতি অপ্রকাশ্য থাকেনি। তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের নিজস্ব একটা জগৎ ক্রমশ তৈরি হতে থাকল : প্রথমে অমলা দাশ, পরে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহানা দেবী, অমিতা সেন, কনক দাস প্রমুখের রেকর্ডের মাধ্যমে। ১৯২৫-এ স্টার থিয়েটারে 'চিরকুমার সভা'-য় নামী অভিনেত্রী নীহারবালা রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন দিনেন্দ্রনাথের কাছে তালিম নিয়ে। ধীরে ধীরে

সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১)

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিনিকেতন-জোড়াসাঁকোর বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই প্রসারেরই একটা রূপ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োগ। রবীন্দ্রকাহিনি নয় এমন যে-চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হল তা নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত 'মুক্তি' (১৯৩৭)। তার আগে নিউ থিয়েটার্সেরই প্রযোজনায় চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' (মুক্তি : ২২-৩-১৯৩২) এবং 'চিরকুমার সভা' (মুক্তি : ২৮-৫-১৯৩২)। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত পরিচালনায় 'নটীর পূজা'-য় ও রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত পরিচালনায় 'চিরকুমার সভা'-য় গান নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তা সম্ভবত রেকর্ড হয়নি। ১৯৩৫-এ নিউ থিয়েটার্স 'মুক্তি' ছবি তোলার কাজ শুরু করে। ছবির পরিচালক-অভিনেতা স্বনামধন্য প্রমথেশ বড়ুয়া সে-সময়ের সুখ্যাত সংগীতশিল্পী পঙ্কজ মল্লিককে 'এই ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্বই শুধু দেননি, সেই সঙ্গে গায়ক অভিনেতার ভূমিকাও দিয়েছিলেন'। 'খেয়া' কাব্যের একটি কবিতায় সুরারোপ করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। এর সুরসৃষ্টিতে অবশ্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রেরও যথেষ্ট অবদান ছিল—নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'আসা যাওয়ার মাঝখানে' শীর্ষক স্মৃতিকথায় এ-ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছেন. বড়ুয়াসাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে বসে স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় 'দিনের শেষে'—একটু গুনগুন করছিলেন পঙ্কজবাবু। বড়ুয়াসাহেবের তা দারুণ ভালো লেগে যায়, পঙ্কজকে বলেন—'এ গান আমার ছবিতে চাই'। পঙ্কজ

বলেন—'...এটা যে রবিবাবুর গান নয়। এটা ওঁর কবিতা। ...ওঁর অনুমতি চাইতে হবে। কিন্তু চাইবই বা কি বলে?' শেষপর্যন্ত বড়ুয়াসাহেবের পীড়াপীড়িতে পঙ্কজকুমার একদিন দুরুদুরু বক্ষে হাজির রবীন্দ্রনাথের কাছে। কবি তখন কলকাতায়—প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়ের 'আম্রপালী' নামাঙ্কিত বরানগরের বাড়িতে যেখানে পরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। তা পঙ্কজকুমার একটু কিন্তু কিন্তু করেই কবিকে সবিনয়ে বললেন—'আপনার কয়েকটি গান আমরা এই ছবিতে ব্যবহার করতে চাই। আর চাই 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটিও এই ছবিতে আমি স্বকণ্ঠে গাইতে।' কবিকে আগে একবার শুনিয়েছিলেন 'দিনের শেষে'। কবি তা আবার শুনতে চাইলেন সেদিন। পঙ্কজকুমার শোনালেন। কবি সম্মতিও দিলেন। একটা জায়গায় কথাও একটু বদলে নিতে বললেন। 'ফুলের বার নাইকো যার ফসল যার ফললো না / চোখের জল ফেলতে হাসি পায়'—কে করলেন—'ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফললো না / অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়'। রবীন্দ্রনাথ সেদিন নিজে থেকেই আরও দু-তিনটি গান ব্যবহার করার কথা পঙ্কজকুমারকে বলেন (এর আগেই পঙ্কজকুমার কাহিনিটি শুনিয়েছেন কবিকে)। বিশেষ করে 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পঙ্কজকুমারের সেদিনের আলাপচারিতায় বড়ুয়াসাহেব তাঁর ছবির নামের হদিসও পেয়েছিলেন। পঙ্কজকুমারের মুখে ছবির কাহিনি ও সিকোয়েন্স শুনে কবি মন্তব্য করেছিলেন—'পঙ্কজ আমি দেখছি তোমাদের ছবির শুরুতেই দ্বার মুক্ত। তোমাদের কাহিনির মূল চরিত্রটি যেন কিসের থেকে মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।' পঙ্কজকুমারের কাছে একথা শুনে বড়ুয়াসাহেবের এ-ছবির নাম খুঁজে পেতে দেরি হয়নি—'মুক্তি'। ছবিতে পঙ্কজকুমার নিজে গেয়েছিলেন 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' ও 'আমি কান পেতে রই' আর খ্যাতনামা অভিনেত্রী কানন দেবী—'তার বিদায়বেলার মালাখানি' ও 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'। চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত প্রথম রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বাইরের একজন মানুষের কেমন তা কানন দেবীর কাছেই শোনা যাক : 'মুক্তি'-র গান শেখানোর জন্য অমর মল্লিক একদিন পঙ্কজবাবুর ঘরে নিয়ে গেলেন। সেইদিনই প্রথম দেখলাম ওঁকে। ...পঙ্কজবাবুর গান শেখানোর ভঙ্গিটি ছিল বড় আকর্ষণীয়। সুর ও কথার ব্যঞ্জনা এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন যে মনের প্রতি পরতে যেন গাঁথা হয়ে থাকত। ওঁর কাছে আমার প্রথম শেখা গান ছিল 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'। ...উনি বলেছিলেন গাইবার সময় একটা কথা সবসময় মনে রেখ 'সবার রঙে'-এ গানটি হোলির গান নয়—পুজোর গান। এখানে এ-গান দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এইটেই বোঝানো যে প্রশান্ত তোমার স্বামী, তার আনন্দেই তোমার আনন্দ, তার কৃতিত্বেই তোমার গৌরব। 'সেই রাতের স্বপন ভাঙা, আমার হৃদয় হোক না রাঙা', কেন রাঙা হবে? না, তোমার রঙেরই গৌরবে। এ রঙ তো খেলার রঙ নয়, এ হল প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার রঙ।' এইভাবে গান বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়াও পঙ্কজকুমার কানন দেবীকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে 'মুক্তি' ছবিতে সকলে কানন দেবীর মুখে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত শুনবেন। তিনি যেন কবির গানের অমর্যাদা না করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের মর্যাদা, মাধুর্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি কানন দেবীর অমন মধুর কণ্ঠের সহৃদয় পরিবেশনে। আগে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকলেও রবীন্দ্রগানের প্রতি শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় এবং কণ্ঠদক্ষতায় নিজেকে যেন ছাপিয়ে উঠলেন কানন দেবী 'মুক্তি'-র গানে। 'মুক্তি' ১৯৩৭-এ মুক্তি পেতেই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল 'আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে'। এই গানটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও কানন দেবীর কথায়—"...আমার মনের মতো গান হয়েছিল তার বিদায়বেলায় মালাখানি'। ও গানটা যেন আমায়

'ডাক্তার' ছবির প্রচার পুস্তিকার প্রচ্ছদ

পঙ্কজকুমার মল্লিক

পঙ্কজকুমারের মুখে ছবির কাহিনি ও সিকোয়েন্স শুনে কবি মন্তব্য করেছিলেন—'পঙ্কজ আমি দেখছি তোমাদের ছবির শুরুতেই দ্বার মুক্ত। তোমাদের কাহিনির মূল চরিত্রটি যেন কিসের থেকে মুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

সবসময় 'হন্ট' করত"। এইভাবে প্রমথেশ বড়ুয়া ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম জায়গা করে নিল রবীন্দ্রকাহিনি নয় এমন এক চলচ্চিত্রে এবং পঙ্কজকুমার-কানন দেবীর কণ্ঠনৈপুণ্যে শ্রোতাদের হৃদয়েও। সেই শুরু। তারপর আজ পর্যন্ত অগণন চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান প্রযুক্ত হয়েছে।

'মুক্তি'-র কাছাকাছি সময়ে একাধিক চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হল বেশ সাফল্যের সঙ্গে যেমন—'অভিজ্ঞান' (১৯৩৮), 'অধিকার' (১৯৩৯), 'জীবনমরণ' (১৯৩৯), 'ডাক্তার' (১৯৪০), 'পরাজয়' (১৯৪০) 'আলোছায়া' (১৯৪০), পরিচয় (১৯৪১), 'উত্তরায়ণ' (১৯৪১) কিংবা 'আহুতি' (১৯৪১)-তে। এর নেপথ্যে যথারীতি প্রধানত সেই নিউ থিয়েটার্স, পঙ্কজকুমার, প্রমথেশ বড়ুয়া, রাইচাঁদ বড়াল। এই পর্বে পঙ্কজকুমারের কণ্ঠে পেলাম 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়', 'ওরে সাবধানী পথিক' (অভিজ্ঞান ; সংগীত পরিচালনা-রাইচাঁদ বড়াল), 'এমন দিনে তারে বলা যায়', 'মরণের মুখে রেখে' (অধিকার ; সংগীত পরিচালনা—তিমিরবরণ), 'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে' (ডাক্তার ; সংগীত পরিচালনা ও অভিনয়ে পঙ্কজকুমার), 'আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল (আলোছায়া ; সংগীত-পরিচালনা—কৃষ্ণচন্দ্র দে) এবং কানন দেবীর কণ্ঠে 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' 'বারে বারে পেয়েছি যে তারে' (পরাজয় ; সংগীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল), 'তোমার সুরের ধারা', 'সেই ভালো সেই ভালো', 'আমার বেলা যে যায়', 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের' (পরিচয় ; সংগীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল)। মনে রাখার মতো গান। এই সময়েই আমরা রবীন্দ্রগানে পাই অনন্য কণ্ঠসংগীতশিল্পী কুন্দনলাল সায়গলকে। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাইরের এই শিল্পীর স্বভাবতই আগে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথম রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন পঙ্কজকুমার মল্লিকের পরিচালনায় 'জীবনমরণ' ছবিতে : 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান' ও 'তোমার বীণায় গান ছিল'। তারপর 'পরিচয়' ছবিতে : 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো', 'একটুকু ছোঁয়া লাগে', 'আজ খেলা ভাঙার খেলা' এবং 'আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে'। গানগুলি মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যায় একজন অবাঙালি শিল্পী কী নিষ্ঠায়-শ্রদ্ধায় কী সহজ নৈপুণ্যে গানগুলি কণ্ঠে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, শোনা যায় সায়গলের রবীন্দ্রসংগীত তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তো চাইছিলেনই যে তাঁর গান জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতনের বাইরে ছড়িয়ে পড়ুক। এমনই তো ভাবছিলেন যে একদিন তাঁর গান সকলকে গাইতেই হবে। সন্দেহ নেই, চলচ্চিত্রের সূত্রে তাঁর গান তাঁর জীবিতকালেই অনেকটাই প্রসারিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত এই ছবিগুলিতে শুধু যে রবীন্দ্রসংগীতই ছিল তা নয়, অন্যান্য গীতিকারের নতুন তৈরি গানও ব্যবহৃত হয়েছিল। শক্তিমান অনুভবী গীতিকার হিসেবে আমরা পেলাম অজয় ভট্টাচার্য, (চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে—ডাক্তার), প্রণব রায় (পরিচয়) প্রমুখকে। ১৯৪৪-এ বিমল রায় পরিচালিত 'উদয়ের পথে' (প্রযোজনা-নিউ থিয়েটার্স, সংগীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল) নানা কারণে উল্লেখযোগ্যতা পেয়েছিল। নবীন দক্ষ গীতিকার শৈলেন রায়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে এ ছবিতে স্থান পেয়েছিল একাধিক রবীন্দ্রসংগীত যা বিনতা রায়ের কণ্ঠ ছুঁয়ে আজও অমলিন। বিনতা এ ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাহিনিভিত্তিক দুটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল : শোধবোধ' (১৯৪২ ; পরিচালনা—সৌমেন মুখোপাধ্যায়) এবং 'শেষরক্ষা' (১৯৪৪ ; পরিচালনা—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়)। দুটি ছবিরই সংগীত পরিচালক রবীন্দ্র স্নেহধন্য অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিনিকেতনের বাইরে সঠিকভাবে রবীন্দ্রনাথের গানকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। 'শেষরক্ষা'-য় অনাদি দস্তিদারের প্রশিক্ষণে গেয়েছিলেন সুপ্রীতি ঘোষ ও বিজয়া দাস। এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে মনে পড়ছে পরবর্তীকালে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, দ্বিজেন চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর মূল্যবান ভূমিকার কথাও। রবীন্দ্রকাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের সূত্রে এখানে গোড়ার পর্বের কয়েকজন পরিচালকের কথা স্মর্তব্য। যেমন—নরেশচন্দ্র মিত্র (গোরা—১৯৩৮, বৌঠাকুরাণীর হাট—১৯৫৩), নীতীন বসু (নৌকাডুবি—১৯৪৭) দেবকীকুমার বসু (চিরকুমার সভা' ১৯৫৬—হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য গান এখানে উল্লেখ্য, তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত রবীন্দ্র-কবিতা অবলম্বনে 'অর্ঘ্য'—১৯৬১)। যা হোক, ১৯৩৫ থেকে শুরু করে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারের এই প্রাথমিক পর্বে সব ছবিতেই যে রবীন্দ্রসংগীত সুপ্রযুক্ত হয়েছিল এমন কথা বলা যাবে না, কিন্তু প্রধানত পঙ্কজকুমার মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, প্রমথেশ বড়ুয়া,

রবীন্দ্রনাথ তো চাইছিলেনই যে তাঁর গান জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতনের বাইরে ছড়িয়ে পড়ুক। এমনই তো ভাবছিলেন যে একদিন তাঁর গান সকলকে গাইতেই হবে। সন্দেহ নেই, চলচ্চিত্রের সূত্রে তাঁর গান তাঁর জীবিতকালেই অনেকটাই প্রসারিত হয়েছিল।

নিউ থিয়েটার্সের উৎসাহে-উদ্যোগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হতে পেরেছিল এবং এর মূল্য অপরিমেয়।

৩

চলচ্চিত্রে গান আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হয় ছায়াছবিটির মূল ভাব ব্যক্ত করার জন্য বা বিশেষ কোনও পরিস্থিতিকে রূপ দেওয়ার কারণেও। একজন রুচিমান বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালক যেভাবে তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করবেন, ঠিক সেই সূক্ষ্মতা সব পরিচালকের কাছে নিশ্চয় আশা করা যায় না। এই প্রেক্ষিতে কয়েকটি ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের নান্দনিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৫৫-তে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পথের পাঁচালি'-র মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র সাবালক হল যাঁর হাত ধরে সেই সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রায় ১৩-১৪টি ছবিতে খুব সচেতনভাবে, শিল্পসম্মতরূপে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। কখনও সম্পূর্ণ গান, কখনও আংশিক। অন্য কোনও গীতিকারের গান তিনি এত ব্যবহার করেননি। ব্যঞ্জনাময় ও রুচিশীল সৃষ্টি এই রবীন্দ্রসংগীত তাঁর খুবই প্রিয় ছিল, এ নিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনাও যে ছিল তা 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা' (এক্ষণ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩৭৪) নিবন্ধে কিংবা সুভাষ চৌধুরীর নেওয়া একটি ব্যাপ্ত সাক্ষাৎকারে (আজকাল, ২৯ মার্চ, ১৯৮১) সুপ্রকাশিত। তাঁর গভীর মননধর্মী ছায়াছবিতে সংস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্র, তাদের মানসিকতা, রুচিবোধ আর উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সঠিক রূপ দিতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে রবীন্দ্রসংগীতের মতোই এক সম্পূর্ণ সৃষ্টি—এমনটাই হয়তো মনে করেছিলেন সত্যজিৎ। যে-যে ছবিতে সত্যজিৎ রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ করেছেন তার সবকটিরই সংগীত পরিচালক যে তিনি নিজেই তা নয়, তবে ছবির সর্বত্রই যে পরিচালক উপস্থিত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় (১৯৬২ ; সংগীত পরিচালনা সত্যজিতেরই) হিমালয়ের অনিন্দ্য নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে সাংসারিক টানাপোড়েন ও দর্পী স্বামীর প্রতাপে বিক্ষত লাবণ্য (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন অনেকদিন পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে গেয়ে ওঠে—'এ পরবাসে রবে কে' তখন গানটি শুধু লাবণ্যর তৎকালীন বিশেষ এক মনের অবস্থার ভাষ্য হয়ে থাকে না, সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রটিকেই আলোকিত করে অন্যতর ব্যঞ্জনায়।

'অভিজান' চলচ্চিত্রের প্রচার পুস্তিকার পৃষ্ঠা

মাত্র চার লাইনের এই রবীন্দ্রগান লাবণ্যকে ফিরিয়ে দেয় হারানো স্বাতন্ত্র্য, জোগায় সেই সাহস আর তারপরই তো সে দাদা জগদীশ (পাহাড়ি সান্যাল)কে বলতে পারে—'ও মেয়ে যা ভাবে তাই যেন করে'। আমরা ভুলতে পারি না এই দৃশ্য, নেপথ্যে অমিয়া ঠাকুরের গাওয়া এই গান ও তার দ্যোতনা। 'তিন কন্যা'-য় (১৯৬১) সত্যজিতের সংগীত পরিচালনায় হাতেখড়ি। এই ছবির দ্বিতীয় অংশ 'মণিহারা'-য় মণিমালিকার (কণিকা মজুমদার) নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণ একাকিত্বকে কী সার্থকভাবেই না রূপ দিলেন 'বাজে করুণ সুরে' গানের মধ্য দিয়ে। মণিমালিকার মুখেই ছিল এ গান। এ গানের প্রয়োগ সম্পর্কে সত্যজিতের বক্তব্য : 'It is a very ornate, very lonely
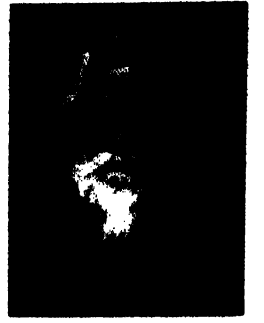
সত্যজিৎ রায়

১৯৫৫-তে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পথের পাঁচালি'-র মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র সাবালক হল যাঁর হাত ধরে সেই সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রায় ১৩-১৪টি ছবিতে খুব সচেতনভাবে, শিল্পসম্মতরূপে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন।

song, that absolutely suited the mood. It is not that the words actually reflect her situation—they are not important here—it's the time'—উদ্ধৃত আছে অ্যানড্রু রবিনসনের 'দ্য ইনার আই' গ্রন্থে। 'চারুলতা'-য় (১৯৬৩) অমল-চারুর (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়) বোঝাপড়ার একেবারে গোড়ার পর্বে অমলের মুখে একটি গান রাখলেন : 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'। পিয়ানো বাজিয়ে বেশ মজা করে হাল্কা চালে দুলে দুলে গাইবে অমল। আগেই ছবিতে দেখানো আছে অমল পিয়ানো বাজাতে পারে। জীবনযাপনের দিক দিয়ে 'পরিবারটি উচ্চ মধ্যবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ পর্যায়ের, সেই সঙ্গে লিবারেল ও কিছুটা রাজভক্ত, অথচ দেশীয়তার প্রতি বেশ ঝোঁক আছে। বাড়িতে রামমোহনের নির্বেদ ভাবনার ব্রহ্মসংগীতের পাশে টপ্পাও চলে। অন্তঃপুরচারিণীরা বাংলা উপন্যাসে উৎসাহী আবার বিলিতি সুরে বাংলা গান গায়। এই পরিবেশে, এই প্রেক্ষিতে অমলের মুখে চমৎকার মানিয়ে যায় 'আমি চিনি গো' গানটি যার মধ্যে বিদেশি ছন্দের ছোঁয়াও আছে। চারুকে নিয়ে অমলের গান গাওয়ার এই দৃশ্যায়ন থেকে 'অন্তর্নাট্যের হদিশ মেলে, ধরা যায় দুজনের সম্পর্কের রহস্যময় মাধুর্য।' শেষদিকে অমল সহজ চাপল্যে 'ওগো বিদেশিনী'-র জায়গায় গেয়ে ওঠে 'ও বৌঠাকুরাণী'। 'এ সবই তো আসলে এক সম্পর্কের বিন্যাস। দ্বন্দ্বে ছন্দে, প্রত্যাখ্যানের আনন্দে অধিকারে এবং নর্তনশীলতায়। এই দ্বন্দ্ব-ছন্দ-দোলাচলই তো চারুলতা-র থিম।' এই ভাবনাকে ফোটাতেই বুঝি সত্যজিৎ থিম-গান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গানটি। অবশ্য কথায় নয় গানটি রেখেছিলেন যন্ত্রে। লিট মোটিফ হিসেবে রবীন্দ্রগানের এমনতর ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার বাংলা ছবিতে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রগানের সুর একাধিক ছবিতে প্রয়োজন বুঝে প্রয়োগ করেছেন সত্যজিৎ। যেমন 'অপুর সংসার'-এ (১৯৫৯) 'যদি তারে নাই চিনি গো', 'আমার সোনার বাংলা', 'দেবী'-তে (১৯৬০) 'ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে', 'তিনকন্যা'-র 'পোস্টমাস্টার' (১৯৬১)-এ 'আমার মন

'এ সবই তো আসলে এক সম্পর্কের বিন্যাস। দ্বন্দ্বে ছন্দে, প্রত্যাখ্যানের আনন্দে অধিকারে এবং নর্তনশীলতায়। এই দ্বন্দ্ব-ছন্দ-দোলাচলই তো চারুলতা-র থিম।' এই ভাবনাকে ফোটাতেই বুঝি সত্যজিৎ থিম-গান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গানটি। অবশ্য কথায় নয় গানটি রেখেছিলেন যন্ত্রে।

সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' (১৯৬৪)

মানে না', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০) ও 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩)-এ 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ', 'ঘরে বাইরে'-তে (১৯৮৫) 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ'। আবার ফেরা যাক কণ্ঠের গানে। 'জনঅরণ্য' (১৯৭৬) ছবিতে নায়ক সোমনাথ (প্রদীপ মুখোপাধ্যায়) তখন বিভ্রান্ত, নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে তার মন সংশয়াকুল, এদিকে আলো নেই—লোডশেডিং—তেমনই এক সংকটময় মুহূর্তে রেডিয়োতে হঠাৎ বেজে ওঠে এক নারীকণ্ঠে 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'। ভরা বর্ষার গান তাই সম্পূর্ণ গানটি নয় প্রয়োজনমতো শুধু দু-তিনটি লাইন সত্যজিৎ এখানে ব্যবহার করেন। সোমনাথের মনের অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা চমৎকার ধরা পড়ে ওই গানের অংশবিশেষের কুশলী সুচিন্তিত ব্যবহারে। 'কাপুরুষ' (১৯৬৫)-এ চা-বাগানের ম্যানেজার বিমল গুপ্ত (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) যখন জিপে করে সাংবাদিক-লেখক অমিতাভকে (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে আসে, তখন বিমল জানে না যে গাড়ি চালিয়ে সে নিয়ে এল তার স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিককে আবার অমিতাভও জানে না যে সে এসে পড়েছে তার প্রাক্তন প্রেমিকা করুণার (মাধবী মুখোপাধ্যায়) কাছে। জিপ থামে, কোয়ার্টারের ভেতর থেকে ভেসে আসে রেকর্ড-প্লেয়ারে চাপানো 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অংশবিশেষ 'অর্জুন, তুমি অর্জুন'। তারপর করুণার পক্ষে তো এ কথাই বলার : 'হা হতভাগিনী, এ কি অভ্যর্থনা মহতের।' এ-সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তীর মন্তব্যে কোনও ভুল নেই : 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের এমন ছিন্নকলির ব্যবহারের অমোঘ ও শিল্পসম্মত ব্যঞ্জনা বাঙালি দর্শক কখনও পায়নি।' 'আগন্তুক' (১৯৯২)-এ সুধীন্দ্র-অনিলার (দীপঙ্কর দে-মমতাশংকর) ছোট্ট শান্ত পরিবারে দীর্ঘকাল বাদে হঠাৎ এসে উপস্থিত অনিলার মামা মনোমোহন (উৎপল দত্ত) যাকে অনিলারা কোনওদিন দেখেনি। এই মনোমোহন কি আসল মনোমোহন? সুধীন্দ্র সংশয়ান্বিত। সুধীন্দ্র অফিস থেকে ফিরে মনে একটু সন্দেহ নিয়েই মনোমোহনের সঙ্গে পরিচয় করে, পরে বাথরুমে যায়। ইতিমধ্যে এক জরুরি ফোন আসে তা জানাবার জন্য অনিলা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দেয়। তখন পর্দায় শোনা যায় সুধীন্দ্র কণ্ঠে : 'সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা'। এই জায়গায় 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি'—গানের ছিন্নাংশের এমত প্রয়োগ কেন? মনোমোহনের প্রধান জিজ্ঞাসা তো এই গানেই রয়েছে তারপর : 'আমায় চেন কি?' রবীন্দ্রসংগীতের এমন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ আমাদের চমকিত করে। এইভাবেই চলচ্চিত্রের ভাব, বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গান আসে 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৫)-তে স্বদেশি-করা সন্দীপের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) গলায় 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' (কিশোরকুমারের পুরুষালি দীপ্র খোলা কণ্ঠে মানিয়েও ছিল বেশ), 'শাখা প্রশাখা' (১৯৯২)-য় পাহাড়-নদী-বনের এক মুক্ত পরিবেশে গানের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন তপতী হঠাৎ গেয়ে ওঠে 'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে', 'গণশত্রু' (১৯৯০)-তে দেবমহিমা ও মানবিক শুভবুদ্ধির দ্বন্দ্বে ডাঃ অশোক গুপ্তর স্ত্রী মায়ার (রুমা গুহঠাকুরতা) গেয়ে ওঠা—'এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা'। 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১) তথ্যচিত্রে সচেতনভাবেই সত্যজিৎ একাধিক রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের একটি অসামান্য গানও : 'তবু মনে রেখো'। সংগীত পরিচালনায় এখানে ছিলেন অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

বাংলা ছবির আর-এক দুরন্ত ব্যক্তিত্ব ঋত্বিক ঘটক। চিন্তাভাবনায় তাঁর সঙ্গে সত্যজিতের তেমন মিল নেই, 'ছবির বিষয় নির্বাচন ও বিন্যাসে ছিল বড় মাপের তফাত'। ঋত্বিকের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ অন্য। পড়াশোনা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন গণনাট্য সংঘের আন্দোলনে। নাটক লিখছিলেন, অভিনয় করছিলেন, তারপর হঠাৎ ১৯৫১-৫২-তে ফিল্মে চলে আসা।

'জনঅরণ্য' (১৯৭৬) ছবিতে নায়ক সোমনাথ (প্রদীপ মুখোপাধ্যায়) তখন বিভ্রান্ত, নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নে তার মন সংশয়াকুল, এদিকে আলো নেই—লোডশেডিং—তেমনই এক সংকটময় মুহূর্তে রেডিয়োতে হঠাৎ বেজে ওঠে এক নারীকণ্ঠে 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'।

দেশভাগের বেদনা তাঁকে পীড়িত করে, সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্রে তিনি বিচলিত হন, পূর্ববঙ্গের নদী-মাঠ-ঘাট তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে : এই হলেন আবেগবিহ্বল স্মৃতিকাতর আত্মভোলা ঋত্বিক। তাঁর একাধিক ছবিতেই গণনাট্যের গান, লোকসংগীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করেছেন তাঁর মতো করেই। নান্দনিক প্রয়োগ। 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬৫)-য় ছোটো সীতা যখন পরিত্যক্ত একটা এয়ারস্ট্রিপে'-র মধ্য দিয়ে কচি গলায় গাইতে গাইতে চলে যায় 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা'—উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তার ছাড়া-পাওয়া মনের আনন্দটা ধরা যায়। কিন্তু এই আনন্দটাই তো চিরস্থায়ী নয়, গানের শেষদিকে চকিতে উদয় হয় এক ভয়ংকর মুখের। রবীন্দ্রপরিমণ্ডলের শিল্পী নন আরতি মুখোপাধ্যায়, অথচ কী অনবদ্যই না কণ্ঠে ধরেছিলেন গানটি ! গানটি এ-ছবিতে তিনবার আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার গানটি আসে অভিরামের বাড়িতে যেখানে তার ছেলে সীতার কাছে গান শুনতে চায়—এ সময় ক্যামেরার ব্যবহার লক্ষণীয়। শেষবার যখন জীবনের অনেক ঝড়-ঝাপটা, বিপদসংকুল রাত্রি পেরিয়ে সীতার দাদা ঈশ্বর ভাগ্নেকে নিয়ে সুবর্ণরেখার তীরে ফিরে আসছে, তখন স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে তার ভাগ্নে ঠিক 'সীতা-মা'-র মতো ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে ছোট হাতে তালি দিতে দিতে গায় 'আজ ধানের ক্ষেতে'। রবীন্দ্রনাথের এই গানটিই যেন সমগ্র ছবিটিকে বেঁধে রাখে একটা সুরে। 'আজ ধানের ক্ষেতে'-র এমন চলচ্চিত্রায়ন আমাদের স্মৃতিতে চিরজাগরুক থাকে। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় (১৯৬০ ; সংগীত পরিচালনা— জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) কেন্দ্রীয় চরিত্র নীতা (সুপ্রিয়া চৌধুরী) দারিদ্রের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে, দেখে তার ভালোবাসার প্রিয়জনকে অধিকার করে নেয় তার বোন, অনুভব করে কেবলমাত্র উপার্জনের সূত্র ধরেই পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক, দারিদ্র্যই হয়তো এর মূল কারণ। কিন্তু এই বেপথু অবস্থাতেও গানপাগল দাদা শঙ্করের (অনিল চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে তার মনের মিলের অভাব ঘটে না। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, বিবিক্ত নীতা রবীন্দ্রসংগীত শিখতে চায় দাদার কাছে। এমনই এক দুর্বহ পরিস্থিতিতে শংকর আর নীতার কণ্ঠে উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের সেই গান—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'। অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর, বেড়ার ফাঁক দিয়ে অল্প আলো এসে

ঋত্বিক ঘটক

আবেগবিহ্বল স্মৃতিকাতর আত্মভোলা ঋত্বিক। তাঁর একাধিক ছবিতেই গণনাট্যের গান, লোকসংগীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করেছেন তাঁর মতো করেই। নান্দনিক প্রয়োগ।

অন্ধকারকে যেন আরও ঘনিয়ে তুলেছে—শংকর আর নীতা গাইছে। 'সব যে হয়ে গেল কালো/ নিবে গেল দীপের আলো' আমাদের হৃদয়ে আছড়ে পড়ে। আর এই গানই যেন শেষ দৃশ্যে 'দাদা, আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলাম'—দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত নীতার এই আর্ত হাহাকারের বাঙ্ময়তায় পৌঁছতে সাহায্য করে। আগে গাওয়া সেই বেদনাবিহ্বল গান—'যে রাতে মোর' আর শেষে নীতার বাঁচতে চাওয়ার আকুতি—সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা। মুহূর্তে আমরা বিষণ্ণ হই, চোখ হয় অশ্রুসজল কিন্তু কোথায় একটা তীব্র মানবিকতা বোধে আপ্লুত আলোকিতও হই। এই গানটিই তপন সিংহ ব্যবহার করেছিলেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৯৬০) ছবিতে, একই গানের বহুমাত্রিকতা এতে প্রকাশ পায়। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেনও চমৎকার। 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় বলতে হয় নেপথ্য দুই শিল্পীর কথাও—কী দরদেই না গানটি কণ্ঠে ধরেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ও গীতা ঘটক। এই দেবব্রত বিশ্বাসই ঋত্বিকের আরও ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে দ্বার খোলার অন্যতম চাবিকাঠি। 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) -এ কিংবা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'—(১৯৭৭)-তে। 'কোমল গান্ধার'-এ ; (সংগীত পরিচালনা— জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) দেখি নাগরিক কিছু মানুষ যারা নাট্যকর্মী, শহুরে বদ্ধতা থেকে বিস্তীর্ণ প্রকৃতির মাঝখানে এসে উপলব্ধি করতে পারে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগটা, অনুভব করতে পারে নিজের স্বরূপ তাই সহজেই গেয়ে উঠতে পারে 'আকাশভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ / তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি

মোর স্থান / বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান'। ঋষির (অনিল চট্টোপাধ্যায়) গলায় এইভাবেই জেগে ওঠে গান : নেপথ্যে দেবব্রত বিশ্বাসের অতুলন গায়ন—তাঁর অভিব্যক্তিময় উচ্চারণ বিশেষত 'বিস্ময়' শব্দটি বারে বারে ফিরে ফিরেই নতুন, সেইসঙ্গে ঋষির মুখেও বিস্ময়ের নানা অভিব্যক্তি। এই ছবিতেই 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে'-র প্রয়োগ অবশ্য কিছুটা মামুলি ধরনের। আলাদা মাত্রা পায় না 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-তে নীলকণ্ঠ বাগচি ও তাঁর স্ত্রীর ফ্লাশব্যাকে দেখানো প্রেমদৃশ্যে 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' গানের ব্যবহারও। ঋত্বিক স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন নীলকণ্ঠের ভূমিকায়। বরং মনে দাগ কেটে যায় পুরুলিয়ায় পঞ্চাননের ফুটিয়ে খাওয়ার সময় নচিকেতা যখন ভাতের থালা উলটিয়ে ফেলে তখন বঙ্গবালার দিকে তাকিয়ে নীলকণ্ঠের গেয়ে-ওঠা : 'কেন চেয়ে আছ গো মা'। এখানে প্রথম লক্ষ্য নিশ্চয়ই বঙ্গবালা কিন্তু আসল উদ্দিষ্ট 'আমাদের দ্বিখণ্ডিত অসহায় বঙ্গভূমি'। 'এরা দেবে না, তোমারে কিছু দেবে না যে / আপন মায়েরে নাহি জানে' এবং 'দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী / নির্মম চেতনাহীন পাষাণে' : এই দুটি ক্ষোভ উচ্চারিত হয়েছে এ-গানে। 'ব্যক্তির বেদনা ও খণ্ডিত দেশের গোপন অন্তঃকরণ যেন জমাট অশ্রুবিন্দুর মতো গানটায় ধরা রয়েছে। আগে সেভাবে গানটাকে আমরা জানিনি। জানালেন ঋত্বিক'—সুধীর চক্রবর্তীর এ হেন মন্তব্য এ প্রসঙ্গে যথার্থ মনে হয়। তবে একটা প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয় যে, নিয়ত মদে ডুবে-থাকা একটি চরিত্র কী খুঁতহীন সুরে-তালে-লয়ে-উচ্চারণে গান পরিবেশন করতে পারেন ? যা হোক, গানটি রূপায়িত হয়েছিল দেবব্রত বিশ্বাস ও সুশীল মল্লিকের দ্বৈতকণ্ঠে একটু অদ্ভুতভাবেই। কখনও দেবব্রতর কণ্ঠ কখনও বা সুশীলের। আসলে হয়েছিল কি—ঋত্বিক চেয়েছিলেন দেবব্রতই পুরো গানটা করেন। কিন্তু বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যদি দেবব্রতর গানকে অনুমোদন না দেন, সেজন্য দেবব্রতর পরামর্শ মেনেই গানটি রেকর্ড করা হয় সুশীল মল্লিককে দিয়ে। কিন্তু ঋত্বিকের আর পছন্দ হয় না। জোর করে এরপর দেবব্রতকে দিয়েও গানটি স্টুডিওতে গৃহীত হয়। পরে দেবব্রতর অনুরোধে দেবব্রতর গানের মাঝে মাঝে সুশীলের কণ্ঠও রাখা হয়।

মৃণাল সেনের ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান প্রায় অনুপস্থিত। তপন সিংহের একাধিক ছবিতে বরং রবীন্দ্রসংগীতের পর্যাপ্ত ব্যবহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথেরই ছোটগল্প 'অতিথি'-র (১৯৬৫) চলচ্চিত্রায়নে তপন বাছেন 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' গানটি। বন্ধন, এমনকি স্নেহবন্ধনও যার সয়না, 'অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য' যার 'চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত', 'নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই' যে 'নিশ্চিন্ত উদাসীন' অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত'—সেই তারাপদর (পার্থ মুখোপাধ্যায়) কথা ভেবেই এমন নির্বাচন। তাঁর অন্যান্য ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে 'আমার যে সব দিতে হবে' (জতুগৃহ—১৯৬৪, শিল্পী-বন্দনা সিংহ), 'পথ দিয়ে কে' (নির্জন সৈকতে-১৯৬৩, শিল্পী—মৃণাল চক্রবর্তী), 'তুমি কোন ভাঙনের পথে' (অন্তর্ধান—১৯৯২, শিল্পী-প্রমিত সেন) ইত্যাদি।

তরুণ মজুমদার আর-এক চলচ্চিত্রকার যিনি বরাবর তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান রেখেছেন। আর এক্ষেত্রে তার মুখ্য সহায় ছিলেন প্রায় প্রতিটি ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'দাদার কীর্তি' (১৯৮০)-তে ফুলদা (তাপস পাল) ও সরস্বতীর (মহুয়া রায়চৌধুরী) মনের প্রাথমিক বোঝাপড়ার পর্বে প্রবাসী বাঙালির অনুষ্ঠানে 'চিত্রাঙ্গদা'-র (সরস্বতীর একটা পুরুষালি ভাব ছিল চিত্রাঙ্গদার মতোই) 'বঁধু কোন্ আলো লাগল চোখে' খুবই সুপ্রযুক্ত। গানটি গেয়েছিলেন অরুন্ধতী হোমচৌধুরী। আর এ-ছবিতে বোকাবোকা ফুলদা যখন অন্তর দিয়ে গায় 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে' তখন সারা প্রেক্ষাগৃহে সূচিপতন স্তব্ধতা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এ-গানকে যেন আমরা নতুন রূপে পেলাম। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য : 'ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে' (বালিকা বধূ-১৯৬৭), 'যৌবনসরসীনীরে' (ঠগিনী-১৯৭৪, কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' (নিমন্ত্রণ—১৯৭১, কণ্ঠ : কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) 'তুমি রবে নীরবে' (কুহেলী—১৯৭১, কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর) 'তোমার কাছে এ বর মাগি' (ভালোবাসা ভালোবাসা—১৯৮৫ ; কণ্ঠ—হৈমন্তী শুক্লা) প্রভৃতি। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছেঁড়া তমসুক' (১৯৭৪) -এ কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'মধুর তোমার', অজয় করের 'মাল্যদান' (১৯৭১)-এ হেমন্তর কণ্ঠে 'এই তো ভাল লেগেছিল' বা যাত্রিক-এর 'যদি জানতেম' (১৯৭৪)-এ রুমা গুহঠাকুরতার কণ্ঠে 'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি' উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ।
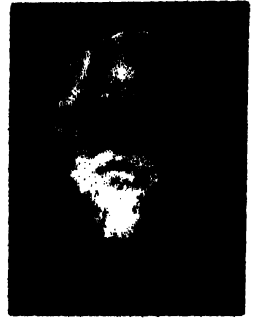
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তরুণ মজুমদার আর-এক চলচ্চিত্রকার যিনি বরাবর তাঁর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের গান রেখেছেন। আর এক্ষেত্রে তার মুখ্য সহায় ছিলেন প্রায় প্রতিটি ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

হাল আমলে অপর্ণা সেনের 'পারমিতার একদিন' ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের নান্দনিক প্রয়োগ দেখা গেল। শেষ দৃশ্যে প্রাক্তন শাশুড়ির শ্রাদ্ধস্থল থেকে যখন বেরিয়ে আসে ছবির নায়িকা (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) ব্যথিত চিত্তে, পেটে তার অনাগত সন্তান, নেপথ্যে এক পুরুষ কণ্ঠে (প্রবুদ্ধ রাহা) বাজতে থাকে একটু দ্রুত লয়েই, 'বিপুল তরঙ্গ রে সব গগন উদ্‌বেলিয়া—মগন করি অতীত অনাগত / আলোকে উজ্জ্বল জীবনে-চঞ্চল এ কি আনন্দ তরঙ্গ' : মৃত্যুর পাশাপাশি নিয়ত জেগে থাকে জীবন প্রবহমান কালসমুদ্রে : 'আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ'। এ-ছবির অন্য দুটি গানও (কণ্ঠ : জয়শ্রী দাশগুপ্ত) সুপ্রযুক্ত। কাছাকাছি সময়ের 'দেশ' (পরিচালনা : রাজা সেন) চলচ্চিত্রে পার্থ সেনগুপ্তর সংগীত পরিচালনায় 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' (কণ্ঠ : লোপামুদ্রা মিত্র), 'দেখা'-য় গৌতম ঘোষের পরিচালনা ও সংগীত পরিচালনায় 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ' (কণ্ঠ : স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত), দেবজ্যোতি মিশ্রের সংগীত পরিচালনায় 'উৎসব' (পরিচালনা : ঋতুপর্ণ ঘোষ) ছবিতে মুক্ত ছন্দে 'অমল ধবল পালে লেগেছে' (কণ্ঠ : শ্রাবণী সেন) উল্লেখযোগ্যতা পায় প্রয়োগ পারিপাট্যে। এখন যে-কোনও একটু সিরিয়াস ধরনের ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের গান যে এখনও কত প্রাসঙ্গিক তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ সব।

এখন যে-কোনও একটু সিরিয়াস ধরনের ছবিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের গান যে এখনও কত প্রাসঙ্গিক তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ সব।

বলতে দ্বিধা নেই বহু ছবিতে খুব একটা চিন্তাভাবনা না করেই মামুলিভাবে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার হয়েছে। সেগুলির বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এখানে অবকাশও তেমন নেই। শুধু দুটি দৃষ্টান্ত : 'রাজবধূ' (১৯৮২)-তে 'বড় আশা করে', 'শ্বেতপাথরের থালা' (১৯৯২)-য় 'ভালোবাসি ভালোবাসি'।

অনেক হিন্দি ছবিতেও রবীন্দ্রসংগীতের সুর নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তা আলাদাভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

৪

আজ পর্যন্ত কত ছায়াচিত্রে কত রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হয়েছে ? সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও মোটামুটি হিসেব এইরকম : প্রায় ২৫০ রবীন্দ্রসংগীত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ২০০টি বাংলা চলচ্চিত্রে। কোনও কোনও গান আবার একাধিক ছবিতে প্রযুক্ত হয়েছে। যেমন—'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' (ভালোবাসা ভালোবাসা, চক্রব্যূহ, চারুলতা-য় যন্ত্রে লিট মোটিফ) 'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে' (পরিচয়, নৌকাডুবি, পারাবত প্রিয়া) 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' (মেঘে ঢাকা তারা, ক্ষুধিত পাষাণ), 'একটুকু ছোঁয়া লাগে' (পরিচয়, একটুকু ছোঁয়া লাগে') ইত্যাদি।

ছায়াছবিতে প্রয়োগের মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীত আরও বেশি করে সাধারণ্যে ছড়িয়েছে সন্দেহ নেই, তবে এই প্রসারের সবটাই ইতিবাচক নয় বোধহয়। বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে দেখা যায় শ্রোতারা শিল্পীকে অনুরোধ করছেন অমুক ছবির গানটা করুন তমুক ছবির গানটা করুন—ইদানীং যেমন শ্রোতারা বলেন 'দাদার কীর্তি'-র গানটা হয়ে যাক কিংবা 'শ্বেতপাথরের থালা'-র গানটা ! রবীন্দ্রনাথের গান এখানে সিনেমার গানে পর্যবসিত, সিনেমাতে আছে বলেই তা শুনে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতারা খেয়ালও রাখেন না যে এসব গান কার রচনা ! রবীন্দ্রসংগীতের জগতে অনেক যোগ্য শিল্পী আছেন কিন্তু যে-শিল্পী সিনেমায় নেপথ্যে কণ্ঠদান করেন তিনিই বেশি মনোযোগ পান। এসব সুখাবহ নয়, তবে এতে চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না। আশা করা যায়, অনাগত দিনে ধীমান, রুচিশীল পরিচালক-সংগীত পরিচালকের মুন্সিয়ানায় চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের সার্থক প্রয়োগ আরও ঘটবে আর আমরা পেয়ে যাব এমনই আলোকোজ্জ্বল তীব্র মুহূর্ত যেখানে লাবণ্য 'এ পরবাসে রবে কে'—মাত্র চার লাইনের একটি গানের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠেন স্বাতন্ত্র্যে কিংবা পেয়ে যাব এমনই বিষাদঘন মুহূর্ত যেখানে 'দাদা, আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলাম'—দাদাকে জড়িয়ে ধরে নীতার এই আর্ত চিৎকারে ভরে যাবে প্রান্তর আর আমাদের মনে পড়ে যাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে বসে দাদার সঙ্গে নীতার সেই যুগল গান : 'সব যে হয়ে গেল কালো / নিবে গেল দীপের আলো.... যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'।

রচনাসূত্র :

আমার যুগ আমার গান, পঙ্কজ কুমার মল্লিক

সবারে আমি নমি, কানন দেবী

রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত, সিদ্ধার্থ ঘোষ

বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়, সুধীর চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র, অরুণকুমার রায়

গানের ভিতর দিয়ে, স্বপন সোম স.

সাতাত্তর বছরের বাংলা ছবি, তপন রায় স.

Bengali Film Directory, Nandan.

লেখক পরিচিতি : সংগীতশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও সংগীত সমালোচক

রবীন্দ্রভাবনা : নৃত্যের মুক্তি

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের সূত্রানুসারে দেখা যায়, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল থেকেই ভারতীয় সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সূচনা। দীর্ঘকালীন গৃহযুদ্ধ। বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ধর্মীয় শক্তির বিরোধ এবং সংগীত-নৃত্যকলা-শিল্পচর্চা প্রসঙ্গে স্বয়ং ঔরঙ্গজেবের বীতরাগ ও অনুশাসন এর অন্যতম কারণ। এই অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী কালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়ী পত্তনের পরবর্তী পর্বে পরিবর্তন সূচিত হল।

ঐতিহাসিকদের মতানুসারে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ এই প্রথম একশো বছরের মধ্যেই সমাজের চেহারা নতুন রূপ নিতে থাকে। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব সমগ্র ইউরোপিয় সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তার প্রভাব এ দেশে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়। ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও সমাজে নতুন শিক্ষিত শ্রেণির আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত যুক্তিবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না, এমনকি ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলাদেশের যে নবজাগৃতি কাল—সেই উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের আবির্ভাব যুগে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগতি সূচিত হল—তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত। স্বভাবতই এর ফলে মনোবিনোদনের প্রকরণরূপে এর চর্চা তৎকালীন বাবুসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তোমাই মাটির কন্যা : নৃত্য পরিকল্পনা— মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার

ঐতিহাসিকদের মতানুসারে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ এই প্রথম একশো বছরের মধ্যেই সমাজের চেহারা নতুন রূপ নিতে থাকে।

শুধু গ্রামবাংলার লোকজীবনের মধ্যেই সুস্থ নৃত্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নব্য শিক্ষিত বাবুসমাজে নৃত্যকলার কোনও শ্রদ্ধার আসন ছিল না। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও অন্যান্য সমাজচিত্রে সংগীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে এই অবক্ষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রেই বন্ধনমুক্তির আদর্শ প্রচার করলেন। তিনি শিক্ষাকে পুঁথির গণ্ডি থেকে, ধর্মকে শাস্ত্রের লক্ষ্মণরেখা থেকে, রাজনীতিকে সংকীর্ণতার মঞ্চ থেকে মুক্ত করলেন। সংগীতকে মুক্ত করলেন নিছক ওস্তাদি ও কালোয়াতির কৃত্রিমতা থেকে।

দিলীপকুমার রায়ের পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমি গান রচনা করতে করতে, সে গান নিজের কানে শুনতেই বুঝেছি যে, দরকার নেই প্রভূত কলাকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়—অতি সূক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।' নৃত্য-ভাবনাতেও রবীন্দ্রনাথের একই ভূমিকা। সংগীতের মতো নৃত্যকেও তিনি ধনাঢ্যদের বিলাসব্যসন, বাগানবাড়ির আঙিনায় খেমটা, বাঈনাচের গণ্ডি ভেঙে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন শিক্ষিত সমাজে ও জনজীবনে। রবীন্দ্রনাথ সংগীতের মতো নৃত্যকেও সঞ্চারিত করতে চাইলেন শান্তিনিকেতন ও ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, নাটকে, ঋতুরঙ্গে, দুঃখে, আনন্দে, শোকে, সান্ত্বনায়, উৎসবে ও নিভৃত প্রাণের গভীরতায়।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনা এমনই এক সৃষ্টি যা ব্যাকরণের কঠিন বন্ধন ও তাত্ত্বিক এবং জ্যামিতিক বৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে এক সহজ-সরল গতিশীল ছন্দবোধের মাধ্যমে বিধৃত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির উল্লাস যেমন বিচিত্রভাবে পরিবর্তনশীল; কবিতার ক্ষেত্রে যেমন প্রথম যুগের মেলবন্ধন পেরিয়ে বলাকার মুক্তছন্দে, আবার গদ্য কবিতায় (তাঁর উপমায়) গদ্য ও কবিতার মধ্যে তিনি ভাসুর-ভাদরবউয়ের সলজ্জ সংকোচের ঘোমটা সরিয়ে আধুনিকতার সন্ধি ঘটালেন। নৃত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তেমনই একই কথা প্রযোজ্য। তাই নৃত্য-পদ্ধতি বা শৈলী নয়—নৃত্য-ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনা এমনই এক সৃষ্টি যা ব্যাকরণের কঠিন বন্ধন ও তাত্ত্বিক এবং জ্যামিতিক বৃত্তের পরিধি ছাড়িয়ে এক সহজ-সরল গতিশীল ছন্দবোধের মাধ্যমে বিধৃত।

নিয়মমাফিক শেখায় ছেলেবেলা থেকেই কবির অনীহা ছিল। যেটা সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

'লেখাপড়া শিক্ষার কারখানা ঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন পিটন ঘটে, তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়। আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানা ঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলাম। ....জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশাই বুঝে গিয়েছিলেন, লেখাপড়া শেখার বাঁধারাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না।' (*ছেলেবেলা*)

সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা :—

'আমার দোষ হচ্ছে, শেখার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারেনি। ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি, ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকতো, তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারতো না। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই—তাদের পথ অনিয়মের শেখায়।' (*ছেলেবেলা*)

এ হল ছেলেবেলার মতিগতি—এবার পরিণত বয়সে চিত্রকলা চর্চার পটভূমিকাতেও একই ছবি দেখা যায়।

'ছবি আঁকা শেখাও অনিবার্যভাবেই অনিয়মের শেখা। কবি একেই বলেছেন অশিক্ষিত পটুত্ব......মুখে দরকার নেই বললেও নন্দলাল কিন্তু বিপুল শ্রমস্বীকার করে একখানি স্কেচবই তৈরি করে দেন রবীন্দ্রনাথকে। তাতে মানুষের হাত এবং পায়ের অসংখ্য ড্রইং ছিল পাতা জুড়ে। শুধু অঙ্গসংস্থানের নকলনবিশীমূলক ড্রইং নয়, খাতার ওই হাত পায়ের ছবিগুলি বিশ্বের নানা যুগের নানা শিল্পসৃষ্টি থেকে সযত্নে আহৃত। প্রচুর পরিশ্রম ও অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল সেই আহরণ প্রয়াসে। ভারতের অজন্তা, রাজপুত, মোগল শিল্প, ইজিপ্সিয়ান আর্ট, চীনা ও জাপানি শিল্প, ইউরোপের মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো ভিঞ্চি, ডুর্যা প্রমুখের ছবি থেকে নন্দলাল মানবদেহের অঙ্গসংস্থানের বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রতিলিপি তৈরি করে দেন রবীন্দ্রনাথকে এই আশায় যে, তিনি তা থেকে ড্রইং-এর অনুশীলনে নিযুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, খাতাখানি রবীন্দ্রনাথ অতীব মনোযোগ ও আগ্রহ নিয়ে দেখে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নন্দলালকেই প্রত্যর্পণ করেন মাত্র কয়েক মিনিট পরেই। 'বাঃ, বেশ, তুমি রেখে দাও',—এই সপ্রশংস ও অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই স্কেচবুক কাহিনীর অভাবনীয় সমাপ্তি।' (*রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা—সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*)

নৃত্যের ক্ষেত্রেও কবিগুরুর সেই একই ঘটনা। তিনি বিশেষ কোনও টেকনিক বা পদ্ধতি প্রবর্তনও করতে চাননি। তিনি করতে চেয়েছেন নতুন সৃষ্টি। নির্মিতি নয়—কারণ কবির ভাষায় নির্মিতি হয় প্রয়োজনের তাগিদে আর সৃষ্টি হয় প্রাণের আনন্দে।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার আগেই রবীন্দ্রনাথকে নৃত্য পরিকল্পকরূপে দেখা গেল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'মানময়ী' গীতিনাট্যে। 'আয় আয় সহচরী' গানটির তিনি নৃত্য পরিকল্পনা করেন। ১৮৯১ সালে যখন 'পুনর্বসন্ত' নামে এটি অভিনীত হয়, তখন তিনি নতুনভাবে আবার এই গানটির নৃত্য পরিকল্পনা
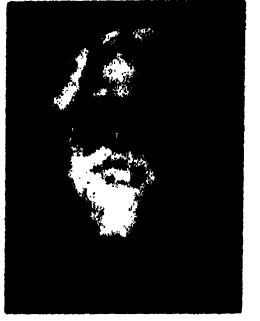
করেন। এই নৃত্য-শিক্ষকের কি অভিজ্ঞতা ছিল? ঠাকুর পরিবারে সংগীত-চর্চার প্রচলন থাকলেও নৃত্য-চর্চার স্থান ছিল না। ১৮৭৮ সালে বিলেতে প্রবাস জীবনে বিদেশি নাচের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে। অনুমান করা যেতে পারে, ওই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 'আয় আয় সহচরী'-র কোরিওগ্রাফি নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষার অঙ্গরূপে নৃত্যকলার স্বীকৃতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বক্তব্য : 'ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রামীণ পদার্থ আছে যার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই অনেক কাল ধরে চিন্তা করেছি।'

শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষা প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ : 'এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকমত বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাব শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা কেবলমাত্র নাচিয়ে তৈরি করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজজীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।'

নৃত্যশিক্ষা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে এই শিক্ষাদানের নামকরণ করতে হয়—'মৃদঙ্গ সহযোগে সাঙ্গীতিক ব্যায়াম'।

এবার নৃত্যকলার উজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের এই অনন্য প্রয়াসে তৎকালীন সমাজে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার ছবিটি দেখা যাক। কাব্য-সাধনা ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

(১) 'যাঁহারা তোমার মাতৃস্থানীয়া, যাঁহারা তোমার ভগ্নীস্বরূপা, তাঁহারা নৃত্যাভিনয় করিতে আসিয়াছেন, তোমরা লজ্জায় মস্তক অবনত কর, ঘৃণায় চক্ষু মুদ্রিত কর, ক্ষোভে দুঃখে বক্ষে করাঘাত কর। আর পাপের প্রশ্রয় দিও না।'

(*সঞ্জীবনী, ১২ মাঘ, ১৩৩৪*)

(২) 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার বিলাসবাসনা এখনো সবুজ রহিয়াছে। শুনা যায় তিনি বিশ্বভারতীতে নারীর নৃত্যের ক্লাশ খুলিয়াছেন। তিনি তাহার এক চলচ্চিত্র (সিনেমা ফিল্ম) উঠাইয়াছেন, সেই চিত্রে দেখা যায় তিনি মধ্যে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া যুবতীগণ নৃত্য করিতেছে ও তিনি তাল দিতেছেন......দূরে তবলচি তবলা বাজাইতেছে। তিনি সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ বালিকাগণকে এ কি শিক্ষা দিতেছেন।'

(*সঞ্জীবনী, ১৭ ফাল্গুন, ১৩৩৪*)

(৩) 'কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার গৃহে নাট্যাভিনয়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর কন্যাকে নাচাইয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন।.....নারীর নৃত্যদ্বারা অর্থসংগ্রহের পথ তিনিই প্রথম দেখাইয়া দিলেন এবং বিলাসী সমাজ বুঝিল যে নারীকে নাচাইলে ও তাহার দ্বারা নাটক অভিনয় করাইলে অধিক অর্থ উপার্জন হয়।.... এইরূপ অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা বিশ্বভারতী ও সংগীত বিদ্যালয় রসাতলে যাউক।' (*সঞ্জীবনী, ১২ মাঘ, ১৩৩৪*)

খ্যামটা, খেসেড়া-খেসেড়ানির নাচ, বাঈজি নাচের বিকৃত রসায়নে যে সব সমাজ অভিভাবকদের বিন্দুমাত্র অনীহা ছিল না, সংস্কৃতি চর্চার সুস্থ ধারার প্রতি তাদের এই সমালোচনা কবিকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এ জন্য হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি তাঁকে অবিরত আঘাত করেছে। আবার তাঁর নিজের সমাজের রক্ষণশীলতাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। ব্রাহ্ম মহিলারা তাঁকে 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার বুকের আঁচলখানি'—এই গানে শালীনতা রক্ষার জন্য 'বুকের' পরিবর্তে 'সুখের' শব্দটি প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিদগ্ধ সমাজে এই নতুন সৃষ্টির স্বীকৃতি ও সমাদর বাড়তে থাকে তার কিছু নমুনাও উল্লেখযোগ্য। যে 'নটীর পূজা' নিয়ে এত বিতর্ক—সেই প্রসঙ্গে :

'শ্রীমতী গৌরী বসু শ্রীমতীর ভূমিকায় তাঁহার সংগীত ও নৃত্যকুশলতায় দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।' (*আনন্দবাজার, ২৯ জানুয়ারি, ১৯২৭*)

'নাট্যকলার চরম ব্যাপার এই শহরে ঘটে গেল 'নটীর পূজা' অভিনয়ে।.....আমরা এমন আর জীবনে দেখিনি.....সেই লাবণ্যনিদান নৃত্য কল্পনার তালে তালে আমাদেরও ডাইনে বামে, আমাদেরও নবজীবনের মাঝে তার ছন্দ নামালো, নৃত্যরতার সমস্ত অবয়ব থেকে যেন লালিত্যের নির্ঝর ঝরে পড়লো.....তার ধারায় জীবন স্নিগ্ধ হয়ে গেল।'

(*নাচঘর, তৃতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৩*)

নৃত্যশিক্ষা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে এই শিক্ষাদানের নামকরণ করতে হয়—'মৃদঙ্গ সহযোগে সাঙ্গীতিক ব্যায়াম'।

এবার দেখা যাক শান্তিনিকেতনে কীভাবে রবীন্দ্রনাথ নৃত্য-চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করলেন। প্রাথমিক পর্যায় প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ : ''বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুরুদেব, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ছাত্রদের গানের এবং নাটক অভিনয়ের চর্চার যখন প্রথম প্রচলন করলেন, তখন গানের সঙ্গে অভিনয়কালে কখনও কখনও তিনি নাচের জন্যও সকলকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু সে নাচ কোনপ্রকার নৃত্যশৈলীর দ্বারা বিধিবদ্ধ নাচ নয়। গানের ছন্দে মিলিয়ে হাত-পা নেড়ে যে যার মতো নেচে যেতেন। সারিবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে একই নিয়মে কেউই নাচতেন না। গুরুদেব এ যুগে যখন নিজে 'ফাল্গুনী' নাটকে বাউলের ভূমিকায় নেচেছিলেন, তখন তা ছিল গানের ছন্দে আপন আনন্দের নাচ। বাংলার বাউলদের একক নাচও ছিল এই প্রকার। বিংশ শতকের কুড়ির দশকের প্রারম্ভে যখন বিধিবদ্ধ নাচ শেখানোর ব্যবস্থা হল শান্তিনিকেতনে, তখন থেকে ছাত্রছাত্রীদের ধ্রুপদী রীতির অভিনয়-নৃত্য ও দলবদ্ধ লোকনৃত্য ধারার— মিশ্রণে অভিনয়ের প্রবর্তন করা হয়।''

এবার শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ছবিটি দেখা যাক

১। ১৯১৯ সালে আগরতলা থেকে বুদ্ধিমন্ত সিং এলেন। শুরু হল পাদবিন্যাস ভঙ্গি ও নৃত্যানুশীলন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কবিগুরু নিজেও অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতেন।

২। ১৯২৩ সালে 'বসন্ত' গীতিনাট্যে কবি প্রথমে একক নৃত্য করেছিলেন। পরে তাঁর নির্দেশে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ ও উল্লাসের দৃশ্যে উদ্দীপক নাচ করত।

৩। ১৯২৫ সালে এলেন নবকুমার সিং। মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগ অন্তরঙ্গ হল।

৪। ১৯২৫-এ 'শেষবর্ষণ'-এর পর থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নটীর পূজা, নটরাজ, ঋতুরঙ্গ, সুন্দর, শ্রাবণগাথা, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, নবীন, শিশুতীর্থ প্রভৃতির অভিনয়। এর মাঝে শান্তিদেব ঘোষ ভাল্লাখোলের কলামণ্ডল থেকে কথাকলি নৃত্যশিক্ষা করে আসেন। পরবর্তী কালে আসেন ভেলায়ুধ মেনন, কেলু নায়ার। ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন মৃণালিনী সরাভাই, আশা ওঝা, পাশ্চাত্য নৃত্যে পারদর্শী শ্রীমতী ঠাকুর। কলাভবনের ছাত্র বাসুদেবন 'ঋতুরঙ্গ' অনুষ্ঠানে এক অভিনয় কোরিওগ্রাফি সৃষ্টি করেন। আঙ্গিকের জটিল পদবিন্যাস ও মুদ্রার আধিক্য বাদ দিয়ে এক নতুন সৃষ্টি ভরতনাট্যমের ছায়ায় এক নতুন ইমপ্রেশনিস্ট নৃত্য।

৫। ১৯৩১ সালে গুরুসদয় দত্ত কবির অনুরোধে একজন লোকনৃত্য-শিক্ষক ও বাদ্যযন্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে পাঠালেন। ছাত্রছাত্রীরা শিখলো বাউল, রায়বেঁশে, জারি প্রভৃতি লোকনৃত্য।

৬। কবির গানের সঙ্গে হাঙ্গেরীয় নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী ক্রুপার তার নিজস্ব আঙ্গিকে নৃত্য পরিকল্পনা করলেন। ১৯৩৯ সালে জাপানি নর্তক শ্রীযুক্ত মেকী চিত্রাঙ্গদায় 'মদন' ও চণ্ডালিকার 'চুড়িওয়ালা' চরিত্রে জাপানি নাচের আদর্শ রূপ দিলেন।

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে নৃত্যকল্পনার সৌন্দর্য প্রকাশে কবিকল্পনা কোনও বিশেষ শৈলী বা গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সাহিত্য, চিত্রকলা বা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর কল্পনা যেমন বিশ্বজনীন, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কবি তাঁর চলমান অভিযাত্রার পুরাতনী রক্ষণশীলতা ত্যাগ করে নতুন ভাষাশৈলীর জন্ম দিয়েছেন। চরণে মিল ত্যাগ করে, যতি ইচ্ছানুসারে স্থাপনা করে, শব্দের ব্যাকরণগত বন্ধন ভেঙে, নতুন বিগ্রহ সৃষ্টি করেছেন, নাটকের ক্ষেত্রে ছন্দ, নৃত্য ও সংগীতের প্রাণবন্ত ভূমিকা ও সুষম সমন্বয়ে টোটাল থিয়েটারের স্বপ্ন দেখেছেন, নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রেও কবিকল্পনা সেই পথেই চলেছে।

আসলে রবীন্দ্রদর্শন বুঝতে গেলে তাঁর বক্তব্য ও লেখাকে শিল্প সংস্কৃতির সবক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সৃজনশীলতাকে অনুসরণ করতে হবে—না হলে পুচ্ছগ্রাহী টিকাকার, গবেষকদের অপব্যখ্যায় তত্ত্বের অরণ্যে দিগভ্রান্তি ঘটবে।

নৃত্যছন্দ প্রসঙ্গে জাভাযাত্রীর পত্রে কবির বক্তব্য : 'মানুষের জীবন বিপদ সম্পদ সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলেছে ; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সঙ্গীত হয়ে ওঠে ; তেমনই আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনও ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়'। এই বক্তব্যই কবির মূল সৃজনভাবনা।

এবার নৃত্যভাবনা প্রসঙ্গে পাঁচটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক। (১) 'মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্য ভাষায়। কোনও

ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে নৃত্যকল্পনার সৌন্দর্য প্রকাশে কবিকল্পনা কোনও বিশেষ শৈলী বা গোঁড়ামির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সাহিত্য, চিত্রকলা বা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর কল্পনা যেমন বিশ্বজনীন, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি।
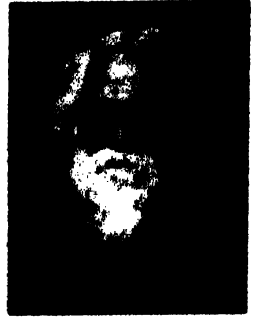
মানুষের চলাকে বলি সুন্দর কোনওটাকে বলি তার উলটো, তফাৎটা কিসে। কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তাহলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলার সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।' (২) 'মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপনদেহে। কেননা তার দেহ ছন্দ রচনার উপযোগী। আবার নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহসঞ্চালনের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ।' (৩) 'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানাভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।' (৪) 'এক রকমের গায়েপড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতি লালিত্য গুণে সহজেই আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেই জন্যে যে আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সেই আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না।' (৫) 'ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে। পাথরের টুকরো দিয়া রুটির কাজ চালানো যায় না, বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা যায় না।'

এই পাঁচটি বক্তব্যের মধ্যে আমরা সমগ্র বিশ্বের সৃজনশীল মনীষীদের চিন্তা খুঁজে পাই এক মননশীল ভাবাদর্শে। বিদেশের স্তানিস্লাভস্কি, ইসাডোরা ডানকান, মার্থা গ্রাহাম, গর্ডনক্রেগ, জোন লিটলউড থেকে আমাদের উদয়শঙ্কর, সাধনা বসু, গণনাট্য আন্দোলনের পরিচালকবৃন্দ, নবনৃত্য আন্দোলনের মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার প্রমুখ কেউই এই শিল্পাদর্শের বিরোধী নন বরং সমধর্মী।

স্তানিস্লাভস্কির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ইসাডোরা মগ্নচৈতন্যকে জাগ্রত করার জন্য যে চালিকাশক্তির কথা বলেছেন, রবীন্দ্র-ভাবনাতে সেই একই বক্তব্য। এছাড়া আত্মিক উন্নতিতে শিল্পের ভূমিকা প্রসঙ্গে ইসাডোরা ডানকানের স্পিরিচুয়াল ও মিস্টিক দর্শনও রবীন্দ্র-ভাবনার সমধর্মী। এ প্রসঙ্গে ইসাডোরার আত্মকথনে : 'My art is just an effort to express the truth of my being in gesture and movement.' অর্থাৎ আমার শিল্পের সত্য ও সুন্দরকে দেহভঙ্গির বিচিত্র সৌকর্যে প্রকাশ করতে চেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' (কবিতার নৃত্যরূপ)—গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ।

আবার এই ভাবনার পরবর্তী পর্যায়ে : 'I spent long days and night in the studios seeking that dance which might be the divine expression of the human spirit through the medium of the bodies movement.' অর্থাৎ আমি দীর্ঘ দিন-রাত্রি স্টুডিওতে সেই নৃত্যছন্দকে অন্বেষণ করেছি একাগ্রচিত্তে, যা মানবাত্মার দৈবি অনুভূতিকে দেহভঙ্গির বিচিত্র সংগীতে নিবেদন করবে। ইসাডোরার

এই লেখা পড়তে গিয়ে মনে আসে কবিগুরুর :

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পূর্ণ করো দহন-দানে।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ে প্রদীপ করো
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক প্রাণে।'

আবার চালিকাশক্তি ও বিশ্বনৃত্য প্রসঙ্গে ইসাডোরার আত্মকথার বক্তব্য পড়লেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের :

'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব নাচের দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও অমল-কমল গন্ধ হে।।'

আত্মপ্রকাশের উৎসে রবীন্দ্রনাথ যে, 'হৃদয় মনীষা মনসা' উপলব্ধির কথা বলেছেন ইসাডোরা সৃজন-ভাবনায় তিনি কবিগুরুর সেই অমৃত সাধনার তপশ্চর্যার ব্রতচারিণী শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চিন্তা নিছক ভাববাদী, মিস্টিক বা অলৌকিক নয়। কবিতার মতো নৃত্যের কল্পচিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও জীবনের অতল রহস্যময়তার উদঘাটন। একদিকে কবির আবেগবৃত্তের পরিধিতে ছড়িয়ে আছে অতীতের নুড়ি, যা বেজে ওঠে বর্তমানের নতুন ছন্দে। পেছনে ফেলে যাওয়া পথের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাধনার আর এক নাম

রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চিন্তা নিছক ভাববাদী. মিস্টিক বা অলৌকিক নয়। কবিতার মতো নৃত্যের কল্পচিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রেও জীবনের অতল রহস্যময়তার উদঘাটন। একদিকে কবির আবেগবৃত্তের পরিধিতে ছড়িয়ে আছে অতীতের নুড়ি. যা বেজে ওঠে বর্তমানের নতুন ছন্দে।

আধুনিকতা। এই শিল্পাদর্শ নিঃসন্দেহে সর্বকালের শিল্প সমৃদ্ধির সোপান।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরবর্তীকালে কিছু স্বনির্বাচিত অভিভাবক রাবীন্দ্রিক শৈলীর কষ্টিপাথরে সমালোচনার আসরে অবতীর্ণ হলেন। স্বয়ং উদয়শঙ্করও 'সামান্য ক্ষতি' ও 'প্রকৃতি ও আনন্দ' প্রযোজনায় এই সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের 'তোমারই মাটির কন্যা', 'কোন নূতনেরই ডাক' সম্পর্কেও তথাকথিত রবীন্দ্র অনুরাগীদের বিরূপ মন্তব্য শুনেছি। শ্রীমতী মৃণালিনী সরাভাই যখন নবপরিকল্পনায় 'চণ্ডালিকা' মঞ্চস্থ করলেন, যা বিহারে হরিজন নিগ্রহের বেতার সংবাদ দিয়ে শুরু হয়েছিল, তখন বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। উত্তরে শ্রীমতী সরাভাই বলেন : ''আমি আবাল্য শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব স্বয়ং আমাকে চণ্ডালিকা পড়িয়েছিলেন, অস্পৃশ্যতার পটভূমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'মৃণালিনী তুমি তোমার নিজের মতো নৃত্যভঙ্গি রচনা কর, তোমার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা কর।' আমি তাঁরই আদর্শে দেশের বর্তমান অবস্থায় এই প্রযোজনা যাতে প্রাসঙ্গিক হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পনা করেছি। ঐতিহ্য শব্দটিকে কেন্দ্র করে শিল্প-ভাবনার সংকীর্ণতা সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতেন না। আমি রবীন্দ্র-ভাবনাকেই অনুসরণ করেছি।''

'তাসের দেশ'-এর প্রযোজনা প্রসঙ্গে বিতর্কের উত্তরে মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার বলেন : ''আজকের শিল্পীরূপে আমরা কবির সাহিত্যের ভাষাকে নিজস্ব চিন্তা দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছি। এ ক্ষেত্রে, নৃত্যনির্মিতি বা নৃত্যভাষার ছয় দশক আগে কবির যুগে ফিরে যাবার প্রশ্নই আসে না। তথাকথিত রাবীন্দ্রিক প্রযোজনায় 'তাসের দেশে'র হাসি শ্লেষ ও কৌতুকের মধ্যেই দর্শকরা মেতে থাকেন। অথচ এ সবের অন্তরালে নাটকটির জনজাগরণের তোলপাড় করা বৈপ্লবিক দিকটি যেন চাপা পড়ে যায়। কঠোর পুলিশিতন্ত্রে যুগ যুগ ধরে পিষ্ট সমাজের দুর্বলতম স্তরের মানুষরাই তো এখানে তীব্র বিদ্রোহের ভাষা প্রকাশ করতে পেরেছিল। হরতনীকে দেখে মনে পড়ে যায় রক্তকরবীর নন্দিনীকে।''

অসিত চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্যকল্পনায় গণনাট্য প্রযোজনা 'আফ্রিকা' বিতর্কের সৃষ্টি করে। কারণ এখানেও তথাকথিত রাবীন্দ্রিক ঢংয়ের পরিবর্তে টোটাল থিয়েটারের আঙ্গিকের মিশ্রণে ঔপনিবেশিক শাসনে শৃঙ্খলিত মানবাত্মার আর্তি প্রকাশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতারও বক্তব্যও তাই। তাহলে রাবীন্দ্রিক হয়নি এ প্রশ্ন কেন ?

সুখের কথা রবীন্দ্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর অচলায়তনের দেওয়াল ভেঙে যাওয়ার পর রবীন্দ্র অনুশীলনে মুক্তভাবনা অবারিত হল। মুক্ত নৃত্যের ভাবনা নিয়ে অনেকে এগিয়ে এলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রযোজনার ছবি পর্যালোচনা করা যাক। 'বাজাও রে মোহন বাঁশি' প্রযোজনা প্রসঙ্গে নৃত্যপরিকল্পকের বক্তব্য : ''ভারতীয় শিল্পের অনন্য সাধারণ বাদ্যযন্ত্র বাঁশি ও বাঁশির ধ্বনি রবীন্দ্রনাথের শিল্পী জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে,—আবার শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বাঁশি নানা রূপে, নানা বর্ণে তাঁর সৃষ্টির সমস্ত বৈভবে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে ছবি ফুটিয়ে তুলেছে বারে বারে। সেই ছবি কখনও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' 'গহন-কুসুম কুঞ্জ' আবার 'আমার বাঁশি তোমার হাতে' এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রদর্শনের আর এক ছবি। কখনও 'ফিরে এসে দেখি ধূলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে, দূর দেশি সেই রাখাল ছেলে' আর এক ছবি হাজির করেছে। এইভাবে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান কবিতায় জড়িয়ে আছে বাঁশি, কবির সেই বাঁশির গান, কবিতাকে আমরা আমাদের অনুভবে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যাপক পবিত্র সরকার এই দৃশ্যগুলির নামকরণ করেছেন জাগরণ, আশ্বাসন, উদ্দীপন এবং নিবেদন। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা, মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা এবং জীবনের ওইসব আবেগ ও অনুভবের মধ্য দিয়ে উত্তরণ ও মিলন নৃত্যের ভাষায় উপস্থিত করার চেষ্টাই 'বাজাও রে মোহন বাঁশি'।''

এই বক্তব্য থেকেই চেনা যায় একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, যা গতানুগতিক রবীন্দ্রগীতানুসারী নৃত্যগীতি-আলেখ্যে অনুপস্থিত। পার্থক্যটা কোথায় ? এই নৃত্য নির্মিতি 'শুধুমাত্র সঙ্গীত ও নৃত্যের সমন্বয়ে একটি অবয়ব নির্মাণের প্রয়াস নয়। রবীন্দ্রদর্শনকে উপস্থাপিত করার সচেতন মনন। একটা উদাহরণ দিলে প্রভেদটা বোঝা যাবে। অনেক সময় দেখি 'শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়' বা 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো' নৃত্য কল্পনায় শিল্পী মুদ্রাসহযোগে বিদ্যুৎ-আগুন বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তখন বলতে ইচ্ছা করে শ্রাবণের মেঘচেরা বিদ্যুৎ চমক বা ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পোড়ানোর আগুন কি কেবলই প্রাকৃতিক শ্রাবণ, বিদ্যুৎ ও আগুন ? নিশ্চয়ই নয়—এ এমন এক অভিব্যক্তি যাতে মানবিক রূপান্তর ঘটে যায়। গভীর আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে উপলব্ধি করেছি শ্রুতির প্রযোজনায় সৃজন ভাবনা যেন নতুন সময়ের পটে এক অভিনব চেতনমননের প্রতিচ্ছবি।
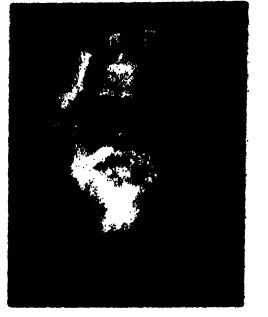
রবীন্দ্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর অচলায়তনের দেওয়াল ভেঙে যাওয়ার পর রবীন্দ্র অনুশীলনে মুক্তভাবনা অবারিত হল। মুক্ত নৃত্যের ভাবনা নিয়ে অনেকে এগিয়ে এলেন।

আর এক সম্ভাবনাময়ী সৃজনকন্যার নাম মধুবনী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'অন্য আমি' এক নতুন নৃত্যভাষা। উৎস রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' হলেও মহাভারতের ধ্রুপদী ক্যানভাসে তার প্রয়োগ পরিকল্পনা বিস্তারিত। প্রতীকী মঞ্চ পরিকল্পনা, অনুভবী সংগীত রচনা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। প্রকৃত অর্থে এই 'অন্য আমি' একুশ শতকের সমকালীন ভাবনা।

এইসব প্রযোজনা থেকে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যভাবনায় যে বস্তুবাহুল্য বিরল কাব্যগত প্রেরণা তা সমকালীন শিল্পীরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁদের আর একটি কথা মনে করিয়ে দিই। ছন্দলীলা প্রসঙ্গে কবিগুরুর বক্তব্য : "নাচতে দেখেছি সারসকে। সেই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না, অর্থাৎ টেকনিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরও কিছু বেশি। সারস যখনই মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে, তখনই তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্যভঙ্গির সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে, তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

কুকুরের মনে আবেগের প্রবণতা যথেষ্ট, কিন্তু তার দেহটা বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার লেজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্যে কুক্কুরীয় ছন্দে ওই লেজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাঁকু করে বন্দীর মতো।

মানুষের সমগ্র মুক্ত দেহ নাচে, নাচে মানুষের মুক্ত কণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টি রহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ করে বসেছে। সে কখনও নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত করে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে; এ তার আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানেই ইচ্ছা। মানুষের ভাবনা রূপগ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দোলীলার নটরাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।"

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় মুক্তছন্দের প্রেরণাই সংগীতে ও নৃত্য পরিকল্পনায় কাব্যের সুষম উপলব্ধিতে সুর-ছন্দে যুক্ত দ্বৈত প্রণামে অন্তরঙ্গ হয়েছে। সূর্যাস্তের রঙ লাগা পশ্চিম দিগন্তে হংসবলাকা যে আকুলতায় কবি হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে, সেই স্পন্দনই তাঁর নৃত্যভাবনায় এনেছে সৃজনছন্দ ও সৌন্দর্য। এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্যে শিল্পের যে মুক্তি, বাঁধ ভাঙার ছন্দে সেই মুক্তি কবিগুরু সঞ্চারিত করেছেন তাঁর নৃত্যধারায়। তাই সৃজনশীল নৃত্য আন্দোলনের পুরোযায়ী পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যবিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

ঋতুনাট্যে ঋতুর উপস্থিতিতে নাটকীয় রসের উজ্জীবন

ইন্দ্রাণী ঘোষ
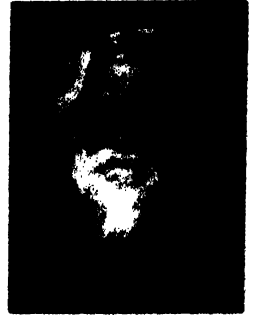
নাটক বলতে সাহিত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকে বোঝায় যা উপন্যাস বা কাব্য থেকে পৃথক। কাব্য এবং উপন্যাস স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের রস উপলব্ধি করার জন্য কবিকে বা পাঠককে আর কারোর উপস্থিতি কল্পনা করে নিতে হয় না। কিন্তু নাটকে এ সুযোগ নেই, কারণ নাটক শুধুই বর্ণনীয় নয়। অভিনয়ের সাহায্য ছাড়া নাটকে বর্ণিত কথা ও সৃষ্ট চরিত্রকে পূর্ণতররূপে দর্শকের অনুভবের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাই সাহিত্যের এই বিশেষ রূপ একান্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে অভিনেতা, অভিনয়মঞ্চ এবং দর্শকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভগ্নহৃদয়ে' এর ভূমিকায় লিখেছেন 'নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল কাণ্ড শাখা পত্র এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।'

অভিনেতা তথা চরিত্রের প্রকৃতি অনুসারে রবীন্দ্রনাট্যের প্রধানত তিনটি রূপ আমরা দেখতে পাই—এক শ্রেণির নাটকে মানব চরিত্রই প্রধান। এগুলিতে প্রকৃতির কোনও উল্লেখ নেই বললেই চলে।

দ্বিতীয় শ্রেণির নাটকে মানুষ প্রধান অভিনেতা হলেও সজীব ও সংকেতময় পটভূমিকায় রয়েছে প্রকৃতি। এগুলিকে রূপক নাট্য বলা যেতে পারে। এই ধরনের নাটক অভিনীত না হলেও অর্থাৎ অভিনেতা ও মঞ্চ ছাড়াই এর মর্মকথা, নাট্যরস ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করার সুযোগের অভাব ঘটে না। রক্তকরবী, অচলায়তন, শারদোৎসব, রাজা প্রভৃতি এই শ্রেণির নাটক।

তৃতীয় শ্রেণির নাটকে প্রকৃতিই প্রধান অভিনেতা, মানুষ শুধুমাত্র পটভূমিকায় আছে। এখানে বিশেষ কোনও তত্ত্বকথা কবি বলেননি। এখানে ষড়ঋতু স্বয়ং অথবা তাদের অনুষঙ্গ নাটকের কুশীলব হিসাবে কাজ করেছে।

এই শ্রেণির নাটককেই ঋতুনাট্য বলে অভিহিত করা হয়। যেমন—**ফাল্গুনী, বসন্ত, শেষবর্ষণ, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, নবীন ও শ্রাবণগাথা।**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতুনাট্যে ঋতুই প্রধান নট। মানবচরিত্র নাটকের পটভূমিকায় বর্তমান থাকলেও তার ভূমিকা কখনও নাটকের ব্যাখ্যাতারূপে, আবার কখনও বা দর্শকরূপে, শ্রোতারূপে—কোনও এক রাজসভায় হয়তো ঋতু উৎসব হচ্ছে। একদিকে বসে আছেন রাজা, পারিষদগণ, নাট্যাচার্য—এরা হলেন নাটকের মানবচরিত্র। অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে আছে বিভিন্ন ঋতু, বনভূমি, নদী, দখিন বাতাস, আম্রকুঞ্জ, বকুল, মাধবী, করবী, মালতী প্রভৃতি।

অভিনেতা প্রকৃতির সংলাপ গানে রচিত। তার অর্থ এই নয় যে এটি পুরোপুরি গানের পালা। এর মধ্যেই রয়েছে সূক্ষ্মনাটকের আবহাওয়া।

প্রায় সবকটি ঋতুনাট্যের ব্যাখ্যা রয়েছে গদ্যে। কেবল নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় গদ্য ব্যাখ্যার পরিবর্তে ব্যাখ্যা রয়েছে কবিতায়। মানব চরিত্রগুলির সংলাপ গদ্যে। কারণ মানব চরিত্রগুলিই ব্যাখ্যাকার। এই সব গদ্যাংশে গানের সঙ্গে গানকে, ঘটনার সঙ্গে ঘটনাকে জোড়া দিতে সাহায্য করেছে।

নৃত্যগীত ঋতুনাট্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই পর্বের ঋতুসংগীতগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান। ভাবের ব্যঞ্জনায়, ভাবের গভীরতায়, বর্ণা-রূপের ঔজ্জ্বল্যে এগুলি অনবদ্য, প্রকৃতি যেন নিজের মনের দ্বারা নিজেই উদঘাটন করেছে। ঋতুনাট্যে গানের সঙ্গে নাচও ছিল। গানের ভাবটি দেহভঙ্গির দ্বারা সুন্দরভাবে ফুটে উঠত। তবে ঋতুনাট্যের নৃত্যের সঙ্গে নৃত্যনাট্যের নৃত্যের একটা প্রভেদ আছে। ঋতুনাট্যে প্রধান ভূমিকা সংগীতের, নৃত্যকে বাদ দিলে রসের হানি হয় না। কিন্তু নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে নৃত্যই প্রধান, নৃত্য ব্যতীত রসসৃষ্টি অসম্ভব। ঋতুনাট্যে নৃত্য মূলত নটরাজের লীলাকে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতুনাট্যে ঋতুই প্রধান নট। মানবচরিত্র নাটকের পটভূমিকায় বর্তমান থাকলেও তার ভূমিকা কখনও নাটকের ব্যাখ্যাতারূপে, আবার কখনও বা দর্শকরূপে, শ্রোতারূপে

শ্রেণিবিচারের দিক থেকে পাঁচটি নাটককে যথার্থ ঋতুনাট্য বলা যায়—**বসন্ত**, **শেষবর্ষণ**, **নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা**, **নবীন** ও **শ্রাবণগাথা** গীতোৎসব, সুন্দর ও বর্ষামঙ্গল প্রায় একই শ্রেণির রচনা, কিন্তু কোনওভাবেই এগুলিকে নাটক বলা চলে না। কারণ এগুলি বিশেষ ঋতু উৎসব উপলক্ষে রচিত গানের মালা। নাটকীয়তার কোনও লক্ষণ এতে নেই। উল্লিখিত পাঁচটি ঋতুনাট্য ঋতু অভিনন্দন উপলক্ষে রচিত হলেও পাত্রপাত্রীর সমাবেশ, প্রবেশ, প্রস্থান প্রভৃতি ইঙ্গিতের দ্বারা এগুলিকে নাটকীয় করে তোলার একটা চেষ্টা আছে।

ফাল্গুনী থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতুনাট্য পর্ব চিহ্নিত হলেও এর আগে গীতাঞ্জলি ও শান্তিনিকেতন পর্বে ঋতুর পটভূমিকায় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে 'শারদোৎসব' নাটকটি কবির প্রথম রচনা। কিন্তু এই নাটক মানুষেরই নাটক। ঋতু এখানে পটভূমিকামাত্র, চরিত্র নয়। ফাল্গুনী, থেকে পরবর্তীকালে রচিত অন্যান্য ঋতুনাট্যতে ঋতু একটি তত্ত্ব ও চরিত্র। বস্তুত শারদোৎসব থেকেই কবির নাট্যরসের ধারা পরিবর্তিত হয়েছে। এই নাটকে ঋতুর গান প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময় থেকে প্রথমত তাঁর নাটকে প্রকৃতির ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করেছে; দ্বিতীয়ত বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় কাহিনি অপেক্ষা সাঙ্কেতিক ব্যঞ্জনা এবং কাব্যিক আবেদন আরও বেশি করে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ তত্ত্বনাট্যের পর্ব শুরু হয়েছে যা পরবর্তীকালে রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবীতে আরও প্রসারিত; তৃতীয়ত এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাট্যে গানের প্রাবল্য লক্ষ করার মতো।

ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে কবিমনে যে তত্ত্বানুভূতি রূপায়িত হয়েছে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপরিচিত তত্ত্ব। প্রকৃতি ও মানব এখানে একই প্রাণের অভিব্যক্তি। প্রকৃতির মধ্যে যে যে প্রাণের লীলা আছে, মানুষের মধ্যেও সেই একই লীলা। প্রকৃতির মধ্যে যেমন একই প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে উপস্থিত হয়, তেমনই মানুষের মধ্যেও সেই চির নবীন প্রাণের ধারা জন্ম-শৈশব-কৈশোর-যৌবন-তারুণ্য-বার্ধক্য-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রূপ থেকে রূপান্তরে আত্মপ্রকাশ করতে করতে অব্যাহত গতিতে চলেছে।

ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে কবিমনে যে তত্ত্বানুভূতি রূপায়িত হয়েছে তা রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপরিচিত তত্ত্ব। প্রকৃতি ও মানব এখানে একই প্রাণের অভিব্যক্তি।

এছাড়াও একটি মহত্তর উদ্দেশ্যের কথা কবি স্বীকার করেছেন যা ঋতুনাট্য তথা ঋতুসংগীত রচনার প্রেরণা হিসাবেও হয়তো সমান সত্য তা হল— 'ঋতুর আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎস-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করা'।

ফাল্গুনী

গীতাঞ্জলি পর্বে রচিত **'রাজা'** নাটক যদি **গীতাঞ্জলির নাট্যভাষ্য** হয় **ফাল্গুনী** তেমনি **বলাকার নাট্যপ্রেক্ষিত**। 'বলাকা'র মধ্যবর্তী পর্বেই ফাল্গুনি রচিত। তারুণ্যের প্রতি, যৌবনের প্রতি কবির জয়তিলক বলাকা কাব্যেই ঘোষিত হয়েছিল। ফাল্গুনীতে তাকেই নাট্যের সুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাত্র। কবি **১৩২১ সালে** ফাল্গুনী ঋতুনাট্যটি রচনা করেন।

১৩২১ সালের বৈশাখ মাস থেকে **'সবুজপত্র'** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই 'সবুজপত্র'কে তারুণ্যের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে এসময় 'বলাকা' কাব্যের অন্তর্গত **সবুজের অভিযান** কবিতাটি দিয়ে কবি পত্রিকাটিকে স্বাগত জানালেন—

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ আমাদের ঘা মেরে
তুই বাঁচা'।

এই বলাকা কাব্যের কবিতাগুলোর মাধ্যমেই এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিজীবনের, সাহিত্যিক জীবনের এক নতুন প্রকাশভঙ্গি তথা নতুন চিন্তাধারার সূচনা হয়।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল। অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে কবি ধীরে ধীরে প্রবহমানতার মধ্যেই বিশ্বের মুক্তির সন্ধান পেলেন। 'বলাকা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় এই মুক্তির সুর ধ্বনিত হল। এই সব কবিতায় বয়সের প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসেও কবি যৌবনেরই বন্দনা করলেন। এই যৌবনের জয়গানই বলাকার মর্মকথা। জরার মধ্যে যৌবন, শীতের মধ্যে বসন্ত এবং মৃত্যুর মধ্যেই যে অমৃত সুপ্ত রয়েছে—এই তত্ত্বটি 'বলাকা'র বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

সমকালীন বলাকা কাব্যে কবি যে যৌবনের জয়গান গেয়েছেন তারই নাট্যরূপ দিয়ে এ সময়ে রচিত হল 'ফাল্গুনী' ঋতুনাট্য। বাইরে থেকে যা জরাগ্রস্ত বলে মনে হয় ভিতরে তার অনন্ত-অক্ষয় যৌবন—এই তত্ত্বটি ফাল্গুনির মর্মকথা। যৌবনের প্রতীক বসন্ত আর তারই নামান্তর ফাল্গুনী।

ফাল্গুনীর গীতি ভূমিকার গানগুলি ও সবশেষের উৎসবের গানটি একত্রে **'বসন্তের পালা'** নামে নাটকের প্রবেশকরূপে এবং নাটক অংশটি **'ফাল্গুনী'** নামে **১৩২১ সালের চৈত্রমাসে 'সবুজপত্র'**-এ প্রকাশিত হয়। তাতে ভূমিকাস্বরূপ কবি লিখেছিলেন—'এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মতো তাহারই মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে।'

১৩২২ সালে নাটকটি কলকাতায় অভিনীত হয় এবং নতুন ভূমিকা সহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই অভিনয়ের পরে কবি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠির উত্তরে কবি লিখেছেন—

'জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়, আকাশের আলোক উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই। তার শ্যামলতা অম্লান। অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরা-মৃত্যুর আক্রমণ চারদিকেই দিনরাত চলছে। তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। ...শীতের মধ্যে এসে যে মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে মনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। ...বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনতুন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষ-প্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারেবারে নতুন করে উপলব্ধি করেছে। যা চিরকালই আছে, তাকে কালে কালে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধি থাকে না।' এই প্রসঙ্গে ফাল্গুনীর একটি গান উল্লেখযোগ্য—

'তোমায় নতুন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণে-ক্ষণে
ও মোর ভালোবাসার ধন।'

'ফাল্গুনীতে' কবি একই নাটকের মধ্যে দুটি নাটকের উপস্থাপনা করেছেন—একটি 'রাজা ও কবির', অন্যটি হল 'চন্দ্রহাসের নাটক।'

ফাল্গুনীর সূচনা রাজোদ্যানে। রাজা, মন্ত্রী, শ্রুতিভূষণ ও কবির কথোপকথন, পাকাচুলের আবির্ভাবে রাজচিন্তা ও সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত রাজা কী করে কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রৌঢ় বয়সের বাহ্যিক ভ্রান্তি কাটিয়ে আবার প্রাণের অজড়, অখণ্ড লীলায় আত্মমগ্ন হলেন—তাই এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে এবং সেই সূত্রেই রাজার সামনে অভিনীত হয়েছে কবির নতুন পালা। গীতিভূমিকাগুলি বাদ দিলে নাট্যাংশের চরিত্রগুলি হল—যুবকদল, চন্দ্রহাস, সর্দার, বাউল, কোটাল, মাঝি ইত্যাদি।

ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিচিত্র নাট্যসৃষ্টি। এই রচনায় নাট্যবস্তুর গুরুত্ব সংগীতের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। ফাল্গুনীতে গানের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যের সঙ্গে নাট্যের এবং সংগীতের সঙ্গে কাব্যের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—'বলাকা'র সঙ্গে 'ফাল্গুনী'র অন্তরঙ্গ—তুলনার সূত্রে তা প্রমাণিত হয়। 'বলাকা' কাব্যে যা কবিতায় বলা হয়েছে, 'ফাল্গুনী'তে তা প্রকাশ পেয়েছে সংগীত ও ছন্দনাট্যে। সংগীতকে কেবল নাট্যকথার ফ্রেমে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফাল্গুনীর ঋতু সংগীতগুলির বৈশিষ্ট্যে কবি স্বয়ং তাঁর গান শিরোনামায় স্থান দিয়েছেন।—

বেণুবনের গান, ফলন্ত গাছের গান, শীতের গান, আসন্ন মিলনের গান, প্রত্যাগত যৌবনের গান ইত্যাদি। অন্যান্য গানের মধ্যে বাউলের গানগুলি ঈষৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এগুলি বাউল সুরে রচিত হয়নি। এই বাউলের গানেই ফাল্গুনী নাটকের গানগুলি অভ্রান্তভাবে বেজেছে।

'ফাল্গুনী' ঋতুনাট্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান হল—

১। পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
২। ওগো দখিন হাওয়া
৩। আকাশ আমায় ভরল আলোয়
৪। ওগো নদী আপন বেগে
৫। ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে
৬। মোদের যেমনি খেলা তেমনি কাজ
৭। আমাদের পাকবে না চুল
৮। আমাদের ভয় কাহারে
৯। আমরা খুঁজি খেলার সাথী
১০। ছাড়গো তোরা ছাড়গো
১১। আমরা নূতন প্রাণের চর
১২। আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
১৩। মোরা চলব না
১৪। চলি গো চলি গো
১৫। ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
১৬। বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম
১৭। ভালো মানুষ নইরে মোরা
১৮। ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি
১৯। এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
২০। এবার তো যৌবনের কাছে
২১। এতদিন যে বসেছিলেম
২২। তুই ফেলে এসেছিস কারে
২৩। আমি যাব নাগো
২৪। সবাই যারে সব দিতেছে
২৫। বসন্তে ফুল গাঁথল
২৬। চোখের আলোয় দেখেছিলেম
২৭। হবে জয় হবে জয়
২৮। তোমায় নতুন করে পাব বলে
২৯। ওরে আয়রে তবে মাতরে সবে
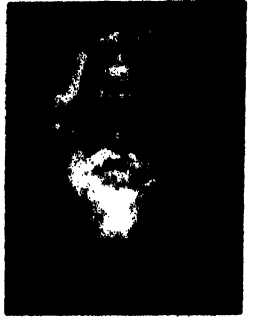
ফাল্গুনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বিচিত্র নাট্যসৃষ্টি। এই রচনায় নাট্যবস্তুর গুরুত্ব সংগীতের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে।
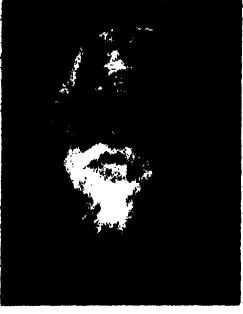
বসন্ত

বসন্ত ঋতুনাট্যটি ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে ঋতু উৎসবের জন্য রচিত ও অভিনীত হয়। এই সময় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৩৩ সালে এটি ঋতু উৎসব গ্রন্থে সংকলিত হয়। বর্ষামঙ্গলের মতো বসন্ত ঋতুর অনেকগুলি গানকে একত্রে নাট্যসূত্রে গেঁথে কবি এই ঋতুনাট্যটি রচনা করেন। বসন্ত ফাল্গুনীর মতোই ঋতু উৎসবের তত্ত্বনাট্য। মুখ্যত সংগীতের আকর্ষণেই এগুলির নাটকীয়তা, বসন্ত পালাগানের কাঠামো 'শেষবর্ষণ'-এর অনুরূপ, এখানে পাত্রপাত্রী দুই শ্রেণির—প্রকৃতি ও মানব। বসন্ত পালাতে কবি বলেছেন—'এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা-না-বোঝার কোনও বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।'

নাটকটির প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন; 'বর্ষামঙ্গলের আদর্শে বসন্ত ঋতুর নতুন একঝাঁক গান নিয়ে [কবি] বসন্ত নামক একটি সুন্দর আসর বসালেন কলকাতায়। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য এই সময় রঙ্গমঞ্চে একটি রাজসভা সাজিয়ে রাজা যেন তাঁর রাজকার্যের নীরস জীবনের অবসরে ও নিভৃতে রাজকবিকে ডেকে তাঁর দলবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তের গান শুনতে বসেছেন,..।'

[রবীন্দ্রসংগীত, শান্তিদেব ঘোষ, পৃষ্ঠা : ১৫১]

বসন্তে ফাল্গুনীর মতো কোনও দৃশ্য পরিবর্তন নেই। আলাদা কোনও নাট্যভূমিকাও নেই। ফাল্গুনীতে রাজা ছিলেন কেবলই দর্শক, কিন্তু বসন্তে সম্পূর্ণ নাটকটিতেই রাজা ও কবির কথোপকথন আছে এবং কবি রাজার কাছে নাটকের গানগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। নাটকের গীতিমুখরিত চরিত্রগুলি বসন্তের প্রতীক। তাই এই নাটকের চরিত্র হয়ে উঠেছে বেণুবন, আম্রকুঞ্জ, ঋতুরাজ, ঝুমকোলতা, শালবীথি, বকুল, নদী, বনপথ প্রভৃতি।

বসন্তে ফাল্গুনীর মতো কোনও দৃশ্য পরিবর্তন নেই। আলাদা কোনও নাট্যভূমিকাও নেই। ফাল্গুনীতে রাজা ছিলেন কেবলই দর্শক, কিন্তু বসন্তে সম্পূর্ণ নাটকটিতেই রাজা ও কবির কথোপকথন আছে এবং কবি রাজার কাছে নাটকের গানগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

পুরাতন চলে গিয়ে নতুনের আসার জায়গা করে দেয়। এই চিরন্তন তত্ত্বটিই নাটকটিতে প্রকাশিত। তত্ত্বের দিক থেকে বসন্তের তত্ত্ব ফাল্গুনীরই দোসর। তাই এই নাটকে কবি চরিত্র রাজাকে বলে উঠেছেন—'আমার ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার একপিঠে নূতন আর একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরাফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।'

শান্তিদেব ঘোষ তাঁর রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থে লিখেছেন—'...এর গানই সব, কথা গৌণ। কেবল গানগুলিকে সংগীতময় করে তোলাই ছিল কথার লক্ষ্য। ....দু-একটি গানে নাচ ছিল কিন্তু সে নাচ আজকালকার মতো.......না। শেষে গানটিতেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচের রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।' বসন্তের গীতিমুখর চরিত্রগুলি যেন ফাল্গুনীর গীতি ভূমিকারই সম্প্রসারণ। গানেই এদের সংলাপ। সুরের রসে মন মজলে তবেই এই অন্তরঙ্গ নাটকের মর্ম অনুধাবন করা যায়।

ঋতুনাট্য বসন্তের ২৩টি গানের মধ্যে অধিকাংশই এই সময়ে রচিত। কেবল 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল' গানটি 'বলাকা'র ১৫ সংখ্যক কবিতা 'মোর গান এরা সব শৈবালের দল'-এর গীতিরূপান্তর।

বসন্ত ঋতুনাট্যের গানগুলি হল :

১। সব দিবি কে সব দিবি পায়
২। বাকি আমি রাখব না কিছুই
৩। ফল ফলাবার আশা
৪। যদি তারে নাই চিনি গো সেকি
৫। দখিন হাওয়া জাগো জাগো
৬। ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া
৭। সহসা ডালপালা তোর উতলা যে
৮। সে কি ভাবে গোপন রবে
৯। ভাঙল হাসির বাঁধ
১০। ও আমার চাঁদের আলো
১১। ও চাঁদ তোমায় দোলা দেবে কে
১২। শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়
১৩। গানগুলি মোর শৈবালেরই দল
১৪। তোমার বাস কোথা যে পথিক
১৫। এ বেলা ডাক পড়েছে
১৬। আজি দখিন বাতাসে
১৭। এখন আমার সময় হল
১৮ বিদায় যখন চাইবে তুমি
১৯ না যেও না
২০ এবার বিদায় বেলার সুর ধরো
২১ আজ খেলা ভাঙার খেলা
২২ ভয় করব না বিদায় বেদনারে
২৩ ওরে পথিক ওরে প্রেমিক

কবির বসন্ত ঋতুরাজকে আমরা পূর্বে দেখেছি 'রাজা' নাটকে। তিনি রাজা হয়েও ঋষি, ঐশ্বর্যবান

হয়েও রিক্তসম্পদ। বাইরে তাঁর ঐশ্বর্য সমারোহ, কিন্তু অন্তরে তার বৈরাগ্য। শরতের মতো বসন্তও 'ক্ষণিকের অতিথি', সেও 'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া'। বসন্ত উৎসব শুরু হয়েছিল ঋতুমঙ্গলের স্তব দিয়ে আর শেষ হল স্মৃতির বেদনায়। ঠিক যেমনটি হয়েছিল 'ঋণশোধ'-এ। ফাল্গুনীর মতো কবি বসন্তেও পুরাতন প্রেমবেদনাকে আবার ভাষা দিলেন—'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ'।

এই মন্ত্রেই 'বসন্ত' উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

শেষবর্ষণ

শেষবর্ষণ ঋতুনাট্যটি রচিত হয় ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে। ওই সময়ই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং গানগুলি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়। শেষবর্ষণের ২০টি নতুন গান 'সবুজপত্র'-র ১৩৩২ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই ঋতুনাট্যটির প্রথমাংশের উপজীব্য বিষয় বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। পালা শেষের মুখে দেখা যায় যে বাদললক্ষ্মীই মেঘের অবগুণ্ঠন ঘুচিয়ে দিয়ে শরৎশ্রীরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বাদললক্ষ্মীই অবস্থাভেদে শরৎশ্রী—এটাই এই পালার মর্মকথা।

কোনও এক রাজসভায় শেষবর্ষণ পালার উৎসব শুরু হয়েছে। মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রাজা, নটরাজ, নাট্যাচার্য, গানের দল, রাজকবি ও পারিষদগণ। নটরাজ ও নাট্যাচার্য নাটকের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে চলেছেন। রাজা হলেন আদর্শ দর্শক। রাজকবি এবং পারিষদগণ দর্শকের প্রতিনিধি। নটরাজ বর্ষাকে আবাহন করেছেন এবং বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমনের গূঢ় তত্ত্বটি গানের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু গানের পরিবেশক কেবলমাত্র নটরাজ নয়, গায়ক-গায়িকার দল তাঁর নির্দেশে গানগুলি পরিবেশন করেছেন। বর্ষা-শরতের আগমনী-বিজয়ার একটি মনোরম তত্ত্ব এই নাট্যপালায় বিধৃত হয়েছে। এখানে বর্ষা ও শরতের রূপ রৌদ্র-ছায়ার মতো মিলিত হয়েছে।

বসন্তের মুখপাত্র ছিলেন কবি, শেষবর্ষণে নটরাজ—আসন্ন নটরাজ ঋতুরঙ্গশালার ভূমিকা যেন এখান থেকেই সূচিত হয়েছে। শেষবর্ষণ পালাটি থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতু উৎসব ও রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। এখানে কবির প্রতিনিধি নটরাজ—ঋতুর অধিপতি তো তিনিই—তাই তাঁর লীলারঙ্গে ঋতুর গান আপনিই জেগে ওঠে, কবি যেন উপলক্ষ।

শেষবর্ষণ পালায় রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলি মাধুর্যে ঘনীভূত, রসে সমৃদ্ধ এবং সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। ঋতুর একটি অনির্বচনীয় মধুরিমাকে সুরে স্পর্শে ফুটিয়ে তোলার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আছে এই কাব্যগীতিগুলিতে। বর্ষার আবির্ভাব ও তার অন্তরের ঘনীভূত বিষাদ, শরতের ক্ষণিক হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্ত ও শেফালির শুভ্র লাবণ্য নির্যাসিত হয়ে এই পালার গানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পালানাট্যে কবি তাঁর সংগীতসৃষ্টির—মাধুর্যের দ্বারা ঋতুপ্রকৃতির অন্তঃপুরটি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন। 'যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে'—কবির বাঁশি গানে গানে তাকেই চুরি করে নিয়েছে। বর্ষা ও শরতের আগমনী ও বিদায়ক্ষণের তত্ত্বটি কেবল গানেই ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এই নাটকে নটরাজ বলে উঠেছেন—'অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে আনতে হয়।'

শেষবর্ষণ পালায় কবি বর্ষা ও শরতের মিলিত রূপের বন্দনা করে ঋতু উৎসবের যে সামগ্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর পরবর্তী নাটক 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'য় আরও পূর্ণাঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির শেষ বয়সের কাব্যে বারবার যে নিরাসক্ত জীবনদর্শনের কথা ঘোষিত হয়েছে—কবির গানে তারই প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে।

শেষবর্ষণের গানের সংখ্যা ২৪ এবং অধিকাংশ গানই নাটকটির রচনাকালে রচিত। কিছু গান পূর্বরচিত, যেমন—

পথিক মেঘের দল জোটে ওই
পুব হাওয়াতে দেয় দোলা
ওগো শেফালি বনের মনের কামনা
এসো শরতের অমল মহিমা

১৩০৪ সালে রচিত 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' (বর্ষামঙ্গল) কবিতাটিতে কবি শেষবর্ষণ অভিনয়কালে সুরারোপ করেন।

শেষবর্ষণ ঋতুনাট্যের গানগুলি নিম্নরূপ :

১। এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে
২। ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর
৩। কোথা যে উধাও হল
৪। আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
৫। বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
৬। পুব হাওয়াতে দেয় দোলা
৭। অশ্রুভরা বেদনা
৮। ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
৯। পথিক মেঘের দল জোটে ওই

শেষবর্ষণ পালায় রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলি মাধুর্যে ঘনীভূত, রসে সমৃদ্ধ এবং সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। ঋতুর একটি অনির্বচনীয় মধুরিমাকে সুরে স্পর্শে ফুটিয়ে তোলার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা আছে এই কাব্যগীতিগুলিতে।

১০। বন্ধু রহো রহো সাথে
১১। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
১২। একলা বসে বাদল শেষে
১৩। শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি
১৪। দেখো দেখো শুকতারা
১৫। ওলো শেফালি
১৬। যে ছায়ারে ধরব বলে
১৭। এসো শরতের অমল মহিমা
১৮। ওগো শেফালি বনের মনের কামনা
১৯। এবার অবগুণ্ঠন খোল
২০। তোমার নাম জানিনে
২১। কার বাঁশি নিশিভোরে
২২। হে ক্ষণিকের অতিথি
২৩। আমার রাত পোহাল
২৪। গান আমার যায় ভেসে যায়

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সালে রচিত ও অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়কালে এর নাম ছিল 'ঋতুরঙ্গ'। এটি কবিতা ও গানের সমন্বয়ে ঋতু উৎসব। শেষবর্ষণে বর্ষা ও 'বসন্ত' ঋতুনাট্যে বসন্ত ঋতুর একাধিপত্য পরিলক্ষিত হলেও এই নাটকটির কাঠামো ভিন্ন। কারণ এটি হল অখণ্ড ঋতুচক্রের পালা। পূর্বের নাটকগুলিতে ঋতুই ছিল প্রধান। এখানে প্রধান স্বয়ং নটরাজ—যিনি ঋতুচক্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বনৃত্য করে চলেছেন।

ঋতু এখানে ঠিক চরিত্র হিসাবে আসেনি। সমস্ত ঋতুচক্রের ভেতর দিয়ে নটরাজের নৃত্যর মাধ্যমে যে মুক্তির আভাস পাওয়া যায় সেই মুক্তির আনন্দরস উপলব্ধি করাই এই পালার মর্মকথা। প্রত্যেক ঋতুর সঙ্গে মানবজীবনের যে শাশ্বত সত্য প্রকাশিত হয় তাকে অন্তরে উপলব্ধি তথা আস্বাদন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন গানের মধ্য দিয়ে কবি সেই অখণ্ড সত্যকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যেমন বৈশাখ তপস্বী কিন্তু সেই তপস্যা নীরস নয় বরং তা আষাঢ়ের সরসতার ভূমিকা। রসোপভোগের পক্ষে তপসংযমের প্রয়োজনেই বৈশাখের এই তপঃক্লিষ্ট মূর্তি—'তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।' এইভাবে সমস্ত ঋতুর মধ্য দিয়েই মানবজীবনের বিভিন্ন অনুভূতি যথা প্রেম, বিরহ, পূর্ণতা, তমসাকে জয় করার শক্তি ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে এই নাটকে।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালাকে নাট্যবিভাগে স্থানান্তরিত করলেও স্বতন্ত্রভাবে গান ও কবিতার যোজনায় এর মধ্যে কোনও নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে কিনা—এ বিষয়ে কবির একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়—

'পূরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর একদল কবিতা আছে—সেগুলি অন্য জাতের তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে।' (মহুয়া কাব্যের গ্রন্থপরিচয়)

ঋতুবিশেষের উপর গান রচনা এর অনেক আগে থেকেই কবি শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে বর্ষা ও বসন্তই ছিল ঋতুর গানে প্রধান। কিছু শরতের গান রচনা করেছিলেন শারোদৎসব রচনাকালে। আশ্রমে বর্ষামঙ্গল, শারোদৎসব, বসন্তোৎসব—এই তিনটি উৎসব উদ্‌যাপিত হত। ১৩৩৩ সালে সব ঋতুগুলিকে নিয়ে কবি এক নতুন উৎসব করলেন, নাম দিলেন 'ঋতুরঙ্গশালা'। ছটি ঋতুর উপযোগী কিছু গান ও কবিতা নিয়ে এই পালাটি রচিত। তবে এই ঋতুচক্রের পিছনে একটি দার্শনিক তত্ত্বকে কবি এই পালায় যুক্ত করেছিলেন।

ঋতুবিশেষের উপর গান রচনা এর অনেক আগে থেকেই কবি শুরু করেছিলেন। বিশেষ করে বর্ষা ও বসন্তই ছিল ঋতুর গানে প্রধান। কিছু শরতের গান রচনা করেছিলেন শারোদৎসব রচনাকালে।

এই নাটকটি রচনার কিছুকাল পূর্বে কবি রচনা করেন 'নটীর পূজা'। এই নাটক থেকেই নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। ইতিপূর্বে কবি দক্ষিণ ভারত ও দঃ পূঃ এশিয়ার শ্যাম, কাম্বোডিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করে এসেছেন। এইসব স্থানের প্রধান অরণ্যদেবতা শিব বা নটরাজ। এখানে ভ্রমণকালেই কবির মনে যে শৈব চেতনার জন্ম তারই প্রকাশ পাওয়া যায় এই সময়ে রচিত কবিতা ও গানে। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র জন্ম এই শৈবচেতনার থেকেই। নাটকটির ভূমিকায় কবি লেখেন—

'নটরাজের তাণ্ডবে তাহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বাহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মোচিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম এই তত্ত্বটিকে কবি একটি গানে প্রকাশ করেন—'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ ঘুচাও সকল বন্ধ হে',

কেবলমাত্র ঋতুর গানই নয় এই নাটকে যুক্ত হয়েছে বৃক্ষরোপণের গান—

১। মরুবিজয়ের কেতন উড়াও
২। আয় আমাদের অঙ্গনে

এ ছাড়াও পঞ্চভূতের বন্দনামূলক কয়েকটি শ্লোক। এই নাটকের অন্যান্য গান হল
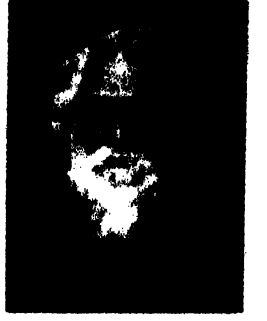
৩। কেন পান্থ এ চঞ্চলতা
৪। নির্মলকান্ত নমোনমো
৫। হায় হেমন্তলক্ষ্মী
৬। তোমর আসন পাতব কোথায়
৭। চরণরেখা তব
৮। এসো হে বৈশাখ
৯। মধ্য দিনে যবে গান
১০। হে সন্ন্যাসী হিমগিরি ফেলে
১১। হিমের রাতে এই গগনের দীপগুলিরে
১২। রাঙিয়ে দিয়ে যাও
১৩। আলোর অমল কমলখানি
১৪। শীতের বনে কোন সে কঠিন
১৫। তপের তাপের বাঁধন কাটুক
১৬। মনে রবে কিনা রবে আমারে

এ ছাড়াও 'ওগো কিশোর আজি' এই কবিতাটিতেও কবি এসময়ে সুরারোপ করেন। ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতায় 'নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা' অভিনয়কালে নিম্নলিখিত গানগুলি যুক্ত হয়—

১৭। শিউলি ফুল শিউলি ফুল
১৮। নমো নমো হে বৈরাগী
১৯। ঐ কি এলো আকাশ পরে
২০। শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
২১। রঙ লাগালে বনে বনে

কবির ঋতুনাট্যগুলির মর্মকথা ব্যক্ত করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসবে (কবি) বিভিন্ন ঋতুর গান করিয়াছেন, নাটকেও রূপায়িত হইয়াছে শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ফাল্গুনীর মধ্যে নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় সকল ঋতুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি গতি বন্ধনমুক্তির পারম্পর্যের মধ্যে সমন্বিত করিয়া মুক্তিতত্ত্বরূপে কবি দেখিতেছেন। এই সব ঋতু উৎসবে পাত্রপাত্রী বা নটনটীর মধ্যে আছে শিশু, তরুর দল। ফাল্গুনীর সময় হইতে নানা ফুলফল, নদী, গিরির মাধ্যমে কবি গান গাহিয়াছেন। বসন্তে ঋতু পূজার বিকাশ ও নটরাজে তাহার পূর্ণতা। (রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃষ্ঠা ৩০১)

নবীন

'নবীন' ঋতুনাট্যটি ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন মাসে রচিত এবং দোলপূর্ণিমার দিন (২০ ফাল্গুন, ১৩৩৭) শান্তিনিকেতনে এটি প্রথম অভিনীত হয়। এরপর চৈত্র মাসে কলকাতায় এটি আবার অভিনয় হয়। এই সময় নাটকটি প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর 'বনবাণী' গ্রন্থে (১৩৩৭, আশ্বিন) কিছুটা পরিবর্তিত আকারে নাটকটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে রচিত বসন্ত, শেষবর্ষণ, সুন্দর প্রভৃতি গীতিনাট্যে রাজা, কবিশেখর বা কবি, মন্ত্রী প্রভৃতি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কবি গান ও ঋতু উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু নবীনে এরূপ পাত্রপাত্রী বা বক্তা নেই। কবি স্বয়ং রঙ্গমঞ্চের পাশে বসে কবিতা আবৃত্তি করেছেন, গান ব্যাখ্যা করেছেন, তারই মাঝে গানগুলি কখনও কখনও শুধু গান, কখনও নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হয়েছে। নৃত্যের মাধ্যমেই গানগুলির নাটকীয়তা প্রকাশ করা হয়েছে। গানের সূত্রে এই নাটকে অলিমালা, কিশোর, মাধুরী, মহাশ্বেতা, কবি প্রভৃতি পাত্রপাত্রী আছে।

'নবীন' ঋতুনাট্যটি দুটি পর্বে বিভক্ত—প্রথমে বসন্তের আবির্ভাবে ও তার পূর্ণ পরিণতি, চিরপুরাতন নানা রূপে-রসে-গন্ধে নবীনরূপে আবির্ভূত এবং তারই প্রভাবে মানবমনের বিচিত্র প্রভাব ; দ্বিতীয় পর্বে বসন্তের বিদায়।

এই ঋতুনাট্যের গানগুলি বস্তুত সংলাপ নয়, বসন্তের অঙ্গবিশেষকে সম্বোধন করে এখানে কবির মুগ্ধ হৃদয়াবেগই গীতছন্দে ঝরে পড়েছে। কবি যেন বসন্তের রঙ্গদেউলের সোপানে বসে টুকরো-টুকরো সুখ-দুঃখের মালা গেঁথেছেন, সাতনরী হার করে পরিয়ে দিতে চেয়েছেন বসন্তলক্ষ্মীর কণ্ঠে—তাঁর সেই গানের দানে মিশিয়ে দিয়েছেন ফাল্গুনের ভরাসাজির উদ্ধৃত থেকে তুলে আনা বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন মণিবন্ধ। হয়তো কবির অনুপস্থিতিতেও এই দানের ভূষণ আমাদের স্মরণিকার কক্ষপটে উপস্থিত। এই আকৃতিটুকুই একটা মুক্তাফলের মতো জমাট বেঁধেছে একটি গানে—'ফাগুনের নবীন আনন্দে'—এই গানটি কেবল নবীনেরই নয়, সমস্ত ঋতুপর্যায়ের গানের ভূমিকা হয়ে উঠেছে।

ঋতুনাট্যের গানগুলি বস্তুত সংলাপ নয়, বসন্তের অঙ্গবিশেষকে সম্বোধন করে এখানে কবির মুগ্ধ হৃদয়াবেগই গীতছন্দে ঝরে পড়েছে।

'নবীন' ঋতুনাট্যের গানগুলি নিম্নরূপ :

১। বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী
২। সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা
৩। আয় গো তোরা কার কি আছে আন
৪। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়
৫। গানের ডালি ভরে দেব
৬। ওরে গৃহবাসী
৭। হে মাধবী দ্বিধা কেন
৮। ওরা অকারণে চঞ্চল
৯। ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী
১০। চলে যায় মরি হায়
১১। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক
১২। শুধু যাওয়া আসা

১৩। ঝরাপাতা গো
১৪। কখন দিলে পরায়ে
১৫। ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
১৬। তুমি কিছু দিয়ে যাও
১৭। আজ খেলা ভাঙার খেলা
১৮। ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক

প্রভৃতি।

শ্রাবণগাথা

১৩৪১ সালের শ্রাবণমাসে শান্তিনিকেতনে **বর্ষামঙ্গল উৎসব** উপলক্ষে পূর্বরচিত কিছু বর্ষার গানকে নাটকের সূত্রে গেঁথে কবি 'শ্রাবণগাথা' ঋতুনাট্যটি রচনা করেন। এটির প্রথমে অভিনয় হয় **২৬ ও ২৭ শ্রাবণ, ১৩৪১ শান্তিনিকেতনে।**

এই ঋতুনাট্যটির কাঠামো ও রচনাশৈলী 'শেষবর্ষণ'-এর মতোই। রাজা, নটরাজ, সভাকবি প্রভৃতি মানব পাত্রপাত্রীদের মধ্যে গদ্যসংলাপ আছে। রাজা ও নটরাজ দুজনে নাটকটির আদর্শ দর্শক ও ব্যাখ্যাতারূপে রয়েছেন। সভাকবি সাধারণ মানুষের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এই নাটকটির তত্ত্ব হল—বৈশাখের রুদ্রমূর্তিই পরিণামে শ্রাবণের রসিক বরবেশে তপস্বিনী ধরণীর পাণিপ্রার্থীরূপে উপস্থিত এবং তাঁদের মিলনে বাসরঘরের প্রচণ্ড বালক শরতের আবির্ভাব।

নটরাজ কল্পিত কিছু প্রাকৃতিক চরিত্র গানের মাধ্যমে নাটকটির উক্ত তত্ত্বটি উপস্থিত করেছে। চরিত্রগুলি হল—উগ্রসেন, সকরুণা, পূরবীকা, মঞ্জুলা, বিদ্যুৎময়ী, কিশলয়িনী, বিজুলী, বিপাসা ইত্যাদি।

রাজা ও নটরাজ দুজনে নাটকটির আদর্শ দর্শক ও ব্যাখ্যাতারূপে রয়েছেন। সভাকবি সাধারণ মানুষের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

'শ্রাবণগাথা'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎকৃষ্ট বর্ষাসংগীতের সমাবেশ ঘটেছে। এই পালাটিতে গীতির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে সংগীতের মাধ্যমে অসাধারণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণে মাধ্যমে আমরা তা সহজেই বুঝতে পারব—

● বর্ষাঋতুর মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর বিরহ বিরাজ করে—এই বিশ্ববেদনার সঙ্গে অন্তরের বিরহের রাগরাগিণীর মিলন অপরিহার্য

'ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
—বিরহ কাতর শর্বরী'

●● কেবল বিরহ মিলনই নয় বর্ষার মধ্যে আছে শ্যামলিমার সঙ্গে উগ্রতা, মাধুর্যের সঙ্গে কাঠিন্যের মিলন—

'সঘন বরষণ শব্দ মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী'

●●● শ্রাবণের ভেরীর ধ্বনি বেজে উঠেছে—

'ওরে ঝড় নেমে আয়'

●●●● মেঘ ও বিদ্যুতে গান—

'দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা'

●●●●● শ্রাবণের অন্তরে ধ্বনিত হয়েছে মুক্তির উদ্বেগ—

'হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে'

●●●●●● রাজা নটরাজকে বলেছেন—

'তোমার পালা বোধ হয় শেষের দিকে পৌঁছাল। এবার গভীরে নামো, যেখানে শক্তি, যেখানে স্তব্ধতা এবং যেখানে জীবন মরণের সম্মেলন আছে।'

'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি'

●●●●●●● শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে বিদায়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—শরতের প্রথম উষার স্পর্শ লেখেছে আকাশে—

'দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়'

পালাটিতে মোট ২২টি গান আছে। গানগুলি হল—

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
বাকি আমি রাখব না
তপের তাপের বাঁধন কাটুক
নমো নমো নমো
এসো নীপবনে
ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে
১০ তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি
১১ দেখো দেখো শুকতারা
১২ বাদলধারা হল সারা
১৩ মম মন উপবনে
১৪ বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
১৫ হারে রে রে রে রে আমায়
১৬ ওরে ঝড় নেমে আয়

প্রভৃতি।

গানগুলির মধ্যে 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' এবং 'মম মন উপবনে' গানদুটি পালাটির রচনাকালে রচিত বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের প্রধান

'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রসংগীত : নন্দিনী যখন 'নেয়ে'

সুচেতা চৌধুরী

"রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে এক মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ... মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

কবি কাজের লোক ও অকাজের লোকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন—কাজের লোকের দলে আছে কিশোর, অধ্যাপক, সর্দার ও আরও অনেকে আর অকাজের দলে আছে শুধুই নন্দিনী। কিন্তু নন্দিনী যদি অকাজেরই হবে তাহলে কবি কেন বলেন নন্দিনী যেন 'ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি তাকে দেখলে সকলের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।'

রক্তকরবী নাটকের অন্যতমা নন্দিনীর হাতে-পায়ে রক্তকরবীর কঙ্কণ, তাকে এই রক্তকরবীর ফুল যোগাবে কিশোর, সে কাজে ফাঁকি দিয়ে আনবে ফুল, তাতে তার শাস্তি হবে, তবু সে ফুল আনবেই।

অধ্যাপক যেহেতু পণ্ডিত ব্যক্তি, তাই তাঁর সচেতন মন সদাই অনুভব করে রক্তকরবীর রক্ত আভায় শুধু মাধুর্য নয়, একটা ভয়লাগানো রহস্যও আছে। যেন সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছেন বিধাতা, সেই রাঙা রঙে কোনও একটা লিখন লেখা হবে। এই সংকেত নাটকের প্রথমেই কবি আমাদের গোচরে আনেন।

রঞ্জন নন্দিনীকে ডাকে রক্তকরবী বলে তাই নন্দিনী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা। সমগ্র নাটকে রঞ্জন এক অনস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে যায় কারণ রঞ্জনকে সমস্ত নাটকে কেউ দেখাতে পায়নি এবং সে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ভাবনার ফসল। নন্দিনী কিন্তু প্রথম থেকেই ঘোষণা করে রঞ্জনকে সে ভালোবাসে, এখানে অর্থাৎ যক্ষপুরীতে মকররাজের এলাকায় আজ রঞ্জনের সঙ্গে তার দেখা হবে। তাই এই নাটকে রঞ্জন এক না-দেখা প্রবল অস্তিত্ব যেন এক অদৃশ্য বলয় রচনা করেছে নন্দিনীকে ঘিরে, আর তাই সাহসী নন্দিনীও সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অধরা অলৌকিক সতত বিচরণশীল রহস্যাবৃতা এক নারী।

এতক্ষণেও রক্তকরবীর গল্পটি বলা হয়নি। কিন্তু রক্তকরবী নাটকের গল্প কি সত্যই কিছু আছে ? একটি পরিপূর্ণ অবয়বের গল্পের অনুপস্থিতি ও তৎসঙ্গে দীর্ঘসংলাপবাহী একটি নাটক কী করে শতবর্ষ অতিক্রম করেও টিকে থাকতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ যেন রক্তকরবী।

আশ্চর্যের বিষয় রক্তকরবীর রাজা আছেন, কিন্তু প্রজা নেই। তার পরিবর্তে আছে শ্রমিক কিন্তু শ্রমিকদের কোনও নেতা নেই। আছেন অধ্যাপক কিন্তু তাঁর কোনও বিদ্যায়তন নেই যেখানে তিনি শিক্ষা

অধ্যাপক যেহেতু পণ্ডিত ব্যক্তি, তাই তাঁর সচেতন মন সদাই অনুভব করে রক্তকরবীর রক্ত আভায় শুধু মাধুর্য নয়, একটা ভয়-লাগানো রহস্যও আছে।
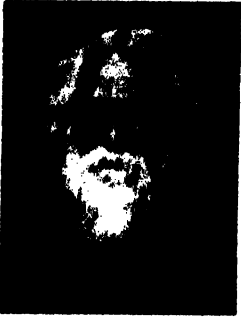
দেবেন। সমগ্র নাটক জুড়ে আছে রঞ্জন কিন্তু তার কোনও দৈহিক অস্তিত্ব নেই। তবুও রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নামেই যেন নেশা ধরায় মনে।

আসুরিক শক্তিসম্পন্ন আত্মদম্ভী রাজা মকররাজ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে মাটির তলা থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করছেন নিজের শক্তি ও আয়ু বাড়াবার কারণে।

দ্বন্দ্ব বাঁধল রাজার নিজের মনেই—সবুজ ঘাস তাঁকে সদাই আকর্ষণ করে, নন্দিনীর ছদ্মবেশে। কিন্তু তাহলে তো নিজের চারপাশে ক্ষমতার কঠিন বেষ্টনী তিনি তৈরি করেছেন তা যে রক্ষা পায় না। রাজার অস্তিত্বের সঙ্গে ক্ষমতার মিশেলে যে কঠিন ব্যূহ তৈরি হয়েছে তাতে কি ছিদ্র আছে তা নাহলে সেখানে নন্দিনী কী করে প্রবেশাধিকার পায়।

রাজা তাঁর সমগ্র কঠোরতা দিয়ে নন্দিনীকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। পরিবর্তে মানবিক দোষগুণ রাজার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মনের মধ্যে তৈরি হয় ঈর্ষা। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে রাজা রঞ্জনকে হত্যা করেন। নন্দিনীর মনের সঙ্গে নিজের মনের যে সেতু তৈরি করবেন রাজা তার প্রধান বাধা ছিল যে রঞ্জন।

অবশেষে রাজার ইচ্ছাশক্তিই জয়ী হল। রঞ্জনের মৃত্যুতে রাজা সেই ক্ষমতা অর্জন করলেন যার দ্বারা চারপাশের সমস্ত বাধার প্রাচীরকে দীর্ণ করে চূর্ণ করে স্বর্ণের আকর্ষণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নন্দিনী নামের ঘাস ফুলটির আকর্ষণে রাজা বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন। হয়তো বা নন্দিনীর হৃদয়কেও জয় করে ফেলেছেন, কিন্তু তাহলে তো নতুন গল্প শুরু হবে সেই ব্যাপারটি উহ্য রেখেছেন বিশ্বকবি।

রাজা তাঁর সমগ্র কঠোরতা দিয়ে নন্দিনীকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। পরিবর্তে মানবিক দোষগুণ রাজার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মনের মধ্যে তৈরি হয় ঈর্ষা। যার চূড়ান্ত পরিণতিতে রাজা রঞ্জনকে হত্যা করেন।

নন্দিনীকে এই সোনা খোদাইয়ের রাজ্যে রাজা যে কেন এসেছেন কেউই বোঝে না। নন্দিনী নিজে বলে 'অকাজের প্রয়োজনে'। এই 'অকাজ' কথাটির মূল্য কবির কাছে খুবই বেশি, অকাজও যে কাজের সমান মেরুতে অবস্থিত থাকতে পারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবি তা বোঝাতে চেয়েছেন।

গোকুল দেখে নন্দিনীর সিঁথিতে ঝোলে রক্তকরবীর মঞ্জরী, তার মনে হয় নন্দিনী যেন 'রাঙা আলোর মশাল' আজ যেন কী বিপদ ঘটবে। নেপথ্য রাজার সঙ্গে নন্দিনীর সংলাপে আমরা বুঝি নন্দিনী আর রাজার মধ্যে রক্তকরবীর পাপড়ি যেন একটি দূরত্ব তৈরি করেছে।

যক্ষপুরীর নেপথ্যবাসী রাজা মকররাজ কিন্তু অনেক বেশি বোঝেন তাই রক্তকরবীর নির্যাস বা নন্দিনীর প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থলের দিকেই রাজার ঝোঁক। রাজা বোঝেন তাঁর মধ্যে আছে শুধু জোর, আর রঞ্জনের মধ্যে আছে যাদু। রাজা এও বোঝেন রঞ্জন সবার জন্য যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে রঞ্জনের 'নন্দিন'।

নাটক এগিয়ে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। যক্ষপুরীর যে খোদাইকররা একে একে তাদের ক্ষোভ বেদনা পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করে। ফাগুলাল, তার স্ত্রী চন্দ্রা, গোকুল, বিশু এরা পরস্পরের দুঃখের অংশীদার। এদের মধ্যে বিশু যাকে সবাই বিশু পাগলা বলে সে খুবই ভালো গান গায়। যক্ষপুরীতে আসার অনেক আগে থেকেই সে নন্দিনীকে চেনে।

ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা রক্তকরবী নাটকের একটি গৌণ চরিত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন সর্বাঙ্গীণ মায়া মমতা দিয়ে চন্দ্রাকে এঁকেছেন। সে যক্ষপুরীর এই দমবন্ধ-করা লৌহকঠিন পরিবেশ থেকে ফিরে যেতে চায় দৈনন্দিন পৃথিবীর হাসি-কান্নার জগতে। সে স্বামীকে অনুরোধ করে, বিশুকে অনুরোধ করে এমনকী ভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সর্দারের কাছেও অনুরোধ করে। ব্যর্থ হয়। চন্দ্রা তার সহজাত নারী-বুদ্ধি দিয়ে বিশুকে সাবধান করে নন্দিনীর সঙ্গে যেন সে না মেশে কারণ নন্দিনীকে তার মনে হয় এক অলৌকিক চরিত্র ! কিন্তু তারই বা কী করার আছে ! এক নারীকে বোঝা যায় না, পুরুষের যে তারই প্রতি বেশি আকর্ষণ। বিশুকে সে ফেরাবে কী করে ! তাই
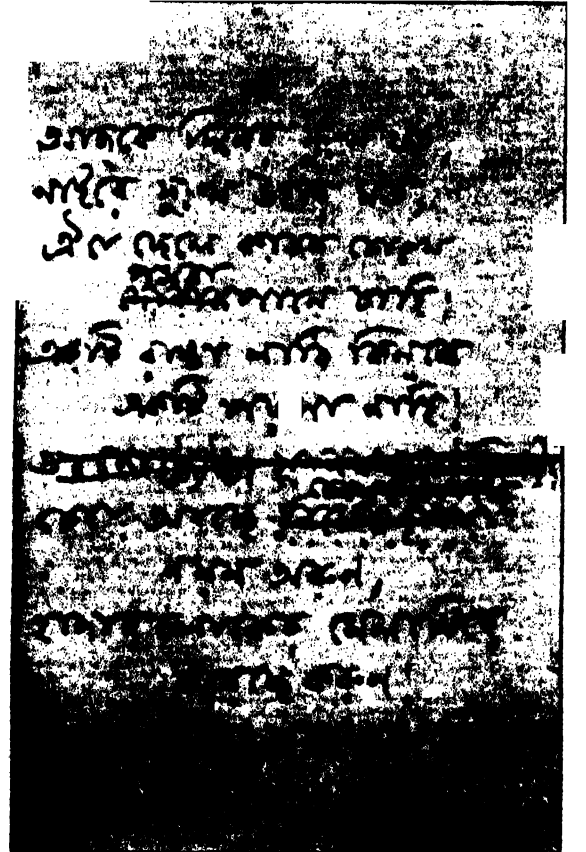
চন্দ্র ভয় পায় যেন রক্তকরবীর মালার ফাঁসে নন্দিনী বিশুকে সর্বনাশের পথে না টেনে নিয়ে যায়।

আমরা পাঠকরা অনুধাবন করতে পারি চন্দ্রার এই ভয় অমূলক। কারণ বিশু পাগলা হতে পারে, কিন্তু বিশু প্রাজ্ঞ, দার্শনিক, বিশু দূরদর্শী। বিশু নিজের লোভ ও অন্যান্য রিপুকে জয় করেছে তাই নন্দিনীর ভবিষ্যৎ সে স্পষ্ট দেখতে পায় এবং অস্পষ্টভাবে আভাস দেয় নিদারুণ ভবিতব্য হয়তো বা নন্দিনী সহ্য করতে পারবে না।

নন্দিনীর মন জলের মতো স্বচ্ছ, কোনও মালিন্যই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। চারিদিকের সহজময়তার রূপটিই নন্দিনীর কাছে যেন অক্লেশে ধরা দেয়, আর সেই স্বচ্ছতার মুকুরেই বিশুর রূপ প্রতিফলিত হয়। ফলে নন্দিনী বিশুকে তার প্রকৃত রূপেই চিনতে পারে আর সেই সহজময়তার অক্লেশ রূপের মাধ্যমেই রাজাকে তার জালের বাইরে বার করে আনার প্রতিজ্ঞায় নন্দিনী অস্থির হয়ে ওঠে।

এই ত্রিস্তরের নাটকে নন্দিনী যেন ত্রিমুখী সরণির কেন্দ্রে দণ্ডায়মান।

নাটকের প্রথম স্তরে পাঠক রঞ্জনের নাম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হয়। নন্দিনী রঞ্জনকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে তাও প্রতীয়মান হয়। পাঠক অপেক্ষা করে একসময়ে নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের দেখা হবে।

নাটকের দ্বিতীয় স্তরে শোষিত শ্রমিক শ্রেণির অবক্ষয়ের রূপটি কবি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। যক্ষপুরীতে সবার পিঠে একটি করে নম্বর, যেন 'দশ, পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।'

নাটকের তৃতীয় স্তরটি হল নন্দিনীর সঙ্গে রাজার প্রণয়ের একটি সূক্ষ্ম রহস্যময় অথচ কোমল পরিবেশ নির্মাণের প্রয়াস।

নেপথ্যবাসী রাজা আর নন্দিনী উভয়ের চরিত্রে যত অসঙ্গতি, তত অমিল তাই বোধহয় উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ। সম্পূর্ণ রক্তকরবী নাটকে রাজার সঙ্গে নন্দিনীর যে সংলাপ কবি গেঁথে তুলেছেন সেখানেই পার্থিব সম্পর্কের আমেজ অনুভব করা যায়।

নন্দিনীর হৃদয় জুড়ে আছে রঞ্জন তাই কিশোর বা বিশুর হৃদয়দৌর্বল্যকে সে উপেক্ষা করে। আবার সম্প্রীতির বাঁধনকেও সে অস্বীকার করে না। নন্দিনীকে ক্ষণকালের জন্য নিষ্ঠুরও মনে হয়, কিশোর রক্তকরবী ফুলের যোগান দেয় নন্দিনীকে, রঞ্জনের খোঁজেও সে এগিয়ে যায়। বিশুও নন্দিনীকে গান শোনায়, গানেই নন্দিনীকে সম্বোধন করে 'ওগো দুখ জাগানিয়া', 'ওগো ঘুম ভাঙানিয়া', 'অগম পারের দূতী' বলে, কিন্তু নন্দিনীর কানে সবই প্রবেশ করে আলগা হাওয়ার মতো। মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করে না।

আসল কথা হল, সমগ্র নাটকে নন্দিনী দুটি কাজ করেছে। একটি হল মকররাজকে অনুভবের দ্বারা পর্যবেক্ষণ, অপরটি হল রঞ্জনের অনুসন্ধান ও তার জন্য অপেক্ষা। ফলে কিশোর বা বিশুর কাছে নন্দিনী যখন স্বীকার করে সে তাদের কথা কিছুই ভাবেনি তখন কোথায় যেন শ্যামার সঙ্গে উত্তীয়ের কথোপকথন মনে করিয়ে দেয় যে স্বার্থপর শ্যামাও বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্য উত্তীয়ের সঙ্গে মধুর সংলাপ বিনিময় করেছিল। মিল অতি সামান্যই কিন্তু মিলের একটি আভাস যেন থেকেই যায়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক সাধের এবং সাধনার নাটক রক্তকরবী তাই বিশুর কথাতেও যেমন মনের তারে ঘা দেয়, সর্দারের কথাতেও মনের মাঝে সুর গুনগুনিয়ে ওঠে। কারণ বস্তুবাদী নিষ্ঠুর সর্দারও নন্দিনীর হাতের কুন্দফুলের মালা আর গলায় দোলা রক্তকরবীর মালার পার্থক্য ধরতে পারে। বলে 'জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ যে হাতের দান—আর বরণমালা ওই রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান।'

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের সব চরিত্রই প্রায় গান গাইতে পারে, কিন্তু এই নাটক তার ব্যতিক্রম। এখানে নন্দিনী আর বিশুই শুধু গান গাইতে জানে। গানের সংখ্যা মাত্র সাত। তার আবার একটির সুর খুঁজে পাওয়া যায় না। মাত্র ছয়টি গান তাও নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যেই তার প্রয়োগ সমাপ্ত।

কবি চেয়েছিলেন তাঁর নাটকটি বাস্তবমুখী হোক। সমস্ত নাট্যকারই তাই চান অবশ্য সেইসঙ্গে নাটকের কিছু বক্তব্যও থাকে তবে তা যেন নাটকের মূল ধারাটিকে ছাড়িয়ে না যায় সেটি নাট্যকারকে দেখতে হয়। সেখানেই নাটকের সফলতা বা বিফলতার সুরটি ধরা থাকে।

রক্তকরবী কিন্তু সেই বাস্তবতার পর্যায়ে উঠতে পারল না, তা যদি পারত তাহলে নন্দিনীকে অন্য ভূমিকায় দেখা যেত।

রাজার বিরাগের কারণে রহস্যজনকভাবে কিশোর অদৃশ্য হয়ে গেল। নন্দিনী শুনল, অবশেষে রঞ্জনের মৃত্যুও সে চোখের সামনে দেখল। অপরিহার্যভাবে নন্দিনীর মনে রাজার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হওয়া উচিত ছিল বা অন্য কোনও জৈবিক অনুভূতি যা প্রিয়তমের মৃত্যু চোখের সামনে দেখলে হতে পারে, কিন্তু তার পরিবর্তে নন্দিনীর প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ক্ষমতাদম্ভী রাজার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করল ও রাজার মুক্তির দিশারি হয়ে গেল। রক্তকরবী সেই মুহূর্তেই বাস্তবতার ক্ষেত্র থেকে তত্ত্বনাটকের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হল। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি যে বহিঃপ্রকৃতিকে এড়িয়ে চলতে পারে
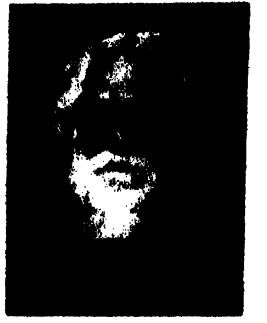
নেপথ্যবাসী রাজা আর নন্দিনী উভয়ের চরিত্রে যত অসঙ্গতি, তত অমিল তাই বোধহয় উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ। সম্পূর্ণ রক্তকরবী নাটকে রাজার সঙ্গে নন্দিনীর যে সংলাপ কবি গেঁথে তুলেছেন সেখানেই পার্থিব সম্পর্কের আমেজ অনুভব করা যায়।

না, দুই প্রকৃতির মধ্যে যে সর্বদাই সামঞ্জস্যের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে বা মানুষ যে তখনই পরিপূর্ণ মানুষ এই উপলব্ধিতে পাঠককে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ভার দিয়েছেন কবি। অন্তঃপ্রকৃতিকে অস্বীকার করে রাজার যে অস্বাভাবিক আচরণ সেই খোলস থেকে রাজাকে মুক্ত করে সহজ স্বাভাবিক 'মানুষ'-এ রাজাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নন্দিনীর সাহায্য নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কারণ আর কারও দ্বারা এই অসম্ভবকে সম্ভব করা কবির পক্ষে কষ্টকর ছিল।

নাটকের ছয়টি গান, প্রতিটিই যে এক একটি মণিমুক্তা, পরিপূর্ণ কাব্যসংগীত। গানগুলির পরিবেশন সফলতা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে গায়কেরা অনেকেই গানগুলি যে রক্তকরবীর তা না জেনেই পরিবেশন করেন।

প্রথম গানটি গ্রামবাসীদের ফসল কাটার গান।

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে
আ য় আ য় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হা য় হা য় হায়।

গানটি পরিবেশনের জন্য গ্রামবাংলায় প্রচলিত সুর বিভাস বাউলের রূপটি কবি নিয়েছেন। শান্তিদেব ঘোষ বাংলাদেশ ঘুরে বিভাস বাউলের রূপটি খুঁজে পেয়েছিলেন আর কবির নিজেরও এই সুরের চলন যথেষ্ট আয়ত্ত ছিল। পরবর্তী গানগুলি হল মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে, তোমায় গান শোনাব, ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার, ভালোবাসি ভালোবাসি, যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে। কবি এই গানগুলিতে খাম্বাজ আর পিলু রাগের মিশ্র রূপটি ব্যবহার করেছেন। আর যুগে যুগে বুঝি আমায় গানটিতে পরজ রাগের চলন ব্যবহার করেছেন।

নাটকের ছয়টি গান, প্রতিটিই যে এক একটি মণিমুক্তা, পরিপূর্ণ কাব্যসংগীত। গানগুলির পরিবেশন সফলতা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে গায়কেরা অনেকেই গানগুলি যে রক্তকরবীর তা না জেনেই পরিবেশন করেন।

খাম্বাজ আর পিলু দুটি রাগেরই একই ভাববৈশিষ্ট্য। খাম্বাজের আরোহণে শুদ্ধ এবং অবরোহণে কোমল নি ব্যবহার করে প্রেমের উদাসীনতার ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

পিলু রাগে সব সুরই ব্যবহার হয় তাই স্বাতন্ত্র্য সর্বদা সেই কারণেই থাকে না কিন্তু পিলুর নিজস্ব যে ভক্তির বৈশিষ্ট্য তার দ্বারাই 'তোমায় গান শোনাব' গানটি অদ্বিতীয়।

খাম্বাজ আর পিলু দুটিতেই প্রেমের সুর সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে যার মধ্যে মিশে থাকে বিনম্র ভক্তি বা শ্রদ্ধা। অর্থাৎ প্রেম আর ভক্তি পাশাপাশি মিশে যায় এদের সুরে। ফলে এইসব গানের সুরে এক ধরনের মাদকতা থাকে যা মানুষকে সহজেই আকর্ষণ করে। শুধু এই দুটি রাগই তো নয় কবির মনে অন্যান্য রাগের অভিজ্ঞতার ছায়াও একই সঙ্গে এগিয়ে আসে। 'ও চাঁদ, চোখের জলের' গানটিতে কখনও পিলু কখনও কাফি বা খাম্বাজ সবই মিলেমিশে একাকার। সম্পূর্ণ ভাববৈশিষ্ট্যেই চিহ্নিত গানটি আমাদের হৃদয়কে অমোঘভাবে অধিকার করে। যুগে যুগে বুঝি গানটিতে মিশে আছে এক ধরনের সুদূর বিষণ্ণতা আর তাই কবি পরজের সুরটি ব্যবহার করেছেন। শুদ্ধ সুর কোমল সুর পাশাপাশি অধিষ্ঠান করে গানটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। স্বল্পসংখ্যক গানগুলির সুরে একধরনের কবিমনের বৈজ্ঞানিক কুশলতা কাজ করছে।

অনেক অনেকদিন পর থিয়েটারের কুশীলবরা আবার রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। খুবই প্রয়োজন ছিল তার। কবির নাটকগুলির পুনঃপ্রচলন হওয়ার যে আশু প্রয়োজন তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এ আমাদের আশার কথা। কারণ দিনবদলের যুগ চলেছে, হৃদয়দৌর্বল্যের স্থান ধীরে ধীরে সুদূরপরাহত, মানুষ কী নিয়ে বাঁচবে তা সে নিজেই জানে না। আমাদের সুখ-দুঃখের কবি অনেক কথাই বলে গিয়েছেন, কেউ আর আজ তা মনেও রাখে না। রক্তকরবী যদি যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে পরিবেশন করা যায় মানুষের অন্তরে তার স্থান হবে অক্ষত। শোষণ ও শাসনের তাৎক্ষণিক ফল অবশ্যই পাওয়া যায় রক্তকরবী নাটক তা আমাদের দেখায় আবার মানুষের হৃদয় যে বনজ প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে আরেক ধরনের পথ প্রস্তুত করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সে পথও রক্তকরবীই দেখিয়েছে। বিশুর গান যার এক বড়ো অংশীদার।
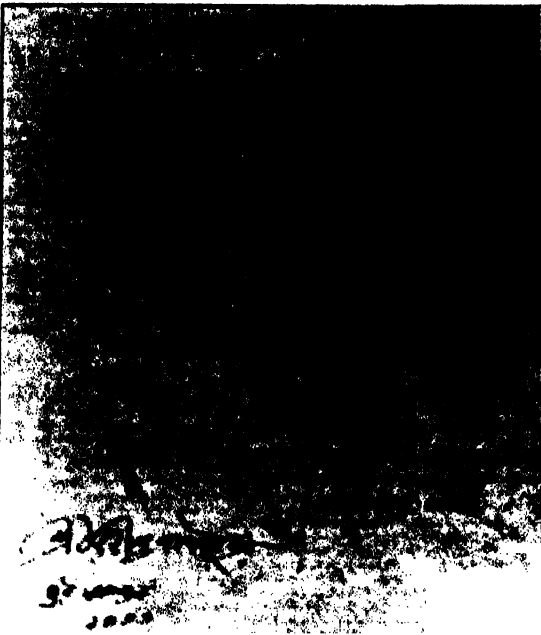
লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপক

'সংগীতে গতির আনন্দ' লেসিং থেকে রবীন্দ্রনাথ

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

লেসিঙের লাওকুন

গট্‌হেল্ট এফ্রাইম লেসিং (Gotthold Ephraim Lessing) (১৭২৯—১৭৮১) তুলনামূলক নন্দনতত্ত্বের একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যেটির নাম Laocoon or on the Limits of Painting and Poetry (১৭৬৬)। জার্মান ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজে ছিলেন Robert Phillimore। আরও একজন এই কাজে হাত দিয়ে আর একটি সংস্করণ বের করেন The Laocoon and other Prose Writings। তাঁর নাম W. B. Ronfeldt।

সমগ্র গ্রন্থে লেসিং শিল্পকলাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি স্থিতিশীল শিল্প যেমন চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ; অপরটি গতিশীল শিল্প যেমন কাব্যকলা ; নাট্যকলা, সংগীত ও নৃত্য। সবই অবশ্য কাব্যকলারই অন্তর্গত বলে ধরা হত।

কিন্তু লাওকুন কে? লাওকুন গ্রিক পুরাণকথার অন্তর্গত সূর্যমন্দিরের পুরোহিত। মন্দিরের শুচিতা রক্ষার তাগিদে তিনি কিছুতেই মিনার্ভাকে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না। বহু বাগবিতণ্ডার পর মিনার্ভা জোর করে তাঁর কাঠের ঘোড়ায় চড়ে মন্দিরে প্রবেশ

গ্রন্থে লেসিং শিল্পকলাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি স্থিতিশীল শিল্প যেমন চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ; অপরটি গতিশীল শিল্প যেমন কাব্যকলা ; নাট্যকলা, সংগীত ও নৃত্য।

করলেন। মিনার্ভা প্রেমের ও শিল্পের দেবী সুতরাং তাঁরও আত্মসম্মানবোধ যথেষ্ট। লাওকুন করলেন কী, মিনার্ভার কাঠের ঘোড়াটিকে পুড়িয়ে ফেললেন। সেই আক্রোশে মিনার্ভা দুটি বিষধর সাপ পাঠিয়ে দিলেন লাওকুনের কাছে। সাপ দুটি লাওকুনের দুই শিশুপুত্রকে দংশন করার পরই লাওকুনকে দংশন করতে উদ্যত হল। আপন কর্তব্যকর্মে রত থেকেও যদি এই পরিণাম হয় তাহলে লাওকুন কী রকম মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন আমরা সবাই বুঝতে পারি। লাওকুনের এই পরিণামদৃশ্য অবলম্বনে ইউরোপে প্রচুর চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সৃষ্ট হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক আদর্শ বলে, মানুষকে সবরকম পরিস্থিতিতেই ধীর ও স্থির থাকতে হবে। প্রচলিত মানবিক আদর্শ বলছে, পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের শরীর ও মনে পরিবর্তন ও সচলতাটাই স্বাভাবিক। সর্পবেষ্টিত পিতা ও পুত্রদ্বয় ক্রোধে ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে। ছবি ও মূর্তিতে এটিই দেখা যায়। পুরাণ কথার এই লাওকুন চরিত্রই লেসিঙের বইটিরও নাম। উনত্রিশটি পরিচ্ছেদে লেসিং বিভিন্ন শিল্পকলার স্থিতির দিক ও গতির দিক সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। কাব্যকলা সম্বন্ধে (সংগীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলা সবই এর অন্তর্গত) লেসিঙের বক্তব্য মানবমনের বিভিন্ন ভাবাবেগের গতির কারণেই কাব্যকলা আর সমস্ত শিল্পের থেকে উন্নততর।

প্রাচীন গ্রিক আদর্শ বলে, মানুষকে সবরকম পরিস্থিতিতেই ধীর ও স্থির থাকতে হবে। প্রচলিত মানবিক আদর্শ বলছে, পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের শরীর ও মনে পরিবর্তন ও সচলতাটাই স্বাভাবিক।

প্লেটো-পরবর্তী যুগে শিল্পকলা ও শিল্পচিন্তায় দেখি দুঃখ যন্ত্রণা সংগ্রাম আবার পক্ষান্তরে সুখ আনন্দ উল্লাস সবই খণ্ডকাব্যে হোক, বৃহৎ কাব্যে হোক, নাট্যকাব্যে হোক সুন্দরভাবে প্রকাশিত। তবু কাব্যের রূপসৃষ্টির খাতিরে তার গতিকে অনেক সংযত ও কোনও কোনও সময় রুদ্ধ রাখতে হয়। সেইখানে রয়েছে লেসিঙের ভাষায় 'limits of poetry'।

২

ম্যাথিউ আরনল্ডের কবিতা : 'Epilogue to Lessing's Laocoön'

ইংরেজ কবি ম্যাথিউ আরনল্ড লেসিঙের লাওকুন গ্রন্থটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। নিজে কবি বলে লেসিঙের কাব্যকলার মূল্যায়ন ম্যাথিউ আরনল্ডের খুব মনঃপূত হয়নি। উপরে উল্লিখিত কবিতায় ম্যাথিউ আরনল্ড লেসিঙের বক্তব্যের ফাঁকটি পূরণ করে কাব্যকলার জয়গাথা রচনা করলেন। ম্যাথিউ আরনল্ডের Poetical Works (O. U. P) খুলে দেখুন অসাধারণ এই কবিতাটি। পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে আমি কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

'Why music and the other arts
Offener perform aright their parts
Than poetry ? Why she, than they,
Fewer fine successes can display ?'

'Behold', 'I said', the Painter's sphere !
The limits of his art appear
In outward semblance he must give
A moment's life of things that live.
Then let him choose his moment well,
With power divine its story tell.'

'The world of music !' I exclaim'd :–
... ... What a sphere
Large and profound, hath genius here !
The inspired musician what a range,
What power of passion,
wealth of change !
Some source of feeling he must choose
And its look'd fount of beauty use,
And through the stream of music tell
Its else unuttlerable spell,
To choose it rightly is his part,
And press into its inmost heart.'

এরপর ম্যাথিউ আরনল্ড দেখাচ্ছেন, কাব্যকলার মধ্যে চিত্রকলা ও সংগীত উভয়েরই ভূমিকা বর্তমান।

'Behold, at last the poet's sphere !
But who', I said, 'suffices here ?
For, ah ! so much he has to do,
Be painter and musician too !
The aspect of the moment show,
The feeling of the moment know !
The aspect not, I grant, express
Clear as the painter's art can dress,
The feeling not, I grant explore
So deep as the musician's lore–
But clear as words can make revealing.
And deep as words can follow feeling.'

সংগীতের গতিময়তা ও চিত্রকলার দৃশ্যময়তা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় কাব্যকলায় বিশেষভাবে বৃহৎ কাব্যে। ম্যাথিউ আরনল্ড চিত্রকলা ও সংগীতকলার সৌন্দর্যকে স্বীকার করে নিয়েও কাব্যকলার প্রতিই পক্ষপাত করেছেন এবং সমস্ত কলার মধ্যে কাব্যকলার স্থান নির্দেশ করেছেন সর্বোচ্চ স্তরে। তাই তাঁর বিশ্বাসদৃঢ় বিচার—

'Beethoven, Raphael, cannot reach
The charm which Homer, Shakespeare, teach.
To these, to these, their thankful race
Gives, then, the first, the fairest place,
And brightest is their glory's sheen,
For greatest hath their labour been.'

লেসিঙের লাওকুনতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্যটিকে কেন্দ্র করে ম্যাথিউ আরনল্ড কবিতার মধ্যে চিত্রধর্মিতা ও সংগীতধর্মিতার জয়গান করেছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ : 'সংগীত ও কবিতা'

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ খুবই আগ্রহের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন ম্যাথিউ আরনল্ডের 'Epilogue to Lessing's Laocoon' কবিতাটি। বলাই বাহুল্য কবির সংগীত সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত সর্বত্রই এই কবিতার অনেকখানি প্রভাব অবশ্যই আছে। কবিতাটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা করলেন 'সংগীত ও কবিতা' যেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী পত্রিকার ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে তরুণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসদৃঢ় বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক :—

"কবি Matthew Arnold তাঁহার 'Epilogue to Lessing's Laocoon'- নামক কবিতায় চিত্রসংগীত ও কবিতার যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম নিজ ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন—চিত্রে প্রকৃতির এক মুহূর্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মুহূর্তে একটি সুন্দর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, সেই মুহূর্তটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরমুহূর্তটি আর তাহাতে নাই। যে মুহূর্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত সেই মুহূর্তটি অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটি মাত্র স্থায়ী ভাব বাছিয়া লওয়া। ভাবশৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সংগীতের কাজ। মনে করো—আমি বলিলাম 'হায় !', কথাটা ওইখানেই ফুরাইল ; কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থা বিশেষ ওই একটিমাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সংগীত সেই 'হায়' শব্দটি লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে—'হায়' শব্দের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিতে থাকে—'হায়' শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সংগীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে—'হায়' শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে বলাইয়া লয়। কিন্তু কবিতার কাজ আরও বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্তের বাহ্যশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসও তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া জীবনের গতি স্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হয়। ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর সঙ্গম পর্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেবলমাত্র স্থির দণ্ডায়মান আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এক সময়ের স্থায়ী ভাবমাত্র তিনি বর্ণনা করেন না—গমামান শরীর, প্রবহমান ভাব, পরিবর্তমান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়—অতএব ম্যাথিউ আরনল্ডের মনে চলনশীল ভাবের প্রত্যেক ছায়ালোক সংগীতে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। সংগীত একটি স্থায়ী স্থির ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা এই বলি যে, গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, তবে এখনো সংগীতের সে বয়স হয় নাই।"

ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ যা ব্যক্ত করলেন সৃষ্টিতে তা তিনি চিরজীবন দেখিয়ে গেলেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে চলমান ভাবের, ভাবান্তরের অসাধারণ সাংগীতিক প্রকাশ ঘটেছে। 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে সংগীতের গতিময়তার প্রকাশ অধিকতর মর্মস্পর্শী। 'মায়ার খেলা' তো তাঁরই ভাষায় 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা'। পূর্বোক্ত দুটি 'গানের সূত্রে নাট্যের মালা'।

শেষ জীবনের তিনটি নৃত্যনাট্যে (চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা) সংগীতের গতিময়তার অসাধারণ শিল্পরূপ প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং নৃত্যনাট্যগুলির বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, যাকে বলতে পারি dialectics, তার অভাবিতপূর্ব সাংগীতিক প্রকাশ ঘটেছে এই তিনটি রচনায়।

প্রথম বয়সের তিনটি গীতিনাট্য ও শেষ বয়সের তিনটি নৃত্যনাট্য ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি নাটকে যে সমস্ত গান প্রযুক্ত হয়েছে সেগুলিও মানবজীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিময়তার প্রকাশ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ফাল্গুনী' নাটকটি উল্লেখ করতে পারি। সমগ্র ফাল্গুনী জীবনের গতিতত্ত্বের উপরেই রচিত। এই নাটকের বিভিন্ন গানের মধ্যে 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে' গানটি গতিরই গান। তাই তো এই গানেই শুনতে পাই—

'চলার পথে আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে'।

অচলায়তন নয়, জীবনের মুক্তি ও গতি আমাদের আদর্শ ও কাম্য। 'অচলায়তন' ও 'গুরু'
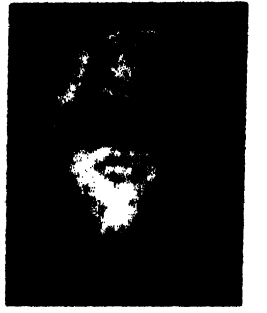
ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ যা ব্যক্ত করলেন সৃষ্টিতে তা তিনি চিরজীবন দেখিয়ে গেলেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে চলমান ভাবের, ভাবান্তরের অসাধারণ সাংগীতিক প্রকাশ ঘটেছে।

নাটকে এই আদর্শরূপই নাট্যরূপ পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট গানগুলিও সেদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্তত একটি দৃষ্টান্ত দিই :

'ওরে ওরে ও ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে'।

লেসিং ও ম্যাথিউ আরনল্ডের বক্তব্যকে সাংগীকৃত করে এবং অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'গতিতত্ত্ব যেমন সত্য, স্থিতিতত্ত্বও তেমনি সত্য—এবং সেইজন্যই গতিকে আমরা স্থিতিরূপে ছাড়া বুঝতেই পারি না।'

(অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪১, পৃঃ ৩৩৪)

কবি অন্যত্র আরও বলছেন—

'জগৎ তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে, একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে, আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত থেকে যেত।'

(রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩)

ফরাসি পণ্ডিত বের্গসঁর মতে জগৎ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। জগতে যা কিছু আছে সবকিছুরই নিরন্তর রূপান্তর ঘটে চলেছে। বের্গসঁ একেই বলেছেন 'becoming' বা 'হওয়া'। অতীত থেকে অবারিত প্রবাহ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান ওই অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে একটি চলমান হাইফেন মাত্র। বস্তুত বর্তমান বলে কিছু নেই ; কারণ যে মুহূর্তকে আমরা বর্তমান বলছি সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যত এসে বর্তমানের হাইফেনটুকুকে অধিকার করেই অতীতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

শুধু জগতে ও জীবনে কেন, রবীন্দ্রনাথের মতে—

'শিল্পে এই চলার শেষ নেই। কি ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, চিত্রকলার, কি সংগীতে, কাব্য ও সাহিত্যে। এই চলার পথেই অসীমের প্রকাশ ঘটছে।'

(তদেব, পৃঃ ৩৮৩)

৪
উপসংহার

'সংগীতে গতির আনন্দ' কথাটি রবীন্দ্রনাথকে লেখা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্রের অন্তর্গত। *(স. চি., পৃঃ ১৩৫)*।

এ প্রসঙ্গ উঠেছে লক্ষ্ণৌতে বসে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকারের মুখে ছায়ানট রাগে খেয়াল গান শোনার পর থেকে। রতনজনকারের গান কবির ভাল লাগলেও অতখানি দীর্ঘ বিস্তারিত গায়নশৈলীকে তিনি আর্ট বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ খেয়াল গানের গতির আনন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে থাকেন পত্রে-পত্রান্তরে। এখন কথা হচ্ছে খেয়াল গানের গতি একটিমাত্র রাগরূপকে কেন্দ্র করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গতিরাগের গান' জীবনযাত্রার প্রভাবের সঙ্গে সর্বদাই সচল। সেই 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' থেকে শুরু করে 'ওই মহামানব আসে' পর্যন্ত।

লেখক পরিচিতি : বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের অধ্যাপক

রবীন্দ্রসংগীত : স্বরলিপির সন্ধানে

তপোশ্রী দাস

রবীন্দ্রনাথের বাল্য কৈশোরেই কলকাতায় সংগীতানুশীলন ও বাঙালির সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগ এসে গেছিল। গান-বাজনা শেখা বা শোনানো ব্যাপারটা বিভিন্ন বনেদি কিংবা জমিদার বাড়ির ঠিক বিলাসিতা আর ছিল না, তার সঙ্গে এসেছিল একটা সংস্কৃতিমনস্কতা, হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চার পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষক রেখে অনেক ধনী বাড়িতেই বিলিতি গানবাজনা শেখার চর্চা বাড়ছিল। পিয়ানো, অর্গান, বেহালা, হারমোনিয়ম প্রায় ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। অনেকেই পাশ্চাত্য স্বরলিপি বা স্টাফ নোটেশান পড়তে ও লিখতে জানতেন। তারই প্রভাবে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সংগীতগুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সংগীততাত্ত্বিক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য রীতিতে স্বরলিপি লিখন ও প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত সংগীতের ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয়েছিল, তার বিশিষ্ট কয়েকটি লক্ষণ ছিল :

ক) বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সংগীতের অনুশীলন।
খ) দেশজ বা লৌকিক, শাস্ত্রীয় এমনকি বিদেশি সংগীতের প্রতি সমশ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব।
গ) নিম্নরুচি, গ্রাম্য, অশ্লীল, অশিষ্ট বিষয়াশ্রিত গান সম্পর্কে একটা অনীহাবোধ।
ঘ) সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে বিশেষত শিক্ষিত সমাজে সংগীতবিদ্যার প্রচার করা।
ঙ) গুণী শিল্পীদের সমাদর।
চ) সংগীত প্রচারের জন্য সর্বজনবোধ্য স্বরলিপি প্রণয়ন।
ছ) সংগীতবিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রকাশ।
জ) সহজে সংগীতশিক্ষার জন্য সংগীত প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় স্থাপন।
ঝ) সর্বজনপাঠ্য সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ক পত্রপত্রিকাতেও স্বরলিপি প্রকাশ ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য এই সবকটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর-পরিবারের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা গীতিচর্চার ইতিহাসে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর কথাই আমরা আলোচনা করছি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চা শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথের আমল থেকে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক উৎসবে সংগীতের ভূমিকাকে অপরিহার্য করেছিলেন। ওস্তাদ সংগীতশিল্পীদের স্বগৃহে স্থান দিয়ে তিনি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। স্বয়ং গুণীর কাছে সংগীতশিক্ষাও করেছেন। পুত্রকন্যাদের নির্বিচারে ওস্তাদ রেখে গানবাজনা শিখিয়েছেন। সে শিক্ষায় ধ্রুপদ থেকে পিয়ানো কিছুই বাদ যায়নি। শুধু সংগীতচর্চাই নয়, ঠাকুর-পরিবারের সংগীত রচনার ঐতিহ্যও দেবেন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে মহর্ষিদেব নিজে এবং তাঁর প্রেরণায় তাঁর পুত্রকন্যারা যেসব গান রচনা করেছেন সেগুলি সংগীতানুরাগী ব্রাহ্মসমাজ যাতে সহজে শিক্ষা করে গাইতে পারে সেজন্য ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সে-সব গানের স্বরলিপি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। ভারতের সংগীতশিক্ষা চিরকালই গুরুমুখী, গুরুর কণ্ঠ থেকে শিষ্যের কণ্ঠে তার প্রচার। সে-সব গানের সুর অনেকক্ষেত্রে শ্রুতি ও কণ্ঠনৈপুণ্যের তারতম্যে প্রকৃত সুর থেকে অনেকটাই সরে গেছে। হয়তো আবার অনেক গানের সুর, সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে হারিয়েও গেছে।

> *জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চা শুরু হয়েছিল দ্বারকানাথের আমল থেকে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক উৎসবে সংগীতের ভূমিকাকে অপরিহার্য করেছিলেন।*

কেবলমাত্র গীতিরচনা ও সুরযোজনার ক্ষেত্রেই নয়, সংগীত সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও দূরদর্শিতা আমাদের বিস্মিত করে। শুধু গানের সৃষ্টিই নয়, সেই গানকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, ভাবীকালের জন্য সেসব গানের সুর সংরক্ষণ করতে যে সহজবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য সুর-সংকেত প্রণালী বা স্বরলিপি প্রণয়ন প্রয়োজন তা এই পরিবারের গুণী সদস্যেরাই প্রথম গুরুত্বের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকও বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় লিখিত কোনো স্বরলিপি পদ্ধতি

প্রণয়ন করে সকলের ব্যবহার্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রাথমিক খসড়া তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত একথা আমাদের সকলেরই জানা। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় তা আরও সূক্ষ্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভাদেবীও ১৩২০ সালে তাঁর ও ইন্দিরা দেবীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত আনন্দসংগীত পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকৃত আকারমাত্রিক স্বরলিপির ঈষৎ সংস্কার করে তাকে কোনো কোনো দিক থেকে উন্নততর করার চেষ্টা করেছিলেন। একথা তিনি নিজেই আনন্দসংগীত পত্রিকায় লিখে গেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলাদেবী সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন করে ১৩০৭-এ শতগান নামক গ্রন্থে এই পদ্ধতিতে রচিত একশোটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। শতগানের আগে ১৩০৪-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চারটি খণ্ডে প্রকাশিত স্বরলিপি গীতিমালায় প্রথম আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। সেই সময় প্রচলিত দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিকে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পরে দক্ষিণারঞ্জন সেন আরও জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আকারমাত্রিক দণ্ডমাত্রিককে সরিয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঠাকুর পরিবারের ভূমিকাই এই কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার।

ঠাকুর পরিবারের সংগীতচর্চা, সংগীতানুশীলন, সংগীতানুরাগ এইভাবেই ক্রমশ একটি ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এই পরিবারের তরুণদের হাতে বাংলার সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতির ধারাগুলি নবজাগরণের উদ্দীপনায় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সংগীতচর্চাকে তাঁরা কেবল পারিবারিক আভিজাত্যের অঙ্গরূপে গ্রহণ করেননি। সংগীতশিক্ষা ও প্রচারের পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানবুদ্ধিও কাজ করেছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথ যখন বাল্য অতিক্রম করে কৈশোরে উপনীত হয়েছিলেন তখন থেকেই পারিবারিক সংগীতসৃষ্টির প্রেরণা তাঁর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। স্বভাবতই কিশোর বয়স থেকেই তিনিও যখন গীতরচনা ও সুরযোজনায় প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই তাঁর গানগুলিকে উপযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগ্রহ বোধ করেছেন। তবে সেই সংগীত প্রচার ও সংরক্ষণে তাঁকে নতুন করে উদ্যম গ্রহণ করতে হয়নি। ঠাকুর পরিবার থেকে প্রকাশিত কোনো না কোনো পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে সে-সব গানের অধিকাংশেরই স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

স্বভাবতই কিশোর বয়স থেকেই তিনিও যখন গীতরচনা ও সুরযোজনায় প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই তাঁর গানগুলিকে উপযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আগ্রহ বোধ করেছেন। তবে সেই সংগীত প্রচার ও সংরক্ষণে তাঁকে নতুন করে উদ্যম গ্রহণ করতে হয়নি।

ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগেই বিভিন্ন সংগীতানুরাগী পরিবারে গানের স্বরলিপিও নিত্য ব্যবহার্য হয়ে ওঠে। এই পরিবার থেকে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী, বালক, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় সমকালে গীত বহু ব্রহ্মসংগীত বা অন্যান্য গানের পাঠ ছাড়াও অনেক স্বরলিপিও প্রকাশিত হয়েছে। সংগীত ও স্বরলিপি প্রচারেও এই পরিবার থেকে শুধুমাত্র স্বরলিপি সংবলিত পত্রপত্রিকা বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৯৭-এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বীণাবাদিনী পত্রিকায়, ১৯০৪-এ তাঁরই চার খণ্ডে স্বরলিপি-গীতিমালা গ্রন্থে, ১৯০৭-এ সরলাদেবীর শতগান গ্রন্থে অসংখ্য গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত-প্রকাশিকা, প্রতিভা দেবী-ইন্দিরা দেবীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত আনন্দসংগীত পত্রিকা স্বরলিপি প্রকাশ ও প্রচারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাতেও বেশ কিছু গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এইসব প্রকাশিত স্বরলিপির সিংহভাগই ছিল রবীন্দ্রনাথের গানের। যত অপরিণত বয়সের রচনাই হোক রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরে এমন একটি সৌষ্ঠব সুষমা ও অনুপম লাবণ্য ছিল যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর চেয়ে বারো বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতার গানগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বুঝে সেগুলির সংরক্ষণে ও প্রচারে বিশেষ যত্নশীল হয়েছিলেন। স্বয়ং সেইসব গানের স্বরলিপি করেছেন। প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী সম্ভবত তাঁরই শিক্ষায় স্বরলিপি রচনায় পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ করে প্রথম জীবনে স্বরলিপি প্রকাশের আয়োজন ছিল এত নিপুণ ও নিখুঁত।

মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকেই একাধিক ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন। সেই বয়স থেকেই তিনি বুঝেছিলেন তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি ব্রাহ্মসমাজেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাই স্বরলিপির মাধ্যমে সেগুলির সুর সংরক্ষণ এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছে সে-সব গানকে সহজ শিক্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনার শুরু থেকেই দেখা যায় ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপিই সর্বাগ্রে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়েছে। গানগুলির জনপ্রিয়তাই সেগুলির স্বরলিপিবদ্ধ হওয়ার মুখ্য কারণ ছিল বলে মনে করা যায়। এইভাবেই পরিবারভুক্ত এবং পরিবার বহির্ভূত ব্যক্তিরা জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিভা-সরলা-ইন্দিরা থেকে কাঙালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরও পরে অনাদিকুমার
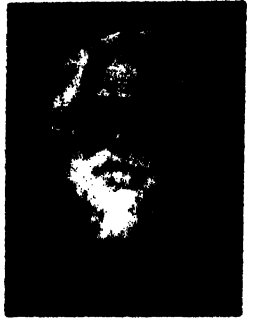
দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, সাহানা দেবী, রমা কর, বামন শিরোদকর, মোহিনী সেনগুপ্ত, সমরেশ চৌধুরী, বিদ্যাধর ওয়াবালওয়ার, অশোকা দেবী, প্রিয়নাথ দাস প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সুর সংরক্ষণ করে ত্রুটিহীন স্বরলিপি রেখে গেছেন, যা ক্রমে ক্রমে স্বরবিতানে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশের ইতিহাস একদিক থেকে রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তারও ইতিহাস। শুধু সংগীতেরই বা কেন, জনমানসে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিষ্ঠারও ইতিহাস। স্বরচিত গানের স্থায়িত্বের ব্যাপারে কবির এতটুকু সংশয় ছিল না। তাই স্বরলিপি রচনায় ব্যক্তিগত দক্ষতা না থাকায় রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে-সব গান যতদিন দিনেন্দ্রনাথকে কাছে পেয়েছেন তাঁকে নয়তো অন্য কাউকে শিখিয়ে দিতেন। তাঁরাও সযত্নে নিপুণ দক্ষতায় তখনই সেসব গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখিত পত্রিকাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতন, প্রবাসী, বিচিত্রা, সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে স্বরলিপি-গীতিমালা ও শতগানের পর কাঙালীচরণ সেনের ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপির ছটি খণ্ডেও (১৩১১—১৩১৮) অন্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। এরপর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত স্বরলিপি গ্রন্থ প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬), গীতলিপি (ছয় খণ্ড, ১৯১০—১৯১৮); দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতলেখা (তিন খণ্ড, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩২৭); গীতপঞ্চাশিকা (আশ্বিন ১৩২৫), বৈতালিক (চৈত্র ১৩২৫), কেতকী (শ্রাবণ ১৩২৬), শেফালি (ভাদ্র ১৩২৬), কাব্যগীতি (পৌষ ১৩২৬), গীতিবীথিকা (১৩২৬), নবগীতিকা (দুই খণ্ড ১৩২৯), বসন্ত (১৩৩০), গীত মালিকা (দুই খণ্ড ১৩৩৩, ১৩৩৬), বাল্মীকি-প্রতিভা (আশ্বিন ১৩৩৫), তপতী (১৩৩৬); ইন্দিরা দেবী-কৃত মায়ার খেলা (আষাঢ় ১৩৩২); দেবনাগরী হরফে ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত সংগীত গীতাঞ্জলি (১৯২৭); সুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী-কৃত শ্যামা (ভাদ্র ১৩৩৬); পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে এ. এ. বাকে-কৃত Twenty six songs of Rabindranath Tagore (১৯৩৫); শৈলজারঞ্জন মজুমদার-কৃত চিত্রাঙ্গদা (বৈশাখ ১৩৪৩), চণ্ডালিকা (চৈত্র ১৩৪৫), বিসর্জন* (চৈত্র ১৩৪৯) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে এসব স্বরলিপি এবং আরও অনেক নতুন গানের স্বরলিপি কালক্রমে স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে সুবিন্যস্তরূপে সংকলিত হতে থাকে। কবির জীবদ্দশায় স্বরবিতানের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে প্রথম (ভাদ্র ১৩৪২), দ্বিতীয় (আশ্বিন ১৩৪৩), তৃতীয় (বৈশাখ ১৩৪৫), পঞ্চম* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) খণ্ডের স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চতুর্থ (চৈত্র ১৩৪৬) খণ্ডের স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের সম্পাদনা করেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। উল্লেখ্য যে, বিসর্জন ও স্বরবিতান পঞ্চম খণ্ড রবীন্দ্র তিরোধানের পর প্রকাশিত হলেও সমসাময়িক গ্রন্থ হিসেবেই এ দুটিকে এই তালিকাভুক্ত করা হল।

কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর সর্বাধিক সংখ্যক গানের স্বরলিপি রচয়িতা দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রচার, শিক্ষণ ও স্বরলিপি রচনাতেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুর-ভুলে-যাওয়া স্বভাবের ঔদাসীন্য থেকে উদ্ধার করে তিনিই কয়েক শত রবীন্দ্রসংগীতকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। ১৯৩৫-এ রবীন্দ্রনাথের 'সকল গানের ভাণ্ডারি দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দিনেন্দ্র রচনাবলির ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন :

> 'চিরজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে করেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিস্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার সুরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন-কি অযোগ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাগ্র সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোনোদিন ক্লান্তি বা ধৈর্যচ্যুতি হতে দেখিনি।'

দিনেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য অনাদিকুমার দস্তিদার ঠিকই লিখেছিলেন, 'এই স্বরলিপিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানকে জীবিত রাখিবে।'

রাগ সংগীত বিশেষজ্ঞ, বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বরলিপি রচনার দক্ষতা কবিকে কতখানি বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল তা জানা যায় প্রফুল্লকুমার দাসকে লিখিত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পত্র থেকে। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> ''তখন আমি আদি ব্রাহ্মসমাজে সংগীতাচার্যের কাজ করি—কোন্ বছর ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় ১৯১০ সাল হবে। শীতকাল, পৌষ মাস; জোড়াসাঁকো থেকে খবর পেলাম, কবিগুরু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য, সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে সুরবাহার যন্ত্রটি। ''যথাসময়ে

আমরা একটু দেখে নিতে পারি মেঘদূত কাব্য কীভাবে স্পর্শ করে গেছে রবীন্দ্রনাথের বাদল দিনের গানগুলিকে। তবে এ কথা ভুললেও চলবে না যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় আঁকা সেসব চিত্র এক নতুন দিগন্তে আমাদের উত্তীর্ণ করে।

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি রচনা ও স্বরলিপি-গ্রন্থ সম্পাদনায় অনাদিকুমার দস্তিদারের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিনেন্দ্রনাথের শিষ্য অনাদিকুমার আমৃত্যু রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণ ও প্রচারে নিরলসভাবে নীরবে কাজ করে গেছেন।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর নিকট বসে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরো কয়েকজন। আমি যেতেই তিনি বললেন 'শুনেছি তুমি স্বরলিপি দ্রুত লিখতে পার। আচ্ছা, আমি গাই, তুমি এই কাগজ কলম নিয়ে স্বরলিপি কর।' আমি বললাম, 'আপনি গেয়ে যান, আমি লিখতে থাকি।' কবিগুরু বললেন, 'দেখ, আমি যে গানটা গাইব এই কাগজে তার কথাগুলোর উপর অনেকগুলো স্বর লিখিয়ে কাজ এগিয়ে রেখেছি।' আমি বললাম, 'ওর দরকার হবে না, আপনি গাইতে আরম্ভ করুন।' বিশ্বকবি গাইতে আরম্ভ করলেন, 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে'। আমার আঙুলচালনা দেখে দিনুবাবু সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই গানটির স্বরলিপি যথাযথভাবে হয়ে গেল এবং কবিগুরুকে শোনালাম। তিনি খুব আনন্দিত হয়ে দিনুবাবু প্রমুখকে বললেন, 'দেখলে, সব বিষয়েই যথার্থ শিক্ষা ও সাধনা চাই।' তারপর সেই দিনই কবিগুরুর ১০/১২টি গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করলাম। ...

"এরপর থেকে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যখনই তিনি আসতেন তখনই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর নূতন নূতন গানের স্বরলিপি করিয়ে নিতেন। এইভাবে তাঁর বহু গানের স্বরলিপি আমার দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল।"

(রবীন্দ্রসংগীত-লিপি—প্রফুল্লকুমার দাস, উত্তরসূরি, মহালয়া ১৩৭৫, পৃ ৭৮-৭৯)

অভিজ্ঞ স্বরলিপিকার দিয়ে নিজের গানের স্বরলিপি করানোর আগ্রহ কবির কতখানি ছিল তা এতেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি রচনা ও স্বরলিপি-গ্রন্থ সম্পাদনায় অনাদিকুমার দস্তিদারের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিনেন্দ্রনাথের শিষ্য অনাদিকুমার আমৃত্যু রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণ ও প্রচারে নিরলসভাবে নীরবে কাজ করে গেছেন। তাঁকে সংগীতভবনের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত করে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

> 'সঙ্গীতশিক্ষাই তোমার প্রধান বিষয়। বিশ্বভারতীর একটি প্রধান অঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যা। তুমি যদি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কর তাহলে আমি আনন্দলাভ করব এবং বিশ্বভারতীর পক্ষে সে একটা গৌরবের বিষয় হবে। ... তাছাড়া স্বরলিপি তোমার এমন অভ্যাস করা কর্তব্য যে এই পড়ার মত স্বরলিপি থেকে যাতে গান গাইতে পার অর্থাৎ প্রতিদিনই কিছু কিছু স্বরলিপি তোমাকে অভ্যাস করতে হবে। ... সঙ্গীতে তোমার নিষ্ঠা আছে বলেই আমি তোমাকে সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতা লাভ করতে উৎসাহ দিচ্ছি।'
>
> *(৫ আগস্ট ১৯১০)*

এর কদিন পরে ৩০ আগস্ট বিদেশ থেকে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

> 'বিশেষ যত্ন করে স্বরলিপি শিখো। স্বরলিপি এমন শেখা চাই যাতে দেখে বই পড়ার মত গান গাইতে পার—এদেশে অনেকেই তা পারে, সুতরাং এ কেবল অভ্যাসসাপেক্ষ। আর একটি কাজ কোরো—দিনুর কাছ থেকে ইংরেজি সঙ্গীতের STAFF NOTATIONS শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে।'
>
> *(রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ)*

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সম্পাদনায় ইন্দিরা দেবীর পরেই অনাদিকুমারের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী রাগসংগীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অনুরাগবশত তিনি ১৩৩৩ সালে দেবনাগরী হরফে রবীন্দ্রনাথের আটানব্বইটি গানের স্বরলিপি সংবলিত গ্রন্থ সংগীত গীতাঞ্জলি (১৯২৭) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন :

> 'বিশ্ববিখ্যাত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকী বনাই হুই গীতাঞ্জলি কবিতা রূপসে প্রসিদ্ধ হৈ। কিন্তু সংগীত মেঁ ভী য়হ এক হী গ্রন্থ হৈ। য়হ অভীতক হিন্দী-সংসারমেঁ সংগীতকে রূপসে অপ্রসিদ্ধ থা। কবিবর জিস প্রকার কবি-সম্রাট হৈ ঐসে হী সংগীত-সম্রাট ভী হৈ। ... গীতাঞ্জলীকে গানকে ভাবোঁ তথা স্বরোঁকা জিস প্রকার সামঞ্জস্য হৈ, সৌ ঔর কহীঁ নহী পায়া যাতা। হমারী ইচ্ছা হুই কি ইসকা রসাস্বাদন হিন্দী সংসার ভী কর সকে, ইসী বিচার সে স্বয়ং কবিবরকে সাথ রহকর ইন গানোঁকা স্বরসাধন কিয়া ঔর আজ দেবনাগরী লিপিমেঁ স্বরলিপি (Notation) করনেকা প্রয়াস কিয়া হৈ। ইন গানোঁকা চয়ন হমনে বংগলা গীতাঞ্জলি, অংগ্রেজী গীতাঞ্জলি, তথা ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থোঁসে কিয়া হৈ। 'বন্দেমাতরম্' তথা 'জনগণ' ইত্যাদি গানোঁকা ভী সমাবেশ

কিয়া হৈ। ইস গ্রন্থকা নাম স্বয়ং কবিবরনে সংগীত-গীতাঞ্জলি রক্‌খা হৈ।'

(রবীন্দ্রসংগীত লিপি—প্রফুল্লকুমার দাস, উত্তরসূরি, মহালয়া ১৩৭৫, পৃ. ৭৯-৮০)

দেবনাগরী অক্ষরে রবীন্দ্রগানের স্বরলিপি প্রকাশের ফলে সর্বভারতীয় স্তরে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও প্রসারের সুযোগ ঘটে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৩৪৯ সালের পর থেকে ১৩৫৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি সংবলিত কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ হয়নি। কিন্তু কবির মৃত্যুর পর তাঁর গানের অনুশীলন এবং প্রচার ক্রমশ বাড়তে থাকে ফলে ব্যবহারিক প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি গ্রন্থের চাহিদাও বাড়তে থাকে। এইসময় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের উদ্যোগে স্বরবিতান গ্রন্থমালা প্রকাশ ও পুনর্মুদ্রণের উদ্দেশ্যে চারজন সদস্যের একটি 'স্বরলিপি-সমিতি' গঠিত হয়। স্বরবিতান প্রথম খণ্ডের ভাদ্র ১৩৫৪ সালের মুদ্রণে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটি এইরকম :

> 'রবীন্দ্রসংগীতচর্চার জন্য সম্প্রতি দেশব্যাপী যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে, গত কয়েক বৎসর মুদ্রণকার্য-সংক্রান্ত নানা বাধায়, স্বরলিপি-সংগ্রহ নিয়মিত প্রকাশ করিয়া সে আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার আয়োজন বিশ্বভারতী করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি যাহাতে ভবিষ্যতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারে, সম্প্রতি সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশকালে বা স্বরলিপি-গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে অথবা লোকব্যবহারে রবীন্দ্রসংগীতের সুর সম্বন্ধে যে-সকল ভ্রান্তি বা চ্যুতি ঘটিয়াছিল তাহার সংস্কার; নূতন স্বরলিপি রচনা এবং সেগুলি সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ—এই সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন; শ্রী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে যে-সকল স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে, আশাকরি, সকলে তাহাই অনুসরণ করিবেন। ...'

অতঃপর এই সমিতির সভানেত্রী ইন্দিরা দেবী এবং সম্পাদক অনাদিকুমার দস্তিদারের নেতৃত্বে সমিতির তত্ত্বাবধানে স্বরবিতান গ্রন্থমালা প্রকাশিত হতে থাকে। বৈশাখ ১৩৭১ পর্যন্ত এই গ্রন্থমালার মোট উনষাটটি খণ্ড পুনর্মুদ্রিত অথবা নতুন প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের করা একটি গানের স্বরলিপি, এছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, কাঙালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভীমরাও শাস্ত্রী, এ এ বাকে, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, সুধীরচন্দ্র কর, সুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী, রমা কর, সাহানা দেবী, বামন শিরোদকর, সমরেশ চৌধুরী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনী সেনগুপ্তা, প্রফুল্লকুমার দাস-কৃত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও পরবর্তীকালে আরও চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে মোট তেষট্টিটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংরক্ষণ ও প্রচার, স্বরলিপিকরণ, লুপ্তপ্রায় গানগুলির সুর উদ্ধারে ইন্দিরা দেবীর ভূমিকা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। এছাড়া শৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষণ ও প্রচারে অভাবনীয় সাফল্যের দ্যোতক একথা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না। শান্তিদেব ঘোষও রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন থেকে আমৃত্যু এবং জীবনাবসানের পরেও কিছু মানুষের আন্তরিক অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর গানের স্বরলিপি এমন সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট, সুষ্ঠু পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রসংগীতের একটা নির্ভরযোগ্য স্থায়ী সুর আমরা সবসময়ই হাতের কাছে পাই যা সমসাময়িক আর কারো গানের ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠেনি। জনপ্রিয়তার কারণেই রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক সুর শিক্ষা, শিক্ষণ, গায়ন ও প্রচারের জন্য স্বরলিপি সংকলনের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আজও সমানভাবে অটুট আছে। রবীন্দ্ররচনার স্বত্ববিলোপের পরেও আজও নির্দ্বিধায় বলা যায় যতদিন স্বরবিতান আছে ততদিন রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বিকৃতির আশঙ্কা অনেক কম।

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি নিয়ে আর একধরনের সমস্যার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, সেটি হল একাধিক পূর্ব প্রকাশিত স্বরলিপির কোনো কোনো জায়গায় সুরের পরিবর্তন অথবা নবপ্রকাশিত কোনো স্বরলিপিতে পরিচিত প্রচলিত সুরে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। এ বিষয়ে প্রথম যিনি এ ক্ষেত্রে সংশয় ও প্রতিবাদ প্রকাশ্যে পেশ করেছিলেন তিনি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৬৮-তে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের গান' গ্রন্থে তিনি এ বিষয়ে এইরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন :

রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি নিয়ে আর একধরনের সমস্যার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য, সেটি হল একাধিক পূর্ব প্রকাশিত স্বরলিপির কোনো কোনো জায়গায় সুরের পরিবর্তন অথবা নবপ্রকাশিত কোনো স্বরলিপিতে পরিচিত প্রচলিত সুরে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন।

'এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নয়। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত, তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি স্বরলিপির বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সংগীতবিভাগের কর্তৃপক্ষের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্যেও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাতো যদি তাঁদের আত্ম-প্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন করে বিকৃত না করতো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে তাঁদের সংগীত-বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কী করে বরদাস্ত করেন ও কেন করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজি নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তাঁর সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়াভাবে রবীন্দ্রসংগীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকেদের দ্বারা।' (পৃ ৭-৮)

এই বিষয়ে আর এক প্রতিবাদী কণ্ঠের নাম কিরণশশী দে তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতের প্রামাণ্য সুর' (১৩৮৩) এবং 'রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি-জিজ্ঞাসা' (১৩৭৪) গ্রন্থদুটিতে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির বিষয়ে বহু জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। ২৬ ও ২৭ মার্চ, ১৯৮৮ বৈতালিক ও টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি বিষয়ক আলোচনাচক্রে তাঁর পঠিত 'রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সংক্রান্ত এই বিতর্কের সন্তোষজনক সমাধান কামনা করে বলেছিলেন :

'আজ আমি জীবনের এমন এক প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি যেখানে আর বিবাদ-বিতর্ক বাদানুবাদ-উষ্মা শোভা পায় না। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে আমি এই নিয়ে লিখেছি। ক্রমাগত সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, যাবতীয় হঠকারিতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছি। যদি তার কোনো ফল কোথাও ফলে থাকে তবে সেই আমার সার্থকতা। যদি কোথাও তার কোনো ফল নাও ঘটে, আমার শান্তি এই ভেবে যে গুরুদেবের গানের সংরক্ষণ ও সুস্থ প্রচারে আমি আমার যথাসাধ্য নিবেদন করেছি। আমার 'রবীন্দ্রসংগীতের প্রামাণ্য সুর' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে আমি এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংকলন করেছি এবং রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সমস্যা সমাধানের কিছু প্রস্তাবও সেখানে নিবেদন করেছি। আশা করি উৎসাহী ও জিজ্ঞাসু পাঠকবৃন্দ সেগুলি সম্পর্কে অবহিত আছেন। যদি আমার কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকে আপনারা দেখিয়ে দিলে আমি সানন্দে সংশোধন করব। আশা করব, রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সম্পর্কে সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা ঘটবে ও রবীন্দ্রসংগীতানুরাগী শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা সকলেই স্বস্তিবোধ করবেন।'

(রবীন্দ্রভাবনা, রবীন্দ্রচর্চাভবন কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ১৯৯০, পৃ. ২১)

স্বরলিপির এই শুদ্ধতা অশুদ্ধতা বিষয়ে বিতর্ক হয়তো কোনোদিনও শেষ হবে না, তবে সে সম্পর্কে কোনো মতামত প্রদান করা বর্তমান প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়।

●

বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত, তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তীকালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি স্বরলিপির বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১ রবীন্দ্রভাবনা, রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি বিষয়ক আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধের বিশেষ সংকলন সংখ্যা (১৯৯০) রবীন্দ্রচর্চাভবন প্রকাশিত।

২ প্রফুল্লকুমার দাসের প্রবন্ধ রবীন্দ্রসংগীত-লিপি, উত্তরসূরি 'রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক' বিশেষ সংখ্যা, মহালয়া ১৩৭৫।

৩ রবীন্দ্রসংগীত ভাবনা; রবিরঞ্জনী; ১৯৮৭, কলকাতা জয়ন্তী সান্যাল ও উৎপল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত)। প্রবন্ধ : রবীন্দ্রসংগীত ও স্বরলিপি—প্রফুল্লকুমার দাস।

৪ রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা—কিরণশশী দে, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট; ১৯৬৭ কলকাতা।

৫ রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক—অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

৬ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস : গীতপ্রাণ সাধক; প্রাক্তনী সুরঙ্গমা আয়োজিত প্রফুল্লকুমার দাস সংবর্ধনা সংখ্যা; এপ্রিল ১৯৯৩ কলকাতা।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপক

রবীন্দ্রসংগীত চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মৌসুমী পাল
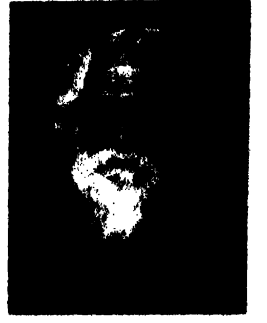
রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির অহংকার। বাঙালির জাতিসত্তার নিশ্চিত স্বরলিপি। রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমাদের ব্যক্তি-জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী। শুধুমাত্র ক্ষণিক বিনোদনের বস্তু হিসাবে এ গান সীমাবদ্ধ নয়। তাই রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে দেখি এ গানের ভাবমূল্য একটুও হ্রাস পায়নি। অথচ এর মধ্যে বাঙালির জীবনযাত্রা কত না বদলে গেছে। বিপুল সর্বনাশের মূল্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, রক্তাক্ত কুঠার দিয়ে ভূমি দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটেছে, মানবিক সম্পর্কের অবমূল্যায়ন হয়েছে, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক তোলপাড় ঘটে গেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন আরও অভাবিত, আরও ব্যাপক, আরও সুদূরপ্রসারী। আকাশে উপগ্রহ ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রায় এসেছে ইলেকট্রনিক যুগের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। তার সঙ্গে নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব, অর্থনীতির বিশ্বায়ন, ধনবন্টনের গভীর বৈষম্য, সুরুচি, নৈতিক আদর্শ, সুন্দরের ধ্যানধারণা, শুভ ও কল্যাণের সনাতন বিশ্বাস এইসব পুরনো বাড়ির পলেস্তারার মতো খসে পড়েছে। এই জাতীয় পরিবর্তনের তালিকা দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু এসব কিছুকে অতিক্রম করেও রবীন্দ্রসংগীত আরও উজ্জ্বল, আরও অন্তরঙ্গ, আরও জীবনসঞ্চালক হয়ে উঠেছে—এ বড়ো বিস্ময়। তাই রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আমাদের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাবের একটু সামগ্রিক পরিমাপ ও পরিচয় গ্রহণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। জানতে ইচ্ছা করে, রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে বাঙালির এই আগ্রহ ও সচেতনতা কবে থেকে তৈরি হতে শুরু করেছিল?

রবীন্দ্রনাথ সংগীতরচনা শুরু করেছিলেন, ধরা যাক, কুড়ি বছর বয়স থেকেই। কিন্তু তাঁর গানের উপর তেমন আলোচনা খুব একটা চোখে পড়ে না রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চাশ বছরের আগের পর্বে। বিপিনচন্দ্র পাল একবার পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে দু-চার কথা নাকি লিখেছিলেন। সেসব এখন দুর্লভ। পঞ্চাশ থেকে আশি বছরের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী, শেফালিকা শেঠ, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আরনল্ড বাকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর লেখাও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাঁর কাব্য ও সংগীতকে এক কোঠায় ফেলে কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। পুলক চন্দ ১৯৩২ সালে
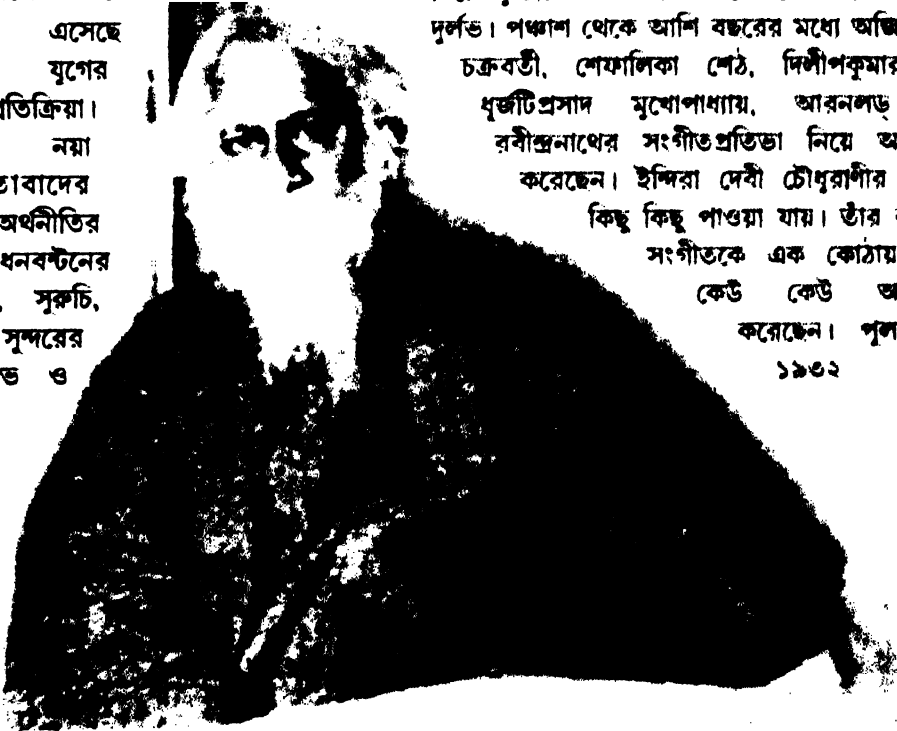
রবীন্দ্রসংগীত হয়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমাদের ব্যক্তি-জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী। শুধুমাত্র ক্ষণিক বিনোদনের বস্তু হিসাবে এ গান সীমাবদ্ধ নয়।
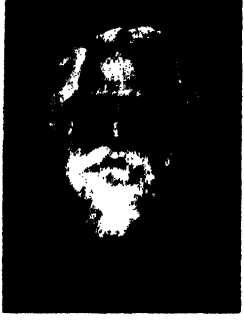
রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে যে বিদগ্ধ সমালোচনা গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্র-প্রতিভা নিয়ে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ ছিল। একটি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'সংগীত রবীন্দ্রনাথ' ও অন্যটি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের সংগীত'।

২

রবীন্দ্রপ্রয়াণ থেকে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ এই কুড়ি বছরে অবশ্য রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে কিছু আলোচনা, অনুশীলন, গবেষণা, ইতিহাস, রসাস্বাদন, তথ্যসংকলন ঘটেছে। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, নীহারবিন্দু সেন, জয়দেব রায়, কালিদাস নাগ, শুভ গুহঠাকুরতা এঁদের রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক গ্রন্থগুলি এই সময়কালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

এগুলির মধ্যে শান্তিদেব ঘোষ-ই তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' বই-এ (১৯৪২) রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশ ও বিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা প্রথম শুরু করেছিলেন।

জয়দেব রায় তাঁর 'রবীন্দ্রগীতি' (১৯৫৩), গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের প্রথম পর্ব, ঠাকুর পরিবারের সাংগীতিক প্রবণতা, রবীন্দ্রনাথের সংগীতজীবনের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ব্যক্তির সংগীতগুণীর, সংগীত শিক্ষকের প্রভাব—এইসব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কৌতুক সংগীত, হাস্যরসের গান বা হাসির গান ইত্যাদি নামে লঘু রসাত্মক কিছু গানের আলোচনায় প্রাক্ রবীন্দ্র গানের ভাণ্ডারে কৌতুকসংগীত রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও চয়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সমকালীন প্যারডিরও তিনি উল্লেখ করেছেন।

নীহারবিন্দু সেনের 'রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমপর্যায়' (১৯৫০), শুভ গুহঠাকুরতার 'রবীন্দ্রসংগীতের ধারা' (১৯৫৯) গ্রন্থ দুটি রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেই লিখিত। কালিদাস নাগের 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৯৫৭) এ সেই একই উদ্দেশ্যে লিখিত। নারায়ণ চৌধুরীর 'সংগীত পরিক্রমা' (১৯৫৫)-য় রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা কিছুটা নিরাসক্ত ও আবেগবর্জিত, প্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' (১৯৬০) কয়েক খণ্ডে রবীন্দ্রসংগীতের ঔপপত্তিক বিষয়গুলির সযত্ন চয়ন।

এছাড়া, প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন', অশোক সেনের 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা', প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ', দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থগুলির নানাবিধ আলোচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা অনেকটাই জায়গা পেয়েছে।

৩

১৯৬২ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতচর্চা যেমন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রন্থ রচনাও সেই সঙ্গে অনেক বেড়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী ও শিক্ষকতায় অভিজ্ঞদের কেউ কেউ এ-কাজে অগ্রসর হয়েছেন। যেমন কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক' (১৯৬২), রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি পাঠকের মনোযোগ নানাদিক থেকে আকৃষ্ট করেছে। বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসাগর সঙ্গমে' (১৯৬২), সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' : মনন ও শিল্প' (১৯৬২), সন্তোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্যের 'কনিকণ্ঠ' (১৯৬৩), জয়দেব রায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত পরিমণ্ডল' (১৯৬৫), কিরণশশী দের 'রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা' (১৯৬৭), অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক' (১৯৬৮), অরুণ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রসংগীতের স্বরসংগতি ও সুরবৈচিত্র্য' (১৯৬৯), প্রিয়ব্রত চৌধুরীর রবীন্দ্রসংগীত—লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব, প্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা'—তিন খণ্ড (১৯৭২-৭৪), শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা' (১৯৭২), সুবিনয় রায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত সাধনা' (১৯৭২), রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক' (১৯৭৩), ইন্দুভূষণ রায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত পরিচয়' (১৯৭৫), কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত কাব্য ও সুর' (১৯৭৫), কিরণশশী দের 'রবীন্দ্রসংগীত সুষমা' (১৯৭৫), শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ' (১৯৭৬), কিরণশশী দের 'রবীন্দ্রসংগীতের প্রামাণ্য সুর প্রসঙ্গ' (১৯৭৬), অমিতাভ চৌধুরীর 'হে বন্ধু হে প্রিয়' (১৯৭৭), অমল মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত সমীক্ষা'(১৯৭৭), দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদারের 'সংগীত সম্বন্ধ' (১৯৭৭), সুগতা সেনের 'রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য' (১৯৭৮), সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া' (১৯৭৮), অরুণকুমার বসুর 'বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত' (১৯৭৮), পঙ্কজকুমার মল্লিকের 'আমার যুগ আমার গান' (১৯৮০), শঙ্খ ঘোষের 'এ আমির আবরণ' (১৯৮০), সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'তবে তাই হোক' (১৯৮০), কিরণশশী দের 'রবীন্দ্রসংগীত : রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ' (১৯৮১), রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের 'রবীন্দ্রনাটকে গানের

১৯৬২ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীতচর্চা যেমন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রন্থ রচনাও সেই সঙ্গে অনেক বেড়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী ও শিক্ষকতায় অভিজ্ঞদের কেউ কেউ এ-কাজে অগ্রসর হয়েছেন।

ভূমিকা' (১৯৮১), সন্‌জিদা খাতুনের 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ' (১৯৮১), সুধাংশুশেখর শাসমলের 'ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত' (১৯৮১), বইগুলি রবীন্দ্রসংগীত-চর্চাকে বহুদূরে প্রসারিত করেছে।

রবীন্দ্রনাটকে গানের প্রয়োগ নিয়ে রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থগুলি যেমন কনক বন্দোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রতত্ত্বনাটক', আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র-নাট্যধারা', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা', শঙ্খ ঘোষের 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক'-এ কিছু কিছু আলোচনা আছে। সুতরাং এগুলি প্রত্যক্ষত সাহিত্যমুখী, পরোক্ষত সংগীতমুখী।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-পরবর্তী রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ক আলোচনায় একটি বড়ো অংশ স্থান পেয়েছে 'রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি-জিজ্ঞাসা'। স্বরলিপি গানের মুদ্রিত সুরসংকেত। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তাঁর গানের মুদ্রিত সুর বা স্বরলিপি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে এসেছে। সেই স্বরলিপি 'স্বরবিতান' গ্রন্থে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু স্বরবিতানের নতুন সংস্করণে অনেক গানের প্রচলিত সুরে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করে বিশেষজ্ঞরা বিপন্ন বোধ করেছেনও এই ব্যাপারে। সংগীত সমিতির উপর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনেছেন। শিল্পীদের মধ্যেও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখে পরে মুদ্রিত স্বরলিপিতে সেইসব শেখা গানের স্বরগত পরিবর্তন দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিরণশশী দে এবং সঙ্গত কারণেই অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন 'রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে। অন্যদিকে প্রফুল্লকুমার দাস যিনি দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর স্বরলিপি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি একাধিক প্রবন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্বরবিতানের নানাবিধ পরিবর্তন-রূপান্তরের সমর্থনে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। যেমন 'রবীন্দ্রসংগীত-লিপি' প্রকাশিত হয়েছে অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথের নানাদিক' গ্রন্থে।

তাছাড়া অরুণকুমার বসুর 'বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যরূপ বিষয়ে গভীর ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁর 'রবীন্দ্র-বিচিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের 'রাজা নাটক ও রাজাতত্ত্ব' প্রবন্ধেও এই জাতীয় সাংগীতিক, সাহিত্যিক বিচার দৃষ্ট হয়। প্রিয়ব্রত চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত-লোককীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ব্যক্তির, সংগীতগুণীর, সংগীত শিক্ষকের প্রভাব এইসব নিয়ে যথাসম্ভব, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। কাজটি যে সত্যই শ্রমসাধ্য তা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

সুবিনয় রায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত সাধনা' গ্রন্থটিতে শিক্ষার্থীর উপযোগী কিছু জরুরি তত্ত্ব আছে। রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রানুষঙ্গ বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন ধরেই জলঘোলা করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের গানে হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হবে না এসরাজ ব্যবহার করা হবে এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। এই বিষয়ে সুবিনয় রায়ের মতো প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী যথেষ্ট উদার, সংস্কারমুক্ত, স্বচ্ছ মনের পরিচয় দিয়েছেন।

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত সমীক্ষা'য় সমকালীন সংগীত রচয়িতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা করা হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় আর এক ধরনের প্রসঙ্গ বা বিষয়বস্তুর কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। সেগুলিকে রূপান্তর সংক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন সংগীতজীবন শুরু করেন তখন ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেই সংগীতচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সংগীত জীবনে তাঁর সংগীত সৃষ্টির সমান্তরাল ধারায় আর সমকালীন অনুজকল্প যে বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকাররা বাংলা গানের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, সেই সমকালীনদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং তাঁদের পারস্পরিক সাংগীতিক সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনাও রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। 'রবীন্দ্রনাথের গীতসাহিত্য' গ্রন্থে সুগতা সেন এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত কাজ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। দুঃখের অন্য পিঠেই আছে মৃত্যু। মৃত্যুর দুঃখই কঠিনতম দুঃখ। দুঃখের গানে মৃত্যুর ছায়া বারে বারেই পড়েছে। সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'তবে তাই হোক' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা দুঃখজনক ঘটনার প্রকৃষ্ট সাক্ষী এবং স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মনে আসে।

সন্‌জিদা খাতুন তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ' গ্রন্থে রবীন্দ্রসংগীতে সঞ্চারীর গুরুত্ব ও অভিনবত্বের কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীত বা রবীন্দ্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত গানের আলোচনায় সাহিত্যই প্রাধান্য পায়, সাংগীতিক ব্যাকরণ সেখানে অল্প অংশ অধিকার করে। রমেন্দ্রনারায়ণ নাগের 'রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা' এই জাতীয় গ্রন্থ।

১৯৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত চর্চার তালিকাটি ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছে। কয়েকটির উল্লেখ অনিবার্য :
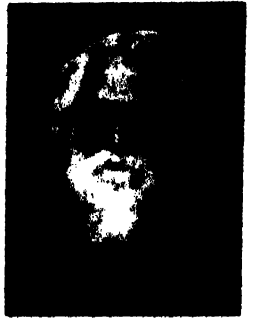
স্বয়ং দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখে পরে মুদ্রিত স্বরলিপিতে সেইসব শেখা গানের স্বরগত পরিবর্তন দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিরণশশী দে এবং সঙ্গত কারণেই অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন 'রবীন্দ্রসংগীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে।
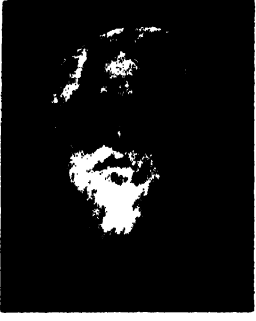
১৯৮২	'রবীন্দ্রগানের মুক্তধারা'	অরুণ ভট্টাচার্য
১৯৮২	'রবীন্দ্রসংগীত অন্বেষা'	কাজল সেনগুপ্ত
১৯৮২	'রবীন্দ্র সংগীতায়ন' (প্রথম খণ্ড)	সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী
১৯৮৩	'রবীন্দ্রসংগীত—বীক্ষা কথা ও সুর'	প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী
১৯৮৩	'রবীন্দ্রসংগীত জিজ্ঞাসা'	সুচিত্রা মিত্র
১৯৮৩	'রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান'	সুভাষ চৌধুরী (সম্পাদিত)
১৯৮৪	'পান্থজনের সখা'	আবু সয়ীদ আইয়ুর
১৯৮৪	'রবীন্দ্রসাহিত্য : মৃত্যুর অমৃতপাত্রে'	শিশিরকুমার সিংহ
১৯৮৪	'আলো আঁধারের সেতু রবীন্দ্র চিত্রকল্প'	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৮৪	'রবীন্দ্র সাহিত্যে সংগীত-ভাবনা'	সিতাংশু রায়
১৯৮৪	'রবিকররেখা'	সুধীরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
১৯৮৪	'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান'	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১৯৮৫	'সে অগ্নিতে দীপ্ত গীতে'	অনন্তকুমার চক্রবর্তী
১৯৮৫	'সুরের ধারা'	অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
১৯৮৫	'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান'	জয়ন্তী ভট্টাচার্য
১৯৮৫	'গানের লীলার সেই কিনারে'	সুধীর চক্রবর্তী
১৯৮৬	'আমার সংগীত ও আনুষঙ্গিক জীবন'	সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৯৮৬	'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু'	ধীরেন্দ্র দেবনাথ
১৯৮৭	'বিলাতী গান ভাঙা রবীন্দ্রসংগীত'	অনুরাধা পালচৌধুরী
১৯৮৭	'রবীন্দ্রনাথ নির্বাচিত রাগসংগীত'	অমলকুমার মিত্র
১৯৮৭	'হে বন্ধু হে প্রিয়'	অশোক রুদ্র
১৯৮৭	'রবীন্দ্রসংগীত ভাবনা'	জয়ন্তী সান্যাল ও উৎপল দাশগুপ্ত (সম্পাদিত)
১৯৮৭	'রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন'	দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার
১৯৮৭	'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা'	পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
১৯৮৭	'নির্জন এককের গান : রবীন্দ্রসংগীত'	সুধীর চক্রবর্তী
১৯৮৮	'সংগীত ও নন্দনতত্ত্ব'	সুচেতা চৌধুরি
১৯৮৯	'বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্র গীতিচর্চা'	কিরণশশী দে
১৯৮৯	'যাত্রাপথের আনন্দগান'	শৈলজারঞ্জন মজুমদার
১৯৮৯	'রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত'	সিদ্ধার্থ ঘোষ
১৯৯০	'রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে'	আবদুল আজাদ ও সন্‌জীদা খাতুন
১৯৯০	'রবীন্দ্র নাট্যপ্রসঙ্গ : সাংগীতিক প্রয়োগ	আলো সরকার
১৯৯০	'রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে'	নিতাই বসু
১৯৯০	'রবীন্দ্রসংগীত মিলন মেলা'	প্রসাদ সেন
১৯৯০	'রবীন্দ্রনাথ গীতিকার ও সুরকার'	ভাস্কর মিত্র
১৯৯০	'রবীন্দ্রসংগীতায়ন' (২য়)	সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরি
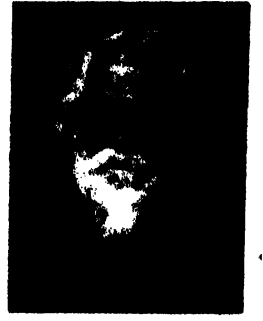
১৯৯১	'সংগীত প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ'	অমিতাভ ঘোষ
১৯৯১	'রবীন্দ্রসংগীত মানস'	গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল
১৯৯২	'সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত'	স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৯২	'রবীন্দ্র গানের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রসংগীতের ধারা'	কৃষ্ণা সরকার
১৯৯২	'রবীন্দ্রসংগীতের অনুভব'	ঋতীশ চক্রবর্তী
১৯৯২	'আলাপ থেকে বিস্তার'	আলপনা রায়
১৯৯৩	'রবীন্দ্রসংগীত : রাগ-সুর নির্দেশিকা'	সুধীর চন্দ
১৯৯৪	'রবীন্দ্র ভাবনা'	অনুকূলচন্দ্র দাশ
১৯৯৪	'নিভৃত প্রাণের দেবতা	লীলাশ্রী বসু
১৯৯৫	'বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ'	অশ্রুকুমার সিকদার
১৯৯৫	'সংস্কৃত সংগীতম'	দীপক ঘোষ
১৯৯৬	রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্ব-ভাবনা	অনিতা মুখোপাধ্যায়
১৯৯৬	ঋতুসংগীতে রবীন্দ্র-কবিমানস	অপূর্ব বিশ্বাস
১৯৯৬	রবীন্দ্রসংগীতে বৈচিত্র্য	অমিয়মুকুল দে
১৯৯৬	আমার এই পথচলাতেই আনন্দ	কৃষ্ণা দাশগুপ্ত
১৯৯৬	প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রসংগীত	সাধন দাশগুপ্ত
১৯৯৬	রবীন্দ্রসংগীতের ভিতর মহল	সঞ্জয় মজুমদার
১৯৯৭	দূরের নীলিমা : আশ্রম কন্যার জীবন ও গান	অরুন্ধতী দেব (সম্পাদিত)
১৯৯৭	অশোকতরু	ঋতুপর্ণা রায় ও ভাস্বতী চক্রবর্তী (সম্পাদিত)
১৯৯৭	ভাঙা দিনের ভেলা	পীযূষকান্তি সরকার
১৯৯৭	রবীন্দ্রসংগীতের রবিনছড	পীযূষকান্তি সরকার
১৯৯৮	রবীন্দ্রনাথের গান	সুকুমার সেন
১৯৯৮	মোহর	সুমিতা সামন্ত (সম্পাদিত)
১৯৯৯	তোমার সুরের প্রতিধ্বনি	অনন্তকুমার চক্রবর্তী
১৯৯৯	'গানের তানের সে উন্মাদনে'	কুমকুম ভট্টাচার্য
২০০০	রবীন্দ্রসংগীতচর্চা : গ্রন্থপঞ্জি	মৌসুমী পাল (সংকলিত)
২০০৩	রবীন্দ্রসংগীত কোষ	প্রতিমা দাস (সংকলিত)

রবীন্দ্রসংগীত এই প্রজন্মকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে বলেই তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে বিবর্তনের দিক থেকে বুঝতে চেয়েছেন, উদ্‌বর্তনের দিক থেকে মাপতে চেয়েছেন ও পরিবর্তনের দিক থেকে আঁকতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহাসিক, সাংগীতিক, নান্দনিক মূল্যায়নে আধুনিক প্রজন্মের ক্রমবর্ধমান আগ্রহই এই গ্রন্থতালিকার নেপথ্যে সক্রিয় ; একথা নিশ্চিত বলা যায়। রবীন্দ্রসংগীত এই প্রজন্মকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে বলেই তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে বিবর্তনের দিক থেকে বুঝতে চেয়েছেন, উদ্‌বর্তনের দিক থেকে মাপতে চেয়েছেন ও পরিবর্তনের দিক থেকে আঁকতে চেয়েছেন। বাংলা গানের যে ধারায় আবির্ভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রচলিত ঐতিহ্যকে ভেঙেচুরে দিয়ে নতুন সৃষ্টির প্রবাহকে উদবারিত করলেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ইঙ্গিতমূলক আলোচনা আছে সুধীর চক্রবর্তীর 'নির্জন এককের গান : রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে।

রবীন্দ্রসংগীতের বিকাশ ও বিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা যদিও শুরু করেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে, তথাপি তারপর থেকে আজ অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত আলোচনায় যাঁরাই অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের প্রথম পর্ব, ঠাকুর পরিবারের সাংগীতিক প্রবণতা,

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন ব্যক্তির, সংগীত গুণীর, সংগীত শিক্ষকের প্রভাব—এইসব নিয়ে অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান', অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা', সুধীরকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'রবিকররেখা', ভাস্কর মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথ-গীতিকার ও সুরকার', মণীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রসংগীত-বিচিন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য যথেষ্টই পাওয়া যায়।

ডঃ স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য রবীন্দ্রসংগীতের সমগ্র শিল্পরূপ। অধিকাংশ লেখকই যেখানে জোর দিয়ে থাকেন, রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ এবং কাব্যমূল্যের উপর, সেখানে এই দিকটিকে অবহেলা না করেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত বেশি জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের সুর, গঠন ও কথার সেই ধ্রুপদী বিশেষত্বের উপর যেখানে রবীন্দ্রসংগীতের নিজত্ব। বেশি মনোযোগ দিয়েছেন সুরের সেই সব বিশেষত্বের উপর যে বিশেষত্বের কারণে এই সুর নিমেষে মনের মধ্যে ঢেউ তুলে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা অভ্রান্তভাবে চিনতে পারি। আমার বিবেচনায় এখানেই লেখিকার মৌলিকতা।

সুধীর চক্রবর্তীর 'গানের লীলার সেই কিনারে' গ্রন্থের 'সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ : বৃক্ষ ও বনস্পতি' প্রবন্ধে শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যান্য গীতিকারদের কাব্যসংগীতগত তুলনাই নেই, এঁদের পারস্পরিক সংগীত রচনার নির্মিত বা স্টাইলেরও চমৎকার তুলনা আছে।

বাংলাদেশের সংগীত বিশেষজ্ঞ করুণাময় গোস্বামীর 'রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা'য় কালগত পরিক্রমার কোনও উদ্যোগই নেই। বিভিন্ন কিছু প্রবন্ধে রবীন্দ্রসংগীতের যুগ বিশেষের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শ্রী সুবোধরঞ্জন রায় তাঁর 'প্রকৃতির গানে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে গভীর সাংগীতিক রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গান থেকে তিনি 'প্রভাতের গান', 'সন্ধ্যার গান'—'রাত্রির গান'। এইসব বিষয়েও অপূর্ব রসাস্বাদ করেছেন।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রসংগীত বীক্ষা : কথা ও সুর' গ্রন্থে সাহিত্য ও সংগীত দুই বিষয়েই লেখকের অন্যান্য বিশেষজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে।

'পান্থজনের সখা' গ্রন্থে আবু সয়ীদ আইয়ুব 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' এই শিরোনামটি প্রথম ব্যবহার করেন। সুচিন্তিত ভাবঘন উক্ত প্রবন্ধে তিনি পূজা পর্যায়ের দুঃখ উপপর্যায়েরই সীমাবদ্ধ রাখেননি তাঁর আলোচনাকে। সর্বপ্রথমে তিনি গানের উল্লেখ করেছেন, 'যাতে দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয় সর্বজাগতিক ; যাতে কবির অথবা যে কোনও বিরহীর অন্তর্বেদনা একাকার হয়ে মিলেছে বিশ্ববেদনার সঙ্গে এবং সারাজগতের বেদনা একটি ব্যক্তির হৃদয়ে জমাট বেঁধে অসাধারণ তীব্রতা লাভ করেছে।' (পৃঃ ২১)

'রবীন্দ্রসংগীতের ভিতর মহল' গ্রন্থের লেখক সঞ্জয় মজুমদার তাঁর বইয়ে অন্যান্য অধ্যায়ের মধ্যে 'দিনান্তবেলায়' নামক একটি অধ্যায়ে কবির গানে মৃত্যুর স্বরূপ বোনার চেষ্টা করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' গ্রন্থে জয়ন্তী ভট্টাচার্য দুঃখের গানকে তাঁর বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু করেছেন। শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর এই গ্রন্থে দুঃখের গান বলতে গীতবিতানের পূজা পর্যায়ের দুঃখ উপপর্যায়ের গানের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তাঁর মতে, কবির গান বিশ্লেষণ করলে, 'ঈশ্বর-সন্ধানে, মানবিক-প্রেমে, দেশ-চেতনায়, প্রকৃতি আস্বাদনে অনুভূতির সমস্ত আধারেই দুঃখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়।' ফলে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র পর্যায়ের গান, নাটকের গান, উপন্যাসের গান থেকে তিনি দুঃখের রস নিঙড়ে বের করেছেন।

সুকুমার মল্লিক তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা'-য় এবং দুলাল চৌধুরী তাঁর 'শান্তিনিকেতনের উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ' নামক দুটি দীর্ঘ, সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ গ্রন্থেও শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত উৎসব ও তথ্যসংক্রান্ত, কবিসৃষ্ট সংগীতের উল্লেখ করেছেন।

সুকুমার মল্লিক তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা'-য় এবং দুলাল চৌধুরী তাঁর 'শান্তি-নিকেতনের উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ' নামক দুটি দীর্ঘ, সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ গ্রন্থেও শান্তি-নিকেতনে প্রবর্তিত উৎসব ও তথ্যসংক্রান্ত, কবিসৃষ্ট সংগীতের উল্লেখ করেছেন।

নিজের জন্মদিনকে স্মরণ করেও কবির বেশ কিছু গানের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সম্পর্কে অনেকেই আলোকপাত করেছেন। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা' গ্রন্থে 'জন্মদিন আসে বারে বারে' প্রবন্ধে সেগুলির উপর আলোকপাত করেছেন।

৪

শুধু কি গ্রন্থ রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে আলোচিত হয়েছে এমন কত অসংখ্য প্রবন্ধ পত্রপত্রিকায় বা লিটল্ ম্যাগাজিনে নানান সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত প্রবন্ধের বিপুল সম্ভার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচনায় বাঁধা যায় না। এবার অল্প কিছু প্রবন্ধের আলোচনা বা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও বিবর্তন অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিক থেকে

রবীন্দ্রসংগীতের পর্যালোচনা, ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ, সংগীতশিক্ষক ও সমকালীনদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা, কালগতভাবে রবীন্দ্রসৃষ্টির আলোচনা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে আসে রাজ্যেশ্বর মিত্রের কথা।

উনিশ শতকের বাংলা গানের পটভূমিকা, মেজাজ, লঘুচারিতা ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানকে বুঝতে চেয়েছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর তিনটি প্রবন্ধে। প্রথমটি 'উনিশ শতকের বাংলা গানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীত'[1], দ্বিতীয়টি 'বাংলা গানের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-সংগীত'[2] এবং তৃতীয়টি 'পুরাতন বাংলা গানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ'।[3]

কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাধিক সমৃদ্ধ প্রবন্ধটি লিখেছেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। তিনি অত্যন্ত সতর্ক অন্বেষায় দেখিয়েছেন গত শতকের কবিসংগীত তথা মালসী, বিরহ, খেউড়, আমনী-বিজয়া, কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি গীতিপর্যায়, কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারদের বিভিন্ন রচনার ভিতর দিয়ে কিভাবে রবীন্দ্রসংগীতের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে।[4]

ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ, রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষক, সমকালীনদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও মূল্যায়ন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন অনেক প্রবন্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য পাওয়া যায়।যেমন সুচন্দ্রা গুপ্তের 'রবীন্দ্র-সংগীতের বিবর্তন পর্যায়'[5], কিরণশশী দে'র 'রবীন্দ্রগীতির উৎস সন্ধানে'[6], নামক দুটি প্রবন্ধে, রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের 'ভারতীয় সংগীতের ভাববৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথ', প্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্রসংগীত রচনার নেপথ্যভূমি'[7], পূর্ণেন্দুশেখর সিংহের 'ভারতীয় ভাবধারার আদর্শে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য'[8], বিমল কুঠারীর 'রবীন্দ্রসংগীতের গোড়ার কথা' ও 'রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও স্তর বিভাগ'[10], সুভাষ চৌধুরির 'রবীন্দ্রনাথের গান কতখানি রবীন্দ্রসংগীত'[11], প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিরণশশী দে তাঁর 'রবীন্দ্রগীতির উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড এবং সেকেলে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায় কেমন ছিল সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতে, বিশেষ করে প্রথম জীবনের সংগীতচর্চায় জ্যোতিরিন্দ্র প্রভাব বসুমিত্র মজুমদারের আর একটি প্রবন্ধে[12] পুনরালোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনের উন্মেষপর্বে জ্যোতিরিন্দ্র প্রভাব সম্পর্কে সর্বাধিক তথ্যনিষ্ঠ, সুলিখিত প্রবন্ধটি আমাদের উপহার দিয়েছেন নেপাল মজুমদার। তাঁর লেখা 'পশ্চিম-বঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম পর্বের ধারক : জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ'[13] এই বিষয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

সুভাষ চৌধুরীর 'সংগীত উষার শুকতারা'[14] প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য ও কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারা কতটুকু প্রভাবিত হয়েছিলেন, কী পরিমাণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানে ঢুকে গেছে এবং উভয়ে একই ধরনের উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছেন, এ সবের তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায় 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গীতিকার ও সুরকার' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরিক্ত ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য ব্যক্তির রচিত গান এবং সাধারণভাবে সংগীতচর্চার তথ্যগুলি একত্রে সংকলন করেছেন।[15]

'রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সাংগীতিক পরিমণ্ডল' নিয়ে কুমকুম ভট্টাচার্য[16] একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর আলোচনাতে নতুন তথ্য না থাকলেও মোটের উপর পরিচিত তথ্যগুলোকে সুন্দর করে সাজাতে পেরেছেন। আর আর্যকুমার মুখোপাধ্যায় 'বিষ্ণু চক্রবর্তী ও ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা' নামক একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে[17] রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীতশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।
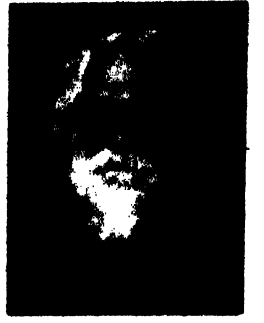
উনিশ শতকের বাংলা গানের পটভূমিকা, মেজাজ, লঘুচারিতা ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানকে বুঝতে চেয়েছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর তিনটি প্রবন্ধে।
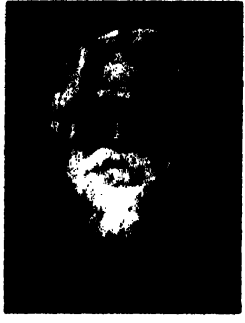
সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ'[১৯] একটি অত্যন্ত সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত অরুণকুমার বসুর অতুলপ্রসাদ সেন সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ, 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুধীর চক্রবর্তীর 'রজনীকান্তের গান'[২০], 'সাহিত্য সংস্কৃতিতে প্রকাশিত মানস বসুর 'নজরুল মননে রবীন্দ্রসংগীত'[২১], অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুল সম্পর্কে তিনটি বিচ্ছিন্ন রচনা। এইগুলিতেও উক্ত সংগীত স্রষ্টাদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

নারায়ণ চৌধুরি 'রবীন্দ্রজীবনের তিনস্তর' প্রবন্ধে[২২] রবীন্দ্রসংগীতের সাংগীতিক বিকাশকে ১৮৮০ থেকে কুড়ি বছরের হিসেবে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। তবে এই বিভাগ সকলে মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ। অসিতকুমার দত্তও 'রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে এই জাতীয় চেষ্টা করেছেন।[২৩]

গীতাঞ্জলি সম্পর্কে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিতে 'গীত' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও আক্ষরিক অর্থে সবকটি যে সুরারোপিত গান নয় তা বলাই বাহুল্য। কেবল গীতাঞ্জলির সুরারোপিত গানগুলিকেই গীতাঞ্জলি পর্বের গানরূপে গ্রহণ করে আমরা রবীন্দ্রসংগীতের বা রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টির ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করতে পারি। এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন, প্রবীণ রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ প্রফুল্লকুমার দাস তাঁর 'গীতাঞ্জলির গান'[২৪] প্রবন্ধে।

গীতাঞ্জলি সম্পর্কে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। গীতাঞ্জলির কবিতাগুলিতে 'গীত' শব্দটি থাকা সত্ত্বেও আক্ষরিক অর্থে সবকটি যে সুরারোপিত গান নয় তা বলাই বাহুল্য।

'গীতাঞ্জলির গান' এই মর্মে রবীন্দ্রসদনে 'ইন্দিরা' শিল্পীগোষ্ঠী একটি নির্বাচিত গীতি অনুষ্ঠান নিবেদন করেছিল।[২৫] কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে গীতাঞ্জলির গানের সুরগত বিশিষ্টতার কোনও তাত্ত্বিক আলোচনা শোনানো হয়নি। যদিও গীতাঞ্জলির গানের সুরগত বিশিষ্টতা সম্পর্কে সেই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত গানগুলির সুনির্দিষ্ট মান উপস্থাপিত হয়েছিল। তার পরিচয় পাওয়া যায় অধ্যাপক অরুণ বসু লিখিত একটি বিবরণ থেকে।

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ঋতু অনুযায়ী রচনাকাল সমীক্ষা' নামে একটি অন্য ধরনের প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়।[২৬] লেখক বিমলেন্দু দাস একটি নমুনা সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের অধিকাংশই রচিত হয়েছে গ্রীষ্মে ও বর্ষায়। তাঁর মতে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান যে পরিমাণে রচিত, তার সংখ্যা কমতে শুরু করে শরৎ থেকে হেমন্ত ও শীতে আরও কমে আসে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু প্রকৃতি বিষয়ক গানের আলোচনায় আমাদের চোখে পড়েছে এই লেখাগুলি।

১। রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির ভূমিকা—পরিমল গোস্বামী, রবীন্দ্রভারতী, শ্রাবণ—আশ্বিন, ১৩৭৯
২। রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণের গান—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৯৭
৩। রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণের গান—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল—জুন, ১৯৮৯
৪। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রভাত—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল—জুন, ১৯৮৯
৫। রবীন্দ্রগানে সন্ধ্যা—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৭৫
৬। রবীন্দ্রনাথের হেমন্ত ও শীতের গান—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৯৪
৭। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান ও আমরা—সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সাহিত্য সেতু (প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ), বৈশাখ—শ্রাবণ, ১৩৯৩
৮। নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে—অপূর্ব বিশ্বাস, বনানী, এপ্রিল—মে, ১৯৮৯
৯। রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম ও পূজা—শ্যামশ্রী লাল, নিষ্পন্ন, জুলাই ১৯৮৬
১০। ঋতুরাগ ও রবীন্দ্রনাথ—সুলেখা ঘোষ, রূপান্বয়, এপ্রিল—জুন, ১৯৮৫
১১। 'পূজা'-র গানে ঈশ্বর—সঞ্জয় মজুমদার, রবীন্দ্রভাবনা, আগস্ট, ১৯৯১
১২। শেষ দুই দশকের গান : প্রকৃতি—অপূর্ব বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৩
১৩। সংগীত ও পূজা—মৈত্রেয়ী দেবী, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, ১৩৯৫
১৪। রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভবন'—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৪০০
১৫। পূজা পর্যায়ে ঈশ্বর উপলব্ধি—বুলবুল ইয়াসমিন, গীতিকুঞ্জের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা, ১২ এপ্রিল, ১৯৯৮।

বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক পরিমল গোস্বামী 'রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির ভূমিকা' প্রবন্ধে[২৭] প্রকৃতিকে গানের মধ্যে উপস্থাপিত করা অথবা, গানের ভাবকে প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি অনুভবের কথা বলেছেন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি প্রবন্ধে[২৮] প্রেম, পূজা ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আপাত নির্দিষ্ট

এই তিনটি পর্যায়েই ওই দারুণ সংগ্রাম ও সামঞ্জস্য একের সঙ্গে বিচিত্রের। ফলত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজা পর্যায়ের গানকে প্রকৃতি ও প্রেমের গান বললে অন্যায় হয় না ; প্রকৃতি পর্যায়ের গানকেও পূজা বা প্রেমের গান হিসাবে দেখলে ভুল হয় না এবং প্রেমের গানের মধ্যেও অপর দুই প্রশাখায় প্রচুর মঞ্জরী দেখে সেই দুটি অভিধায় অভিহিত করলে অবৈধ হয় না। তাঁর প্রেমের বোধ প্রকৃতি ও পূজার যোগফল, প্রকৃতি—চেতনা প্রেম এবং পূজার একটি চিত্রিত আধার এবং পূজা, প্রেম ও প্রকৃতির হরগৌরী পরিণয়ের মতোই।''

সুলেখা ঘোষের 'ঋতুরাগ ও রবীন্দ্রনাথ'' একটি করে গানের ছত্র উদ্ধার করে তার গদ্যভাষ্য। শ্যামশ্রী লাল অবশ্য এই প্রেম ও পূজা সম্পর্কে গতানুগতিক ভাষার বাইরে কিছু কথা বলেছেন। এই প্রবন্ধে'' তিনি চারখানি গানের আলোচনা করেছেন। যদিও এই চারখানি গান সম্পর্কে তাঁর আলোচনার মূল কথা তিনি শঙ্খ ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়েই বুঝিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূজার গান বা ভক্তির গান নিয়ে সম্প্রতি অনেকে নানা ধরনের আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে সম্ভবত প্রাচীনতম লেখাটি হল 'ধর্মসংগীত' এই নামের একটি প্রবন্ধ যা রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য প্রথম যুগের রবীন্দ্রসমালোচক, অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা এবং ব্রহ্মসংগীতে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা বিষয়ে একদা বিপিনচন্দ্র পাল পত্র-পত্রিকায় কিছু মন্তব্য করেছিলেন, অন্যান্য প্রবন্ধের সাক্ষ্যে তা জানা যায়।

এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সুভাষ চৌধুরি ও সুচিত্রা মিত্র সম্পাদিত প্রথম খণ্ড 'রবীন্দ্রসংগীতায়ন' গ্রন্থে, প্রবন্ধটির নাম 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত'। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক অরুণকুমার বসু রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত এবং সাধারণভাবে পূজা পর্যায়ের গান এগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতি' এই শিরোনামে নরেন্দ্রকুমার মিত্র 'বাংলা ভাষা' নামক একটি প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মার্চ—মে, ১৯৯৫) বলেছেন''—

রবীন্দ্রনাথের পূজার গান বা ভক্তির গান নিয়ে সম্প্রতি অনেকে নানা ধরনের আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে সম্ভবত প্রাচীনতম লেখাটি হল 'ধর্মসংগীত' এই নামের একটি প্রবন্ধ যা রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য প্রথম যুগের রবীন্দ্রসমালোচক, অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠান। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি পাঠ করছেন ক্ষিতিমোহন সেন

"'ভক্তিগীতি' রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু 'নাম-গান' নয় হার্দিক প্রেমের গান যেখানে লীলাময় ব্রহ্ম প্রকাশিত হচ্ছেন ও সত্যের চেতনার স্পর্শ প্রকাশ করেছেন এবং যেখানে পৃথিবীকে আনন্দময় হতে দেখে তারই বন্দনা করছেন আনন্দগান গেয়ে। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলোকে বেছে নিয়েছেন যেখানে তিনি প্রভু, পিতা, সখা, সুন্দর, করুণাময়, বন্ধু, গুণী, তুমি, তোমার, স্বামী, নাথ, দেবতা, রাজা, প্রিয়, অন্তরতম, ভুবনেশ্বর, অন্তর্যামী, জীবনস্বামী, প্রাণের ঠাকুর ইত্যাদি নামের সঙ্গে নানা বিশেষণ সংযোগ করে গীতরচনা করেছেন।

অসিতকুমার দত্ত 'গীতলেখা'[৩২] শিরোনামে 'প্রতিদিনের প্রার্থনা', 'জীবনদেবতার গান', 'হরিপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা' প্রভৃতি পর্যায়ে অনেক গানকে সামনে রেখে কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসংগীত সম্পর্কে জয়দেব রায় 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকায় শারদীয় ১৩৮৯ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন[৩৩], "ব্রহ্মসংগীত রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ হিন্দি ভজন গানের সঙ্গে রূপ ও ভঙ্গিমার পার্থক্য সৃজন। আর এজন্যই কীর্তন বা বাউল রীতিকে যথাসম্ভব পরিহার করা হল। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য সারা ভারতের গানের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে আনা হল বিভিন্ন ভঙ্গিমা।"

ভক্তিগীতি' রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু 'নাম-গান' নয় হার্দিক প্রেমের গান যেখানে লীলাময় ব্রহ্ম প্রকাশিত হচ্ছেন ও সত্যের চেতনার স্পর্শ প্রকাশ করেছেন এবং যেখানে পৃথিবীকে আনন্দময় হতে দেখে তারই বন্দনা করছেন আনন্দগান গেয়ে।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে প্রাজ্ঞ দিলীপকুমার বিশ্বাস একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন[৩৪], দেশ সাহিত্য সংখ্যায়, ১৩৯৩ সালে। প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত'। আলোচ্য প্রবন্ধটি আমাদের বহু তথ্যের সন্ধান দেয়।

অনন্তকুমার চক্রবর্তীর লেখা 'ব্রহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি বিমল কর সম্পাদিত শিলাদিত্য পত্রিকার নবপর্যায়ের দ্বিতীয় বর্ষ, বারো সংখ্যা অর্থাৎ মে, ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই প্রবন্ধে ব্রহ্মসংগীতকে গবেষকের দৃষ্টিতে দেখে কিছু মতামত দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনা তাঁর সাহিত্যের একটি বাদী সুর। এ সম্পর্কে কয়েকটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক অরুণ কুমার বসুর দুটি প্রবন্ধ, একটি রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ পর্যায়—দু-একটি বিনীত প্রস্তাব[৩৫] এবং অপরটি 'রবীন্দ্রসংগীতের' স্বদেশ পর্যায় : একটি সমীক্ষা'।[৩৬] 'রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান'—সুচিত্রা মিত্র[৩৭], 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত ও উত্তরকালের সংগীতে তার প্রভাব'—সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৮], 'কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা'—বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী[৩৯], 'জাতীয়তা ও রবীন্দ্রসংগীত' বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[৪০]

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়েছে। তবে সব আলোচনা একত্রীভূত করা অনেক সময়সাপেক্ষ। তাই এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান'[৪১] প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথের সুখের গান এই নিয়ে কেউ প্রবন্ধ লেখেননি, কিন্তু 'দুঃখের গান' এই শিরোনামটি একাধিক প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। দুঃখের অন্য পিঠেই আছে মৃত্যু। মৃত্যুর দুঃখই কঠিনতম দুঃখ। দুঃখের গানে মৃত্যুর ছায়া বারেবারেই পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা স্বভাবতই প্রাসঙ্গিক দুঃখের গানও উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলির উপর আলোকপাত করেছেন।

মৃত্যুর বিষয়ে গানের একটি স্বতন্ত্র আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় সুবোধরঞ্জন রায়ের একটি প্রবন্ধে (রবীন্দ্রনাথের গানে মৃত্যুর স্বরূপ)।[৪২] অধ্যাপক রায়ের প্রবন্ধে রবীন্দ্র চেতনায় মৃত্যুর স্বরূপ প্রথাগত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটিতে যেমন তিনি মৃত্যুতত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি সুর সম্পর্কেও তাঁর বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঠিক মৃত্যু সম্পর্কিত গানের আলোচনা না হলেও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদৃষ্টিভঙ্গির একটা উজ্জ্বল

বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার ১৯৯৩, ৮ মে রবীন্দ্র জন্মদিবসের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায়।[৩৭]

রবীন্দ্রসংগীতের কৌতুক সংগীত, হাস্যরসের গান বা হাসির গান এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অনেক গ্রন্থে। অনেক প্রবন্ধে যেমন 'রবীন্দ্রনাথ ও নবীনবন্দনা'—বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায়[৩৮], অমিতাভ চৌধুরীর 'ভাঙনের জয়গান গাও'[৩৯] প্রবন্ধে যৌবন চেতনাকে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে চিত্রলেখা চৌধুরীর 'আনন্দগান'[৩৯] প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ বিচক্ষণ আলোচনা লিখেছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গানের ভাষার আড়াল'[৩৭] নামে তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত রাজা, প্রভু, নাথ প্রভৃতি শব্দের বাচ্যার্থ ও গূঢ়ার্থ নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা আছে। এছাড়া এই বিষয় নিয়ে আরও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন : বিশ্বজীবন মজুমদারের 'সুরে যার শুরু কথায় তার পূর্ণতা'[৩৮], উৎপলকুমার গুপ্তের 'অধরা মাধুরী'[৩৯] এবং ডঃ রমা চৌধুরীর 'তোমার অমল অমৃত পড়িবে ঝরিয়া'।[৪০]

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে অনেক কিছুই আলোচনা করা সম্ভব হল না। এগুলির মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষের বই, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলি, দক্ষিণীর পত্রপত্রিকা, পুরনো গীতবিতান বার্ষিকী, অমিয় চক্রবর্তীর বই, বুদ্ধদেব বসুর বই, বুলা মহলানবীশের গ্রন্থ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের, গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি ইত্যাদি নানা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা আছে। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দপ্রয়োগ, কথা ও সুর অথবা রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও লোকসংগীতের প্রভাব, রাগের ব্যবহার, পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব, লোকসংগীতের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান, রবীন্দ্রনাটকে, গল্পে, উপন্যাসে গানের আলোচনা, কবিতার সঙ্গে গানের তুলনা, তাঁর গানে ধর্ম ও দর্শনের প্রতিফলন, রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থে গান, স্বরলিপি বিষয়ক আলোচনা, রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা, প্রচার, শিক্ষণ, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন, রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রানুষঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখালেখি-প্রবন্ধ-আলোচনা, ভাষা-বিতর্ক আজও অব্যাহত। নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধের উল্লেখ করে এই বিষয়ের উপর একটি অসম্পূর্ণ প্রতিবেদনমাত্র উপস্থাপিত হল।

উল্লেখসূত্র :

১। উনিশ শতকের বাংলা গানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীত—রাজ্যেশ্বর মিত্র, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৩।

২। বাংলাগানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রসংগীত—রাজ্যেশ্বর মিত্র, উত্তরসূরি, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩

৩। পুরাতন বাংলা গানের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ—রাজ্যেশ্বর মিত্র, রবীন্দ্রসংগীতায়ন (প্রথম খণ্ড) সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরি সম্পাদিত, প্যাপিরাস, ১৯৯০

৪। 'দূর রজনীর স্বপন লাগে'—অরুণকুমার বসু, 'বিষয়—কলকাতা', জাতীয় গ্রন্থাগার সমিতি, ১৯৯৩

৫। রবীন্দ্রসংগীতের বিবর্তন পর্যায়—সুচন্দ্রা গুপ্ত, তৌর্যত্রিক, এপ্রিল—মে ১৯৬৭

৬। রবীন্দ্রগীতির উৎস সন্ধানে—কিরণশশী দে, সুরের মায়া, ২য় বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৫

৭। ভারতীয় সংগীতের ভাববৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথ—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, রবীন্দ্রভারতী, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৭৯

৮। রবীন্দ্রসংগীত রচনার নেপথ্যভূমি—প্রফুল্লকুমার দাস, অন্বিষ্ট, নভেম্বর ১৯৭৪

৯। ভারতীয় ভাবধারার আদর্শে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য—পূর্ণেন্দুশেখর সিংহ, সাহিত্য ভারতী, জুন ১৯৭৭

১০। রবীন্দ্রসংগীতের গোড়ার কথা—বিমল কুঠারী, রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও স্তর বিভাগ—বিমল কুঠারী, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, বর্ষ ৩ এবং ৪, পঁচিশে বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮৯-৯০

১১। রবীন্দ্রনাথের গান কতখানি রবীন্দ্রসংগীত ? —সুভাষ চৌধুরি, পরিবর্তন, ১৫ মে ১৯৮০

১২। রবীন্দ্রসংগীতে জ্যোতিরিন্দ্র-প্রেরণা—বসুমিত্র মজুমদার, বিদগ্ধ মে ১৯৯৫

১৩। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম পর্বের ধারক : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—নেপাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০৩

১৪। সংগীত উষার শুকতারা—সুভাষ চৌধুরি, কলকাতা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, আগস্ট ১৯৭৭

১৫। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গীতিকার-সুরকার—শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়, দেশ, বিনোদন, ১৯৮৪

রবীন্দ্রসংগীতের ভাষা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ বিচক্ষণ আলোচনা লিখেছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গানের ভাষার আড়াল'[৩৭] নামে তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রসংগীতে প্রযুক্ত রাজা, প্রভু, নাথ প্রভৃতি শব্দের বাচ্যার্থ ও গূঢ়ার্থ নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা আছে।

১৬। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সাংগীতিক পরিমণ্ডল—কুমকুম ভট্টাচার্য, সমবীন, ১৫ মার্চ, ১৯৯৭

১৭। বিষ্ণু চক্রবর্তী ও ঠাকুরবাড়ির সংগীতচর্চা—আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, ২৫ বৈশাখ ১৩৯০

১৮। সমকালীন গীতিকার ও রবীন্দ্রনাথ—সুশীল চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীত বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী, ১৯৮২

১৯। অতুলপ্রসাদ সেন—অরুণকুমার বসু, তত্ত্বকৌমুদী, বর্ষ ৮৯, আশ্বিন ১৩৭৩

২০। রজনীকান্তের গান—সুধীর চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী, কার্তিক—পৌষ ১৩৭২

২১। নজরুল মননে রবীন্দ্রসংগীত—মানস বসু, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৯৬

২২। রবীন্দ্র জীবনের তিন স্তর—নারায়ণ চৌধুরী, অতিথি, এপ্রিল—জুন ১৯৮০

২৩। রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ—অসিতকুমার দত্ত, গীতলেখা, নববর্ষ ১৩৯৫

২৪। গীতাঞ্জলির গান—প্রফুল্লকুমার দাস, গীতবিতান রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৬১

২৫। গীতাঞ্জলির গান—অরুণ বসু, বারোমাস, আগস্ট ১৯৭৮

২৬। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ঋতু অনুযায়ী রচনাকাল সমীক্ষা—বিমলেন্দু দাস, বালাসন, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

২৭। রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতির ভূমিকা—পরিমল গোস্বামী, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৭৯

২৮। প্রেম, পূজা, প্রকৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, গীতবিতান রবীন্দ্রশতবর্ষ সংখ্যা, ১৯৬১

২৯। ঋতুরাগ ও রবীন্দ্রনাথ—সুলেখা ঘোষ, রূপান্তর, এপ্রিল—জুন, ১৯৮৫

৩০। রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম ও পূজা,—শ্যামশ্রী লাল, নিষ্পন্ন, জুলাই ১৯৮৬

৩১। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতি—নরেন্দ্রকুমার মিত্র, বাংলাভাষা, মার্চ—মে ১৯৯৫

৩২। গীতলেখা—অসিতকুমার দত্ত, নববর্ষ, ১৩৯৫

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসংগীত—জয়দেব রায়, শিল্প ও সাহিত্য, সেপ্টেম্বর ১৯৮২

৩৪। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত—দিলীপকুমার বিশ্বাস, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৩

৩৫। রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ-পর্যায়—দু-একটি বিনীত প্রস্তাব—অরুণকুমার বসু, বাংলা সংগীত মেলা, স্মারক, এপ্রিল ১৯৯৮

৩৬। রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ পর্যায় : একটি সমীক্ষা—অরুণকুমার বসু, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৩

৩৭। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান—সুচিত্রা মিত্র, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৯৪

৩৮। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীত ও উত্তরকালের সংগীতে তার প্রভাব—সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবমানস, মে ১৯৮৬

৩৯। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা—বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরি, সবুজ সাথী সংঘ, সময়ের উল্লেখ নেই।

৪০। জাতীয়তা ও রবীন্দ্রসংগীত—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রিপন কলেজ ম্যাগাজিন, বর্ষ ২৬, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৯৪১

৪১। আধুনিক মন ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা স্মারক পত্র, ১৩৯০

৪২। রবীন্দ্রনাথের গানে মৃত্যুর স্বরূপ—সুবোধরঞ্জন রায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল—জুন, ১৯৯৪

৪৩। Life in Death—Pabitra Sarkar, The Statesman, supplement on R. N. Tagore, on his 132nd Birth Anniversary, May 8, 1993

৪৪। রবীন্দ্রনাথ ও নবীন বন্দনা—বাসন্তী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ সংস্কৃতি, ১২৫তম জন্মবার্ষিকী সংকলন, মে ১৯৮৬

৪৫। ভাঙনের জয়গান গাও—অমিতাভ চৌধুরি, শ্যামীক মে ১৯৯১

৪৬। আনন্দ গান—চিত্রলেখা চৌধুরি, আনন্দ জগৎ, মে ১৯৭৯

৪৭। গানের ভাষার আড়াল—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচয়, শারদ ১৩৮২

৪৮। সুরে যার শুরু কথায় তার পূর্ণতা—বিশ্বজীবন মজুমদার, প্রকাশিত গীতিকুঞ্জ স্মারক, ১২ এপ্রিল ১৯৯৮

৪৯। অধরা মাধুরী—উৎপলকুমার গুপ্ত, বনানি, মে ১৯৮৯

৫০। তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া—ডঃ রমা চৌধুরি, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র, ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৯।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক

গীতবিতান : বিকল্প বিন্যাসের অনুভাবনা

লীলাশ্রী বসু
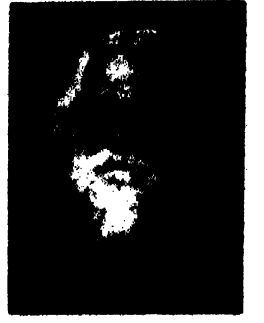
সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে পূর্ণের, ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগের একটি নিগূঢ় সুনিবিড় সম্বন্ধের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত সত্য, এবং এই অনুভূতিও রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ মতবাদের রূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহা যে একান্তই কবিগুরুর নিজস্ব তাহা নহে ; আমাদের দেশের প্রাচীন মননধারার মধ্যে হয়ত এই প্রত্যয়ের পরিচয় আছে। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে ইহা একটি বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিচার্য তাহা নহে। এই মতবাদের সঙ্গেই আবার রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার রহস্যও জড়িত ; কিন্তু তাহাও আলোচ্য নহে। বলিবার কথা এই যে, এই সীমা অসীমের সম্বন্ধ, এই জীবন দেবতার রহস্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ নয়, কোনো প্রকার ধর্মের সূত্র নয়, শুদ্ধ অনাবিল অনুভূতি মাত্র। অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্র রূপ ফুটিয়া ওঠে ; আবার এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন আকাশই সুবিস্তৃত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমাদের ব্যক্তিজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি করিয়াই সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে একটি অশেষ অপরূপ চিরন্তন লীলা চলিয়াছে ; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান

বলিবার কথা এই যে, এই সীমা অসীমের সম্বন্ধ, এই জীবন দেবতার রহস্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইহা কিছু তত্ত্ব বা মতবাদ নয়, কোনো প্রকার ধর্মের সূত্র নয়, শুদ্ধ অনাবিল অনুভূতি মাত্র।

করিয়াছেন, একটি অপূর্ব সুগভীর রহস্য রূপে অনুভব করিয়াছেন।

[নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ৫ম সংস্করণ]

ললিতকলার সবকটি শাখাতেই রবীন্দ্র প্রতিভার প্রসারণ ঘটলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি মাত্র পরিচয়কেই সত্য বলে স্বীকার করেছেন—তিনি কবিমাত্র। কবি জীবনের পরম বাণীটি একমাত্র সংগীতের মধ্য দিয়েই তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন—'লাগলো ভালো মন ভোলানো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই।' কবিতার সমান্তর ধারায় রবীন্দ্রনাথ নিরলসভাবে গান বেঁধেছেন। কবিতায় যেমন প্রেম, প্রকৃতি, পূজা ও স্বদেশের অনুষ্ঠান তাঁর গানেও তেমনি আইডিয়ার বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। তথাপি রবীন্দ্রসংগীত ঠিক ভাববস্তুর ভারে আমাদের মননশীলতার কাছে যতটা না আবেদন উপস্থিত করে, তার লঘুপক্ষ শব্দ সমূহের পাখিরা তার চেয়ে বেশি বাতাস পায় সুরের আকাশে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত গানগুলির সংকলন প্রকাশে নিজে যতটা না আগ্রহী ছিলেন তার চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ সুহৃদ বন্ধুরা। তাই প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কিছু গীত সংকলন গ্রন্থ—রবিচ্ছায়া, প্রবাহিনী, কাব্যগ্রন্থাবলী, গান, ধর্মসংগীত, বৈকালী, গীতিচর্চা এবং সর্বোপরি গীতবিতান, এগুলির মধ্যে একমাত্র গীতবিতান ছাড়া অন্য গ্রন্থগুলিতে গানগুলির বিষয় বিভাগ তেমন সুচিন্তিত ছিল না, ধর্ম সংগীত, জাতীয় সংগীত, গান, বাউল, বিবিধ—এই ধরনের কয়েকটি বিভাগের মধ্যেই সেগুলি বিভাজিত ছিল। অবশ্যই একথা স্বীকার্য যে, যে সময়ে গীত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের গান রচনা শেষ হয়ে যায়নি। তাই ওই গ্রন্থগুলিকে কখনোই রবীন্দ্রগীতের পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা যায় না।

গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কালানুক্রমিকভাবে গানগুলিকে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু সে বিন্যাস রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারেনি। তাঁর চেতনার জগৎ কখনও নিছক তথ্যের নীরস বন্ধনকে মেনে নেয়নি।

গীতবিতানে এসেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানকে একত্রিত করা হল এবং বিষয়ানুক্রমে সেগুলিকে সাজানো হল। অবশ্য গীতবিতানের প্রথম সংস্করণে এই বিষয়ানুক্রম ছিল না। গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কালানুক্রমিকভাবে গানগুলিকে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু সে বিন্যাস রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারেনি। তাঁর চেতনার জগৎ কখনও নিছক তথ্যের নীরস বন্ধনকে মেনে নেয়নি। আর তাই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর গানের ক্রম সাজুক ভাবের অনুষঙ্গে। গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণে তাই আমরা পেলাম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাজানো গানের বিন্যাস—ভাবের অনুষঙ্গে।

এই ভাবানুক্রমে সাজানো গানগুলি নিঃসন্দেহে গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার কাছাকাছি নিয়ে যায় আমাদের। তবুও তাঁর গানের সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম ভাবগুলি অস্পষ্টতার কুহেলিকা ভেদ করে একটা প্রশ্ন চিহ্নের মূর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়—এই কি শেষ! নিয়ত পরিবর্তনশীল রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে থাকলে হয়ত নিজের সৃষ্টিকে আবার পাল্টে ফেলতেন—শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে! তাঁর কাছে কোনও কিছুই কি শেষ বলে প্রতিভাত হয়েছিল? এক ভাবনা থেকে আর এক ভাবনায় শেষ থেকে ফের শুরুতে সঞ্চরণ তো তাঁর সৃষ্টিতে নিয়তই দেখতে পাই আমরা। তাই হয়তো আবার নতুন ক্রমে সাজত গীতবিতানের গানগুলি।

ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলিকে সাজানোর পেছনে রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতা তা তিনি গীতবিতানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতেই ব্যক্ত করেছিলেন :—

'গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল, সেইজন্য এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতি কাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।'

কবির এই উক্তি প্রমাণ করে যে গীতবিতানের গানগুলিকে কবি সুরের সহযোগিতা ছাড়াই গীতি কবিতারূপে পাঠকদের সমাদরের উপকরণ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব অনুভাবনায় ভাবিত হয়েই এই বিষয় বিভাগ করেছিলেন। ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি এই তিন বিশাল ব্যাপ্তিতেই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি পরিক্রমা। কাব্য অথবা সংগীত দুই ক্ষেত্রেই মুগ্ধ কবির মানসাভিসার এই তিন ভুবনের পথ ধরে। তাই তাঁর গানে নিভৃত প্রাণের দেবতার আহ্বান যেমন শোনা যায়, যেমন কবির ভক্তি বিগলিত বিনম্র নিবেদন ফুলের মত সুরভিত করে মনকে, তেমনি মানবিক প্রেমের রহস্যময় গতি কখনও বিরহাভাসে, কখনও প্রতীক্ষায় আকুল প্রেমিকার অশ্রুজলের মত সিক্ত করে আমাদের ভাবনাকে, আবার প্রকৃতির বিচিত্র লীলার সৌন্দর্যময় প্রকাশ আমাদের হৃদয়ের গোপন তন্ত্রীতে কোন সুদূরের ইঙ্গিত বয়ে আনে।

গীতবিতানে ছটি পর্যায়ের মধ্যে একমাত্র পূজার গানগুলিকেই কবি স্বয়ং সূক্ষ্ম বিষয় ভেদে একুশটি

উপপর্যায়ে ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রেমের গানে মাত্র দুটি উপপর্যায় এবং প্রকৃতির গান শুধুমাত্র ঋতুভেদে বিভক্ত। স্বদেশ পর্যায়ের গানে কোনও উপপর্যায় নেই। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত গানগুলি রয়েছে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে এবং অবশিষ্ট যে গানগুলি এই সকল পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না সেগুলি 'বিচিত্র' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। গীতবিতানের গানগুলিকে বিষয় ভেদে পৃথক করে রবীন্দ্রনাথ তাদের কাব্যের মর্যাদাতুল্য করেছেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই এ কথা স্বীকার করেন যে এই পর্যায় বিভাগকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানেই এমন এক সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা তথা অন্তর্লীন এক অনুভূতির আভাস আছে যা অবলীলায় গানগুলিকে পর্যায় বদল করে গাওয়া চলে। সব গানের ক্ষেত্রে এ কথা সত্যি না হলেও এই সম্ভাবনার গানগুলির সংখ্যা প্রাচুর্য রবীন্দ্রানুরাগীদের জিজ্ঞাসু মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাত্ম চেতনার গানগুলিকে ব্রহ্মসংগীত বা ধর্ম সংগীতের গণ্ডী থেকে বের করে পূজার বিশ্বজনীনতায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু একথা তো অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনা মানেই শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভক্তিচেতনা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর তথা দেবতাকে খুঁজেছিলেন এক অন্তর্মুখীন ভাবনার পথ ধরে। আমাদের মনের মধ্যেই সেই পরম সুন্দরের বাস—বাউল তত্ত্বের এই প্রত্যয় তাঁর মনে শুধু যে অনুরণন তুলেই থেমে যায়নি তার পরিচয় তাঁর গানগুলিতেই প্রতিষ্ঠিত। যে কোনো পর্যায়ের গানের মধ্যেই সেই বিরাট 'আমি'র সঙ্গে এই ক্ষুদ্র 'আমি'র চেনা জানার আভাস আমরা পাই।

গীতবিতানের পর্যায় বিভাগের বিকল্প পরিকল্পনা করা যায় কিনা এ নিয়ে সকল রবীন্দ্রানুরাগীদের মনেই হয়তো একটা নিরুচ্চার প্রশ্ন রয়েছে। সুতরাং বিকল্প বিন্যাসের একটা তালিকা করে তার গ্রহণযোগ্যতা বিচারের ভার পাঠকের ওপর দেওয়ার একটা প্রয়াস করা যেতে পারে।

এই কাজে অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের বর্তমান পর্যায় বিন্যাসকে ভুলে গিয়ে গীতবিতানের সব গানগুলির ভাব, চিত্রকল্প এবং বিষয়কে ভাবনার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা কোন্ কোন্ পথ ধরে পরিক্রমা করেছে এটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখব বিশেষ কতকগুলি অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবি চেতনাকে সৃষ্টির উদ্দীপনা জুগিয়েছে। তার মধ্যে একটা হল অরূপের অনুভূতি। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির পেছনে যে কোনও এক অদেখা সত্তার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ রয়েছে একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। সেই অদেখা অরূপের সাক্ষাৎ যেসব গানে আমরা পাব সেই গানগুলিকে একত্রিত করে সেই পর্যায় বা বিভাগের নাম দেওয়া যেতে পারে—অরূপ বা অন্তর্যামী। যেমন :

পূজা পর্যায়ের—

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
অরূপ তোমার বাণী
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
প্রভু তোমার বীণা
তুমি একলা ঘরে বসে বসে
কবে আমি বাহির হলেম
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
সীমার মাঝে অসীম তুমি
আমারে তুমি অশেষ করেছ
আমার না বলা বাণীর
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
ইত্যাদি।

প্রেম পর্যায়ের—

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে
যে ছায়ারে ধরব বলে
ওরে আমার হৃদয় আমার
আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা যাওয়া
আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে
বাজিল কাহার বীণা
আমারে করো তোমার বীণা
আমার পরাণ লয়ে কী খেলা খেলাবে
সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে—
ইত্যাদি।

প্রকৃতি পর্যায়ের—

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও
কত যে তুমি মনোহর
নাই রস নাই
হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
এসো শ্যামল সুন্দর
গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব
আজি শ্রাবণ ঘন গহনমোহে গোপন
তব চরণ ফেলে
এসো হে এসো সজল ঘন বাদল বরিষণে
ইত্যাদি।

পূজা, প্রেম বা প্রকৃতির গানের মধ্যে যেসব গানে সমর্পণের আভাস আছে সেগুলির পর্যায় হতে পারে, 'নিবেদন' অথবা 'সমর্পণ'। এই সমর্পণ ঐশী অথবা মানবিক যে কোনো রকমই হতে পারে। যেমন এই গানগুলি—
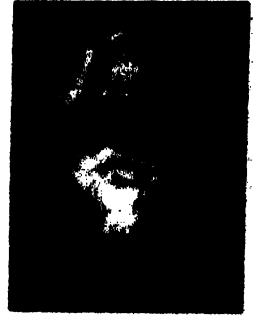
একথা তো অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনা মানেই শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভক্তিচেতনা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বর তথা দেবতাকে খুঁজেছিলেন এক অন্তর্মুখীন ভাবনার পথ ধরে।

ও অকূলের কূল
প্রভু আমার প্রিয় আমার
আমার অভিমানের বদলে
তোমায় কিছু দেব বলে
ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
তুমি একটু কেবল বসতে দিও
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
মনে হোল যেন পেরিয়ে এলেম
আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে
বাকি আমি রাখব না কিছুই
আমি কী বলে করিব নিবেদন
আমার মল্লিকা বনে যখন
প্রথম ধরেছে কলি...

ইত্যাদি।

স্বপ্নময়তা রবীন্দ্রনাথের গানের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নতন্ময় কবিমন প্রতিদিনের ধূলি মলিন জীবনের কন্দরে কন্দরে বপন করেছে স্বপ্নের বীজ। অঙ্কুরিত সেই বীজ ক্রমে শাখায় শাখায় পল্লবিত কুসুমিত হয়ে সুরভিত করে তুলেছে তাঁর গানের ভাণ্ডার। কবির এই স্বপ্নিল চেতনাকে ধরা যেতে পারে 'স্বপ্ন' নামে একটি পর্যায়ের বন্ধনে। সেই পর্যায়ে থাকতে পারে :

ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী
স্বপ্নে আমার মনে হোল
স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
এবার উজাড় করে লও
এসো আমার ঘরে
মধু গন্ধে ভরা
আমি তখন ছিলেম মগন....

ইত্যাদি।

সুরের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক সংযোগ কবির মনে সুদূরের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে বার বার, সৃষ্টি করেছে এক অনির্বচনীয় আবেগ। এক পথে চলতে চলতে কবির ভাবনা গতি পরিবর্তন করেছে এই সুদূরেরই আহ্বানে।

'গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া ওঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে—তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যেভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কত রকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।' 'সুদূর' নামে একটি পর্যায়ে কবির এই অনুভূতির গানগুলিকে একত্রিত করা যেতে পারে। যেমন :

আমি চঞ্চল হে....
আমার আপন গান....
এবার আমায় ডাকলে দূরে....
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে....
আজি এই গন্ধ বিধুর সমীরণে....
নীল আকাশের কোণে কোণে....

ইত্যাদি।

কবি যেন সকল সময় কারও প্রতীক্ষা করেছেন। কেবলই তাঁর মনে হয়েছে—হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে। কবির এই প্রতীক্ষারত ভাবনাকে যেসব গানের মধ্যে আভাসিত হতে দেখা যায় সেই গানগুলিকে গ্রথিত করা যেতে পারে 'প্রতীক্ষা' নামে একটি পর্যায়ের গ্রন্থিতে।

কবির গানে আরও যেসব অনুভূতির আভাস পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান অনুভূতি হল প্রতীক্ষা। কবি যেন সকল সময় কারও প্রতীক্ষা করেছেন। কেবলই তাঁর মনে হয়েছে—হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে। কবির এই প্রতীক্ষারত ভাবনাকে যেসব গানের মধ্যে আভাসিত হতে দেখা যায় সেই গানগুলিকে গ্রথিত করা যেতে পারে 'প্রতীক্ষা' নামে একটি পর্যায়ের গ্রন্থিতে। সেখানে থাকতে পারে এই গানগুলি—

ওই শুনি যেন চরণ ধ্বনি রে
আসা যাওয়ার মাঝখানে
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
আমি কান পেতে রই
বনে যদি ফুটল কুসুম
আমার জ্বলেনি আলো
এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও
হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
মেঘের পরে মেঘ জমেছে
উতল ধারা বাদল ঝরে
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে....

ইত্যাদি।

আরও যে সমস্ত পর্যায় হিসেবে গানগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে সেগুলির মধ্যে রয়েছে—অভিসার, আকাঙ্ক্ষা, প্রশ্ন, আনন্দ, উৎসব, পরিচয়, স্মৃতি, মানসী, ছবি, আলো, অশেষ, নিভৃতচারিণী—ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, এও শেষ নয়। আরও অনেক কিছু হতে পারে এবং একথাও মনে হয় এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'পূজা'র উপপর্যায় নির্দেশ করার পর প্রেম এবং প্রকৃতিতে এসে নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতির রাশটি টেনে ধরে পাঠকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর গানগুলিকে, উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন আমাদের ভাবনাকে।

লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক, রবীন্দ্রসংগীত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রসংগীত : একাল থেকে সেকাল

অমিতাভ চৌধুরি
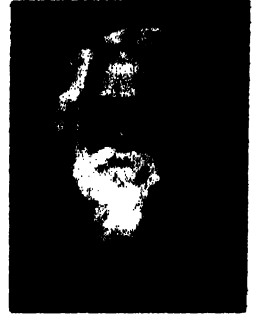
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক ঘরোয়া আসরে বলেছিলেন, অখণ্ড গীতবিতানের যেকোনও পৃষ্ঠা থেকে একটা না একটা গান তিনি পুরো মুখস্থ বলতে পারেন। শুধু মুখস্থ নয়, তিনি গাইতেও পারেন। না গাইতে পারলেও আমি প্রায় তাঁর মতোই যেকোনও পৃষ্ঠার অন্তত একটা গান পুরো বলতে পারি। তার কারণ 'একজন গায় খুলিয়া গলা, আর একজন গায় মনে মনে।' এই মনে মনে গাওয়া কণ্ঠের অক্ষমতা হলেও, মনের নয়। অর্থাৎ গাইতে না পারলেও আমি গীতবিতান পড়ি। যেকথা আমি প্রকাশ করতে পারি না, যেভাব মনের মধ্যেই গোপন থাকে, তাকে রবীন্দ্রনাথ এতো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, মনে হয় কথাগুলো যেন শুধু আমারই, শুধু আমারই।

আসলে, শোকে সান্ত্বনা দেয়, সুখে সঙ্গী হয়, আমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত মুখর রাখে এই রবীন্দ্রসংগীতই। প্রিয়সঙ্গসুখের কালে কিংবা প্রিয় বিচ্ছেদের প্রাক্কালে কিংবা ভোরের আকাশ দেখা বিস্ময়ে কবির গানের কলি ভাষা জুগিয়ে দেয় আমার ঠোঁটে। মনে হয় ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমারই জন্যে যেন ওই বিশেষ গানটি লেখা। একখানা অখণ্ড গীতবিতানের ভেতর একটি অখণ্ড জীবন ধরা।

আমি শৈশব থেকে রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশে মানুষ। 'কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ মাঝে, জানি
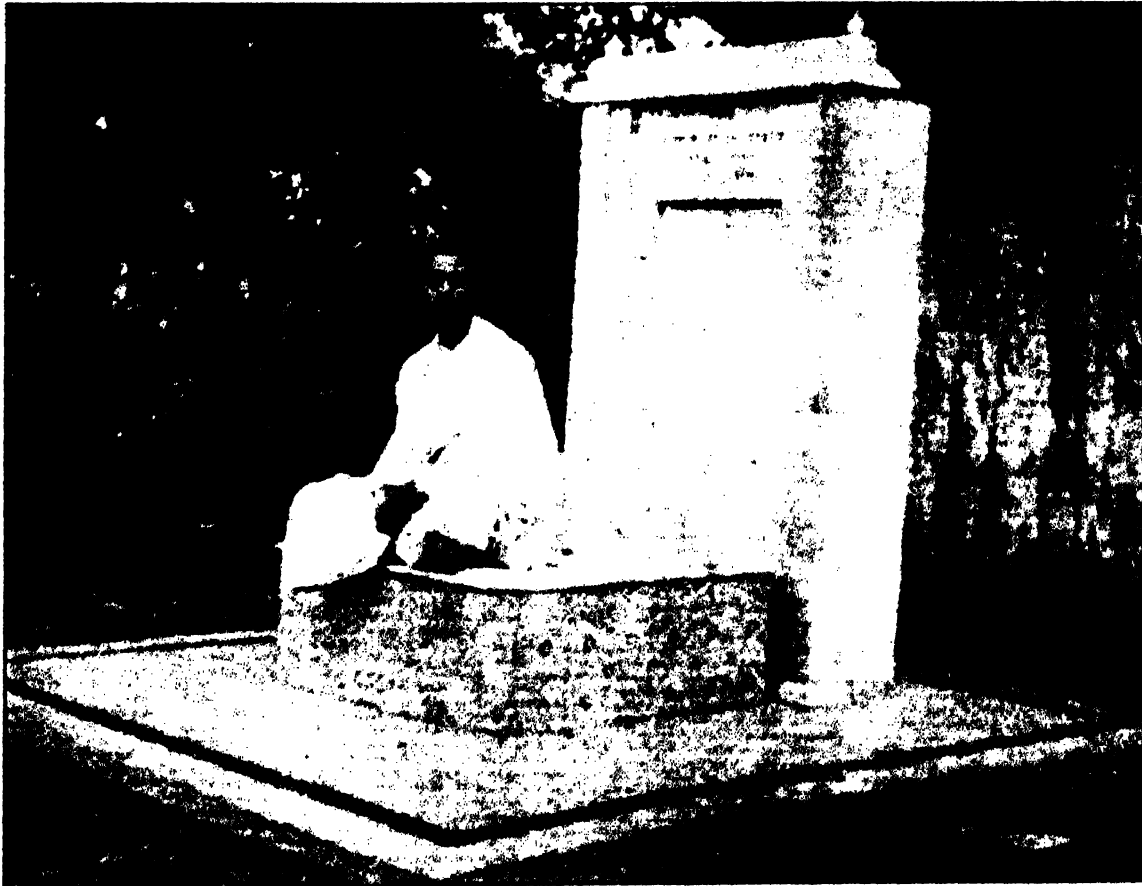
শান্তিনিকেতনে উপাসনাবেদিতে রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়সঙ্গসুখের কালে কিংবা প্রিয় বিচ্ছেদের প্রাক্কালে কিংবা ভোরের আকাশ দেখা বিস্ময়ে কবির গানের কলি ভাষা জুগিয়ে দেয় আমার ঠোঁটে। মনে হয় ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমারই জন্যে যেন ওই বিশেষ গানটি লেখা।
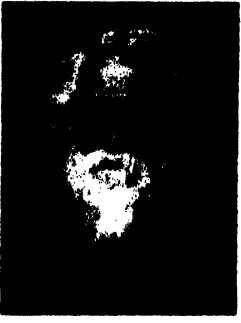
না যে, জানি না যে'—এই পঙ্‌ক্তিটি কী শিহরণ যে জাগাত ছোটবেলায় আমাদের বাড়ির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো করবী গাছটার দিকে তাকালে, সে কথা আজও এই বৃদ্ধবয়সেও ভুলতে পারিনা। এলাম শান্তিনিকেতনে। সেখানে চারদিকে 'গীতবিতান' ছড়ানো। সেখানকার প্রকৃতি গীতবিতানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। তবে গীতবিতানের মধ্যে আমার আবার বেশি ভালো লাগে বর্ষার গান। আমার জন্ম শ্রাবণ মাসের পয়লা তারিখে বলেই হয়তো তাই। আসলে রবীন্দ্রসংগীতে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। পূজা এবং প্রেমের গানেও প্রকৃতি জায়গা করে নিয়েছে সংগোপনে। এই প্রকৃতির মধ্যে উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্ষার। শান্তিনিকেতন মূলত প্রখর তপনতাপে দগ্ধ হত বলে প্রকৃতিকে, বিশেষ করে বর্ষার গানে মনটা দ্রুত দ্রব হয়ে যায়। যখন শুনতাম, 'শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে'—তখন শান্তিনিকেতনে বর্ষার ছবিই বড়ো হয়ে ওঠে। বর্ষাকে বুঝতে হলে শান্তিনিকেতনে যেতে হয়, শান্তিনিকেতনে থাকতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী নিয়ে আমাদের যে হাঁকডাক, তার পেছনে কিন্তু চোখে দেখা শান্তিনিকেতনের ছবিই জীবন্ত হয়ে ওঠে। তবে শুধু বর্ষার কথাই বা বলি কেন, বসন্ত বা শরৎ ঋতুও গানে গানে হয়ে ওঠে সমান আদরণীয়। যখন বলি,—'ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি, বনের পথে যেতে, ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে'— তখন কিন্তু ওই শান্তিনিকেতনেরই ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। শান্তিনিকেতনের সর্বত্র 'ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান', তাই রবীন্দ্রনাথের মতোই 'বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।' রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া শরৎ ঋতুকে ভাবতেই পারি না। বর্ষা ঋতুর গান ছাড়া আমার অন্যতম প্রিয় গান—'আমার নয়ন ভুলানো এলে/কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে'—বললেই শরতের পদধ্বনি পরিষ্কার শুনতে পাই। বুকে কেমন যেন ব্যথা অনুভব করি। আসলে আনন্দ আর ব্যথা পাশাপাশি থাকে।

শান্তিনিকেতনে বর্ষার কী মনোমোহন রূপ। বর্ষার অমন আশ্চর্য সৌন্দর্য শান্তিনিকেতনের মতো অন্য কোথাও নেই এবং নেই বলেই রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রচনায় বর্ষা এসে মোহিনী রূপসী হয়ে আছে।

এবার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ যদি শান্তিনিকেতনে না এসে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে তাঁর বিদ্যালয় খুলতেন, যদি সেখানে জীবনের শেষ কটি দিনের আবাস গড়ে তুলতেন, তাহলে কি বর্ষা ঋতু তাঁকে এতো আচ্ছন্ন করে রাখত ? বোধহয় না। চিৎপুরের গলিতে বৃষ্টির জলের ধারা দেখে তিনি উন্মনা হয়েছেন, শিলাইদহে পদ্মার চরে ঝড়ের দাপাদাপি দেখে পুলকিত হয়েছেন, বর্ষশেষের ঝড়ের পর নবাঙ্কুর ইক্ষুরসের মধ্যে বৃষ্টিধারাও তাঁর মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বর্ষামঙ্গল উৎসবের সূচনা চিৎপুরে নয়, শিলাইদহে নয়,—শান্তিনিকেতনে। সেখানে প্রকৃতির বসনের রং ছিল গেরুয়া। তারই মাঝখানে বসে কাতর আহ্বান জানাতে হয় বরুণদেবকে, বলতে হয় 'তৃষ্ণার জল এসো এসো', মৌনী তাপসের ক্রোধ প্রশমিত করতে হয়, 'এসো শ্যামল সুন্দর' গানে।

শান্তিনিকেতনে বর্ষার কী মনোমোহন রূপ। বর্ষার অমন আশ্চর্য সৌন্দর্য শান্তিনিকেতনের মতো অন্য কোথাও নেই এবং নেই বলেই রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের রচনায় বর্ষা এসে মোহিনী রূপসী হয়ে আছে। রবীন্দ্রজীবনের শেষ চল্লিশ বছর ওই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাস্নিগ্ধ শান্তিনিকেতনে কেটেছে। সৌভাগ্যবান আমরা, শেষজীবনে শান্তিনিকেতন আঁতুড়ঘর বলেই গীতবিতানের বেশি পাতা জুড়ে আছে ওই বর্ষাঋতুটি। সকালে-সন্ধ্যায়, দুপুরে-মধ্যরাত্রে আমরা কখনও বৃষ্টির নূপুরধ্বনি শুনতে পাই, কখনও মেঘে মেঘে তড়িৎ শিখায় ভুজঙ্গপ্রয়াতে চমকে উঠি। কখনও বা গভীর দুখে দুঃখী দুজনে মুখোমুখি বসে মনে মনে বলি—'এমন দিনে তারে বলা যায়'। শুধু আমরা নই, আজ নয়, কাল নয়, চিরকাল এমনই বলবে ভবিষ্যতের বাঙালিরা সার্থক হবে কবির গানের সেই 'দম্ভোক্তি'—বিস্মৃত স্রোতের প্লাবনে ফিরে ফিরে আসবে সেই তরণী, যা তার সুরের খেতের সোনার ধান বয়ে নিয়ে চলেছে একাল থেকে সেকালে।

লেখক পরিচিতি : রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক

প্রাণ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যেন গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
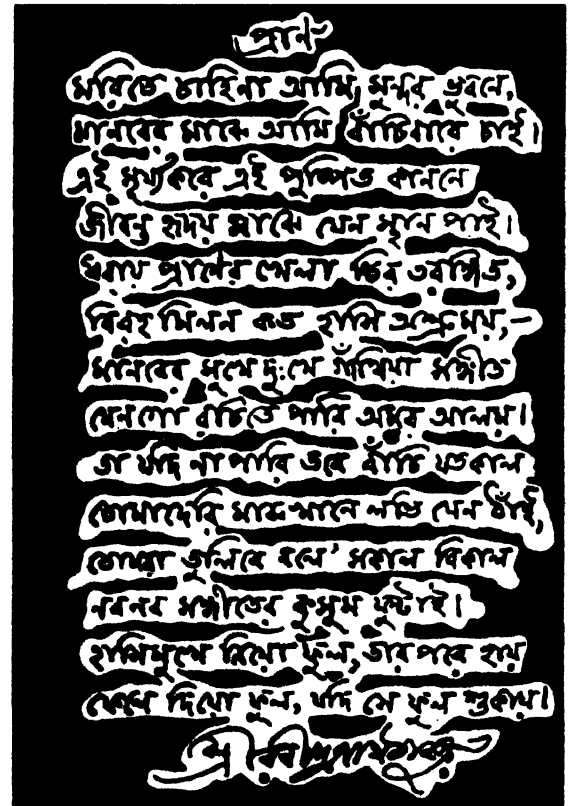
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীত : সেকাল ও একাল

সুগতা সেন

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বয়স একশো বছর অতিক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ও পঞ্চাশোর্দ্ধ। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও গায়নও নিশ্চয়ই কমবেশি এই একশো বছর ধরেই। তবে বর্তমান প্রবন্ধে 'সেকাল'-এর কালসীমা পঞ্চাশের দশকের শেষ প্রান্ত থেকে ষাটের দশকের কাল। কারণ লেখিকার সচেতন অভিজ্ঞতা এর পূর্বে নেই।

কালের যাত্রার পথে ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন-চিন্তা-রীতি-প্রক্রিয়া সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটে। সেটাই স্বাভাবিক, অনিবার্যভাবেই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীতচর্চারও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, সেকালে ও একালে কিছু পার্থক্য ও ব্যবধান এসেছে। তারই একটা সংক্ষিপ্ত ছবি তুলে ধরার চেষ্টা এই রচনা।

রবীন্দ্রনাথ বারেবারেই বলেছেন বাঙালি চিত্তের এক স্বাভাবিক প্রবণতা গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা। মনের যে-কোনো ভাবাবেগে, চিত্তের যে-কোনো উন্মীলনে বাঙালি গান গেয়েছে। সেই গীতপ্রিয়তার অজস্র উৎসার ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এবং সংগীতসুধা আকণ্ঠ পান করতে করতেই রবীন্দ্রনাথের

মনের যে-কোনো ভাবাবেগে, চিত্তের যে-কোনো উন্মীলনে বাঙালি গান গেয়েছে। সেই গীত-প্রিয়তার অজস্র উৎসার ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এবং সংগীতসুধা আকণ্ঠ পান করতে করতেই রবীন্দ্রনাথের বড়ো হওয়া।

বড়ো হওয়া। তাই গান, তাঁর সমগ্র সত্তা সমগ্র চেতনার সঙ্গে তাঁর অজান্তেই এক হয়ে মিশেছে। আর তারই ফল বাঙালি জাতির এক অতুল্য, অপূর্ব সম্পদ লাভ—রবীন্দ্রসংগীত সম্ভার। এ গান তাঁর 'আপন মনের গান' যা তাঁরই মনকে হরণ করে ভাসিয়ে নেয় সকল সীমার ওপারে। এ গান 'ঘরের মধ্যে মাধুরী পাবার জন্য' মনের আনন্দে গেয়ে ওঠার জন্য। সভায় সমিতিতে কালোয়াতি বৈঠকে গাওয়ার জন্য এ গান তিনি সৃষ্টি করেননি।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রাচীন তপোবনের আদর্শে। কোনো গণ্ডিবদ্ধ পাঠ্যক্রমের দ্বারা নয়, মুক্ত পরিবেশে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে আনন্দের সঙ্গে খেলার সঙ্গে যে শিক্ষা তা-ই সত্যকার শিক্ষা,—শিশুর সর্বাঙ্গীণ মনোবিকাশের যথার্থ পথ—এই বিশ্বাসে তিনি বিদ্যালয়ে এক বিশিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেন। শিশুমনে গানের আকর্ষণ স্বাভাবিক ও সহজাত। সে কারণেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আনন্দের শিক্ষার একটি অতি-আবশ্যিক অঙ্গ সংগীতশিক্ষা। পাখি যেমন প্রকৃতির কোলে আপন মনের আনন্দে গায় গায়, পাখির গানেই প্রতিটি ঋতুর আগমনী শোনা যায়, আশ্রম বালক-বালিকারাও প্রকৃতির কোলে তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত গান গেয়ে উঠবে—এমনই ছিল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। একদিকে পূজা-প্রেম-প্রকৃতির গানে তিনি নিজের সকল অনুভূতিকে উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছেন, অন্যদিকে আশ্রমবাসী শিক্ষক ছাত্রছাত্রী মন্দিরে উপাসনায় বৈতালিকে বিভিন্ন উৎসবে অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রাণের অনুভূতিকে সেই গান গেয়ে অভিব্যক্ত করছেন—এই দেওয়া-নেওয়াতেই আশ্রম প্রাঙ্গণকে ঘিরে রবীন্দ্রসংগীতের ধারাও সেদিন বহুমুখে উৎসারিত হয়েছিল।

পাখি যেমন প্রকৃতির কোলে আপন মনের আনন্দে গায় গায়, পাখির গানেই প্রতিটি ঋতুর আগমনী শোনা যায়, আশ্রম বালক-বালিকারাও প্রকৃতির কোলে তেমনই স্বতঃস্ফূর্ত গান গেয়ে উঠবে—এমনই ছিল রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা।

শিশুমনে গানকে আনন্দের গান, প্রাণের গান করে তুলতে গান শেখানোর এক বিশেষ পদ্ধতি নিয়েছিলেন ইস্কুলের গীতগুরুরা—যার ফলে গান শেখা কখনোই ক্লান্তিকর বা বোঝা বলে মনে হয়নি। সেই পদ্ধতির কথাটি একটু বিশদ করে না বললে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসংগীতের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যটি ঠিক বোঝানো যাবে না। সেই প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথাও এড়ানো যাবে না যেহেতু লেখিকা শান্তিনিকেতনেই আজন্ম লালিত ও শিক্ষিত হয়েছেন। আশা করি পাঠকবর্গ ক্ষুণ্ণ হবেন না।

পাঠভবনের একদম নীচু ক্লাস, এমনকী তারও আগে 'আনন্দ পাঠশালা' (ওখানকার Nursery school) থেকেই গান শেখানো শুরু হত। মঞ্জুদি (মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়) কুটুদি (আরতি বসু), ক্ষমাদিরা (ক্ষমা ঘোষ) গান শেখাতেন সম্পূর্ণ খালি গলায়, কোনোরকম যন্ত্রবাদ্যের সাহায্য না নিয়ে। তাঁদের হাতে কখনো 'গীতবিতান' বা 'স্বরবিতান' দেখিনি। আমরাও ঠিক সেইভাবেই গান শিখতাম—পাখির মতো তাঁদের সুরের অনুকরণ করে—মুখে মুখে, গলা থেকে গলায়। একটু উঁচু ক্লাসে 'গানের খাতা' হল, কিন্তু সে কেবল কী কী গান শেখা হয়েছে তার তালিকা রাখার জন্য। বই বা কাগজ দেখে গান গাওয়া বারণ ছিল। গান শিখেছি, কিন্তু স্বরগ্রাম, তাল, তালের মাত্রাবিভাগ, স্বরলিপি—এসব সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু সুরও ভুল হত না, তালও কাটেনি কখনো। গানের কোনো সিলেবাস ছিল না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই গান বেছে শেখাতেন। বৈতালিক-উপাসনা-মন্দিরের জন্য গান, বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী প্রকৃতির গান, বিভিন্ন উৎসবের জন্য নির্বাচিত গান সবই শিখিয়ে দিতেন তাঁরা। একটু বড়ো হয়ে আমরাও কোনো গান শেখবার আবদার জানিয়েছি—তাঁরা তা সস্নেহে রক্ষা করেছেন। গান শিখতে হত প্রত্যেককে—তাই পাঠভবনে পড়েছেন কিন্তু একেবারে গান জানেন না এমন কেউ নেই, আজও নেই। তবে ক্লাসে সকলের সমবেত গানের মধ্য থেকেই সুর বা বেসুর চিনতেও তাঁদের ভুল হত না। ঠিক বুঝে নিতেন কে বা কারা বেশি ভালো গান করে। মন্দির, সাহিত্যসভা কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য এদের নির্বাচন করে নিতেন, সেই বিশেষ গানগুলি শিখিয়েও দিতেন ; দরকার হলে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ গায়নভঙ্গি আছে—যাকে 'ঘরানা' বলা যায়। ক্লাসিকাল গানের ঘরনার মতই এই ঘরানাও একটি বিশেষ 'পরিবার-উদ্‌ভূত'। সে পরিবার 'শান্তিনিকেতন-পরিবার', সে পরিবারের আদিপুরুষ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গুরুপরম্পরায় সেই ঘরানা চলে এসেছে—যার প্রধান বৈশিষ্ট্য গানে সুরের শুদ্ধতা বজায় রেখেও ভাবের অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের গান বাণীপ্রধান ; সুরের তরী বেয়ে সেই বাণীই শ্রোতার মর্ম স্পর্শ করে। শান্তিনিকেতনের প্রশিক্ষণে শান্তিনিকেতনের গায়কিতে রবীন্দ্রসংগীতের সেই ভাবরূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে। একেবারে শিশু বয়সে না হলেও, ইস্কুলের উঁচু ক্লাস থেকেই গানের কথার অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে গান শেখানো হত। তাছাড়াও গীত-গুরুদের ভাবতন্ময় গায়ন থেকেও ছাত্ররা সেই বিশেষ ঘরানার অধিকার অর্জন
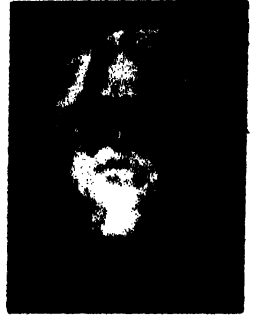
শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, ৮ পৌষ ১৩২৮ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১)।

করে নিত। আজকাল প্রায়শ 'ভাবলেশহীন' ও 'যথেচ্ছ নির্বাচিত' রবীন্দ্রসংগীত শুনলে বুঝতে পারি সেই প্রশিক্ষণের মূল্য কতখানি। শান্তিনিকেতন-ঘরানার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য খালি গলায় ও খোলা গলায় গান। বাদ্য-নির্ভর গান কখনো স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। শান্তিনিকেতনে কোনো বাদ্যনির্ভরতা ছিল না বলে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যখন তখন যেখানে সেখানে প্রাণে গান এলেই গেয়ে উঠতে পেরেছে। উপরন্তু, এই ঘরানার সবচেয়ে বড়ো পাঠ মিলেছে আশ্রম প্রকৃতির কাছে। ইস্কুলের সব ক্লাসে এবং কলেজেরও বহু ক্লাস হত গাছের নীচে বেদি ঘিরে—আশ্রম-প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কোথাও কোনো ব্যবধান ছিল না। তাই প্রকৃতির পালায় পালায় সকাল-সন্ধ্যায়, শীতে-গ্রীষ্মে, বর্ষায়-বসন্তে, আলোকে-অন্ধকারে মন যখনই দুলে উঠেছে—রবীন্দ্রনাথের গান আপনিই কণ্ঠে এসেছে। আশ্রম-প্রকৃতির পটেই রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ভাস সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মানানসই।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরি। ছোটবেলা থেকেই গান গাইতাম, গাইতাম ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে থেকেই—গান যে ছিল আশ্রমের আকাশে বাতাসে। কিন্তু গানের ব্যাকরণ, তালের ব্যাকরণ শিখলাম উঁচু ক্লাসে—গান যখন ঐচ্ছিক বিষয়। তখন গানের ক্লাসও হতে লাগল সংগীতভবনে, সংগীতভবনের মাস্টারমশাইদের কাছে। (অবশ্য পাঠভবনের Compulsory গানের ক্লাসও সংগীতভবনের গুরুরা নিতেন)। এই সময় সিলেবাস ধরে গান শেখা শুরু হল। এবং এই সময়েই সরগম, স্বরলিপি, বিভিন্ন তাল, তালের মাত্রা বিভাগ, রাগরাগিণী ও তাদের রীতি প্রকরণ, গানের স্কেল ইত্যাদি শেখার সঙ্গে সঙ্গে তানপুরা-এসরাজ-তবলার সঙ্গে গান শেখার শুরু। অসুবিধা কিছুই হল না কারণ অনুষ্ঠানে তো যন্ত্রানুসঙ্গে গান গাইতামই। রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তালের মাঝখান থেকে গান ধরা, কিংবা এসরাজে এক লাইন গান বাজলে ঠিক স্কেলে গলা মিলিয়ে গান ধরা ইত্যাদি অজান্তেই জানা হয়ে গিয়েছিল। মজা লাগল, যে স্বর গলায় আছেই তাকে গান্ধার কি মধ্যম কি ধৈবত প্রভৃতি নামে চিনতে শিখে। তানপুরা বাঁধা, স্বরলিপি পড়া ও করাও এই সময় শেখা। আমার মনে হয় এইটিই প্রকৃত শিক্ষণ পদ্ধতি। ভাষা যেমন আগে মুখে আসে, পরে তার ব্যাকরণ শেখা—তেমনই গানও আগে কানে শুনে

মজা লাগল, যে স্বর গলায় আছেই তাকে গান্ধার কি মধ্যম কি ধৈবত প্রভৃতি নামে চিনতে শিখে। তানপুরা বাঁধা, স্বরলিপি পড়া ও করাও এই সময় শেখা। আমার মনে হয় এইটিই প্রকৃত শিক্ষণ পদ্ধতি।

শিখে পরে তার নিয়মটা শিখলে সে শিক্ষা অন্তরে গভীর হয়।

আমাদের সেকালে শান্তিনিকেতনে হার্মোনিয়ামের কোনো ব্যবহার ছিল না। শৈলজাদা (শৈলজারঞ্জন মজুমদার) শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ) বীরেনদা (বীরেন্দ্রনাথ পালিত) নিজেরা এসরাজ বাজিয়ে শেখাতেন। মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), বাচ্চুদি (নীলিমা সেন), কুটুদি, মঞ্জুদি নিজেরা এসরাজ বাজিয়ে শেখাতেন না। যদিও তাঁরা বাজাতে জানতেন, কারণ ওঁদের আমলে সংগীতভবনের পাঠ্যক্রমে দু বছর এসরাজ বাদন শেখা আবশ্যিক ছিল। রবীন্দ্রসংগীতের মিড়প্রধান সুর এসরাজেই যথাযথরূপে রণিত হয়—সেজন্যই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসংগীত এসরাজের সঙ্গেই গাইবার রেওয়াজ এত গুরুত্ব পেয়েছে। ক্লাসিকাল গান তানপুরার সঙ্গতে শিখতাম। হার্মোনিয়াম যন্ত্রটি কোথাও দেখা যেত না।

পাঠভবনের নীচু ক্লাসে শৈলজাদার কাছে গান শিখেছি। তারপর তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান। পরে কলকাতায় এসে শৈলজাদার কাছে গান শিখেছি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। কলকাতাতেও তিনি শান্তিনিকেতনের পদ্ধতিতে তানপুরা ও নিজের বাজানো এসরাজের সঙ্গে গান শেখাতেন। তাঁর পরিচালিত অনুষ্ঠানগুলিতেও হার্মোনিয়াম নিষিদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের গানে 'কলটেপা সুরের গোলামি' চাননি—রবীন্দ্রনাথে নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য শৈলজারঞ্জন গুরুদেবের সেই অভিপ্রায় সশ্রদ্ধায় রক্ষা করেছেন আজীবন। শৈলজাদা-প্রতিষ্ঠিত 'রবিরঞ্জনী' সংস্থা এখনও কেবল তানপুরা-এসরাজ-তবলার সঙ্গতে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও অনুষ্ঠান করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে এখন হার্মোনিয়ম বাজবেই। সেকালের অনুষ্ঠানগুলিতে গানের দলের পিছনে ফুলমালায় সজ্জিত দু-তিনটি তানপুরার দণ্ডকে মাথা তুলে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত দেখতাম, একালে সেই পুষ্পমালাশোভিত দণ্ডগুলিকে অনুষ্ঠানে খুঁজে পাই না। পরিবর্তে গানের দলের সামনে একাধিক হার্মোনিয়ামের আবশ্যিক উপস্থিতি।

সেকালে শান্তিনিকেতনের সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান হত সব 'ভবন' থেকে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। তাই পাঠভবন থেকেই শান্তিনিকেতনের ভিতরে ও বাইরে বিশ্বভারতী-আয়োজিত সব অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি আমরা। দৈনিক উপাসনা, সাপ্তাহিক মন্দির, বৈতালিক বা ইস্কুলের সাহিত্যসভা প্রভৃতি ছাড়া সব বড়ো অনুষ্ঠানগুলির মহড়া হত সংগীতভবনে,—আগে শৈলজাদা পরে শান্তিদার পরিচালনায়। এসব মহড়ায় দিনের পর দিন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মোহরদি, বীরেনদা, কুটুদি, মঞ্জুদি সমানে গান গেয়েছেন। এক স্টেজে বসে তাঁদের সঙ্গে গান করেছি, তাঁদের গানের সঙ্গে নেচেছি আমরা। নৃত্যনাট্যের মহড়া চলেছে মাসভর ! অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরীর মতো প্রবাদপ্রতিম যন্ত্রশিল্পী ও শিক্ষকরা রোজ মহড়ায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গত করেছেন। এ যে কী অসামান্য ব্যাপার, আজকের যুগে যে কী অকল্পনীয়—এখন ভাবলে রোমাঞ্চিত হই। সেদিন কিছুই বুঝিনি—কত নিরহংকার ও অকৃপণ ছিল তাঁদের দান। এই মহড়াগুলি বহু আশ্রমবাসীর সান্ধ্য বিনোদন ছিল। ফলত অনুষ্ঠান যখন মঞ্চস্থ হত, কোথাও কোনো খুঁত থাকত না।

আজকের শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক ভবনের জন্যে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসূচি থাকে—ভবন-নির্বিশেষে যৌথ অনুষ্ঠান হয় না। অনুষ্ঠান দেখে, বিশেষত সমবেত গান ও নাচ দেখে মনে হয় সেদিনের সেই আত্যন্তিক মহড়ার প্রথা বোধহয় উঠেই গেছে—'সময় কারো যে নাই' ! এখন প্রত্যেক ভবনের জন্য আলাদা আলাদা সংগীতশিক্ষক—তাঁরা নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা মহড়া দেওয়ান। কিন্তু সামগ্রিক বন্ধনটি এতে দৃঢ় হয় না, ফলে অনুষ্ঠানগুলি সুতো-ছেঁড়া মালার মতো বিস্রস্ত হয়ে পড়ে।

'বর্ষামঙ্গল' কিংবা বর্ষাকালীন অন্য অনুষ্ঠান ছাড়া শান্তিনিকেতনের সব অনুষ্ঠান, এমনকী নৃত্যনাট্যও অনুষ্ঠিত হত খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির বুকে। আম্রকুঞ্জে, বকুলবীথিতে সকালের অনুষ্ঠান, আর সন্ধ্যায় গৌর প্রাঙ্গণে স্টেজ বেঁধে নাটক বা বিচিত্রানুষ্ঠান—এই হল শান্তিনিকেতনের চিরকালীন প্রথা। স্টেজ বাঁধবার খরচ বাঁচাতে গৌর প্রাঙ্গণে এক পাকা বেদি করা হয়েছে পরবর্তীকালে, কিন্তু সেখানেও মাথার উপর কোনো ছাদ নেই। সুন্দরী প্রকৃতির কাছে আর কোনো মঞ্চসজ্জা কি দাঁড়ায় ? বসন্ত পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া মঞ্জরিত শালবীথির চেয়ে শ্রেষ্ঠ পটভূমি 'ফাল্গুনী' নাটকের জন্য আর কী হতে পারে ? যিনি বিশ্বরূপকার—তাঁর রূপসজ্জাতেই শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান সেজেছে। ৭ই পৌষের মন্দির হয় ছাতিমতলায়—প্রকৃতির বুকে বিনম্র হৃদয় বিশ্বদেবতার পায়ে আপনি লুটিয়ে পড়ে। মানুষ বদলায়, প্রকৃতি তো চিরন্তনী। আশ্রমের উৎসব অনুষ্ঠান এখনও

আম্রকুঞ্জে, বকুলবীথিতে সকালের অনুষ্ঠান, আর সন্ধ্যায় গৌর প্রাঙ্গণে স্টেজ বেঁধে নাটক বা বিচিত্রানুষ্ঠান—এই হল শান্তিনিকেতনের চিরকালীন প্রথা।

সেই প্রকৃতির পটেই হয়—এমনটি সারা দেশে আর কোথাও হয় বলে জানি না। আশা করি যতদিন শান্তিনিকেতন থাকবে ততদিনই এই রীতিও থাকবে। রবীন্দ্রনাথের গান আর শান্তিনিকেতনের আশ্রম-প্রকৃতি যে 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ'। প্রকৃতির কোলে সে গান সজীব সপ্রাণ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গান্তরে যাই। রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রসাহিত্য-রত্নাকরের শ্রেষ্ঠতম রত্ন—শান্তিনিকেতনের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা। সে শিক্ষার চাবিকাঠি ছিল সংগীতভবনের ভাণ্ডারীদের হাতে। তাঁদের অকৃপণ দানে ভবন-নির্বিশেষে শান্তিনিকেতনের সব ছাত্রছাত্রীই রবীন্দ্র-গীতসুধারসে পরিপ্লুত হতে পেরেছিল। সংগীতভবনের ক্লাসের বাইরে, পাঠভবনের সাধারণ গানের ক্লাস তো তাঁরা নিতেনই ; তাছাড়া অন্য যে-কোনো ভবনের যে-কোনো ছাত্র সংগীতভবনে স্পেশাল ক্লাস করতে পারতেন। একসময় এমনও ছিল, স্কুলের গণ্ডি পার না হয়েও সংগীতভবনের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করা যেত। এর বাইরেও যে-কোনো শিক্ষকের বাড়িতে হাজির হয়ে গান শিখতে চেয়েছি আমরা, খুশি হয়ে শিখিয়েছেন সবাই। পারিশ্রমিকের কোনো প্রশ্ন কখনো ওঠেনি। আসলে রবীন্দ্রসংগীতের অতলান্ত সাগরের স্বাদ পেয়েছিলেন তাঁরা, সে অমৃত যত দান করেছেন, অমৃতভাণ্ড ততই তাঁদের ভরে উঠেছে। এমন সনিষ্ঠ অকৃপণ দানে গ্রহণ ও সমৃদ্ধ হয়।

শুধু গান শেখানোই নয়, সংগীত পরিচালনা করেছেন, সমবেত গানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সংগীতভবনের গুরুরা। শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন উৎসবে, কোনো মহাপুরুষের জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে বৈতালিকের দল বেরোয় প্রভাতে ও রাত্রে। মন্দির, ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, শালবীথির পথে আশ্রমলক্ষ্মীকে ঘিরে বৈতালিকের গান ধ্বনিত হয়। এ দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, প্রবীণ-নবীন সকলের অবাধ অধিকার। তখনকার কালে দেখেছি বৈতালিকের গানও গুরুরা আগেই শিখিয়ে রেখেছেন এবং দলের সামনে সামনে নেতৃত্বও দিয়েছেন তাঁরাই। সংগীতভবনের তালবাদ্য শিক্ষকরাও গলায় খোল ঝুলিয়ে বৈতালিকের গানে সহযোগিতা করেছেন। বসন্তোৎসবে 'ওরে গৃহবাসী' নাচের প্রোসেশনের সঙ্গেও এইভাবেই গানের দল চলেছে। আজও বৈতালিক হয়, কিন্তু শিক্ষকদের নেতৃত্ব দিতে দেখতে পাই না। প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্রছাত্রীরাই বৈতালিক পরিচালনা করেন। 'ওরে গৃহবাসী' গানটি স্টেজ থেকে গাওয়া হয় ; মাইকের সাহায্যে নাচের দলের কানে তা পৌঁছয়।

● তখনকার কালে দেখেছি বৈতালিকের গানও গুরুরা আগেই শিখিয়ে রেখেছেন এবং দলের সামনে সামনে নেতৃত্বও দিয়েছেন তাঁরাই। সংগীতভবনের তালবাদ্য শিক্ষকরাও গলায় খোল ঝুলিয়ে বৈতালিকের গানে সহযোগিতা করেছেন। বসন্তোৎসবে 'ওরে গৃহবাসী' নাচের প্রোসেশনের সঙ্গেও এইভাবেই গানের দল চলেছে।

শান্তিনিকেতনে সংগীতের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।

দেখে মনে হয় সংগীতভবনের শিক্ষকদের সেই অকৃপণ দানের উৎস আর তেমন অবারিত নেই। হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ও আয়তন বৃদ্ধি, হয়তো বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এর যা ক্ষতি তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, সমস্ত জাতির। আরও মনে হয়, সেকালের গুরুরা অতিখ্যাত শিল্পী হলেও, তাঁদের 'শিক্ষকসত্তা'কে তাঁদের 'শিল্পীসত্তা' কখনো আচ্ছন্ন করেনি। অবশ্য রবীন্দ্রসংগীত তখন আজকের মতো এমন 'বাণিজ্যিক শিল্প' হয়ে ওঠেনি। আজকের শিক্ষকরাও অনেকেই বিখ্যাত শিল্পী। তাঁদের উপর এই মহাবিদ্যালয়কেই অগ্রাধিকার দেবেন—এমন বিশ্বাসই রাখব। যিনি দাতা, তাঁকে তো কিছু ত্যাগ করতেই হবে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে হার্মোনিয়ামের ব্যবহার মনকে পীড়িত করে। তেমনই পীড়া বোধ করি যখন দেখি অনুষ্ঠানে সকলেই কাগজ বা বই বা স্বরলিপি হাতে নিয়ে গান গাইছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যদি মনে না থাকে, তাহলে কথার ভাব হৃদয়ে জাগবে কেমন করে ? সেই ভাবকে গলায় ফুটিয়ে তোলাই বা যাবে কী করে ? শান্তিনিকেতনের বাইরে অনেক গায়কই কথার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে কেবল নিখুঁতভাবে স্বরলিপি অনুসরণ করেন গলায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাষায় তাঁরা 'অনুপস্থিত শিল্পী, ...গানের মধ্যে তাঁরা হাজির থাকেন না, যান্ত্রিকভাবে গানটা গেয়ে যান মাত্র।' শান্তিনিকেতনী ঘরানার সম্পূর্ণ বিপরীতে এঁদের গান। ঘরানাকে রক্ষা করতে গেলে বংশকৌলিন্য কিছুটা তো মানতেই হয়। তাই মনে হয় গুরুমুখী এই রবীন্দ্রসংগীতের ধারাকে শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে গেলে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাকে মেনে চলতেই হবে। নতুবা লোপ পাবে সেকালের সেই রবীন্দ্র-দিনেন্দ্র প্রবর্তিত ঘরানা—যার কিছু কিছু লক্ষণ একালে দেখা যাচ্ছে।

ঘরানাকে রক্ষা করতে গেলে বংশকৌলিন্য কিছুটা তো মানতেই হয়। তাই মনে হয় গুরুমুখী এই রবীন্দ্রসংগীতের ধারাকে শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে গেলে গুরু-শিষ্য-পরম্পরাকে মেনে চলতেই হবে। নতুবা লোপ পাবে সেকালের সেই রবীন্দ্র-দিনেন্দ্র প্রবর্তিত ঘরানা—যার কিছু কিছু লক্ষণ একালে দেখা যাচ্ছে।

তবু, তবু বলব অনেক গিয়েও অনেক বদলিয়েও 'আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে। এখনও প্রেমের খেলা সারাদিন সারাবেলা। .....উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।' উৎসবে-অনুষ্ঠানে প্রাণের টানেই ছুটে যাই শান্তিনিকেতনে,—আজন্ম পরিচিত আশ্রমপ্রকৃতির চিরপুরাতন কিন্তু নিত্যনবীন রূপ হৃদয়কে আনন্দে আবেগে আকুল করে তোলে। যে গান শুনি তা মনের তারে হয়তো তেমন কাঁপন জাগায় না। কিন্তু কলকাতায় কোনো গানের আসরে যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষিত

রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনা চলছে।

কোনো গায়কের গান শুনি—কানে ধরা পড়ে তার বিশিষ্টতা। প্রত্যায়িত হই—'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'।

সেদিন শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের আগের সন্ধ্যায়, আকাশে যখন সোনার থালার মতো চাঁদ উঠছে, পথ চলতে চলতে শিশুর কচি গলা ও আধো উচ্চারণের গান কানে ভেসে এল— 'ওরে গৃহবাসী খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল......'। খুশি হয়ে মন বলল—এই তো চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুঝে হোক না বুঝে হোক প্রকৃতির টানে আশ্রমের বালক-বালিকারা প্রাণের আনন্দে তাঁর গান গাইবে। এখনও গৌর প্রাঙ্গণে বা পাঠভবন প্রাঙ্গণে, পৌষমেলার জমায়েতে, বৈতালিকের দলে কিংবা কলকাতার 'আশ্রমিক সংঘ'-এ ছেলেমেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত খোলা গলার গান শুনলে আশ্বস্ত হই—

'হারায় নি তা হারায় নি বৈতরণী পারায় নি
নবীন চোখের চপল আলোয় সে কাল ফিরে পেয়েছি।'

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও মুরলীধর গার্লস' কলেজের অধ্যাপক

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

গীতা ঘটক

গুরুদেবের মৃত্যুর এক বছর আগে যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই আমার বয়স তখন ছয়। এক বর্ণ বাংলা জানি না, বাঙালি খাবার খেতে পারি না। বুঝি আর বলি শুধু জার্মান ভাষা। আমার জন্ম জার্মানিতে। বাবা ডঃ কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় একজন কৃতী কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কর্মসূত্রে বার্লিনে বাস করতেন। হিটলারি তাণ্ডবে বাবা আমাদের নিয়ে জার্মানি ছাড়তে বাধ্য হলেন। একটা জাপানি জাহাজে করে গোটা আফ্রিকা ঘুরে আমরা সিলোনে (অধুনা শ্রীলঙ্কা) পৌঁছালাম। বাবা তখন মেয়েদের নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায়। কী করে আমাদের ভারতীয় করে তুলবেন ! বাবার এই চিন্তার কথা গুরুদেব জানতে পেরে বললেন, 'মেয়েদের ভারতীয় করে গড়ে তুলতে চাও কানাই ? শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও। আমার মেয়ে মীরা, পুত্রবধূ প্রতিমা এখানে আছেন। ওদের দেখেশুনে রাখবেন।' গুরুদেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাবা আমাকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন।

শান্তিনিকেতনে প্রতি বুধবার মন্দিরের পর সমস্ত আশ্রমবাসী গুরুদেবকে প্রণাম করতে যেতেন। গুরুদেবের অসুস্থতার কারণে এই নিয়ম কিছুটা পালটালো। আমি ওখানে যাওয়ার পর দেখলাম শুধু শিশুরা তাঁকে প্রণাম করতে যায়। আমিও থাকতাম সেখানে। তখনও জানতামই না উনি কে। তবে ওঁর কাছে গেলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হত। মনে হত, এই তো আমার আপনজন। তখনও তো বুঝিনি যে ওঁর সঙ্গে আমার সারা জীবন এমনভাবে জড়িয়ে যাবে ! ওঁরই সাধনায় আমার জীবন কাটিবে ! এখনও মনে আছে প্রণাম করার সময় ওঁর পায়ের পাতায় অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিতাম। বড়ো ভালো লাগত। মনে হত, খুব আপনজনের কাছে আছি। প্রণামের পর শিশুদের হাতে লজেন্স দিতেন। একটা বোতলে সাদা আর গোলাপি রংয়ের পায়রার ডিমের মতো দেখতে মাঝখানে বাদাম দেওয়া লজেন্স রাখা থাকত। একবার আমাকে দুটো লজেন্স দিলেন। রেগেমেগে জার্মান ভাষায় বললাম, 'শুধু দুটো কেন ?' হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে মুঠো ভরতি লজেন্স তুলে দিলেন।

গীতা ঘটক

শান্তিনিকেতনে তখন ছোটোদের গান শেখাতেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। এখনও তাঁকেই আমার শ্রেষ্ঠ সংগীতগুরু হিসাবে মানি। তখনও বাংলা ভাষা জানতাম না। তবে গান তুলে নিতে পারতাম। গুরুদেবের গানের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে বাংলা শিখে ফেললাম। কিছুদিনের মধ্যে সভায় গান করলাম। সবাই অভিভূত হল। ভারতের মাটিতে আমার প্রথম অনুষ্ঠানেই অনেক প্রশংসা কুড়োলাম। সেই শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান আমার সমস্ত সত্তা আর অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল।

গুরুদেবের মৃত্যুর পরে বাবা আমাকে লখনউতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ির সকলে তখন ওখানেই বাস করছেন। আমার সৌভাগ্য যে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান লখনউতে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলাম। জওহরলাল নেহরু (আমরা ডাকতাম জওহরলাল আঙ্কল)-র অনুরোধে 'ন্যাশনাল হেরল্ড' পত্রিকার দায়িত্ব নিয়ে বাবা লখনউতে গিয়েছিলেন। ওখানে যাওয়ার পরে নাচ শেখাও চলল। আশা ওঝা ও শম্ভু মহারাজের কাছে কথক শিখলাম। আমার বরাবরের ইচ্ছা ছিল নাচিয়ে হওয়ার। ছোটোবেলা থেকে সেই জার্মানিতে থাকার সময়েই

ওঁর কাছে গেলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হত। মনে হত, এই তো আমার আপনজন। তখনও তো বুঝিনি যে ওঁর সঙ্গে আমার সারা জীবন এমনভাবে জড়িয়ে যাবে !

আমার নাচ শেখা শুরু হয়েছিল। যাক্ যে কথা হচ্ছিল। এদিকে পড়াশোনাও পাশাপাশি চলল। বি এ পাস করলাম।

তারপর আবার ফিরলাম শান্তিনিকেতনে। মূল আকর্ষণ ছিল কথাকলি গুরু হরিদাস নায়ারের কাছে নাচ শেখা। কিন্তু সংগীত ভবনের তখনকার নিয়মানুসারে শুধু নাচ নয়, তার পাশাপাশি গান আর এসরাজও শিখলাম। বাধ্যতামূলকভাবে দু-বছর এসরাজ শিখতেই হত। সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীত। সে সময় মণিপুরি নাচ শেখাও বাধ্যতামূলক ছিল। সংগীত ভবনের তখনকার অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমার লোকাল গার্জিয়েনও ছিলেন। সেই সময় বিদ্যাভবন তৈরি হল। বিদ্যাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ প্রবোধ বাগচী। তিনি নিজে তখন সংগীত ভবন, কলা ভবনে ঘুরে ঘুরে বললেন, 'এখানে তোমরা যারা যারা গ্র্যাজুয়েট আছ তারা সবাই আমার বিদ্যাভবনে ভরতি হয়ে যাও।' এম এ-তে আমার বিষয় ছিল এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার। কালচার-এ সব সময় প্রায় ফুল মার্কস পেয়ে আমি প্রথম হতাম। আমাদের শিক্ষক ছিলেন পৃথ্বীশ নিয়োগী। এমন আত্মমগ্ন বিদগ্ধ শিক্ষক পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

বহু প্রবাদপ্রতিম শিক্ষকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার ঘটেছে। শান্তিনিকেতনে তখন আমরা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছেও গান শিখেছি। তবে আমি ক্লাসে যত না শিখেছি, তার থেকে অনেক বেশি শিখেছি অনুষ্ঠানে গেয়ে। এখনও শিখে চলেছি। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতি পলে জড়িয়ে আছি।

আমি খুব আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে, গুরুদেবের সঙ্গে এমন একাত্ম না হতে পারলে তাঁর গান গাওয়া যায় না। এককথায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথকে ভালো না বাসলে তাঁর সাধনায় ব্রতী হওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের সব রচনা পড়া সম্ভব না হলেও কিছুটা না পড়লে বা ন্যূনতম ধারণা না থাকলে তাঁর গান গাওয়া যায় না। গাইলে সে গান প্রাণহীন হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথে দীক্ষিত হওয়া দরকার। তাঁকে অনুভব করা দরকার। তবেই তাঁর বাণীকে সুরে প্রাণিত করা সম্ভব। আমার কাছে যারা গান শিখতে আসে আমি প্রথমে তাদের একটাই প্রশ্ন করি—'তুমি কি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাস?' তা না হলে সব রেওয়াজ, সব পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম হবে।

রবীন্দ্রনাথে দীক্ষিত হওয়া দরকার। তাঁকে অনুভব করা দরকার। তবেই তাঁর বাণীকে সুরে প্রাণিত করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ যখন গান রচনা করেছিলেন তখন মানুষের জীবনের সব রকমের পরিস্থিতি সব ধরনের রং-কে বিষয় করেছিলেন। তিনি বড়ো ভালোবেসে গান রচনা করেছিলেন। গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পর্শকাতর ছিলেন। তিনি বলতেন, 'দেখো আমার গান যেন আমার গান বলে চেনা যায়।' ১৯৬১ সালে বোম্বাই থেকে ফিরে দেখলাম রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষের দৌলতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তবে পরিবেশটা পালটে গিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা বজায় রাখাটা 'অবশ্যই জরুরি' তালিকার দুনম্বরে ঠাঁই নিয়েছে। তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে বসেছে প্রসার আর প্রচারের ব্যাপারটা। গুরুদেবের গানে অর্ধেক কথা আর বাকি অর্ধেক সুর। এই দুয়ের সার্থক যুগলমিলনে রবীন্দ্রনাথের গান প্রাণ পায়। এখন প্রযুক্তিগত কৌশলে, যন্ত্রের নৈপুণ্যে সুরের দিকটা হয়তো জোর পাচ্ছে, কিন্তু কথার মাধুর্য যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ভালোভাবে স্পষ্ট করে রবীন্দ্রসংগীতের বাণী উচ্চারণ করতে না পারলে তা শ্রোতার মনকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। হয়তো ব্যক্তিগত কথা কিছুটা এসে পড়বে কিন্তু আজকের রবীন্দ্রসংগীতের সার্বিক চিত্রটি বোঝার সুবিধার জন্য ঘটনাটির উল্লেখ বাহুল্য হবে না। একবার বসন্তকালে কোন্নগরে একটা অনুষ্ঠানে গান গেয়ে মঞ্চ থেকে নেমেছি। বেশ কয়েকজন শ্রোতা প্রায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'দিদি রবীন্দ্রসংগীত হবে শুনে প্রথমে গান শুনতে আসতে চাইনি। সেই একঘেয়ে দাঁত চেপে গান আর কত শুনব! কিন্তু আপনার গান শুনে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, এমন দরাজ খোলা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণেও রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া যায়!' মোহরদিকেও কথাটা বলেছিলাম। সত্যিই তো, স্পষ্ট উচ্চারণে গলা খুলে গুরুদেবের গান না গাইলে শ্রোতার মনকে কিছুতেই ছোঁয়া যাবে না।

আজ আমার এই উনসত্তর বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথের গান আমার প্রাণের বাণী। আমার সকল সংকটে মুক্তির দিশারি। আমি নিজেকে রবীন্দ্রনাথে দীক্ষিত, রবীন্দ্রসাধনায় ব্রতী একজন শিল্পী বলে মনে করি। মানুষ আমার গান শুনতে ভালোবাসেন, অনুষ্ঠানে বরাদ্দ গানের পরে আরও গাইতে অনুরোধ করেন—এটাই আমার সব থেকে বড়ো পাওয়া। আমার গান শুনতে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের শুভেচ্ছা আমাকে আরও আরও গাইতে প্রাণিত করে। এই সাধনায় যেন জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত নিবেদিত থাকতে পারি সেটাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী

অনুলিখন : সেরিনা জাহান

আজকের জীবনে রবীন্দ্রসংগীত

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

টেলিভিশনের মাধ্যমে বাঙালি জীবনযাত্রার যে ছবি পাওয়া যায়, সেটা যদি বাস্তব জীবনের রূপায়ণ হয়, তাহলে আজকের জীবনে রবীন্দ্রসংগীত কতটা আছে, কীভাবে আছে, কেনই-বা আছে, তার নির্ধারণ খুব সহজ হবে না। সারাদিন সারা রাত জুড়ে যেসব ধারাবাহিক নাটক চলে, যে-নামেই চলুক—সিরিয়াল, মেগা সিরিয়াল, টেলিনাটক, টেলিফিল্ম—তাতে আনন্দের মুহূর্তে, বিষাদের মুহূর্তে, পুলকের মুহূর্তে, অন্য গান যত থাকে তার তুলনায় রবীন্দ্রসংগীত বেশিই থাকে। সুতরাং আজকের জীবনে রবীন্দ্রসংগীত আছে, এটা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিলে প্রশ্ন উঠবে, ওই নাটকগুলো কতটা বাস্তবের প্রতিফলন, আর কতটা নাটকগুলোর দর্শক-শ্রোতার চাহিদা ভেবে লেখক-লেখিকার মনগড়া। কোনও কোনও চ্যানেলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাসের বাইরে কী নিয়ে ফূর্তি করে, পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়েরা গিন্নিবান্নিরা কীভাবে সময় কাটায়, রাস্তাঘাটে মানুষজনেরা কী ভাবে, কী আশা করে, এইসব দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোতে আবার রবীন্দ্রসংগীত বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীরা হিন্দি গান গায়, বাংলা ব্যান্ডের গান গায়, পল্লীগীতিও গায়, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে। লাফঝাঁপের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত যায় না, গেলেও সেটা সুখকর হত না। কিন্তু, এটা বাস্তব ঘটনা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তেমন উত্তেজিত নয়। কেন নয়, সেটা অন্য প্রশ্ন। কোনও যুগেই কি বাঙালিরা সর্বস্তরে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে

কোনও কোনও চ্যানেলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাসের বাইরে কী নিয়ে ফূর্তি করে, পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়েরা গিন্নিবান্নিরা কীভাবে সময় কাটায়, রাস্তাঘাটে মানুষজনেরা কী ভাবে, কী আশা করে, এইসব দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানগুলোতে আবার রবীন্দ্রসংগীত বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত।

আজকের শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবে জনগণের অংশগ্রহণ   ছবি : কাজল বিশ্বাস

মগ্ন ছিল, সেটাও আর এক প্রশ্ন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দীক্ষিত-অদীক্ষিত রুচি নির্বিশেষে রবীন্দ্রচর্চা করা যায় কি না, সেটাও আর এক প্রশ্ন।

বহুকাল ধরে সারা বছর ধরে বাণিজ্যিক স্তরে কলকাতার নানান সদনে, ভবনে, আসরে, বাসরে, রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে। এই ঘটনা থেকেও মনে হতে পারে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপ্তি ঘটেছে শ্রোতৃমহলে। মফস্বল শহরেও রবীন্দ্রসংগীত চর্চার বিরাম নেই, কলকাতার অগণন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তো আছেই। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে চাইবাসায় অকস্মাৎ এক গভীর নির্জন রাতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তেড়ে গিয়েছিলেন কোনও এক বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে। তেড়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল, রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার এক্তিয়ার শক্তিরই আছে, নগণ্য চাইবাসায় কার আস্পর্ধা রবি ঠাকুরের গান গায়। কোনও বাঙালি লেখক তাঁর সাহিত্যজীবনে কখনও-না-কখনও রবীন্দ্রসংগীতের কোনও কলি ব্যবহার করেননি, এমন লেখকের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কোনও বাঙালি প্রবাসী কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ ছাড়ার আগে রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট বা সিডি না নিয়ে ছাড়ছেন, ভাবা যায় না। বিদেশেও তাঁদের পারস্পরিক মিলনের অন্যতম অঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত। দেশেও স্বজনমিলনের সময় বাঙালি পরিবার গানের আসর 'জনমুখী' গান, সলিল চৌধুরীর গান, হই-হল্লায় শেষ হলেও শুরু হয় শান্ত শুদ্ধ পরিবেশে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। সুতরাং কে বলবে বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রসংগীত অবিচ্ছেদ্য নয় ?

কিন্তু এটা নিশ্চিতই একটি অতিকথা, যদি বলা হয়, রবীন্দ্রসংগীত বাঙালি জীবনের সর্বস্তরে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে আজকের জীবনে রবীন্দ্রসংগীত শয়নে-স্বপনে অনুরণিত হলেও, উচ্চমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের ঘরে সেটা নিশ্চয়ই গাওয়া হয় না। গ্রামের খেতমজুররা, চাষাভুষোরা, শহরের খেটে-খাওয়া শ্রমিকেরা রবীন্দ্রনাথের গান দূরের কথা নামও শুনেছে কিনা সন্দেহ, শহরের উচ্চবিত্তেরা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অবহিত থাকলেও কতটা অনুরক্ত তাতেও ঘোরতর সন্দেহ জাগে। বাঙালিমাত্রেই কবিতা লেখে, বাঙালিমাত্রেই রবীন্দ্রভক্ত এসব অতি কথারই অঙ্গ। এই অতিকথার শুরু রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। রবীন্দ্রসহচর এক ডাক্তারের মুখে ইয়েটস সাহেব শুনেছিলেন, his songs are sung from the west of India into Burmah wherever Bengali is spoken। যে যুগে রেডিও গ্রামোফোন ছিল না, যে যুগে রবিবাবুর গান শোনা যেত শুধু রবিবাবুরই মুখে সভাসমিতিতে, গান ছাপা হত স্বরলিপিসহ অল্প সংখ্যায় ছাপা পত্রিকায়, দুয়েকটি রবি ঠাকুরের গান শোনা যেত নাটকে, সেই যুগে ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বে যেখানেই বাঙালি আছে, সেখানেই রবি ঠাকুরের গান আছে, এটা যদি

শান্তিনিকেতন ছবি : কাজল বিশ্বাস

বাঙালিমাত্রেই কবিতা লেখে, বাঙালিমাত্রেই রবীন্দ্রভক্ত এসব অতি কথারই অঙ্গ। এই অতিকথার শুরু রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই।

অতিকথা না হয়, তাহলে অতিকথার সংজ্ঞা কী ? সেই ডাক্তার পরে ইয়েটস সাহেবকে জানিয়েছিলেন, তিনি ব্রাহ্ম। এবার অবশ্য সেই ডাক্তারের কথা স্পষ্ট হল। ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রবাবুর গান আদৃত, এটা মেনে নিতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সব বাঙালি না হলেও রবীন্দ্রসংগীতভক্ত বাঙালির সংখ্যা এখন অগণন, সেটা পঁচিশে বৈশাখ এবং তারপর পক্ষকাল ধরে ওই গানের বিস্তৃত আয়োজন এবং তাতে উৎসাহ দেখার পর সন্দেহ থাকে না। বসন্তোৎসব, বর্ষামঙ্গল, বিবিধ আনুষ্ঠানিক উপস্থিতিতে রবীন্দ্রসংগীত সারা বছর জুড়েই থাকে। এমনকী কলকাতার বারোয়ারি দুর্গাপূজাতেও মাইকের গানে ফিল্মি গান হঠিয়ে রবীন্দ্রসংগীত জায়গা করে নিয়েছে। সেই সব অনুষ্ঠানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দুশো-তিনশো গান গাওয়া হলেও, শ্রোতারা সেইসব গানের প্রথম কলির পরে দ্বিতীয় কলি বলতে না পারলেও, গায়ক-গায়িকারা বই না খুলে গান না করতে পারলেও, এটা সত্য, রবীন্দ্রসংগীত আজ যত জনপ্রিয়, কোনও কালেই এত জনপ্রিয় ছিল না। শিক্ষিত বাঙালিকে সহজে কাছে টেনে নিতে যদি কোনও অবাঙালি চায়, রবীন্দ্রসংগীতের মতো আর কিছু নেই। মাসখানেক আগে এক টেলিভিশন চ্যানেলে সোনাল মানসিং একটি বাংলা গান শুনিয়ে শ্রোতাদের মাত করে দিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনাতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গার্লফ্রেন্ড ওকাম্পো'কে শুনিয়ে এসেছিলেন ওকাম্পোকে উদ্দেশ করে লেখা গান 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'। গানটা যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ওকাম্পোকে চেনার তিরিশ বছর আগে, আমরা সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনিনি—সোনাল মানসিং-এর মতো খ্যাতনাম্নী ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী যে খাঁটি উচ্চারণে রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন, আমরা তাতেই গলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বাঙালি গবেষকদের ভাষ্য নিয়ে যখন কলকাতা শহরে কাদম্বরী সন্ধ্যা হয়, যেসব গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৌঠানের সম্পর্ক সুদূরবিস্তৃত কল্পনাতে আনাও দুঃসাধ্য হয়, তখন রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ হওয়া সহজ নয়। আগুন নিয়ে খেলা করবেন না, অগ্নিনির্বাপক কর্তা যখন চেতাবনি দিয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং রচনার শিরোনাম দেন 'আগুনের পরশমণি', তখন আমাদের সন্দেহ জাগে, এই জনপ্রিয়তার মূল্য কতটুকু ! রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে বিস্তর লেখালেখি চলছে, তৎসত্ত্বেও, কোনও শিক্ষিত রবীন্দ্রভক্ত এখনও মনে করেন 'এ মণিহার আমার নাহি সাজে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নোবেল পুরস্কার পেয়ে। গায়ক যেভাবে বুঝে থাকেন, সেভাবে গান গাইবেন, আপত্তি করার কিছু নেই, শ্রোতা যে অর্থ করবেন করুন, তাতেও আপত্তি নেই, শুধু অশুদ্ধ তথ্য দিয়ে বা তথ্য না জেনে, রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে গান রচনা করেছিলেন যখন বলেন, তখন আপত্তি করতেই হয়। তখনই মনে হয়, এই জনপ্রিয়তার মূল্য কী ?

সব বাঙালি না হলেও রবীন্দ্রসংগীতভক্ত বাঙালির সংখ্যা এখন অগণন, সেটা পঁচিশে বৈশাখ এবং তারপর পক্ষকাল ধরে ওই গানের বিস্তৃত আয়োজন এবং তাতে উৎসাহ দেখার পর সন্দেহ থাকে না।

'তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই' গাওয়া প্রজন্মের সঙ্গে 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না'-গাওয়া প্রজন্মের কি কোনও মিল হতে পারে? 'ত্বকের যত্ন নিন' এই ব্যঙ্গ সংগীতের সঙ্গে 'বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল, / গেঁথেছ কি মালা মুকুলে'-র আর্তি কি কখনই মিশ খাবে?

অবশ্য হবেই না, এমন কথাও বলা যায় না। আমাদের মন কি স্তরে স্তরে বিচরণ করে না? 'এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে / তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে', এই মনও যেমন সত্য, 'রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়, / তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি॥' সেটাও তেমন সত্য। এই সংগীতবিশ্বে 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি'ও আছে, 'দিনশেষের রাঙা মুকুল'ও আছে। অবশ্যই এই বিশ্বে 'মিলন সমুদ্রবেলায় চির-বিচ্ছেদ জর্জর মর্জা'-ই বিস্তৃত পরিসর নিয়ে আছে, কিন্তু সেখানে এদেরও স্থান আছে, 'যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে / তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই—তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না।' যেখানে 'মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল।।' এই বিশ্বে রাজাও আছে, ঠাকুরদাও আছে, আবার পাগলও আছে, আছে 'সকল'। এই প্রজন্মের 'লক্ষ্মীছাড়ার দল' খুঁজে পেতেও পারে তাদের বিশ্ব রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে।

এই বিশ্বে হাঁদাভোদাদেরও স্থান থাকবে না কেন। ছোটবেলায় দিদিরা হাসত কোনও পড়শির তারস্বরে এমন রবীন্দ্রসংগীত সাধা নিয়ে : বসন্ তোবা তাসে। এতে হাসির কী আছে, ভেবে অবাক লাগত। ওই পড়শি তাস খেলতে ভালোবাসতেন, তোবা-ও মুসলমান ঘরামি-সূত্রে জানতাম, আরবি ঘৃণা-সূচক অব্যয়। দিবি৷ মানে দাঁড়াচ্ছে—বসন নিয়ে কোনও অপকর্ম-জনিত, হয়তো তাস খেলার সূত্রে, ধিক্কারের গানে। বহুদিন পরে অবশ্য আবিষ্কার করা গেল গানটির মর্ম : শুনে বাণী ভাসে বসন্তবাতাসে। সুধীর চক্রবর্তী আমাদের জানিয়েছেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছেলেবেলায় এমন গান শুনে তদনুযায়ী অর্থ করে তৃপ্ত ছিলেন, ভীষ্ম যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার। শরশয্যায় ভীষ্ম, অসাধারণ পুরুষ সেই কন্টকশয্যায়ও নিদ্রামগন, আর গগন অন্ধকার—এতে অসুবিধা কোথায়। জয় গোস্বামীও রেডিওতে এমন গান শুনে অখুসি ছিলেন না বাল্যকালে : মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালো মাঝে। সবই যেখানে মহা, কালো রঙটাই বা মহা হতে বাধা কী? হাঁদাভোদারা চিরকালই

হাঁদাভোদা থাকবে। এমন কোনও কথা নেই, অনেকেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয় গোস্বামী হয়ে উঠতে পারেন। যেসব গাইয়েদের উচ্চারণে হাঁদাভোদাদের এই অবস্থা। তা সেই সব গাইয়েদের কি রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করে দেননি : 'গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী?' (এটা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা ভাববেন যিনি তিনি রবীন্দ্রনাথকে চেনেন নি)।

বাংলার ফিল্মি গীত রচয়িতারা ভাবতে পারেন, তাঁদের ভাষায় দোষটা কোথায়? তাঁদের মতোই তো মহাকবিও লিখেছেন এমন কলি : 'আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি কেবল তুমি'। অবশ্যই লিখেছেন। কিন্তু সুরে বসান কথাগুলো, আর মুখরায় ফিরে আসুন গানটার, 'সন্ধ্যা হল গো—মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো', পার্থক্য কোথায়, ফিল্মি লাইনের কোথায় রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরণ ঘটে, ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

এক সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল, হিংসার বঞ্চনার শোষণের এই আধুনিক জগতে শুদ্ধ শান্ত রবীন্দ্রসংগীত প্রাসঙ্গিক কি? তিক্ততায়, অবিশ্বাসে জড়ানো এই জীবনে কী আশ্বাস দেবে ওই গান? তখনই গুমরে ওঠে এমন কলি, 'ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো'। এই কলিটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় ফিরে আসেনি? কামতপ্ত পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা' তাহলে কার?

এক সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল, হিংসার বঞ্চনার শোষণের এই আধুনিক জগতে শুদ্ধ শান্ত রবীন্দ্রসংগীত প্রাসঙ্গিক কি? তিক্ততায়, অবিশ্বাসে জড়ানো এই জীবনে কী আশ্বাস দেবে ওই গান?

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

রবীন্দ্রনাথের গান : লেখকের জবানবন্দী

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

সেই অবাক কিশোরটির কথা আজ আবার পুনরুক্তিতে উঠে এল কলমের মুখে। কেননা এর নাম উপায়হীনতা।

যদিও এ ঘটনা সাধারণ্যে অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই লেখকের কাছে এমনই অনুপম যে, কোনও জুড়ি নেই এর। এমন তো বারবার হয় না। কিংবা বহু ব্যবহারেও প্রাচীন হয় না। একবার, মাত্র একটিবারের আবির্ভাবেই সে বাকি জীবনখানি ভরিয়ে রাখে অথবা ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সে এক গ্রীষ্মদিনের বিকেলবেলা। মফস্বলি বলখেলার মাঠে ফুটবল পড়েছে। ছেলের দল বল নিয়ে দাপাদাপি করছে। বল ছুটছে এধার থেকে ওধারে। এ সবেরই একপাশে পশ্চিমে তেঁতুলগাছের দিকে নিঝুম এক গোলপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে সেই আনমনা কিশোর হঠাৎ শুনতে পেল অদূরের পাড়াঘরের দিক থেকে তখনকার লাউডস্পিকারের মুখ ফেটে অতর্কিত গান : 'আকাশ ভরা সূর্য তারা—বিশ্ব ভরা প্রাণ.......'

সেই মুহূর্তটির বিবরণ সেই মুহূর্তের মধ্যেই নিমগ্ন রইলেও, আজ এতকাল পরে তার স্বপ্নপ্রস্তুতা হারিয়ে যায়নি। সেদিনের সেই স্বপ্ন-সংসারে বুঝি যথার্থই তড়িৎপ্রবাহ ঘটে গিয়েছিল। কেননা অল্প সময়ের জন্য হলেও সে সময় তার চোখের সামনে থেকে কলরব কোলাহল আর ফুটবল মাঠ উবে গিয়ে একমাত্র সেই গোলপোস্ট অবলম্বন বিকেলের মোহচ্ছায়ায় বিপুল গ্রহতারকার আকাশ আঁকা হয়ে গিয়েছিল। মন্দ্র সমুদ্রের বিপুলতা অদৃশ্য এক সুরমণ্ডলে ঘিরে ফেলেছিল। ঘনিয়ে ওঠা সুর যে এমন প্রকাণ্ড হতে পারে, তার পাপড়িগুলি এমন কোমল হতে পারে, কিংবা কী হতে পারে বা পারে না—এমনই সব বিচিত্র টানাপোড়েনের অলীক অসম্ভবে হয়তো বা সেই বিকেলবেলাটি দুলে উঠেছিল। গান বলছিল—বিশ্বভরা প্রাণ—বিশ্বভরা প্রাণ......

এই অনুভবের সঙ্গী শুধু একজন লেখকই নন। প্রতিদিন, প্রতিপলে বিরাট এই সংসারের অগণ্য মানুষ—কে জানে হয়তো বা মানুষেতরেরাও। তবে কিনা একজন কলমকারের বিচরণ যেহেতু উভচরে, ফলে মানুষী-অমানুষীর দায়ে তাকে বেঁধে ফেলা একটু বিষমই হতে পারে। সে কারণেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের গান তার কাছে প্রতি মুহূর্তেই এক শব্দহীন বিস্ফোরণ, কোলাহল উধাও

একজন কলমকারের বিচরণ যেহেতু উভচরে, ফলে মানুষী-অমানুষীর দায়ে তাকে বেঁধে ফেলা একটু বিষমই হতে পারে। সে কারণেই বুঝি রবীন্দ্রনাথের গান তার কাছে প্রতি মুহূর্তেই এক শব্দহীন বিস্ফোরণ, কোলাহল উধাও বিকেলবেলার ফুটবল মাঠ, অথবা কেবলই বিশ্বভরা প্রাণ—কিংবা অন্য কোনও কিছু।

বিকেলবেলার ফুটবল মাঠ, অথবা কেবলই বিশ্বভরা প্রাণ—কিংবা অন্য কোনও কিছু।

এখানে এসে এক ধরনের অতি বাস্তবতার দায়ে পড়ে মনে হয় যে ব্যাপারটি এমন কখনও নয় যে একজন লেখক কেবলই রবীন্দ্রনাথের গানের কাছে যেতেই থাকেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের নামকরণের অজুহাতে। সাধারণ্যে এমনটি ঘটার চল থাকলেও কার্যকারণে আর চেতন-অবচেতনে অহরহ ঘটে চলে এমনই এক লীলা যার আদ্যন্ত ব্যাখ্যা করা সেই ঋণী লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই লেখক কী পাহাড়প্রমাণ অসহায়। এই সব অসহায়তার কোনও হিসেব-নিকেশ হয় না। ফলে বিষয়টি মুখে বলবার অতীত—শরীরের রক্তস্রোতে গোপন হর্ষ-বেদনা অথবা আরও কিছুর চকিত অনুপ্রবেশ, অজ্ঞাত অনুভবের করতাড়না এবং সব শেষে তাঁর গানের কাছে কতক সাড়ে কতক বা নিঃসাড়ে আত্মসমর্পণ।

কেন গেলাম, কোথায় যেতে চাই, কিংবা কখনই বা সেই যাত্রার সময় সংকেত এল লিখতে লিখতে এই সমস্ত তত্ত্বকথা ভারি গোলমেলে। 'চিত্রাঙ্গদা'-র সেই গানখানি মনে করলেই বা কি যথেষ্ট নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! 'পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি, হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে—পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।' বলা বাহুল্য, এও এক বিষম মোহমায়া। আর এ কথাও সত্যি যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচিত গানের মোহজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলেন। জড়াতে জড়াতে জাল ছিন্ন করেছেন এবং যুগপৎ নতুন এক জালে জড়িয়ে পড়েছেন। ফলে দাতা-গ্রহীতার ক্রমাগত জড়িয়ে পড়া, ছিন্ন করা এবং পুনরপি—এই রকমই বিচিত্র ঘুরে মরা।

লেখকের এক সময় মনে হতেই পারে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি 'গীতবিতান' বরাবর পড়ে যাওয়া যেতে পারে। পড়তে পড়তে কাব্য পাঠের বাইরে বাড়তি অসম্ভব অনুভূতিও কিছু ঘটে। বিশেষ করে—গদ্যলেখকের সামনে তাঁর গান পড়ে যাওয়া এবং তার পরিণাম বেপথু স্তব্ধতা। মস্তিষ্কের ঝিমন্ত কোষগুলিতে খানিক প্রাণ আসে। ইচ্ছে করে—নতুন করে আরম্ভ করতে। কিন্তু এ যে কী বিষম আলেয়া! সেই আলেয়ার নিয়ম-শাসন এখনও বহু শতক জারি থাকবে বলেই হয়তো গদ্যকারের কলম বিকম্পিত হয়। সে ভেবে কূল পায় না—এই কবিই যখন গল্প লেখেন তখন কি তিনি কলম বদলে নেন! গান এবং গল্পাদি রচনার ক্রিয়াকলাপও কি আলাদা! এই সময়ের একজন লেখকের তরফ থেকে এমন মূঢ় প্রশ্ন নিছক মূঢ় হলেও চালাকির হাত ধরে যে নয় তা কবুল করতে দোষ কোথায়। বুঝি অনেক কারণের মতো এমন একটির জন্যও রবীন্দ্রনাথ এখনকার লেখকের কাছে কী ভীষণ জটিল আর রহস্যময় চরিত্র। সে কারণেই বুঝি আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে একটিও জ্বলন্ত আখ্যান রচনা করা সম্ভব হয়নি। এ কথা বলার মানে এই নয়—যে আখ্যানকারের এমন একটি দায় সব সময় থেকেই যায়। তাহলেও কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়ে চলেছে সেই কোন কাল থেকে বলেই এই সত্যটিও কবুল করা গেল এবং মনে হল এ সত্ত্বেও গায়ক

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচিত গানের মোহজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলেন। জড়াতে জড়াতে জাল ছিন্ন করেছেন এবং যুগপৎ নতুন এক জালে জড়িয়ে পড়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের, চরিত্র রবীন্দ্রনাথের গায়ে কোনও আঁচড়ই পড়েনি। বরং সে রকম কোনও আগুন রচিত হলে সেই লেখকের জন্যেই নিদান হাঁকা হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের গান পড়ে যাওয়ার যে কথার সূত্রে এত কিছু আজ কথা তার আগে এবং পিছে যে কত কথা ঘুরে বেড়ায়। সেই সব কথা বলে—আগে সুর, পরে কবিতা। কিংবা বিপরীতটা। তা না হলে কেমন করে ওই 'বিশ্বভরা প্রাণ'-এর কথা প্রথম দফাতেই উঠে এল। সব লেখকই জন্মমুহূর্তে পঞ্চজনের মতন কেঁদে ওঠেন—সুরে-বেসুরে যেমনই হোক না কেন। ফলে লেখক কিংবা লেখকেরা যাবতীয় মানুষের কথা বলতে বসলে সুর একটি প্রধানতম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কি কান্নারও কোনও ধারক-বাহক ভাষা আছে ! এখানে অবশ্যই বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের কথা তুলে রাখতে হয়। সেখানে তো ভাষা বা বন্দিশ যেমন তেমন হলেও দোষ নেই। মূল কথা হল সুর বিস্তার। হাজার বার সঁইয়া সঁইয়া করলেও কানে লাগে না। কিন্তু বিষয় যখন রবীন্দ্রনাথের গান তখন মহা মহা কালোয়াতকেও দু-কানে হাত ছোঁয়াতে হয়।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা না বললে সত্য প্রমাণ দাখিল করা যাবে না এবং নিজের সঙ্গে আরও একবার ছল করা হবে। ১৯৯৩ সালের শেষ জানুয়ারিতে ডায়মন্ডহারবারে গঙ্গাবক্ষে 'গঙ্গোৎসব' উৎসব উপলক্ষে গান গাইতে এসেছিলেন পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। সরকারি অনুষ্ঠান। সেই শীতের অপরাহ্ণে এই রচনাকারের দায়িত্ব ছিল গঙ্গার তীর থেকে পণ্ডিতজিকে ভুটভুটিতে নিয়ে আসা এবং ভাসমান জাহাজি মঞ্চে পৌঁছে দেওয়া। কনকনে ঠাণ্ডায় তাঁর পাঞ্জাবি-পাজামাপরা শরীরে কোনও শীত পোশাক নেই। তীব্র লালরঙা শালটি শুধু কাঁধে ফেলা। সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী। নৌকো থেকে ভাসন্ত মঞ্চে হাত ধরে তুলে বসানো হল চেয়ারে—ডেকের ওপর। একটু পরেই তাঁর গান শুরু হবে। গৃহিণী চৌকোনা কৌটো খুলে পান-জর্দা এগিয়ে দিচ্ছেন। সেই ফাঁকে আমি বলে বসি, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। কথা শুনে তাকালেন আমার দিকে। আমি বলি, আজ যদি একটি রবীন্দ্রসংগীত শোনান।

এ কথা বলার সূত্র ছিল আমার কাছে। তার কিছুদিন আগে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত আসরে তিনি রবীন্দ্রনাথের দুখানি গান গেয়েছিলেন।

আবেদন শোনামাত্র তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে আমার এক হাতের কবজি চেপে ধরলেন এবং ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলে গেলেন, নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও......।

আমার হাত ধরে রেখেই তিনি হিন্দিতে বলে উঠলেন, ও গান—গুরুদেবের গান। দরবারি কানাড়া। ওটি শিখতে আমায় আলাদা করে তালিম নিতে হয়েছিল। আজ সে গান নিখুঁতভাবে আমি গাইতে পারব না। সেটা অন্যায় হবে। তুমি কিছু মনে কোরো না।

এই অকপট সরল স্বীকার শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। একজন এত বড়ো শিল্পী, অথচ চালাকি করে এড়িয়ে যাওয়া নেই। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর কাছে এমনই।

আসলে সব শিল্পকর্ম সেধে চলা মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান এক অলখ অবলম্বন। না চাইলেও তিনি এসে দাঁড়ান সত্তা জুড়ে। অস্তিত্ব জারিত করে। সে মাধ্যম কলম, তুলি বা অন্যকিছু যাই হোক না কেন।

লেখকের তরফ থেকে রবীন্দ্রনাথের গান শুধু পড়ে যাওয়ার কথা উঠেছিল সেখানে আরও কিছু প্রশ্ন জড়ো হয়। সে প্রশ্ন যখন গান ঘিরে তখন সুরের কথা অনিবার্য। এ কথা তো সত্যি—যিনি লেখেন তাঁর মনে মনে একটি সুরের ভুবন তৈরি হয়েই আছে। কলম দিয়ে প্রতিটি শব্দ লেখার নেপথ্যে সব সময়েই সুরের লীলা চলে। প্রতিটি অক্ষরই সুরে সুরে টানটান বাঁধা। সুর ছিন্ন হলে কিংবা শব্দাবলি সুরে না বললে লেখা হয় না। তাই এমনটি মনে হওয়া অবান্তর নয় যে, লেখকের চোখের থেকে কান অধিক দড়। আর সেই দু-কান ভরে তিনি শব্দের সুর শোনেন, শুনতে শুনতে কলম ভাসিয়ে দেন অকাতরে। তবে কিনা এ কোনও বিরামদায়ক ব্যবস্থা নয়। সুরে সুরে কথা বলারও তো মকসো ঘর আছে। সেই নমুনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই।

বাংলা ভাষায় যাঁরা লেখালেখি করেন তাঁদের জন্য রবীন্দ্রনাথের গান সব দিক দিয়েই কিছু বাড়তি আশ্রয় দিয়ে বসে আছে। সেই দিক দিয়ে বাঙালি লেখক সুবিধাভোগী, নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথ যখন বলে ওঠেন, 'এ পরবাসে রবে কে হায় ! কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।। হেথা কে রাখিবে দুখভয় সঙ্কটে—তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে', তখন বাঙালি লেখক রাগ-রাগিণী বিচার না করে, পূজা কিংবা প্রেম পর্যায়াদি তুলে রেখে, শুধু দু-কান পেতে দিয়ে গান শোনেন। শুনতে শুনতে ভাষার সঙ্গে সুরের কতখানি মেলামেলি হল তা বিচার করতে সময় পান না। সুর-বাণী ইত্যাদি ছাড়িয়ে বহু দূর মহাশূন্যের সমাচার টের পাওয়া যায়। অনুভবের কাছে কী এক বুক মুচড়ে আসা হাহাকারের হু-হু হাওয়া দাপিয়ে বেড়ায়। চোখের ভেতরে প্রাচীন দরদালান, জাফরিকাটা নকশা, গোলাপায়রার প্রতিধ্বনি থেকে আরম্ভ করে ধু-ধু জ্যোৎস্নার বালুচরি নদী বাঁকে একবাঁক সুপুরি

শিল্পকর্ম সেধে চলা মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান এক অলখ অবলম্বন। না চাইলেও তিনি এসে দাঁড়ান সত্তা জুড়ে। অস্তিত্ব জারিত করে। সে মাধ্যম কলম, তুলি বা অন্যকিছু যাই হোক না কেন।

গাছের দুলন্ত মাথা, দেদার হাওয়ায় মেঘের তল বরাবর একটি নিঃসঙ্গ পাখির উড়ে যাওয়া, এমনকী চোঙাওয়ালা নিঝুম গ্রামোফোনের সামনে নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধা—এমনই কত সহস্র ছবি আঁকা হতে থাকে একের পর এক। এই চলচ্চিত্রমালা এক-একজনের কাছে এক এক রকম। মনে হয় সেই পুরানো বাংলা প্রবাদটি—কৃষ্ণ কেমন, না মন যেমন। তাই তো রবীন্দ্রনাথের গান বহুরূপী। লেখকের সামনে সর্পিল গূঢ় মৃদু জ্যোৎস্নার শুঁড়িপথ। এর কোনও মনোবিজ্ঞান নেই। তথাকথিত পণ্ডিতেরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখে গেলেও এর কোনও সমাপন ঘটে না।

বাঙালি লেখকের এমনতর মনে হতেই পারে—প্রাণের উপর দিয়ে কেমন করে চলে যাওয়া যায়। 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে—বসন্তের বাতাসটুকুর মতো'—সত্যিই কি প্রাণ নামে বায়বীয় কিংবা নির্ভার নিরালম্ব পদার্থের উপর দিয়ে চলে যাওয়া যায় ! এই রকমই অগাধ জাদু বা ম্যাজিক রবীন্দ্রনাথের গান জোড়া। যার হিসেব কষতে বসা মানে সেই অতল জাদুসাগরে নিমজ্জিত হওয়া। এর পরিণাম একজন লেখকের পক্ষে দুঃখ-সুখময়। কিন্তু তাঁর গান এমনই যে, তার দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন আর কোনও পথ নেই।

রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালি লেখকের একরকম জীবনভাষ্যও বটে। আর পাঁচজন মানুষের ভালো লাগার এপারে-ওপারে একজন লেখকের কোনও তারতম্য নেই। লেখক কেবল এক জায়গাতেই একটু আলাদা যে তিনি অহরহ তাঁর গান থেকে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে আহরণই করে যান। নিজের জীবনের সঙ্গে আয়না আয়না খেলা প্রায়ই ঘটে যায়। এমন কোনও দায় নেই যে জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর গান মিশে যেতেই হবে। তাহলে তো জীবনে প্রলয় ঘটে যাওয়ার কথা। গূঢ় জটিল এই গান একজন লেখকের জীবনের উপর দিয়ে অনেকটাই ওই বসন্ত-বাতাসের আলগা চলে যাওয়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালি লেখকের একরকম জীবনভাষ্যও বটে।

এই কলমকারের বারে বারে কেবলই এই গানখানির বিস্ময়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বিলাস হয়। এ বুঝি এক ধরনের ইচ্ছাবিলাস। সেই বিলাসের ফল মনে মনে আখর তোলে, 'সে ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে, চাঁদের আলোর দেশে গেছে, যেখান দিয়ে হেসে গেছে হাসি তার রেখে গেছে রে.....।' লেখকের মনে এই চাঁদের আলোর দেশ কথাটি অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব বলে বেজে ওঠে। চাঁদের দেশ জাতীয় অজস্র কথামালার পর এও কি সম্ভব ! চাঁদের দেশই তো আলোর দেশ। কিন্তু যখনই বলা হয় চাঁদের আলোর দেশ, তখন কী যে আলোর প্লাবন ঘটে যায়। উপলব্ধির কোনও সরল বর্ণনা থাকে না লেখকের জন্যে। তখন সেই গানখানির এক জায়গার মতো বলতে হয়, 'হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল রে.....।'

লেখকের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শুধু বিশেষ ধাঁচের এক সুরমণ্ডল বা আশ্চর্য গীতিকবিতা নয়। লেখকের কাগজ-কলম-বন্দী জীবনের বাইরে থেকে তাঁর গান প্রায়ই ছুটির ডাক পাঠায়। ছুটির প্রস্তাবনা হলেও আদতে সে আরও কাজের ফরমান হেঁকে বসে নিভৃতে। তখনই ভাবনা হয় যে মানুষটি সারাটা জীবন গানে গানে ছুটির ফাঁক খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁকে কী পরিমাণ শারীরিক শ্রম করে যেতে হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন—তিনি আজীবন যে পরিমাণ লিখেছেন তা যদি একজন সরকারি কেরানি মহাশয়কে শুধু কপি করে যেতে হয় তাহলে সেই ভদ্রলোকের গোটা চাকরিজীবন ছাড়াও এক্সটেনশন দিয়েও কুলোবে না। অথচ সেই মানুষটি জীবনব্যাপী ছুটি খোঁজার কথাই বলেছেন গানে গানে, কাজ থেকে পলায়ন করে নিকাজের রহস্য করেছেন।

অতি স্থূলভাবে বলতে গেলে এবং কিঞ্চিৎ হাস্যকরও যে, রবীন্দ্রনাথের গান একটি গল্প লেখার জন্য প্রাণপাত মাথাখোঁড়ার সময়ে হঠাৎ গল্পের অঙ্কুর এনে দেয় লেখকের সামনে। এমন একটি সত্য কবুল করা চালাক-মূর্খতার বাইরে হলেও কেমন করে তাকে লুকিয়ে রাখা যায়। তবু উদাহরণ দেওয়ার মতন বোকামির ফাঁদে না পড়াই ভালো। তা না হলে বঙ্গলেখক বাঁচবে কেমন করে। বিশেষ করে যখন সেই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবাদ আর ফিরে আসেনি এই বাংলায়। এবং রবীন্দ্রনাথের মতো কোনও একজন নতুন প্রাণদাতা নেই এ সাহিত্যসংসারে। সে কারণেই একমাত্র প্রায় প্রাণের তাড়নায় তাঁর গানের কাছে ফিরে ফিরে যাওয়া লেখকের।

এ প্রসঙ্গে—হরেক প্রশ্ন ছেড়ে মনে পড়তে পারে একটি গানের কথা।'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে আর কোলাহল নাই।' এখানেও সেই আশ্চর্য জাদুমায়া ঘিরে আসে। সংসারের সমস্ত জাগতিকতার উর্ধ্বে অলীক মায়া আঁকা হয় মূঢ় লেখকের জন্য। হৃদয়—এক প্রকাণ্ড আঁধার প্রান্তর, যার বুকে রাত্রি এক বিশাল পাখি আস্তে আস্তে ডানা সঞ্চারিত করে ভেসে আসছে। এই অবসরে চারিধারে কোনও কোলাহল নেই। নিঃশব্দ চরাচর।

রবীন্দ্রনাথের গান লেখকের কলমের মুখে বিগলিত আলোর মহিমা। জীবনের পরতে পরতে এক আশ্চর্য রূপপরিক্রমা।

লেখক পরিচিতি : ঔপন্যাসিক

রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যনাট্য : প্রচার ও পরিবেশনা
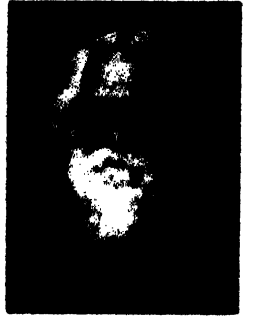
অশোক ঘোষ

রবীন্দ্রসংগীতে ভাষার যে অসাধারণ জাদু আছে, সুরের যে মাদকতাময় আবেদন আছে, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শনের যে গভীরতা আছে তা অতুলনীয়। বাঙালির প্রাণের ভাষায় মনের কথা প্রাণ পেয়েছে রবীন্দ্রসংগীতে। রবীন্দ্রসংগীত বাঙালির প্রাণের সম্পদ, বাঙালির অহংকার। বাংলার প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ, মানুষের জীবনছন্দ, ঋতুবৈচিত্র, ধর্মানুভূতি—সবকিছুরই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রসংগীতে। সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, আবেগ, হৃদয়যন্ত্রণা—এই শত সহস্র আবেগ অনুভূতির মাতৃভাষায় প্রকাশকে তার সংগীতের মাধ্যমে কত সহজতর করে দিয়ে গেছেন আমাদের গুরুদেব, প্রণম্য রবীন্দ্রনাথ। উদ্বোধন করেছেন আমাদের চিত্তকে বিশ্ববীক্ষায়।

কিন্তু আমাদের এই প্রাণের সম্পদকে তিনি শুধু ঘরবন্দী করে রাখতে চাননি। 'বিশ্বময় দিয়াছে তারে ছড়ায়ে'। বিশ্বের আকাশ-বাতাসকেও মুখরিত করেছে রবীন্দ্রসংগীত। শুধু গানের সুরে নয়, তালের ছন্দে নেচে উঠেছে জীবন, মন। নৃত্যের লীলায়, নাট্যকলার শৈলীতে প্রকাশিত হয়েছে পরম কথা। নৃত্য ও নাট্যের বিশ্বজনীন ভাষায় তা পৌঁছে গেছে বাংলার বাইরে, ভারত তথা বিশ্বের কোণে কোণে। এই পৌঁছে দেওয়ার কাজটি যিনি করে গেছেন সেই হরেন ঘোষ, ভারতের প্রথম প্রমোদ পরিবেশক (ইম্প্রেসারিও) হিসেবে যিনি স্বীকৃত—তার কথা আজ অনিবার্যভাবে উঠে আসে।

১৯৩৬ সালে নিউ এম্পায়ারে চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হরেন ঘোষ সহ শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা

রবীন্দ্রনাথ শুধু গান রচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তা প্রসার ও প্রচারের কাজেও ছিলেন সক্রিয়। এ ব্যাপারে গুরুদায়িত্বটি তিনি দিয়েছিলেন হরেন ঘোষকে।

এই কাজের দায়িত্ব নিয়েই ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ কলকাতাসহ বোম্বাই (১৯৩৩) লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ এবং সিংহল প্রভৃতি শহরে Tagore week-এর ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বোম্বাই শহরে ১৯৩৩ সালে একদিকে হয়েছে 'তাসের দেশ' ও 'শাপমোচন' নৃত্যাভিনয় এবং অন্যদিকে সপ্তাহব্যাপী ছিল তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী।

১৯৩৩ সালেই হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠানের পর হায়দ্রাবাদের নিজাম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর জন্য ১ লক্ষ টাকা দেন। ১৯৩৬ সালে মাহাত্মা গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে ৬০,০০০ হাজার টাকা দিয়ে বলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে বিশ্বভারতীর জন্য শহরে শহরে গিয়ে নাচ-গানের অনুষ্ঠান করে অর্থের আয়োজন করা সমীচীন নয়। এ কথায় রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ রুষ্ট হন এবং বলেন, মানুষের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ ও উন্নতির জন্য এইসব অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্রনাথ যখন মনস্থ করেন হরেন ঘোষের উপর এই বিশাল কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন তখন কিন্তু তাঁর দু-একটি ছাড়া বেশি নৃত্যনাট্য ও গান লেখা হয়নি। একদিকে চলছে তাঁর

রবীন্দ্রনাথ শুধু গান রচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তা প্রসার ও প্রচারের কাজেও ছিলেন সক্রিয়। এ ব্যাপারে গুরুদায়িত্বটি তিনি দিয়েছিলেন হরেন ঘোষকে।

নব নব সৃষ্টি আর অপরদিকে অনুষ্ঠান। এটা সম্ভব হয়েছে হরেন ঘোষের মতো নিষ্ঠাবান কর্মবীর মানুষকে পেয়েছিলেন বলে। হরেন ঘোষ জানতেন কেমন করে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করতে হয়। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকতেন বা কোনও কোনও সময় অসুস্থতাহেতু সবকিছুর খবরও নিতে পারতেন না। কিন্তু অনুষ্ঠানের কাজ যে সুচারুভাবে চলছে বা চলবে এ বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর ছিল। তাঁর এই দূরদর্শিতা বিশ্বভারতীর অনেক আর্থিক দুরবস্থা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়ে অর্থকষ্টে বিপন্ন বিশ্বভারতীর সাহায্যের জন্য তিনি কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, কলম্বোয় নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সপ্তাহ পালন করার ব্যবস্থা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালের পর থেকেই বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট দেখা দেয়। ১৯৩০ সালে অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠলে রবীন্দ্রনাথ স্থির করেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যদি বাংলা ও বাংলার বাইরে কয়েকটি প্রদেশে নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা যায় তবে বাংলার মানুষের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষের একটা দিক উন্মোচন হবে এবং বাংলার বাইরের মানুষের সঙ্গে সংস্কৃতির রুচি বিনিময় হবে।

কিন্তু অনুষ্ঠানের কাজ যে সুচারুভাবে চলছে বা চলবে এ বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর ছিল।

হরেন ঘোষ শুধুমাত্র খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করেননি। অনেক অখ্যাত, অপরিচিতকেও পরিচিতির স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশেষ করে সারা ভারতে নৃত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম।

কিন্তু বিশ্বকবির কী অসাধারণ মহানুভবতা ! তিনি হরেন ঘোষের কর্মকুশলতাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি এবং হরেন ঘোষের ভারতীয় ছৌ-নৃত্যদল নিয়ে ইউরোপ যাওয়াকে ভবিষ্যৎ ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পী ও সংস্কৃতির এক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত দিলেন। আজ আমরা তারই ফলশ্রুতি দেখতে পাই।

হরেন ঘোষ তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, 'গুরুদেবের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো, একসঙ্গে থাকা খাওয়া, কথা বলা কত যে ভাগ্যের কথা তা আমি প্রতি মুহূর্তে ভেবে ভেবে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। ভাবি আমি কত ভাগ্যবান।' তিনি যখন ১৯৩৮ সালে সরাইকেল্লার ছৌ-নৃত্যদল নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করে এক পরিচয়পত্র দেন এবং তাতে তিনি লেখেন, 'I have known Mr Haren Ghosh for a long time and recently often had to requisition his help to organise the tours made by the students of the Santiniketan Music School to popularise our music and dancing in various parts of India. Mr Ghosh has gathered great experience as an Impresario and I am really happy that he is taking out a troupe of Indian dancers to Europe and America. His experience in the foreign countries would be of inestimable value in his future work in India and I hope he will also be able to make contacts in those countries whereby exchange of artists between India and the West will be facilitated.'

হরেন ঘোষ

সিংহলে নৃত্যানুষ্ঠানের আসরে শিল্পীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

এমন একজন সৎ রুচিশীল আদর্শবান সৌম্যকান্তি আস্থাভাজন ও কর্মঠ মানুষের উপর রবীন্দ্রনাথ সারা ভারতে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে উপবিষ্ট থাকতেন তাঁর ছবিও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। কাজের দায়িত্বে থাকায় হরেন ঘোষের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মৃত্যুর আগের দিন অর্থাৎ ৬ আগস্ট বিকেলবেলায় সজনীকান্ত দাস তাঁকে ফোন করে বলেন, 'হরেনবাবু শীঘ্র চলে আসুন, গুরুদেবের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়।' এ কথা হরেন ঘোষের ডায়েরিতে লেখা আছে : 'সন্ধ্যা থেকে জ্ঞান হয়েছে একবারও শুনিনি, বারান্দা থেকে দেখছি গুরুদেব আধবসা আধশোয়া অবস্থায় চোখ বুজে আছেন। ২/১ জন ডাক্তাব, বুড়ি, রানি, সৌম্যর স্ত্রী সকলে রয়েছেন। পরদিন ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ সাল বেলা ১২-১৩ মিঃ-এ কবি দেহত্যাগ করেন।'

লেখক পরিচিতি : প্রাবন্ধিক

রবীন্দ্রসংগীত : বিশিষ্টদের অভিমত
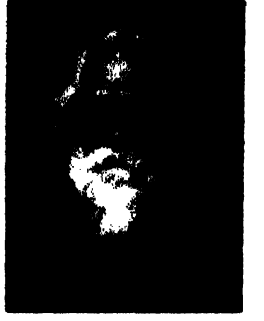
রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত জানতে একগুচ্ছ প্রশ্ন পেশ করা হয়েছিল। তাঁদের মতামত পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হল। প্রথমে প্রশ্নমালা :

(১) আপনার জীবনে রবীন্দ্রসংগীত কতখানি বা কীভাবে জড়িয়ে আছে ?

(২) রবীন্দ্রসংগীত যথার্থভাবে গাইতে বা অনুভব করতে গেলে রবীন্দ্রসাহিত্য বা রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গে পরিচয় থাকা কি একান্ত জরুরি ?

(৩) আপনার কি মনে হয় রবীন্দ্রসংগীত আজ পণ্য হয়ে উঠেছে ?

(৪) ক্রমবর্ধমান রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান কি নতুন শ্রোতা সৃষ্টি করছে নাকি রবীন্দ্রসংগীতের আবহমান চাহিদা মেনেই এই ক্রমবর্ধমান অনুষ্ঠান ?

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

(১) শৈশবে মায়ের মুখে রবীন্দ্রসংগীত শোনা শুরু আমার। আগাগোড়াই রবীন্দ্রসংগীত নিয়েই আছি। গান শেখা শুরু করেছি রবীন্দ্রসংগীত দিয়েই। তারপর অন্যান্য গান। আমার সমস্ত জীবনদর্শন জুড়ে রবীন্দ্রসংগীত। নানা সমস্যার সমাধান খুঁজি রবীন্দ্রসংগীতেই। রবীন্দ্রসংগীতকেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন বলে মনে করি।

(২) একেবারেই। শাস্ত্রীয় সংগীতের যেমন পরম্পরা আছে, রবীন্দ্রসংগীতেরও তাই। সবক্ষেত্রেই চাই গুরু। সম্পূর্ণ গানের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন গুরু। যাঁরা না বুঝে গান গান তাঁদের গান শুনেই তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঢুকতে হবে। এজন্য রবীন্দ্ররচনা পাঠ একান্ত জরুরি।

(৩) সেই অর্থে পণ্য অনেক আগে থেকেই হয়েছে। রেকর্ড, ক্যাসেট এসব তো একটা ইন্ডাস্ট্রি। মুনাফা না হলে লোকে কেন করবেন ? আর গায়ক-গায়িকার লক্ষ্য তাঁর গানটি বিক্রি হতে হবে। পণ্য করব বলে রবীন্দ্রসংগীতকে টিপিক্যাল বাজারি করে তুলব তা একেবারেই কাম্য নয়।

(৪) দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। ইদানীং বেশি হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশেই আদৃত হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত তথা রবীন্দ্রসৃষ্টি। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বেশি করে রবীন্দ্রসংগীত শিখছে। শান্তিনিকেতন, দক্ষিণী, রবিতীর্থ ইত্যাদিতে শাস্ত্রমতে শেখানো হচ্ছে। এটা শুভ ইঙ্গিত। তবে অশুভ দিক হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতকে আরও বেশি করে পণ্য করে তোলা হচ্ছে। দূরদর্শনে দেখছি গাছের ডালে বসে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে। তবে এসব আসছে আবার চলেও যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালের জন্য।

বিমান মুখোপাধ্যায়
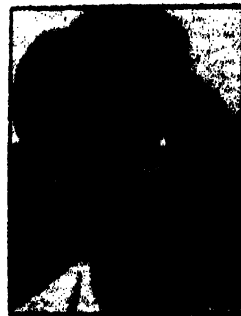
(১) আমার জীবনের বেশির ভাগটাই জুড়ে আছে রবীন্দ্রসংগীত। নজরুলের গান গাইলেও। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সঙ্গে আমার পিতৃদেব সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যোগাযোগ ছিল। তিনি বলতেন, বাংলা

গান গাইতে গেলে রবীন্দ্রসংগীত শেখো। শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়—তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছুতেই আমি প্রভাবিত।

(২) একশো ভাগ দরকার। কেননা রবীন্দ্রনাথের গান এক একটা উৎস থেকে এসেছে। কোনওটা উপনিষদ, কোনওটা ধ্রুপদ, কোনওটা বা টপ্পা থেকে। অন্যের নকল করে গাইলে হবে না। পুরো গান সম্পর্কে জেনে বুঝে গাইতে হবে। সেজন্য রবীন্দ্রসৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত জরুরি।

(৩) পণ্য তো নিশ্চয়ই। আমি যে গাই, সেজন্য তো টাকা নিই। শিল্পীরা তো এক ধরনের পণ্য আদান-প্রদান করেন। কাজেই পণ্য না বলে (শব্দটা ভালো শোনায় না) ব্যবসায়িক স্বার্থে রবীন্দ্রসৃষ্টিকে ব্যবহার করি বলা ভালো।

(৪) আমি রেডিওতে অডিশনে পাশ করলেও বাবা প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আগে ভালো করে শিখতে হবে। দরকারে শিখতে শিখতে বুড়ো হয়ে যাও। ভালোভাবে শেখার পর গাও। আর আজ প্রচারের মোহে অনেকে নিজের পয়সা খরচ করে অনুষ্ঠান করছেন। এধরনের প্রয়াস যে-কোনও শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর। নতুন শ্রোতা তৈরি হবে কেন ? বাঙালি শ্রোতার মন তো রবীন্দ্রসংগীত শোনবার জন্য বরাবরই তৈরি। তাই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতা তৈরি হয় বলে আমার মনে হয় না। আর রবীন্দ্র-অনুরাগী হবার জন্য ফাংশন করার বা ফাংশনে যাওয়ার দরকার আছে বলেও মনে করি না।

প্রমিতা মল্লিক

(১) পুরোটাই। জন্মাবধি (শান্তিনিকেতনে জন্মেছি) রক্তমজ্জায় নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রসৃষ্টির থেকে নিজেকে কখনওই আলাদা ভাবতে শিখিনি।

(২) ভীষণই জরুরি। রবীন্দ্রসাহিত্য বা সংশ্লিষ্ট গানের পশ্চাদপট জানা থাকলে তবেই সঠিক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। যেমন 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' গানটিতে যে শোকের অনুভূতি আছে তা জানা থাকলে এটি আর কেউ পিকনিকে হই হই করে গাইবেন না।

(৩) শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়—যে-কোনও শিল্পই আজ পণ্য। ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন' (সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট) তত্ত্ব অনুযায়ী নিজেকে সবাই বিপণনযোগ্য করে তুলতে চান। আরও বেশি করে বিপণনযোগ্য বা অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলুক। তবে 'কাল'ই বলে দেবে কোনটি চিরস্থায়ী হবে।

(৪) নতুন শ্রোতা খুব যে বেড়েছে তা নয়। সেই তুলনায় উৎকর্ষ বাড়েনি। রবীন্দ্রসংগীতের নতুন শিল্পীদের অনেকের মধ্যেই আবিষ্কার বা ভাবার কিংবা নতুন দিক তুলে ধরার প্রয়াস নেই। গতানুগতিকভাবে পরিবেশিত হয়। এসব নতুন শ্রোতাকে অনুপ্রাণিত করছে বলেও মনে হয় না। উদ্ভাবনী হোক সেটাই কাম্য।

পুবালি দেবনাথ

(১) আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে-দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে-ভবিষ্যৎ ভাবনায় পুরোটাই জুড়ে আছে রবীন্দ্রসংগীত। জীবনের কোনও অংশই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারি না। যখন কষ্ট বা আঘাত পাই তখন রবীন্দ্রনাথের গান গাই। সেই গান আঘাত থেকে আমাকে উন্নত করে, উত্তরণ ঘটিয়ে আমাকে ব্যথার জায়গা থেকে সরিয়ে আনে। আনন্দের সময়েও চলতে ফিরতে তাঁর গানই গাই। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমি রবীন্দ্র-অনুসারী। কাউকে কঠোর কথা বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের থেকে এ শিক্ষা পেয়েছি।

(২) রবীন্দ্রসাহিত্য বা রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গে পরিচয় না হলে তাঁর গান সেই মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া যায় না। তাঁর ভাবনা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের গান আর শুধু তাঁর একার থাকে না— নিজের হয়ে যায়। ফলে গান গাওয়া আর শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়।

(৩) কেউ যদি রবীন্দ্রসংগীতকে পণ্য মনে করে থাকেন বা সেই চেষ্টা করেন তাহলে বলব সেটা তাঁর নিজস্ব ভাবনা। আমি বিশ্বাস করি রবীন্দ্রনাথকে পণ্যের জায়গায় নামিয়ে আনা যায় না। শ্রোতারা শিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে শুনতে মানুষের কান এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে সেখানে পণ্য হওয়া হয়ে উঠবে না। শ্রোতারাই ঠিক করে নেবেন কোনটি গ্রহণ করবেন আর কোনটি বর্জন করবেন।

(৪) আজকের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে আগ্রহী। তাঁরা চান শ্রোতার কাছে রবীন্দ্রনাথের গান পৌঁছে যাক। রবীন্দ্রগানের এই গ্রহণযোগ্যতাই অনেক সময় উদ্যোক্তাদের রবীন্দ্রসংগীতকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে উৎসাহিত করে। তবে নতুনরা সবাইই যোগ্য শিল্পী নন। তবুও তাঁদের মধ্যে থেকে যোগ্যজনকে বেছে নিতে হবে।

রবীন্দ্রসংগীত একদিকে—অন্যদিকে অন্য সব স্ট্রিমের গান। অনেকেই সহজ হবে ভেবে রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে শুরু করেন, পরে আধুনিক বা অন্য গানে যান। এটা করলে রবীন্দ্রনাথ হারিয়ে যাবেন। হতে হলে পুরোপুরি রবীন্দ্রসংগীতেই মগ্ন হতে হবে। এজন্য নতুনদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, সচেতন হতে হবে। সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, পীযূষকান্তি সরকার প্রমুখ রবীন্দ্রসংগীত গেয়েই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এখন অবশ্য তা হয় না। সেটা মেনে নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী না হোক—সীমিত শ্রোতার কাছে পৌঁছেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। হীনম্মন্যতা বা হিংসা ছাড়তে হবে। গভীর জীবনবোধে বিশ্বাস রাখতে হবে।

লোপামুদ্রা মিত্র

(১) রবীন্দ্রসংগীত জুড়ে আছে আমার নিঃশ্বাসে। আমার আনন্দে। আমার দুঃখে। চিত্তশুদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ প্রয়োজন।

(২) খুবই জরুরি। নয়তো তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে বোঝাই যাবে না। বিশেষত তাঁর মৃত্যুভাবনা পড়া না থাকলে। তাঁর প্রকৃতি, প্রেম, পূজা সবকিছু এত একাকার হয়ে আছে যে রবীন্দ্রচিন্তাকে ঠিকমতো না বুঝলে সব ভাসা ভাসা হয়ে যাবে।

(৩) পণ্য না হলে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকা সম্ভব নয়। যুগের নিয়ম—সবকিছুই বাজারে বিকোয়। বাজারে বিকানোর ওপরই সবকিছু নির্ভর করে। এতদিন পরও রবীন্দ্রনাথ সেই জায়গায় রয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ বলেই এটা সম্ভব। সেই অর্থে আমি পণ্য বলে ভাবি না। বাজার থেকে কিছু কিনে আমার ভালো বা উন্নতির কারণ হলে তা তো শুভ লক্ষণ।

(৪) ২৫ বৈশাখের অনুষ্ঠান খুব ভালোই হয়। বাকিগুলোতে যে লোকে হই হই করে শুনতে আসেন তা নয়। হুজুগে বাঙালি গান শুনতে আসেন বটে, তবে বাড়ি ফিরে কে কতটা শোনেন বলা মুশকিল।

আজ মানুষের সমস্যা বেড়ে গেছে। ধৈর্যও নেই। তাই একটু বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে সংগীত পরিবেশন করলে শিল্পী-শ্রোতা সবারই মঙ্গল।

সুমিত্রা সেন

(১) আমার সংগীত জীবনের গোড়াতে নানাধরনের গান গাইতাম। তারপর রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শুরু করার পর অন্য কোনও গানে আর সরে যেতে পারিনি।

রবীন্দ্রনাথের গান আমার কাছে একটা অনুভব, একটা উপলব্ধি।

(২) নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বুঝতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় ; নাহলে যথার্থ ভাবে পরিবেশন করা যায় না। এই বোঝার জন্য তাঁর সাহিত্য বা দর্শনের সঙ্গে পরিচয় থাকতেই হবে।

(৩) তা কিছুটা তো হয়েইছে। রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শিল্পীরা অর্থ উপার্জন করছেন। ক্যাসেট কোম্পানিগুলো ব্যবসা করছে। তবে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি বাঙালির একটা অন্য ধরনের শ্রদ্ধা কাজ করে। পুরোপুরি পণ্য হয়ে ওঠার পথে এই শ্রদ্ধাই হয়তো প্রতিবন্ধকতা করবে।

(৪) দুটোই সত্যি। একদিকে অনুষ্ঠানের আধিক্য যেমন নতুন শ্রোতা তৈরি করছে তেমনই শ্রোতাদের শোনার চাহিদা বাড়ছে বলেই এত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আমি মনে করি যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত শোনেন তাঁরা শিক্ষিত শ্রোতা। তাই এই অনুষ্ঠানগুলির মেজাজও অন্য মাত্রায় বাঁধা থাকে।

শ্রাবণী সেন

(১) এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্য কোনও গান গাইনি। একেক দিন রবীন্দ্রনাথের একেকটা গান একেক রকম মানে নিয়ে আমার কাছে আসে। একেকভাবে সেগুলো আমার অনুভূতিকে নাড়া দেয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের গান দিনভেদে ভিন্ন ভিন্ন আবেদনে আমার কাছে ধরা দেয়।

(২) দরকার। রবীন্দ্রনাথের সব রচনা আমার পড়া নেই কিন্তু তাঁর যে কোনও গান গাওয়ার আগে অনেকবার পড়ে নিই তারপর সেই উপলব্ধির আলোকে কথায় সুরে ছবি আঁকার চেষ্টা করি।

(৩) হ্যাঁ, অন্তত ক্যাসেট কোম্পানিগুলোর দৌলতে পণ্য হচ্ছে। শিল্পীরা কোনও অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত গান গাইতে চাইলে ক্যাসেট কোম্পানিগুলো ঝুঁকি নিতে চায় না। চেনা বাজারচলতি গানগুলোই বারবার গাওয়ানোর নীতি মেনে চলে তারা।

(৪) আগে শ্রোতারা টিকিট কেটে গান শুনতে আসতেন। এখন অবস্থা কিছুটা অন্য রকম। বেশ কিছু উঠতি শিল্পী নিজেরা পয়সা খরচ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা দরকার যে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রসংগীত শুনছে বা শুনতে চাইছে। এই চাহিদাটা বজায় রাখা নির্ভর করে পরিবেশনের পদ্ধতির উপর। ঠিকমতো পরিবেশন করতে পারলে নতুন ছেলেমেয়েরাও গান শোনে।

সাক্ষাৎকার : **স্মরজিৎ প্রামাণিক ও সেরিনা জাহান**